বাণিজ্যধারা

অর্থনীতি ও পৌরনীতি

শ্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রধান অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বর্ধমান রাজ কলেজ ;

সদস্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—অক্টোবর, ১৯২৯

মুদ্রাকর :
শ্রীরামকৃষ্ণ পান
লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস
২০৯বি, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাণিজ্য-ধারার ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যপাঠ্য অর্থনীতি ও পৌরনীতি প্রকাশিত হইল। বাণিজ্য বা ব্যবসায় শাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে প্রয়োগমূলক শিক্ষা, কিন্তু তত্ত্বের অংশ ভালভাবে জানিতে পারিলে তবেই কোন প্রয়োগ-শাস্ত্র অধিগত করা সম্ভব। ক্রেতা ও বিক্রেতার আচার-আচরণ, বাজারের সংগঠন, টাকার ও দ্রব্যের বাজারের নানা প্রতিষ্ঠান ও বেচা-কেনার রীতিনীতি,—এই সকল কিছু সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যদি অর্থনীতির মূল তত্ত্বগুলি জানা থাকে। উপরন্তু, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কার্যে নিযুক্ত কর্মী বা ব্যবসায়ী যেমন একদিকে নিজে নাগরিক, আবার অপরদিকে সে সামাজিক-রাজনৈতিক আইনকানুনে আবদ্ধ। কেবল ক্রয়-বিক্রয় বা হিসাবরক্ষণে নিযুক্ত থাকিলেই সে নিজস্ব কর্তব্যের সীমানায় পৌছায় না, এইরূপ লেনদেনের ভিত্তিতে গঠিত আধুনিক সমাজে তাহাকে সমাজসচেতন নাগরিকের ভূমিকাও পালন করিতে হয়। তাই আধুনিককালে বাণিজ্যে-নিযুক্ত কর্মীদের অর্থনীতির এবং পৌরনীতির মূল বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া সকল দেশের বাণিজ্যধারার পাঠ্যক্রমেই সন্নিবেশিত হইতেছে। এই পুস্তকটিকে সেই ভূমিকা পালন করিতে হইবে, তাহা মনে রাখিয়া ইহা রচিত।

এই পুস্তক প্রসঙ্গে দুইটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীগণ যাহাতে বিষয়টি তোতাপাখীর মত কেবল মুখস্থ না করে, লেখকের তাহাই কামনা। অর্থনীতি ও পৌরনীতি উভয় শাস্ত্রই প্রধানত বিশ্লেষণমূলক। তাই ইহাদের চিন্তা করিয়া বোঝা প্রয়োজন, হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মনে স্বাধীন চিন্তা, নিজস্বতা, মৌলিক মননশীলতা কিরূপে দেখা দিবে? উপরন্তু, বর্তমান জগতে অর্থনীতি ও পৌরনীতি উভয় শাস্ত্রই সদা-প্রসারশীল, সর্বদা ইহাদের সূত্রগুলির আলোচনার পরিধি, ধরন ও গভীরতা পরিবর্তিত হইতেছে। নূতন শিক্ষার্থীদের হাতে যেমন নিজে পড়িয়া বোঝার মত সহজ বই তুলিয়া দেওয়া দরকার, আবার এই সকল তত্ত্বের সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবলম্বনেই ইহার রচনা প্রয়োজন। মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিচার করিবেন, এই উভয় লক্ষ্য কতটা পূরণ করিতে পারিয়াছি।

এই পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর, এমন দাবি লেখক করেন না। আরও কিভাবে ইহাকে উন্নত করা যায়, ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করা যায়, সে-বিষয়ে সকলের নির্দেশ সযত্নে বিবেচিত হইবে, এই আশ্বাস দিতেছি। কোন পুস্তকই একার চেষ্টায় সর্বোত্তম হয় না, অনেকের সাহায্যে ক্রমশ দোষত্রুটিমুক্ত হইয়া উঠে। মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও স্নেহাস্পদ ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে এ-বিষয়ে উপযুক্ত সাহায্য পাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

হরশঙ্কর ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম বৎসরেই পুস্তকখানা ছাত্রীছাত্রী ও শিক্ষকমহলে আদৃত হইয়াছে, তাই এত দ্রুত নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইতেছে। এই সংস্করণে প্রতিটি বিষয়ই পরিমার্জিত করা হইয়াছে, নূতন কয়েকটি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। আশা করি এই উন্নত সংস্করণটি ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি সাহায্য করিতে পারিবে।

হরশঙ্কর ভট্টাচার্য

SYLLABUS

A. ECONOMICS

(Including Indian Economic Problems)

1. Some Fundamental Concepts : Wealth, Goods, Utility, Production and Consumption. Supply and Demand. Value and Price.

2. Wants and their Characteristics—Law of Diminishing Utility—Total and Marginal Utility.

3. Law of Demand—Elasticity of Demand.

4. Factors of Production—Land, Labour, Capital and Organisation. Land and other factors of production—Laws of Returns. Supply and efficiency of Labour—Division of Labour. Capital—Wealth and Capital. The functions of the Organisation.

5. Large-scale Production—Internal and External Economies of large-scale production, small scale production. Localisation of industries. Organisation of large and small industries in India.

6. Exchange : What is a market ? Conditions determining size of market—Value and Price. Value and Competition—Theory of Value Market value and Normal value—Equilibrium of Demand and Supply in the case of market value and in the case of normal value. Value and the Laws of Returns.

7. Money : Barter, what is Money ? Functions of Money. Different kinds of Money in India. Paper money—Value of money. Quantity Theory of Money—Inflation—Prices in India.

8. Credit and Banking : Nature and Characteristics of Credit. Credit instruments. Banking : Central and Commercial Banks and their functions

9. Distribution : Rent, Wages, Interest and Profit. National Dividend and National Income—India's National Income and its principal sources.

B. CIVICS

(Including Indian Administration)

1. Meaning and Scope of the study of Civics.

2. The Individual, Society, the State and the other Associations.

3. Ends and Functions of the Modern State.

4. Citizenship—Citizens and Aliens—Acquisition and termination of citizenship—Indian citizenship. Rights and Duties of a citizen.

5. Law—Meaning of Law. Law and Liberty.

6. Forms of Government—Democracy and Dictatorship. Merits and Demerits of Democracy—Conditions for Democracy.

7. The Executive, the Legislature and the Judiciary. Theory of Separation of Powers.

8. The Electorate—Adult Suffrage—Extent of Electorate—Minority Representation. Voters and Constituencies in India.

9. Government of India—Union Executive and Union Legislature. State Executive and State Legislature. Judicial System.

—

সূচীপত্র

অর্থনীতি

৬

বাজার ও মূল্য নিরূপণ : Market and Price Determination

৭

টাকা ও টাকার মূল্য : Money and Value of Money

৮

ঋণব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কব্যবস্থা : Credit and Banking

খাজনা ও বণ্টন : Rent and Distribution

পৌরনীতি

১

পৌরনীতি : বিষয়বস্তু ও পরিধি : Civics : Meaning and Scope

২

ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

The Individual, Society, the State and Associations

৩

রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কার্যাবলী : Ends and Functions of the State

৪

নাগরিক : The Citizen

১১

ভারতশাসন পদ্ধতি : Indian Administration

অর্থনীতি

অর্থনীতি আলোচনার ভুমিকা

ভোর হইতে রাত্রিবেলায় শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত একটি লোকের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, তাহার প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্য হইল কোন-না-কোন অভাব মিটাইবার চেষ্টা; আবার প্রত্যেকটি অভাব মিটাইবার জন্যই তাহার অর্থের প্রয়োজন। ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলে লোকটি শয্যাত্যাগ করিবে। শয্যায় আছে তক্তপোষ, বালিশ, মশারি, চাদর প্রভৃতি। অর্থের সাহায্যে এই নিদ্রার আয়োজন তাহাকে ক্রয় করিতে হইয়াছে। এই সামান্য অভাব মিটাইবার জন্য কত দেশের কত লোকের যে শ্রম নিয়োগ করিতে হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মশারির কাপড়টি হয়তো বোনা হইয়াছে বোম্বাইয়ের একটি বয়ন কারখানায়, সেলাই হইয়াছে স্থানীয় একটি দরজীর কলে। চাদরটি হয়তো বাঁকুড়ায় তৈয়ারী, সুতা প্রস্তুত হইয়াছে মাদ্রাজের একটি তাঁতে। তক্তপোষ বা খাটটির কাঠ ক্রয় করা হইয়াছে নাগপুরে, আর জিনিসটি তৈয়ার হইয়াছে স্থানীয় কোন আসবাব তৈয়ারির কারখানায়। তোশক ও বালিশের তুলা আসিয়াছে বোম্বাই হইতে, আর তাহাদের আবরণী তৈয়ার হইয়াছে কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি কাপড়ের কলে। ভোরে উঠিয়াই সে হাতমুখ ধুইবে, ইহার উপকরণও তাহাকে অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। দাঁত মাজিবার ব্রুশটি তৈয়ার হইয়াছে জাপানে, দাঁতের মাজন আসিয়াছে সুদূর পাঞ্জাব হইতে। সকালে উঠিয়া তাহার হয়তো চা পান করিবার অভ্যাস। এই অভ্যাসটি মিটাইবার জন্য কয়েকটি উপকরণের আবশ্যক। এই উপকরণও অর্থের দ্বারা ক্রয় করিতে হইয়াছে। চায়ের কাপটি হয়তো তৈয়ার হইয়াছে উত্তর প্রদেশের একটি চিনামাটির পাত্র-নির্মাণ কারখানায়, চায়ের পাতা আসিয়াছে আসামের এক চা-বাগান হইতে, চিনি উৎপন্ন হইয়াছে কানপুরের একটি চিনির কারখানায়, আর গুঁড়া দুধ রপ্তানি করিয়াছে সুদূর আমেরিকা। লোকটি কাপড় বা পায়জামা পরিয়াছে, গায়ে একটি গেঞ্জি, পায়ে স্যাণ্ডাল। গেঞ্জিটি হয়তো তৈয়ার হইয়াছে কলিকাতার একটি গেঞ্জির কারখানায়, সুতা আসিয়াছে বোম্বাই হইতে। পায়ের পাদুকাটি তৈয়ার হইয়াছে বাটার কারখানায়, আর তার চামড়া সংগ্রহ করা হইয়াছে মাদ্রাজ হইতে। সে হয়তো চা খাইয়া পড়িতে বসিল। বইটি ছাপানো হইয়াছে কলিকাতায়, কাগজ তৈয়ার হইয়াছে টিটাগড়ে, ছাপাইবার যন্ত্রটি দিয়াছে জার্মানী, আর ছাপাইবার কালি দিয়াছে জাপান, বাঁধাই করিয়াছে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের দপ্তরী। এইরূপে প্রত্যেকটি কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য কোন-না-কোন অভাব মিটাইবার চেষ্টা এবং সেই অভাব মিটাইতে হইলে প্রতিপদে অর্থের প্রয়োজন। অর্থের সাহায্যে কেমন করিয়া অনন্ত অভাব মেটে, তাহা

আলোচনা করাই অর্থশাস্ত্রের কাজ। আর এই অভাব মিটাইতেছে শত সহস্র লোক, নানাদেশে নানাপ্রকার উৎপাদনের সাহায্যে ও পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া; এই উদ্দেশ্যে তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান, বহুরকমের রীতিনীতি ও আইনকানুন।

অর্থনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু (Definition and Subject-matter of Economics): মানুষের নানা অভাব ও তাহা মিটাইবার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাহাকে "অর্থনীতি" আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থ উপার্জন করিয়া এবং অর্জিত অর্থ ব্যয় করিয়াই মানুষকে তাহার অভাব মিটাইতে হয়। অর্থকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের সকল কাজকর্ম –উহাদের আলোচনাই হইল অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্র।

অর্থের সাহায্যে মানুষ অভাব মেটায়

পৃথিবীর অধিকাংশ কর্মক্ষম লোককেই নানাপ্রকার কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে হয়। কোন কোন লোক হয়তো কাজ করে একটা অলস খেয়ালের বশে। উদ্দেশ্যহীন ভাবেও অনেকে কাজ করে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই কাজ করে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টায়। নানাপ্রকার কাজ করিয়া লোকে টাকা-পয়সা রোজগার করে, কেহ চাষের কাজ করে, কেহ কারখানায় মজুরের কাজ করে। কেহ কেরানীর কাজ করে, কেহ করে ব্যবসা, কেহ করে ওকালতি, ডাক্তারি বা নানা প্রকার চাকরি ও কারিগরি কাজকর্ম। সকলের উদ্দেশ্যই অর্থোপার্জন। অভাব মিটাইবার জন্য অর্থ উপার্জনের ও ব্যয়ের যত প্রচেষ্টা এবং সেই উদ্দেশ্যে গঠিত দেশে যতপ্রকার প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন—উহারাই অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

অভাব মিটাইবার জন্য মানুষ অনেক রকমের কাজকর্ম করে

তবে অর্থ উপার্জন ছাড়াও অন্যান্য নানাপ্রকার কাজে মানুষ আত্মনিয়োগ করে। বৃদ্ধেরা ধর্মালোচনা করে, সাধুরা জপতপ করে, মাতা সন্তান প্রতিপালন করে, অলস লোকেরা বিছানায় শুইয়া মেদবৃদ্ধি করে, ধনীরা খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদে দিন কাটায়। দুঃসাহসী হিমালয়ের শিখরে অভিযান চালায়। এই সব কাজ সাধারণত অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য লইয়া করা হয় না। সুতরাং ইহারা অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় নয়। অর্থশাস্ত্র সেইসব কাজকর্মের কারণ ও ধরন বিশ্লেষণ করে যাহাদের টাকা-পয়সার মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়। শতকরা নব্বইটি লোকের নব্বইটি কাজ অর্থোপার্জনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পৃথিবীতে অতি অল্প লোক বলিতে পারে যে তাহার কোন অভাব নাই, তাহার অর্থের কোন প্রয়োজন নাই, এবং তাহার রোজগার করিবার প্রয়োজনও নাই। অভাবকে কেন্দ্র করিয়া

তাহা মিটাইবার জন্য মানুষের যে-সকল কাজ, উহাদের আলোচনাই অর্থনীতির বিষয়বস্তু—কেম্ব্রিজের বিখ্যাত ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্শাল এই কারণে বলিয়াছেন, সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্মের আলোচনা অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের রূপ আর একটু গভীরভাবে আলোচনা করা দরকার। প্রত্যেকটি মানুষের অভাব সীমাহীন। সর্বদা নানাপ্রকার অভাব মনে জাগিতেছে। কোন একটি অভাব মিটিতে না মিটিতে আর একটি অভাব আসিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করে। নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করা বর্তমান সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। মানুষের অভাববোধ প্রতিনিয়ত বাড়িয়াই চলিয়াছে, ইহার কোন শেষ নাই।

অভাবের শেষ নাই কিন্তু উপকরণ সীমাবদ্ধ

বিজ্ঞানী, শিল্পী যত অভাব অভিযোগ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ততই নূতন অভাব সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতি এত অভাব মিটাইবার মত সম্পদ্ আমাদের হাতে তুলিয়া দেন নাই। কোন দেশে এত সামগ্রী উৎপাদন করাও অসম্ভব। আমাদের প্রত্যেক ছেলে বা মেয়ে যদি একটি করিয়া মোটর গাড়ি চায় বা ছোট একখানা বিমান চায়, তবে সেই অভাব মিটাইবার মত না আছে উপকরণ, না আছে জাতির সামর্থ্য। অভাব অনন্ত অথচ উপকরণ সীমাবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে। প্রতিটি উপকরণকে আমরা বহু প্রকার কাজে ব্যবহার করিতে পারি। আমার একখণ্ড জমি আছে। এই জমিতে আমি ধান, পাট, গম বা ডাল উৎপাদন করিতে পারি। ধান উৎপাদন করিলে পাট উৎপাদন বাদ দিতে হয়, গম বা ডাল উৎপাদন করাও চলে না। মোট উপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ তো বটেই, আবার প্রতিটি উপকরণকে নানা দিকে কাজে লাগানো যায়—এক ব্যবহারে খাটাইলে অন্যান্য ব্যবহারে উহাকে তখন আর নিয়োগ করা চলে না। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ চেষ্টা করিবে কি করিয়া বহু ব্যবহারে নিয়োগযোগ্য সীমাবদ্ধ উপকরণের দ্বারা অসীম অভাব যতটা সম্ভব দূর করা যায়। অপ্রচুর সম্পদ দিয়া অসংখ্য অভাব দূর করা যায় না। সুতরাং আমাদের নির্বাচন করিতে হইবে, কোন্ অভাবটি এখন মিটাইব, কোন্‌টি পরে মিটাইব, কোন্ উপকরণটিকে কোন্ দিকে নিয়োগ করিব। প্রতিটি মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ নির্বাচন ও বাছাই-এর কাজ করিয়া চলিয়াছে। অপ্রচুর সম্বল লইয়া সে বিচার করিতেছে, কোন্ কোন্ সম্বল কোন্ দিকে খাটাইলে তাহার সর্বাধিক অভাবমোচন ঘটিবে, তাহার সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ ঘটিবে। এই সবই মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং সমাজবদ্ধ মানুষের এই সকল কাজকেই অর্থনৈতিক কাজকর্ম বলে এইগুলিই ধনবিজ্ঞান বা অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

১

কয়েকটি মৌলিক সংজ্ঞা

Some fundamental concepts

প্রত্যেকটি বিজ্ঞান আলোচনার সুবিধার জন্য নিজস্ব কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু অর্থনীতি আলোচনার সময়ে আমরা সাধারণভাবে আমাদের চারিপাশের শব্দগুলিই ব্যবহার করি। তবে এই সকল শব্দগুলিকে অনেক সময় ইহাদের প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করিয়া নূতন অর্থ আরোপ করিয়া লই। অর্থনীতি আলোচনার সুবিধার জন্য এইরূপ কয়েকটি শব্দের অর্থ আমাদের জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। এই শব্দগুলি সাধারণ হইলেও ইহারা নিজ নিজ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা একে একে দ্রব্যসামগ্রী (Goods), উপযোগিতা (Utility), সম্পদ্ (Wealth), উৎপাদন (Production), ভোগ (Consumption), যোগান ও চাহিদা (Supply and Demand) এবং মূল্য ও দাম (Value and Price) প্রভৃতি ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করিয়া লইব।

দ্রব্যসামগ্রী (Goods) : যে সকল জিনিসের সাহায্যে মানুষের কোন-না-কোন অভাব দূর করা চলে তাহাদের দ্রব্যসামগ্রী বলা হয়। দ্রব্যসামগ্রীর সাহায্যে মানুষেরা প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। প্রতিদিনই মানুষের নানাপ্রকার জিনিসের আবশ্যক হয়। এই সকল আবশ্যকীয় জিনিসই দ্রব্য। দ্রব্য দুই প্রকার— বস্তুগত ও কার্যগত। বস্তুগত দ্রব্যের উদাহরণ হইল,—বই, খাতা, জুতা, ছাতা, জামা ইত্যাদি। ইহাদের ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরান যায়। কার্যগত দ্রব্যের উদাহরণ হইল সঙ্গীতশিল্পীর রসসৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, ডাক্তারের কাজ, উকিলের কাজ, শিক্ষকতা প্রভৃতি। ইহাদের ধরা-ছোঁয়া যায় না বটে, কিন্তু ইহারা মানুষের অভাব মেটায়। তাই অর্থনৈতিক বিচারে ইহারাও দ্রব্যসামগ্রী।

দ্রব্যসামগ্রীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : অবাধ সামগ্রী ও অর্থনৈতিক সামগ্রী (Free goods and Economic goods)। যে সকল জিনিস পাইতে কোনও টাকা-পয়সার দরকার হয় না, বিনামূল্যেই পাওয়া যায়, তাহাদের অবাধ দ্রব্য বলে। প্রকৃতির অনেক দান এত সুপ্রচুর যে তাহা মানুষের প্রয়োজন মিটাইয়াও অনেক বেশি থাকে। এই সকল দানই অবাধ দ্রব্য। যেমন,—নদীর জল, সূর্যের কিরণ, মুক্ত বাতাস, সাহারার বালুকা প্রভৃতি। এই সকল দ্রব্যের উপযোগিতা আছে। কিন্তু প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া দাম দিতে হয় না।

আবার যে দ্রব্য মানুষের অভাব মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যাহার যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ, তাহা সাধারণত অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিয়া পরিচিত। মানুষের অভাব দূর করে, অথচ যত ইচ্ছা তত পাওয়া যায় না, -এই প্রকার জিনিস দাম দিয়া কিনিতে হয়। যেমন,—বই, টেবিল, ঘড়ি, চেয়ার। তবে কোন জিনিস এক জায়গায় মূল্যহীন হইলেও অন্যত্র মূল্যবান হইতে পারে। যেমন,—সাহারায় বালুকা প্রচুর, সুতরাং সেখানে ইহার দাম নাই। কিন্তু শহরের ঠিকাদারের গুদামে বাড়ি তৈয়ারীর জন্য যে বালুকা থাকে, তাহা অপ্রচুর। এই জন্য উহাকে দাম দিয়া কিনিতে হয়। সেইপ্রকার সাহারা মরুভূমিতে এক গ্লাস জলের দাম আছে, সেইস্থানে অত্যন্ত জলাভাব, কিন্তু নদীর পাশে জলের জন্য কোন দাম দিতে হয় না।

ধন বা সম্পদ্ (Wealth)—সাধারণ ভাষায় ধন বা সম্পদ্ বলিতে আমরা বুঝি—টাকাকড়ি, সোনা, রূপা, মূল্যবান প্রস্তরাদি প্রভৃতি। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে 'ধন' শব্দটিকে একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক দেশে নানা রকম জিনিসপত্রের উৎপাদন ও কাজকর্ম চলিতেছে। কত বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য সমাজে সর্বদা কেনা-বেচা চলিতেছে, আজ এই মুহূর্তে, বর্তমান সময়ের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে দাঁড়াইয়া তাহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। অর্থের বিনিময়ে বেচাকেনা করা যায় এইরূপ সকল দ্রব্যকে সম্পদ্ বা ধন বলে: "Wealth consists of goods which possess exchange value." টাকার বদলে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বা সম্পদ্ হইতে হইলে উহার তিনটি গুণ থাকা নিতান্ত দরকার —উপযোগিতা, দুষ্প্রাপ্যতা, বিনিময়-যোগ্যতা। এই তিনটি গুণ একত্রে না থাকিলে কোন দ্রব্য বেচাকেনা করা যায় না; উহাকেও অর্থনীতিতে সম্পদ্ বা ধন বলিয়া গণ্য করা হয় না।

যে জিনিস টাকার বদলে বেচাকেনা সম্ভব

(ক) উপযোগিতা (Utility)—যে জিনিস আমাদের অভাব দূর করিতে পারে না তাহাকে কখনও সম্পদ্ বলা চলে না। যে লোক লেখাপড়া জানে না তাহার নিকট বই-এর কোন উপযোগিতা নাই। যে ধূমপান করে না তাহার নিকট এক প্যাকেট সিগারেটের কোন মূল্য নাই। অভাব দূর করিবার ক্ষমতা বা উপযোগিতা না থাকিলে কোন জিনিসকে সম্পদ্ বলে না।

(খ) দুষ্প্রাপ্যতা (Scarcity)—কিন্তু উপযোগিতা যতই থাকুক না কেন জিনিসটি অপ্রচুর না হইলে তাহাকে সম্পদ্ বলা যায় না, কারণ, কেহ উহার বদলে টাকা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইবে না। দাম থাকিতে হইলে চাহিদার তুলনায়

তাহার যোগান কম হওয়া আবশ্যক। নদীর ধারে জলের দাম নাই, উহা সম্পদ্ নহে; কিন্তু শহরে পরিমিত যোগান আছে বলিয়া উহার জন্য দাম দিতে হয়। উহাকে তাই সম্পদ্ বলিতে হইবে।

(গ) বিনিময়যোগ্যতা (Exchangeability)—সম্পদ্ হইতে হইলে উহা বিনিময়যোগ্য হওয়া চাই, অর্থাৎ টাকাকড়ির বদলে উহার ক্রয় ও বিক্রয় যেন সম্ভবপর হয়। যে দ্রব্য বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় করা চলে না, তাহা সম্পদ্ নহে।

বিনিময়ের যোগ্য হইতে হইলে উহার দুইটি গুণ থাকা প্রয়োজন—হস্তান্তর-যোগ্যতা (Transferability) ও বহিরবস্থান (external to man)। অর্থাৎ, উহার মালিকানা একজন ব্যক্তির নিকট হইতে অপর ব্যক্তির নিকট চলিয়া যাইতে পারে এইরূপ হওয়া চাই এবং সেইরূপ হইতে হইলে উহাকে মানুষের বাহিরে অবস্থিত থাকিতে হইবে।

হস্তান্তরযোগ্য কাহাকে বলে? দ্রব্যটিকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে পাঠানো সম্ভব না হইলেও, উহাকে একজনের মালিকানা হইতে যদি অন্যের মালিকানায় লইয়া আসা সম্ভব হয়, তবে তাহাকে হস্তান্তরযোগ্য বলা চলে। জমি একস্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠানো চলে না। কিন্তু উহার মালিকানা ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভবপর। সুতরাং উহা সম্পদ্। কিন্তু কোন ব্যক্তির যোগ্যতা, সাধুতা বা দক্ষতা অপর একজনকে দান করা চলে না, তাই ইহাদের সম্পদ্ বলা সম্ভব নয়। কারণ, কোন দ্রব্য যদি মানুষের বাহিরে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে উহাকে একের মালিকানা হইতে অন্যের মালিকানায় সরাইয়া লওয়া যায়, মানুষের মনের বা মস্তিষ্কের জিনিস কাহাকেও দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা, আইনস্টাইনের বিজ্ঞান-প্রতিভা কাহাকেও দেওয়া সম্ভব নয়। উহা তাঁহাদের অন্তর্নিহিত, এইজন্য উহারা হস্তান্তরযোগ্য নয়। টাকার সহিত ইহাদের বিনিময় চলে না, তাই ইহাদের সম্পদ্ বলাও যায় না।

কি কি গুণ থাকিলে বেচাকেনা চলে

এইরূপে দেখা যাইতেছে, বস্তু হউক বা কার্য হউক, সম্পদ্ হইতে হইলে উহাকে বেচাকেনার সামগ্রী হইতে হইবে। বেচাকেনার সামগ্রী হইতে গেলে উহার উপরিউক্ত তিনটি লক্ষণ একত্রে থাকা দরকার। যেমন, সাধারণ ভাষায় বলা হয় স্বাস্থ্যই সম্পদ্। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে ব্যক্তির স্বাস্থ্য কখনই সম্পদ্ নয়, কারণ, উপযোগিতা ও দুষ্প্রাপ্যতা থাকিলেও ইহা বিনিময়যোগ্য নয়। পরীক্ষার সার্টিফিকেটও কেনাবেচা করা চলে না, কারণ, উহা হস্তান্তরযোগ্য নয়। তাই দেখা যায়, এই সকল লক্ষণ একত্রে থাকা দরকার।

ব্যক্তিগত ধন এবং জাতীয় ধন (Individual wealth and National wealth)—প্রত্যেকটি লোকের হাতে যত মূল্যবান জিনিস আছে, উহাদের সমষ্টি তাহার ব্যক্তিগত ধন (Individual wealth)। যেমন—তাহার টাকা-পয়সা ঘর বাড়ি, জমি, আসবাব, সোনা, গহনা, কাপড়-জামা, শেয়ার, সুনাম (goodwill) প্রভৃতি সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তাহার ব্যক্তিগত ধন।

ইহা ছাড়া কতকগুলি সমষ্টিগত ধন (Collective wealth) থাকে। উহারা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। যেমন—হাওড়ার পুল, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ, সিন্ধ্রি সার উৎপাদনের কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা প্রভৃতি। এই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদের যোগফল হইতে বিদেশের নিকট আমাদের দেনা বাদ দিয়া ও উহার সহিত বিদেশের নিকট হইতে আমাদের সকল পাওনা যোগ করিয়া আমরা জাতীয় সম্পদ্ (National wealth) পাইয়া থাকি। মনে কর, ভারতের সমস্ত নাগরিকের ব্যক্তিগত ধনের যোগফল এক হাজার কোটি টাকা, সমষ্টিগত ধনের পরিমাণ দুইশত কোটি টাকা, বিদেশের নিকট দেনা তিন শত কোটি ও পাওনা একশত কোটি। তবে জাতীয় সম্পদের মোট পরিমাণ হইল $(1000+200-300+100)=1000$ কোটি টাকা। কিন্তু কোনও কোনও ব্যক্তিগত ধন জাতীয় সম্পদ্ হইতে বাদ দিতে হয়। যেমন,—ন্যাশানাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট ব্যক্তিগত সম্পদ্, কিন্তু জাতীয় সম্পদ্ গণনার সময়ে উহা বাদ দিতে হয়।

ব্যক্তিগত + সমষ্টিগত = জাতীয়

উপযোগিতা (Utility): অর্থনীতি শাস্ত্রে দ্রব্যসামগ্রী বলিলে বুঝায় যে সকল জিনিসের মধ্যে মানুষের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে। জিনিসের এই ধর্ম বা মানুষের অভাব মিটাইবার এই গুণ বা ক্ষমতাকে উপযোগিতা বলে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন ভাবে হউক যাহাকিছু মানুষের কোন-না-কোন অভাব মিটায় তাহারই উপযোগিতা আছে এরূপ ধরিতে হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে মানুষের অভাব মিটাইবার ক্ষমতাই সেই দ্রব্যের উপযোগিতা।

দ্রব্যের মধ্যে অভাব মিটাইবার ক্ষমতা

প্রতিটি দ্রব্যের মধ্যেই অন্তর্নিহিত কোন-না-কোন গুণ আছে যাহার দ্বারা ইহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে। উপযোগিতা বলিলে দ্রব্যের অন্তর্নিহিত এইরূপ কোন গুণ বুঝায় না। যেমন ধূমপায়ী ব্যক্তির নিকট সিগারেটের উপযোগিতা আছে। সিগারেটের অন্তর্নিহিত স্বাদ ধূম্রপায়ীকে তৃপ্ত করে, প্রত্যক্ষভাবে তাহার অভাব মেটায়। কিন্তু যে ধূমপায়ী নয় এরূপ ব্যক্তির নিকট সিগারেটের অন্তর্নিহিত আস্বাদের কোন গুরুত্ব নাই। সিগারেট সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে তৃপ্তি দিতে

পারে না। কিন্তু কোন বন্ধুকে উপহার দিবার জন্য সে সিগারেট ক্রয় করিতে পারে, তখন সিগারেট তাহার পরোক্ষ অভাব মিটায়। সিগারেটের অন্তর্নিহিত গুণের সহিত উহার উপযোগিতার বা অভাব মিটাইবার এক্ষেত্রে কোন সম্পর্ক নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই সকল ব্যক্তির নিকট একটি দ্রব্যের উপযোগিতা সমান হয় না, অথবা একটি ব্যক্তির নিকট সকল দ্রব্যের উপযোগিতাও সমান নয়। ব্যক্তির মন, রুচি ও অভ্যাসের উপর তাহার নিকট কোন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা নির্ভর করে। যে ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িতে পারে না তাহার নিকট ঘোড়ার যেরূপ উপযোগিতা, তাহার তুলনায় যে ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িতে সক্ষম তাহার উপযোগিতা ভিন্নরূপ। গান গাহিতে জানে না বা সুন্দর ছবি দেখিতে শেখে নাই তাহার নিকট ইহাদের উপযোগিতা স্বভাবতই অন্যরূপ। কেবলমাত্র যে ব্যক্তি-ভেদে উপযোগিতার তারতম্য হয় তাহা নয়। একই ব্যক্তি একই জিনিস হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগিতা পাইতে পারে। রুচি, ফ্যাসান বা বিজ্ঞাপনে পরিবর্তন আসিলে, ঋতু পরিবর্তিত হইলে ব্যক্তির নিকট কোন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা বদলাইয়া যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হউক না কেন

ইহা ব্যক্তির মনের ব্যাপার

মনে রাখা দরকার যে উপযোগিতা ও তৃপ্তি এক নহে। ব্যক্তির মনে দ্রব্যটি পাইবার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে উপযোগিতা বলা চলে। ব্যক্তির ধারণা অনুযায়ী তাহার মনে হয় কোন একটি দ্রব্য তাহার অভাব কতটা মিটাইতে পারিবে। সে ওই দ্রব্যটি পাইতে ততটা ইচ্ছা করে। এই আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্তিটির নিকট দ্রব্যের উপযোগিতা। এই উপযোগিতা বা আকাঙ্ক্ষার দরুন বাজারে দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তির চাহিদা দেখা দেয়।

অর্থনীতিতে এই উপযোগিতা বা আকাঙ্ক্ষা পরিমাপ করা হয় দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তি কি দাম দিতে রাজী আছে সেই টাকার পরিমাণ দ্বারা। যদি দ্রব্যটির জন্য সে বেশি দাম দিতে রাজী থাকে তবে বুঝিতে হইবে তাহার নিকট ঐ দ্রব্যের উপযোগিতা বেশি, যদি সে কম দাম দিতে রাজী থাকে তবে উহার উপযোগিতাও কম। কোন ব্যক্তি কি পরিমাণ টাকা সেই দ্রব্যটি পাইবার জন্য ব্যয় করিতে ইচ্ছুক, অর্থত্যাগের সেই পরিমাণ দ্বারাই উপযোগিতার পরিমাপ করা সম্ভব। সুতরাং ক্রেতা হিসাবে ব্যক্তি কিরূপ দাম দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার দ্বারাই দ্রব্যের উপযোগিতা পরিমাপ করা হইয়া থাকে।

উপযোগিতা পরিমাপ করে টাকার অঙ্কে

উৎপাদন (Production) : প্রকৃতি আমাদের বহু প্রকার বস্তু দিয়াছেন। মানুষ সেই সকল বস্তুর সহিত নিজের শ্রম মিশাইয়া দ্রব্য-সামগ্রী তৈয়ার করে। বস্তু প্রকৃতির দান, মানুষ ইহা সৃষ্টি করিতে পারে না। মানুষ সেই বস্তুকে নিজের অভাব মিটাইবার উপযোগী করিয়া তোলে। মানুষ বস্তুকে এমনভাবে পরিবর্তিত করে, যাহাতে উহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে, অর্থাৎ উহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বস্তুর মধ্যে নূতন বা অতিরিক্ত উপযোগিতা সৃষ্টি করাকেই উৎপাদন বলা হয়।

বস্তু বা কাজের মধ্যে উপযোগিতা সৃষ্টি করা

কোন বস্তুর আকার পরিবর্তন করিয়া নূতন বা বেশি উপযোগিতা সৃষ্টি করিলে উহাকে আকারগত উপযোগিতা (form utility) বলা হয়। যেমন, মানুষ কাঠ হইতে চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির দ্রব্য উৎপাদন করে। মানুষ স্থানগত উপযোগিতাও (place utility) সৃষ্টি করিতে পারে। কোন জায়গায় একটি জিনিস পরিমাণে খুব বেশি পাওয়া গেলে সেখানে উহার দাম কম হয়। যেখানে সেই জিনিসটি বিশেষ পাওয়া যায় না সেখানে উহা লইয়া গেলে উহা দ্বারা সেই অঞ্চলের লোকদের অভাব মিটিতে পারে, ইহাও উৎপাদন। এইরূপে বছরের কোন এক সময়ে যে জিনিস খুব বেশি পরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে মজুত করিয়া যদি অন্য সময়ে উহাকে ব্যবহার করার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও উহাতে উপযোগিতা সৃষ্টি হয়। ইহাও একপ্রকার উৎপাদন; এক্ষেত্রে কালগত উপযোগিতা (time utility) সৃষ্টি হইতেছে। তাহা ছাড়া, মানুষের যে বিভিন্ন প্রকার কাজকর্মের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা বা উপযোগিতা আছে (service utility), সেই সকল কাজকর্ম করাকেও উৎপাদন বলা হয়। যেমন,—ডাক্তারের কাজ, উকিলের কাজ, শিক্ষকের কাজ, কেরানীর কাজ প্রভৃতি মানুষের অভাব মেটায়। তাই, এই সকল কাজ করাকেও অর্থনীতিতে উৎপাদন বলিয়া গণ্য করা হয়।

উৎপাদনের বিভিন্ন রূপ

এই বিষয়ে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি নিছক নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উপযোগিতা সৃষ্টি করে, তবে তাহা উৎপাদন নয়; অন্তত অর্থনীতিশাস্ত্রে উহাকে উৎপাদন বলে না। দ্রব্যটি বিক্রয় করার বা বিনিময় করার জন্য তৈয়ারী হইলে তবেই উহাকে উৎপাদন বলা চলে। সুতরাং, "বিক্রয়ের বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে বস্তুগত বা সেবাগত উপযোগিতা সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলা হয়।"

ভোগ (Consumption): মানুষ যেমন কোন বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না, প্রকৃতির দেওয়া দ্রব্যসাম্যগ্রীর মধ্যে কেবলমাত্র উপযোগিতা আরোপ করিতে পারে, ঠিক সেইরূপ মানুষ বস্তু ধ্বংস করিতেও পারে না। সে বস্তু হইতে উহার অভাব মিটাইবার ক্ষমতা নিজে ব্যবহার করিতে পারে। দ্রব্যসামগ্রীর অভাব মিটাইবার ক্ষমতা ব্যবহার করা অর্থাৎ ইহার উপযোগিতাকে ক্ষয় করা—ইহাকেই অর্থনীতি শাস্ত্রে ভোগ বলে। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায়, "Consumption, in its broadest sense, means the use of the economic goods and personal services in the satisfaction of human wants."

দ্রব্যের উপযোগিতা ক্ষয় করা

মনে রাখা দরকার যে আমরা কোন কোন দ্রব্যের উপযোগিতা স্বল্পক্ষণের মধ্যেই ব্যবহার করিয়া ক্ষয় করিতে পারি, যেমন একগ্লাস জল, একটি সুন্দর ছবি দেখা প্রভৃতি। ইহারা অস্থায়ী দ্রব্য। আবার কোন কোন দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগিতা আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যবহার করি। যেমন বাসগৃহ, মোটরগাড়ী প্রভৃতি। ইহারা স্থায়ী দ্রব্য। ভোগকার্যকে সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। উৎপাদনশীল ভোগ (Productive consumption) এবং অনুৎপাদনশীল ভোগ (Unproductive consumption)। যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করিয়া উৎপাদনের কার্যে সহায়তা হয় তাহাদের বলে উৎপাদনশীল ভোগ। আর যে-সকল দ্রব্যের ভোগের দ্বারা সরাসরি উৎপাদনের সাহায্য হয় না, তাহাদের বলে অনুৎপাদক ভোগ।

চাহিদা (Demand): ব্যক্তির মনে নানাপ্রকার অভাব মিটাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়াই সে নানারকম দ্রব্যসামগ্রী পাইতে চায়। কিন্তু কেবল আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা থাকিলেই অর্থনীতিশাস্ত্রে উহাকে চাহিদা বলা হয় না। যদি ব্যক্তির মনে ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত অর্থব্যয় করিবার বাসনা থাকে তখনই একমাত্র সেই ইচ্ছা চাহিদায় রূপান্তরিত হয়। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বহু সামগ্রী পাইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি সেই দ্রব্যটি পাইবার জন্য বাজারে গিয়া অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হয়, তখন আমরা বলি ঐ দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তির চাহিদা আছে।

এই কারণে চাহিদার সহিত দামের সম্পর্কও অতি ঘনিষ্ঠ। চাহিদা বলিলে বুঝা যায় একটি নির্দিষ্ট দামে কোন এক ব্যক্তি কোন একটি দ্রব্যের কি পরিমাণ ক্রয় করিতে রাজী। ইহাকে বলে ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা (individual demand)। আবার একটি নির্দিষ্ট দামে বাজারের সকল ক্রেতা মিলিয়া দ্রব্যটির মোট যে

পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাকে বলে ঐ দ্রব্যটির জন্য ঐ দামে বাজার-চাহিদা (market demand for the product at that price)। দাম বাড়িলে ক্রেতার চাহিদা কম হইবে, দাম কমিলে তাহার চাহিদা বেশি হইবে। তাই দাম ছাড়া চাহিদার কথা আমার চিন্তা করিতে পারি না। আবার, চাহিদা বলিলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতার চাহিদা বুঝায়। যেমন প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস বা প্রতি বৎসর প্রভৃতি। আমরা বলি যে প্রতি পাউণ্ড 4 টাকা দামে এক ক্রেতা প্রতি সপ্তাহে 5 পাউণ্ড চা বা প্রতি মাসে 20 পাউণ্ড চা চাহিদা করে।

যোগান (Supply): একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট দামে কোন উৎপাদক বাজারে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করেন, তাহা সেই বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান। আর সেই সময়ে ও সেই দামে বাজারের সকল বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান যোগ দিলে তাহা সেই বাজারে সেই দ্রব্যের মোট যোগান।

দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে অনেকে কোন পার্থক্য করেন না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। প্রথমত, যাহা উৎপন্ন হইল তাহার কিছু অংশ ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতারা মজুত করিয়া রাখিয়া দিতে পারে। এই অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগান কম হইবে। অথবা, বিক্রেতারা পূর্বের মজুত হইতে বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য বাজারে ছাড়িয়া দিতে পারে; এই অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগান বেশি হইবে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্য উৎপন্ন হইলে তাহা বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিবেই এমন নহে, কারণ, উৎপাদক নিজের ভোগের জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু পরিমাণ রাখিয়া দিতে পারে। তৃতীয়ত, অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া বাজারে যোগান হইবার পূর্বেই কিছু পরিমাণ নষ্ট হইয়া যায়, যেমন শাক-সব্‌জি, দুধ, মাছ প্রভৃতি। এইরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগানের পরিমাণ কম হইবে।

মূল্য (Value): প্রত্যেকটি সম্পদেরই মূল্য আছে। মূল্য ছাড়া সম্পদ্ হইতে পারে না। মূল্য কথাটি সাধারণত আমরা দুইটি অর্থে ব্যবহার করি। (১) ব্যবহারিক মূল্য ও (২) বিনিময় মূল্য। প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতার দ্বারা ব্যবহারিক মূল্য (use-value) ঠিক করা হয়। যেমন জলের ব্যবহারিক মূল্য খুব বেশি। কারণ, জল ছাড়া মানুষ বেশি দিন বাঁচিতে পারে না। আবার, কোনও একটি জিনিসের পরিবর্তে অন্য একটি জিনিস কি পরিমাণ পাওয়া যাইবে, তাহা উহার বিনিময় মূল্য (exchange-value)। দুইখানা কাপড় দিয়া যদি এক মণ চাউল পাওয়া যায়, তবে একখানা কাপড়ের বিনিময় মূল্য হইল আধ মণ চাউল। সুতরাং

ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্য

এইরূপ বিনিময় ঘটিলে একখানা কাপড়ের বিনিময়ে যতটা চাউল পাওয়া যাইবে, তাহাই কাপড়ের বিনিময় মূল্য।

দাম (Price) **:** কোন দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য টাকাকড়ির সাহায্যে প্রকাশ করিলে সেই টাকা হইল দ্রব্যের দাম (price)। একটি দ্রব্যের পরিবর্তে কত টাকা পাওয়া যায়, তাহাকে উহার দাম বলা হয়। দশ টাকায় একজোড়া কাপড় পাওয়া গেলে আমরা বলি, একজোড়া কাপড়ের দাম দশ টাকা। ঐ কাপড় কিনিতে বেশি টাকা লাগিলে আমরা বলিব যে কাপড়ের দাম বাড়িয়াছে।

Questions to be discussed

1. Define Goods. What is the distinction between Free Goods and Economic Goods ?

দ্রব্যসামগ্রীর সংজ্ঞা দাও। অবাধ সামগ্রী ও অর্থনৈতিক সামগ্রীর মধ্যে পার্থক্য কি ?

2. Define wealth. Do you consider the following to be wealth ?

(i) Health of an individual.
(ii) Musical talent of a singer.
(iii) Higher Secondary Certificate of a student.
(iv) Motor-car.

সম্পদ্ কাহাকে বলে ? নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পদ্ কিনা লিখ :

(i) ব্যক্তির স্বাস্থ্য (iii) কোন ছাত্রের হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষার সার্টিফিকেট
(ii) ব্যক্তির সঙ্গীত-প্রতিভা (iv) মোটর গাড়ী

3. Write short notes on :

(a) Utility, (b) Production, (c) Consumption, (d) Demand, (e) Supply, (f) Value, and (g) Price.

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : (ক) উপযোগিতা, (খ) উৎপাদন, (গ) ভোগ, (ঘ) চাহিদা, (ঙ) যোগান, (চ) মূল্য, (ছ) দাম

২

অভাব ও উপযোগিতা

Wants and Utility

অভাব কাহাকে বলে (What are wants): আমাদের চারিপাশে যে কোন ব্যক্তির দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই তাহার সকল অর্থনৈতিক কাজকর্মের একটি সহজ কারণ আছে। তাহার প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্য হইল কোন-না-কোন অভাব মিটাইবার চেষ্টা। ব্যক্তির মনে কোন-না-কোন জিনিসের জন্য আকাঙ্ক্ষা বা অভাববোধ না থাকিলে সে কোনরূপ অর্থনৈতিক কাজকর্ম করিতে উদ্যোগী হইত না। ব্যক্তির মনে অভাবের অনুভূতি, অর্থাৎ জিনিসপত্র পাইবার আকাঙ্ক্ষা—ইহাই মানুষের সকল প্রকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার উৎস। মানুষকে তাই অনেকে বলেন 'A bundle of desires',—নানাবিধ আকাঙ্ক্ষার সমষ্টি। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায়—"The life history of a normal human being is the record of a continuous sense of incompleteness."

মানুষের মনে অভাব দেখা দেয় কেন ? ইহার প্রথম কারণ সে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাহির হইতে নানারকমের দ্রব্যসামগ্রী না পাইলে তাহার জীবনধারণ করা সম্ভব নয়, এইজন্যই তাহার মনে অভাবের উদ্ভব। কেবলমাত্র শরীর রক্ষার প্রয়োজনেই তাহার দরকার খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়স্থল।

অভাব দেখা দেয় কেন ? ১। শরীর রক্ষার প্রয়োজনে

দ্বিতীয়ত, মানুষ যত সভ্য হইয়াছে ততই শরীরের প্রয়োজন মিটাইয়া, তাহার মনে নিত্য নূতন অভাববোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার মন, অভ্যাস ও রুচি ক্রমশ বিকাশ লাভ করিয়াছে। ফলে নূতন নূতন দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য অভাব দেখা দিয়াছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাবের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরল জীবন যাপন এবং উচ্চচিন্তা আজ আর মানুষের আদর্শ নাই ; জীবন-যাত্রার মান ক্রমাগত বৃদ্ধি করা, নিজের মনে বিভিন্ন প্রকারের অভাব সৃষ্টি করা ও তাহা পূরণ করা—ইহাই সভ্য মানুষের অগ্রগতির মানদণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

২। মন ও রুচির বিকাশের ফলে

তৃতীয়ত, বর্তমান কালে ব্যক্তির মনে দ্রব্যসামগ্রীর জন্য অভাব কেবলমাত্র তাহার নিজের রুচি ও চিন্তার ফল নয়। তাহার অভাব-বোধ আজকাল বৃহত্তর সামাজিক

পরিবেশের দ্বারা নির্দিষ্ট। সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, প্রয়োজন—সকল কিছুর তাগিদে ব্যক্তির অভাবের ধরন (the pattern of wants) নির্ধারিত হয়। ব্যক্তি যে জনগোষ্ঠীতে বাস করে, যে সামাজিক গোষ্ঠীর (social group) সঙ্গে তাহাকে চলাফেরা ও মেলামেশা করিতে হয় (social contacts), সেই সকল গোষ্ঠীর লোকেরা কি কি দ্রব্য ব্যবহার করে, পাইতে চায় বা আয়ত্তে রাখে (used, longed for or possessed) তাহার দ্বারা কোন ব্যক্তির অভাবের ধরন নির্দিষ্ট হইতে থাকে। ব্যক্তি যে যে সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেই গোষ্ঠী হইতে একটু উঁচুতে অবস্থিত বা "সম্মানিত" গোষ্ঠীর লোকেরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করে ব্যক্তির মনে সেইসকল দ্রব্যের জন্য ক্রমাগত অভাব সৃষ্টি হইতে থাকে। তাহার মনে অনুকরণের প্রভাবই এইরূপ নানা অভাবের সৃষ্টি করে।*

৩। সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে

আধুনিক সমাজে ব্যক্তির অভাবের উপর অনুকরণের প্রভাব বা প্রদর্শন-প্রভাব (demonstration effect) ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে।

অভাবের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of wants): মানুষের অভাব সম্পর্কে আলোচনা করিলে উহার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে। প্রথমত, অভাবের সংখ্যা সীমাহীন (wants are unlimited)। ব্যক্তির মনে সর্বদা নানাপ্রকার অভাব জাগিয়া ওঠে। কোন একটি অভাব মিটিতে-না-মিটিতে আর একটি অভাব আসিয়া মনের শূন্যস্থান পূর্ণ করে। ব্যক্তির মনের সচেতন স্তরে কয়েকটি অভাব প্রবলভাবে দেখা দেয় কিন্তু বেশির ভাগ অভাব মনের নীচের স্তরগুলিতে যেন একে একে সাজান আছে। প্রথম স্তরটি শেষ হইলে তাহার পরের স্তরের অভাবটি যেন ভাসিয়া ওঠে। অবিরত ধারায় একের পর এক অভাব মানুষের মনে দেখা দিতে থাকে। আমরা তাই ব্যক্তির অভাবের কোন অন্ত খুঁজিয়া পাই না। দ্বিতীয়ত, সমগ্রভাবে কোন মানুষের অভাব সীমাহীন হইলেও একটি দ্রব্যের জন্য মানুষের মনের অভাব কিন্তু সীমাহীন নয় (particular want is satiable)। পৃথক্‌ভাবে একটি দ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইলে ব্যক্তির মনে সেই দ্রব্যটির জন্য অভাব মিটিতে পারে। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় বলিতে গেলে, "Human wants and desires are countless in

* সামাজিক দৃষ্টিতে অধিকতর সম্মানিত জনগোষ্ঠীর ভোগকাঠামো অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রী নকল করিলে ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও হীনমন্যতা (ambition and inferiority complex) তৃপ্ত হয়।

number and very various in kind; but they are generally limited and capable of being satisfied."*

তৃতীয়ত, (অভাবগুলি পরস্পর পরিপূরক (wants are complementary)। কোন একটি অভাব মিটাইতে হইলে আমাদের কতকগুলি দ্রব্য একসঙ্গে পাওয়া দরকার। কলম ও কালি; চা, চিনি ও দুধ; মোটর ও পেট্রোল—ইহারা একে অন্যের পরিপূরক সামগ্রী (complementary goods)। বাস্তব জীবনে কেবলমাত্র একটি দ্রব্যের জন্য বিচ্ছিন্ন চাহিদা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।) চতুর্থত, অভাবগুলি পরস্পর প্রতিযোগী (wants are competitive)। ইহার কারণ মানুষের অভাব সীমাহীন। কিন্তু অভাব মিটাইবার মত সম্পদ্ পরিমাণে খুবই অল্প। অনন্ত অভাব কিন্তু সীমাবদ্ধ উপকরণ। আবার প্রতিটি উপকরণকে আমরা বহুপ্রকার কাজে ব্যবহার করিতে পারি। আমার একখণ্ড জমি আছে। এই জমিতে আমি ধান, গম, ডাল বা পাট উৎপাদন করিতে পারি। ধান বপন করিলে পাট রোপণ করিতে পারি না, গম উৎপাদন করিলে সেই জমিতে ডাল তৈয়ার করা চলে না। এক ব্যবহারে খাটাইলে অন্য ব্যবহারে উহাকে তখন আর নিয়োগ করা চলে না। বিভিন্ন অভাব একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা চালায়, প্রত্যেকে প্রথমে মিটাইবার জন্য নিজের দাবি পেশ করিতে থাকে। পঞ্চমত, কতকগুলি অভাব পরস্পরের বিকল্প (some wants are alternative)। একটি বিশেষ অভাব মিটাইবার জন্য ব্যক্তি 'হয় এইটি অথবা ওইটি' ব্যবহার করিতে পারে। যেমন পানীয়ের অভাব মিটাইবার জন্য চা, কফি ও কোকো যে-কোন একটি দ্রব্য ব্যবহার করা চলে। একটির পরিবর্তে অপর দ্রব্যটি দিয়া অভাব মেটানো যায় বলিয়া এই সকল দ্রব্য একে অন্যের পরিবর্ত-সামগ্রী (substitutes)। ষষ্ঠত, একটি অভাব বারবার দেখা দেয় (wants recur)। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইলে দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তির অভাব সাময়িকভাবে মেটে ঠিকই। কিন্তু কিছু কাল পরে, কিছুটা সময়ের ব্যবধানে, আবার সেই দ্রব্যের জন্য অভাব জাগিয়া উঠিতে পারে। তখন সেই অভাবকে আবার মিটাইতে হয়। এইরূপে তাহার কোন একটি দ্রব্য ব্যবহারের অভ্যাস গড়িয়া উঠে। উহা হইতে আমাদের জীবনযাত্রার মান তৈয়ার হয়।

* অভাবের এই বৈশিষ্ট্যই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়মের ভিত্তি। যেহেতু প্রতিটি অভাবই তৃপ্তিযোগ্য (satiable), এই কারণে ব্যক্তি একটি দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করিতে থাকিলে উহা হইতে তৃপ্তির মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য, আরামের দ্রব্য ও বিলাসের দ্রব্য (Necessaries, Comforts and Luxuries) : যে সকল দ্রব্যসামগ্রী দিয়া ব্যক্তি তাহার অভাব মোচন করে উহাদের আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি—প্রয়োজনীয় দ্রব্য, আরামের দ্রব্য ও বিলাসের দ্রব্য। (i) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (necessaries of life) হইল যাহা ব্যক্তির শরীর রক্ষার জন্য একান্ত দরকার, যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি। (ii) দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (necessaries of efficiency) হইল যাহাদের না হইলেও আমাদের জীবন ধারণ করা সম্ভব, কিন্তু পাইলে আমাদের দক্ষতা বাড়ে। যেমন, কোন ছাত্রের জন্য একটি টেবিল, একটি চেয়ার ও একটি টেবিল-বাতি। (iii) প্রচলিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য (conventional necessaries) : যে সকল দ্রব্য অনবরত ব্যবহার করিতে করিতে ব্যক্তি একেবারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, উহাদের না হইলে তাহার একেবারেই চলিবে না। যেমন বিশেষ কোন ওষুধ, তামাক বা মদ্যাদি। আবার সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ করিতে হইলে ব্যক্তিকে কতকগুলি দ্রব্য প্রথাগত ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, যেমন বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। যেমন, শহরে কোন স্কুলের ছাত্রকে জুতা পরিধান করিতেই হয়, উহাই রীতি। বিদ্যালয়ের শিক্ষককে গায়ে জামা দিতেই হয়, কারণ, এইরূপ রীতি সকল স্কুলে সকল শিক্ষক মানিয়া চলেন।

আরামের দ্রব্য (comforts) বলিলে এমন দ্রব্যসামগ্রী বুঝায় যাহা ব্যক্তি তখনই কেনে যখন তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব মিটিয়াছে। এই সকল জিনিস ব্যবহার করিলে তাহার আরাম বোধ হয়, যেমন গ্রীষ্মকালে বৈদ্যুতিক পাখা, বাড়িতে পাচক বা ভৃত্য রাখা ইত্যাদি। ইহাদের ব্যবহারের ফলে দক্ষতা বাড়ে বটে, কিন্তু ব্যয়ের তুলনায় দক্ষতা বৃদ্ধি বেশি নয়।

বিলাস-সামগ্রী (luxuries) বলিলে বোঝা যায় যে সকল দ্রব্য ব্যবহার না-করিলে কোন ক্ষতিই নাই, বরং উহা অপব্যয়। ব্যক্তিগত ভোগের আতিশয্যই বিলাস, "Luxury in its ordinary sense means anything that satisfies a superfluous want"

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, দ্রব্যসামগ্রীকে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা সম্ভব নয়, ইহাদের মধ্যে সর্বদা-নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা টানা চলে না। একই দ্রব্য কাহারও নিকট আরামের দ্রব্য, আবার কাহারও নিকট বিলাসের সামগ্রী। মোটর গাড়ি কাহারও নিকট বিলাস-দ্রব্য, কাহারও নিকট আরাম-সামগ্রী, আবার ব্যস্ত ডাক্তারের নিকট একান্ত প্রয়োজনীয়।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম (Law of Diminishing Utility): কোন দ্রব্য ব্যক্তির অভাব মিটায় বলিয়া সে উহা পাইতে চায়, উহার জন্য তাহার মনে চাহিদা দেখা দেয়। দ্রব্যটির জন্য এই আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদার কারণ উহার অভাব মিটাইবার ক্ষমতা। দ্রব্যের এই ক্ষমতাকে বলে উহার উপযোগিতা (utility)। কোন ব্যক্তির নিকট একটি দ্রব্যের উপযোগিতা কতটা তাহা পরিমাপের উপায় হইল ওই দ্রব্যটির জন্য কত টাকা সে ছাড়িয়া দিতে রাজী আছে। উহার জন্য বেশি টাকা ছাড়িয়া দিতে রাজী থাকিলে, অর্থাৎ বেশি দাম দিতে রাজী হইলে আমরা বলি যে তাহার নিকট উহার উপযোগিতা বেশি। যতটা দাম সে দিতে প্রস্তুত, তাহাই ব্যক্তির নিকট দ্রব্যটির উপযোগিতার পরিমাপ।

ব্যক্তির নিকট কোন একটি দ্রব্যের কতটা উপযোগিতা, অর্থাৎ দ্রব্যটি পাইবার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা কতটা তাহা নির্ভর করে ব্যক্তির আয়ত্তে দ্রব্যটির কি পরিমাণ আছে। একজনের তিনজোড়া জুতা আছে, তাহার তুলনায় যাহার একজোড়াও জুতা নাই সেই ব্যক্তির নিকট জুতার উপযোগিতা স্বভাবতই বেশি। একজোড়া পাইবার পরে দ্বিতীয় জোড়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা বা উহার উপযোগিতা প্রথম জোড়ার তুলনায় কম। আবার দুই জোড়া পাইবার পরে তৃতীয় জোড়ার উপযোগিতা আরও কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য যত অধিক পাইতে থাকে, ততই তাহার নিকট উহার আর একটি ইউনিট পাইবার আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পায়। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় বলিতে গেলে "The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing, diminishes with every increase in the stock that he already has." এই নিয়মকেই অর্থনীতি শাস্ত্রে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম বলে। কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরবর্তী ইউনিটটির উপযোগিতার হ্রাস ঘটে দ্রুত হারে, কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে ধীর গতিতে। কিন্তু সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এই নিয়মটি প্রযোজ্য।

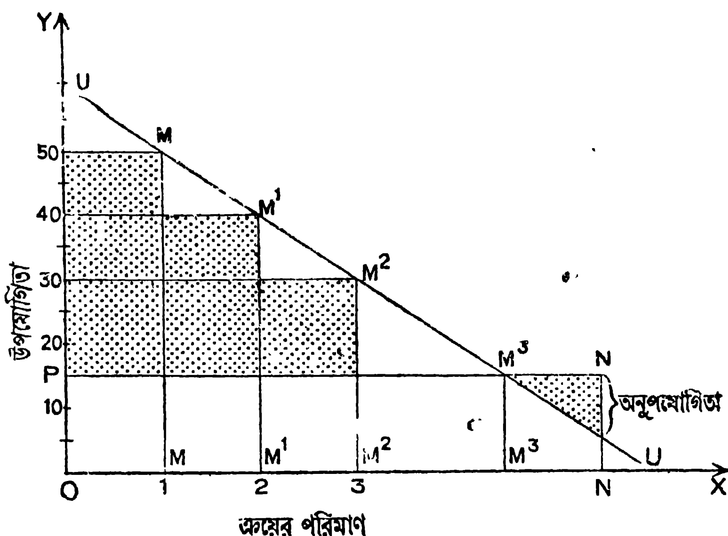
উপযোগিতার পরিমাপ করা হয় টাকার অঙ্কে। অর্থাৎ দ্রব্যটি পাইবার জন্য যত টাকা ব্যক্তি ছাড়িয়া দিতে রাজী আছে উহাই দ্রব্যটির উপযোগিতা। তাই দামের হিসাবে এই নিয়মটিকে প্রকাশ করা চলে। ধরা যাউক কোন ব্যক্তি এক জোড়া জুতার জন্য 50 টাকা দিতে রাজী আছে। উহাই তাহার নিকট ওই জোড়ার উপযোগিতা। সে দ্বিতীয় জোড়ার জন্য প্রথম জোড়ার তুলনায় কম দাম দিতে রাজী, কারণ, উহার উপযোগিতা প্রথমের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে। ধরা যাউক সে 40 টাকা দিতে প্রস্তুত আছে। তৃতীয় জোড়ার উপযোগিতা তাহার নিকট

আরও কম, ধরা যাউক 30 টাকা। এইরূপে চতুর্থ জোড়ার উপযোগিতা 15 টাকা। তাহার নিকট জুতার পরিমাণ বাড়িতেছে বলিয়া পরবর্তী আর একজোড়া জুতার জন্য আকর্ষণ কমিতেছে, অর্থাৎ উহার উপযোগিতা হ্রাস পাইতেছে। পরবর্তী ইউনিটটির জন্য সে কত দাম দিতে রাজী উহা হইতেই বুঝা যায় উপযোগিতা কিরূপ হারে হ্রাস পায়। এইরূপে ক্রেতা ক্রয় বাড়াইতে থাকে। ক্রমে সে এমন এক স্তরে পৌছায় যাহার পরে আর অধিক ইউনিট ক্রয় করিতে সে প্রস্তুত নয়। ধরা যাউক, বাজারে জুতার দাম প্রতি-জোড়া 15 টাকা, ক্রেতা 4 জোড়া জুতা কিনিবে। উহার পরে পঞ্চম জোড়া হইতে সে উপযোগিতা পাইবে 5 টাকা, কিন্তু দাম দিতে হইবে 15 টাকা। ইহাতে তাহার লোকসান। ফলে সে মোট 4 জোড়া জুতাই কিনিবে, এবং 4 জোড়ার অতিরিক্ত আর এক ইউনিট বা পঞ্চম জোড়া সে ক্রয় করিবে না।

কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের মোট যে পরিমাণ ক্রয় করে উহার সর্বশেষ ইউনিটকে বলে প্রান্তিক ইউনিট (marginal unit) এবং সেই ইউনিট হইতে পাওয়া উপযোগিতার নাম প্রান্তিক উপযোগিতা (marginal utility)। দ্রব্যটির মোট যে-পরিমাণ কেনা হইয়াছে উহার প্রত্যেকটি ইউনিটের পৃথক্ উপযোগিতাগুলি যোগ করিলে পাওয়া যায় মোট উপযোগিতা (total utility)। ক্রেতা যখন প্রথম জোড়া জুতা কেনে তখন তাহার মোট উপযোগিতা 50 টাকা, প্রান্তিক উপযোগিতাও 50 টাকা। যখন সে 2 জোড়া কেনে, তখন তাহার মোট উপযোগিতা হয় 90 টাকা (50+40), কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা হইল 40 টাকা। যখন সে 3 জোড়া কিনিতেছে তখন তাহার মোট উপযোগিতা হইল 120 টাকা (50+40+30), কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা 30 টাকা। সে 4 জোড়া কিনিলে তাহার মোট উপযোগিতা হয় 135 টাকা (50+40+30+15), কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা কমিয়া হয় 15 টাকা। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে ক্রেতা ক্রমান্বয়ে কোন দ্রব্যের একের পর এক ইউনিট কিনিতে থাকিলে দ্রব্যটি হইতে প্রাপ্ত মোট উপযোগিতা বাড়িতে থাকে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা কমিতে থাকে। অধ্যাপক মার্শাল তাই এই নিয়মটিকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "The marginal utility of a thing to any one diminishes with every increase in the amount of it he already has." এই কারণেই ইহাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম (Law of Diminishing marginal utility) বলে। এই নিয়মটিকেই পর পৃষ্ঠায় তালিকার আকারে দেওয়া হইল:

দ্রব্যটির ইউনিট : প্রতি জোড়া জুতা	বাজার দর	ব্যক্তি কত দাম দিতে রাজী বা উপযোগিতার পরিমাপ	মোট উপযোগিতা (বৃদ্ধি পাইতেছে)	প্রান্তিক উপযোগিতা (হ্রাস পাইতেছে)
1ম জোড়া জুতা	15 টাকা	50 টাকা	50 টাকা	50 টাকা
2য় জোড়া জুতা	15 টাকা	40 টাকা	90 টাকা	40 টাকা
3য় জোড়া জুতা	15 টাকা	30 টাকা	120 টাকা	30 টাকা
4র্থ জোড়া জুতা	15 টাকা	15 টাকা	135 টাকা	15 টাকা

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার এই নিয়মটিকে আমরা একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। যেমন, নীচের চিত্রে OX রেখাটি ক্রয়ের পরিমাণ-সূচক এবং OY রেখাটি দ্রব্যের বিভিন্ন ইউনিট হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতার পরিমাণ



পরিমাপ করিতেছে। OP পর্যন্ত হইল বাজার দর। প্রথম ইউনিট হইতে ক্রেতা উপযোগিতা পায় MM, দ্বিতীয় ইউনিট হইতে M_1M_1, তৃতীয় ইউনিট হইতে M_2M_2, এবং চতুর্থ ইউনিট হইতে M_3M_3 উপযোগিতা পাইতেছে। এই পরিমাণ

উপযোগিতা বাজার দরের সমান ; তাই সে এই দামে মোট চার ইউনিট ক্রয় করিবে। যদি সে পঞ্চম ইউনিট কেনে তাহা হইলে 10 টাকার অনুপযোগিতা ঘটিতেছে।*

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়মের অনুমানসমূহ (Assumptions of the Law of Diminishing Utility) : ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম ব্যাখ্যা করার সময়ে কতকগুলি বিষয় ধরিয়া লইতে হয়। ইহাদের বলে এই নিয়মটির অনুমানসমূহ (বা assumptions)। এই সকল অনুমান ধরিয়া না-লইলে নিয়মটি কার্যকর না-ও হইতে পারে। প্রথমত, বলা হয় যে, ক্রেতার ক্রয় বা ভোগের সময় খুবই কম বা নির্দিষ্ট। যদি বেশি সময়ের মধ্যে ভোগ-কার্য ঘটে তবে উহার মধ্যে ক্রেতার রুচি, পছন্দ বা অভ্যাস বদলাইয়া যাইতে পারে। এরূপ ঘটিলে এই নিয়মটি কার্যকর না-ও হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যটির ইউনিটগুলি পর্যাপ্ত বা উপযুক্ত আয়তনের হওয়া চাই। প্রথম দিকের ইউনিটগুলি ছোট বা কম হইলে ক্রেতা পরবর্তী ইউনিটগুলি হইতে অধিক উপযোগিতা পাইতে পারে

তৃতীয়ত, ইহাও ধরিয়া লইতে হয় যে এই ভোগ-কালের মধ্যে ক্রেতার আয় সমানই আছে, উহাতে কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে না। আয়ে পরিবর্তন হইলে এই নিয়ম কার্যকর না-ও হইতে পারে। যেমন, ক্রেতা প্রথম জোড়া জুতা হইতে 50 টাকার উপযোগিতা পায়, দ্বিতীয় জোড়া হইতে 40 টাকার। কিন্তু প্রথম জোড়া ক্রয়ের পরেই তাহার আয় মাসিক 600 টাকা হইতে 1000 টাকা হইয়া গেলে দ্বিতীয় জোড়ার জন্য সে হয়ত 60 টাকা দিতে প্রস্তুত হইবে। তাই ধরিয়া লইতে হয় যে, ভোগ-কালের মধ্যে ক্রেতার আয়ে কোন পরিবর্তন আসে না।

মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতা (Total and Marginal Utility) : আমরা যখন উপযোগিতার কথা বলি তখন সাধারণত মোট উপযোগিতা ধরিয়া লই। এক ব্যক্তি কোন দ্রব্যের যে কয়টি ইউনিট ক্রয় করিয়াছে তাহাদের প্রতিটি ইউনিটের উপযোগিতা যোগ করিলে মোট উপযোগিতা পাওয়া যায় যেমন, শার্টের উপযোগিতা বলিলে বোঝা যায় নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তির হাতে যে-কয়টি শার্ট আছে উহাদের মিলিত মোট উপযোগিতা।

এই মোট উপযোগিতা কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা হইতে পৃথক্। ক্রেতা যখন এক ইউনিট কম বা বেশি কেনে তখন তাহার মোট উপযোগিতা যতটুকু কমে বা বাড়ে তাহাই প্রান্তিক উপযোগিতা। ব্যক্তির হাতে 9টি শার্ট আছে। তাহার মোট উপযোগিতা 100 ; যখন সে 10টি শার্ট কেনে তখন তাহার মোট উপযোগিতা

* অনুপযোগিতার ক্ষেত্র ছাড়া চিহ্নিত স্থানগুলি ভোগোদ্বৃত্তের (consumers' surplus) পরিমাপ দেখাইতেছে।

108। এইরূপ অবস্থায় প্রান্তিক উপযোগিতা 8। ব্যক্তির হাতে মজুত কোন দ্রব্যের সকল ইউনিটের পৃথক্ পৃথক্ উপযোগিতার যোগফল হইল মোট উপযোগিতা; আর এই অবস্থায় এক ইউনিট কম বা বেশি ক্রয় করিলে মোট উপযোগিতার পরিবর্তনটুকুর নাম প্রান্তিক উপযোগিতা।

মোট উপযোগিতা পরিমাপ করা যায় কি উপায়ে? ভোগের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক উপযোগিতাগুলি যোগ করিয়াই মোট উপযোগিতা পাওয়া যায়। যেমন,

ভোগের ইউনিট	1+ 1+ 1+1+1
প্রান্তিক উপযোগিতা	20+15+10+8+7

ক্রেতার হাতে ঠিক এক প্রকার পাঁচটি শার্ট থাকিলে মোট উপযোগিতা হয় 60; ভোগের বিভিন্ন স্তরে প্রতিটি ইউনিটের প্রান্তিক উপযোগিতা যোগ দিয়া ইহা পাওয়া গিয়াছে।

মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতার মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ? কোন ব্যক্তি যখন একটি দ্রব্যের একের পর এক ইউনিট ক্রয় করিতে থাকে, তখন উহার প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রমশ হ্রাস পায়, কিন্তু মোট উপযোগিতা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়িতে থাকে। কিছুসংখ্যক ইউনিট কেনার পরে এমন এক স্তরে ব্যক্তি পৌছায় যাহার পরে আর সে ক্রয় করে না। কারণ, আরও ক্রয় করিলে প্রান্তিক উপযোগিতা 0 হইবে এবং উহার পরে ঋণাত্মক (negative) হইতে থাকিবে, অর্থাৎ উপযোগিতার বদলে অনুপযোগিতা (disutility) পাওয়া যাইবে।

নীচের তালিকা হইতে উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক বুঝা যাইতেছে:

ইউনিট	মোট উপযোগিতা	প্রান্তিক উপযোগিতা	ইউনিট	মোট উপযোগিতা	প্রান্তিক উপযোগিতা
1	100	100	6	310	10
2	180	80	7	310	0
3	240	60	8	305	-5
4	280	40	9	285	-20
5	300	20	10	255	-30

উপরের তালিকাটিতে দেখা যায় যে ষষ্ঠ ইউনিট পর্যন্ত প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস পাইতেছে, মোট উপযোগিতা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়িতেছে। সপ্তম ইউনিটের প্রান্তিক উপযোগিতা 0, এই অবস্থায় মোট উপযোগিতা সমানই আছে। সে যদি অষ্টম ইউনিট ক্রয় করে (বাস্তবে কোন ক্রেতা এইরূপ করে না), তবে তাহার প্রান্তিক উপযোগিতা হয় ঋণাত্মক (−5) এবং মোট উপযোগিতা হ্রাস পায় (305)।

মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতার মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব অর্থনীতিশাস্ত্রে খুবই বেশি। দ্রব্যের মূল্য দেখা দেয় কেন, অথবা মানুষের নিকট অনেক বেশি উপযোগী অনেক

দ্রব্যের মূল্য কেন খুব কম অথচ অনেক কম উপযোগী দ্রব্যের মূল্য কেন এত বেশি, তাহা বুঝিতে হইলে মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতার পার্থক্য জানা দরকার। এককালের অর্থনীতিবিদ্‌রা এই পার্থক্য জানিতেন না বলিয়া অনেক সময় বিভ্রান্ত হইতেন। জলের উপযোগিতা খুবই বেশি, জীবনধারণের পক্ষে হীরার উপযোগিতা নগণ্য। তবুও বাজারে জলের কোন দাম নাই, অথচ হীরার দাম খুবই বেশি। জলের উপযোগিতা বেশি অথচ দাম নাই, আবার হীরার উপযোগিতা নাই কিন্তু দাম বেশি—এই আপাতবিরোধিতা (paradox) ব্যাখ্যা করিতে হইলে মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতার পার্থক্য জানা দরকার। জলের মোট উপযোগিতা খুবই বেশি সন্দেহ নাই। তাহার কারণ জল না পাইলে ব্যক্তির মোটেই চলিবে না, যখন তাহার হাতে অল্প একটুও জল নাই, তখন প্রথম গ্লাস জলের জন্য সে প্রচুর দাম দিতে রাজী, উহার উপযোগিতাও অপরিসীম, কিন্তু ব্যক্তির হাতে এত বেশি পরিমাণ জল আছে যে তাহার পরে আর এক ইউনিট বেশি জলের জন্য সে কোন দাম দিতে রাজী নয়। অর্থাৎ জলের প্রান্তিক উপযোগিতা নাই। কিন্তু ব্যক্তি এক ইউনিট হীরার জন্য প্রচুর দাম দিতে রাজী, অর্থাৎ হীরার প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই বেশি। তাই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতাই দামকে প্রভাবিত করে, মোট উপযোগিতা নয়।

Questions to be discussed

1. Define wants and discuss their characteristics.

অভাব কাহাকে বলে? অভাবের বৈশিষ্ট্য কি?

2. Discuss the Law of Diminishing Utility with assumptions and limitations.

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা বিধি কাহাকে বলে? ইহার অনুমানগুলি ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

3. Discuss the law which proves that a particular want is satiable.

একটি নির্দিষ্ট চাহিদাকে যে তৃপ্ত করা সম্ভব ইহা কোন্ বিধি অনুযায়ী প্রমাণ করা সম্ভব?

4. What are the assumptions of the Law of Diminishing Utility?

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা বিধির অনুমানগুলি কি কি?

5. Distinguish between Total and Marginal utility. Why is this distinction important?

মোট এবং প্রান্তিক উপযোগিতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। এই পার্থক্যের গুরুত্ব কি?

6. Explain why water though useful has little value, and diamond which is less useful has more value.

'জলের উপযোগিতা আছে অথচ মূল্য নাই এবং হীরার উপযোগিতা কম অথচ মূল্যবান'—ব্যাখ্যা কর।

৩

চাহিদা

Demand

স্থান, কাল ও প্রতিযোগিতার দিক হইতে বাজার যেরূপ হউক না কেন সেখানে দ্রব্যের দাম স্থির হয় উহার চাহিদা ও যোগান-এর দ্বারা। জিনিসের ক্রেতাগণ বাজারে সেই দ্রব্যের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে। জিনিসের বিক্রেতাগণ বাজারে বিক্রয়ের জন্য উহার যোগান দেয়। তখন বাজারে যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে দাম-নির্ধারিত হয়। সুতরাং চাহিদা ও যোগান কাহাকে বলে, উহাদের কেমন করিয়া হিসাব করিতে হয়, উহাদের নিয়মসমূহ কি কি এবং কিরূপে উহারা পরিবর্তিত হয় তাহা আমাদের আলোচনা করিতে হইবে।

চাহিদা ও চাহিদার নিয়ম (Demand and the Law of Demand): কোন ব্যক্তির যদি কোন দ্রব্য পাইতে আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা হইলেই উহাকে চাহিদা বলা যায় না। যদি বাজারের প্রচলিত দাম দেওয়ার মত টাকা ও ইচ্ছা সেই ব্যক্তির থাকে তাহা হইলেই সেই আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা যায়। সুতরাং কোন ব্যক্তির চাহিদা বলিলে বোঝা যায় বাজারের চলতি দামে দ্রব্যটির কি পরিমাণ সে ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। দামের সঙ্গে ব্যক্তির চাহিদার পরিমাণ তাই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; দাম বদলাইয়া গেলে ব্যক্তির চাহিদার পরিমাণও বদল হইয়া যাইবে।

চাহিদা কাহাকে বলে

দামে পরিবর্তন হইলে ব্যক্তির চাহিদাও পরিবর্তিত হয়; ইহাকে বলে চাহিদার উপর দাম-প্রভাব (price-effect)। অন্যান্য সকল বিষয় সমান থাকিলে, দাম বাড়িলে দ্রব্যের জন্য চাহিদা কমিয়া যায় এবং দাম কমিলে উহার জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দামের পরিবর্তনের বিপরীত দিকে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন আসে—ইহাকে চাহিদার নিয়ম বলে।

চাহিদার নিয়ম বা দাম-প্রভাব

চাহিদার নিয়ম বা দাম-প্রভাব দুইটি কারণ বা দুইটি অধীনস্থ প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। একটি হইল আয়-প্রভাব (income effect), অপরটি হইল পরিবর্ত প্রভাব (substitution effect)। এই দুইটি কারণের জন্যই দ্রব্যের দাম বাড়িলে উহার জন্য চাহিদা কমিয়া যায় এবং দ্রব্যের দাম কমিলে উহার জন্য চাহিদা বাড়িয়া যায়। আয়-প্রভাব কাহাকে বলে? আমরা জানি যে, লোকের আয় বাড়িয়া গেলে তাহারা পূর্বের তুলনায় কিছু বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে

চায়। জিনিসের দাম কমিয়া গেলে ব্যক্তির মনে হয় যেন তাহার আয় বাড়িয়া গেল। যেমন মনে করা যাউক, চা-এর দাম প্রতি পাউণ্ড 4 টাকা এবং সেই দামে কোন ব্যক্তি মাসে 8 পাউণ্ড চা-এর চাহিদা করিতেছে, অর্থাৎ চা ক্রয় করিতে তাহার মাসে 32 টাকা ব্যয় হইতেছে। যদি চা-এর দাম কমিয়া 3 টাকা হয়, তাহা হইলে 8 পাউণ্ড চা খরিদ করিতে এখন তাহার 24 টাকা খরচ হইবে, 8 টাকা বাঁচিয়া যাইবে। ব্যক্তির মনে হইবে যেন তাহার আয় মাসে 8 টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং সে একটু বেশি পরিমাণ চা-ক্রয় করিতে শুরু করিবে। এইরূপে দ্রব্যের দাম বাড়িয়া গেলে তাহার মনে হইবে যেন তাহার আর্থিক আয় কমিয়া গিয়াছে, সে পূর্বাপেক্ষা কম ক্রয় করা শুরু করিবে। ইহাকে আয়-প্রভাব বলা হয়।

আয়-প্রভাব কাহাকে বলে

আরও একটি কারণের ফলে চাহিদার নিয়ম ঘটে; উহা হইল পরিবর্ত-প্রভাব। যেমন, চা ও কফি উভয় দ্রব্য দ্বারাই আমাদের গরম পানীয়ের অভাব মেটে, ইহারা একটি অপরটির পরিবর্ত-দ্রব্য। এইরূপ প্রায় সকল দ্রব্যেরই কোন-না-কোন পরিবর্ত-দ্রব্য আছে। কোন জিনিসের দাম বাড়িয়া গেলে আমরা সেই জিনিসটি কম ক্রয় করি এবং উহার পরিবর্ত-দ্রব্যের ক্রয় বাড়াইয়া দিই। মনে করা যাউক, চা ও কফি একে অন্যের পরিবর্ত-সামগ্রী এবং উভয়ের দামই প্রতি পাউণ্ড 4 টাকা। যদি চা-এর দাম বাড়িয়া প্রতি পাউণ্ড 5 টাকা হয়, তাহা হইলে যে-ব্যক্তি মাসে 8 পাউণ্ড চা ক্রয় করিত সে চা-এর ক্রয় কমাইয়া দিবে এবং তুলনামূলক ভাবে কফি সস্তা হওয়ায় সে পূর্বাপেক্ষা বেশি কফি ক্রয় করিবে। অর্থাৎ চা-এর চাহিদা কমিয়া যাইবে। যদি চা-এর দাম কমিয়া প্রতি পাউণ্ড 3 টাকা হয়, তাহা হইলে সে কফি ক্রয় কমাইয়া দিবে এবং কফি হইতে তাহার চাহিদা চা-তে সরিয়া আসায় চা-এর চাহিদা বাড়িয়া যাইবে।

পরিবর্ত-প্রভাব কাহাকে বলে

চাহিদার নিয়ম সঠিকভাবে কার্যকর হইতেছে বলিতে গেলে কতকগুলি অবস্থা স্থির আছে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ স্থির বিষয়গুলির কোন একটিতে পরিবর্তন হইলেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। এই বিষয়গুলি হইল (ক) ব্যক্তির আর্থিক আয়, (খ) তাহার রুচি ও অভ্যাস এবং (গ) পরিবর্ত-সামগ্রীর দাম। যখন কোন দ্রব্যের দাম বদলায় তখন যদি ইহাদের কোন একটিতে পরিবর্তন আসে তাহা হইলে দাম-পরিবর্তনের বিপরীত দিকে চাহিদা না-ও বদলাইতে পারে। অর্থাৎ এই সকল অনুমান (assumptions) মানিয়া লইলে তবেই চাহিদার নিয়ম গঠন করা সম্ভব।

এই নিয়মের অনুমানগুলি

যে-ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব এবং পরিবর্ত-প্রভাব উভয়ই বিশেষ শক্তিশালী সেই ক্ষেত্রে দাম একটু কমিলে ক্রয় অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং দাম একটু বাড়িলে ক্রয় অধিক পরিমাণে হ্রাস পায়। যে-ক্ষেত্রে এই প্রভাব দুইটি দুর্বল, সে-ক্ষেত্রে দামে পরিবর্তন হইলে, কোন দিকেই চাহিদার খুব বেশি পরিবর্তন হয় না।

এই দুইটি শক্তির উপরই দাম-প্রভাবের তীব্রতা নির্ভর করে

সীমাবদ্ধতা (Limitations): অন্যান্য সকল কিছু আছে ধরিয়া লইলেও, অর্থাৎ স্বীকার্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত আছে মনে করিয়া লইলেও, কয়েকটি ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কার্যকর না-ও হইতে পারে। (ক) কতকগুলি দ্রব্য এরূপ থাকিতে পারে যে, তাহাদের নিজস্ব গুণের জন্য তাহাদের ক্রয় করা হয় না, অপরকে দেখাইয়া নিজের অর্থগৌরব প্রকাশ করাই দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্য। ভেব্লেন্ এইরূপ ক্রয়কে প্রদর্শনীয় ভোগ (conspicuous consumption) বলিয়াছেন। এই সকল দ্রব্যের দাম বাড়িলে উহার ব্যবহার আরও আকর্ষণীয় হয়, ফলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে। (খ) দ্রব্যের দাম যদি খুবই কম থাকে, (যেমন, দিয়াশলাই) তাহা হইলে উহার দাম আর একটু কমিলে আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকর হয় না, চাহিদাও না বাড়িতে পারে। অথবা দাম যদি খুবই বেশি থাকে (যেমন, মোটরগাড়ি) তাহা হইলে উহাতে অল্প একটু পরিবর্তনের ফলে চাহিদায় বিশেষ পরিবর্তন না হইতে পারে। (গ) যদি দামের বৃদ্ধির ফলে ক্রেতাদের মনে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, দাম আরও বাড়িয়া যাইবে, তবে তাহারা মজুত করিবার জন্য চাহিদা বাড়াইয়া দিতে পারে। এইরূপ অবস্থা শেয়ার বাজারে ঘটিয়া থাকে, অথবা পূর্ব-পাকিস্তানে লবণ-সঙ্কটের সময় ঘটিয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রেও এমন দেখা যায়। যদিও দাম কমিবার ফলে ক্রেতাদের মনে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে দাম শীঘ্রই আরও কমিয়া যাইবে, তবে তাহারা চাহিদা না বাড়াইয়া অপেক্ষা করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কার্যকর হয় না। (ঘ) যদি কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া যায়, তাহা হইলে বিত্তশালী ক্রেতাগণ উহাকে 'নিকৃষ্ট দ্রব্য' মনে করিয়া ক্রয় না করিতে পারে, পরিবর্ত-সামগ্রী বা একটু বেশি দামে 'উৎকৃষ্ট' দ্রব্য ক্রয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে (the case of inferior goods)। (ঙ) গিফেন একটি উদাহরণ দিয়া বলিয়াছিলেন, আয়ারল্যাণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে লোকে এত দরিদ্র ছিল যে, তাহারা তাহাদের আয়ের একটি বড় অংশ আলুতে ব্যয় করিয়া অল্পাংশ মাংসে ব্যয় করিত। আলুর দাম বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা মাংসের ক্রয় কমাইয়া দিয়া প্রধান খাদ্য হিসাবে আলুর চাহিদা বাড়াইয়া দিতে বাধ্য

হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, চাহিদার এইরূপ পরিবর্তনকে গিফেন প্রভাব (Giffen Effect) বলা হয়।

ব্যক্তির চাহিদা কিসের উপর নির্ভর করে (Factors on which the demand of a commodity depends): কোন ব্যক্তি একটি দ্রব্য কি পরিমাণ ক্রয় করিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের মিলিত প্রভাবের উপর নির্ভর করে এক ব্যক্তি কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ ক্রয় করিবে অর্থাৎ কোন্ দ্রব্যের বাজারে ব্যক্তির চাহিদা কিরূপ পরিমাণ হইবে তাহা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করে।

(ক) ব্যক্তির রুচি, পছন্দ ও অভ্যাস। কোন ব্যক্তি কোন্ কোন্ জিনিস কি পরিমাণ ক্রয় করিবে তাহা নিশ্চয়ই তাহার রুচি, পছন্দ ও অভ্যাসের উপর প্রধানত নির্ভরশীল। যে-দ্রব্যটিকে ব্যক্তি কম পছন্দ করে উহার তুলনায় যাহাকে বেশি পছন্দ সেই দ্রব্যটিকে ব্যক্তি নিশ্চয়ই একটু বেশি ক্রয় করিতে চাহিবে।

(খ) দ্রব্যটির দাম। দাম যদি বেশি হয় উহা কম পরিমাণে ক্রয় করিবে, দাম যদি কম হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি উহা বেশি পরিমাণে চাহিদা করিবে।

(গ) ব্যক্তির আয়। ব্যক্তির আয় বাড়িয়া গেলে জিনিসপত্র বেশি পরিমাণে কেনে, তাহার আয় কমিয়া গেলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদাও হ্রাস পায়। কিন্তু যদি নেহাত সাময়িক ভাবে আয়ের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়, তাহা হইলে ব্যক্তির চাহিদা না বাড়িতে বা না কমিতে পারে। যদি স্থায়িভাবে আয়ের পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে ব্যক্তির চাহিদাতে পরিবর্তন অবশ্যই ঘটিবে।

(ঘ) পরিবর্ত-দ্রব্য এবং পরিপূরক-দ্রব্যের দাম। পরিবর্ত-দ্রব্যের দামের উপর কোন দ্রব্যের জন্য ব্যক্তির চাহিদা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে। চা-এর জন্য ব্যক্তির চাহিদা কি পরিমাণ হইবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে কফি ও কোকো প্রভৃতি পরিবর্ত দ্রব্যের দামের উপর। শুধু তাহাই নহে। পরিপূরক-দ্রব্যের দাম-এর উপরেও দ্রব্যটির জন্য চাহিদা কিছুটা নির্ভরশীল। যেমন, দুধ ও চিনির দাম-এর উপরে চা-এর চাহিদা কিছুটা নির্ভর করে। দুধ ও চিনি চা-এর পরিপূরক দ্রব্য। উহাদের দাম বাড়িয়া গেলে ব্যক্তি চা-এর চাহিদা কমাইয়া দিতে পারে; উহাদের দাম কমিয়া গেলে সে চা-এর চাহিদা বাড়াইয়া দিতে পারে।

ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার চাহিদা (Individual demand and Market demand): বাজারের চলতি দামে কোন ব্যক্তি একটি দ্রব্যের কিছু পরিমাণ ক্রয় করে, ইহাকে ব্যক্তিগত চাহিদা বলে। দাম বাড়িয়া গেলে ক্রয়ের

পরিমাণ কমে, দাম কমিয়া গেলে ক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে। দ্রব্যটির বিভিন্ন দামে কোন ব্যক্তি উহার বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে। বিভিন্ন দামে কোন ব্যক্তি দ্রব্যটির যে বিভিন্ন পরিমাণ কেনে, উহাদের তালিকাকে ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা বলে। যেমন,

দাম (প্রতি পাউণ্ড)	চা-এর চাহিদা
6 টাকা	2 পাউণ্ড
5 টাকা	3 পাউণ্ড
4 টাকা	5 পাউণ্ড
3 টাকা	8 পাউণ্ড
2 টাকা	12 পাউণ্ড

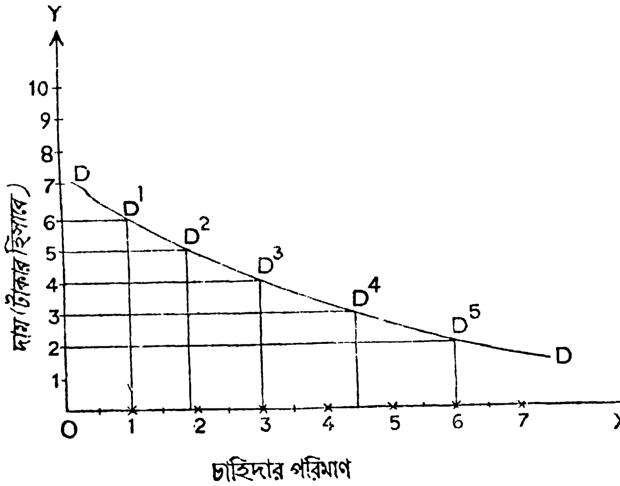
কোন বাজারে যত ক্রেতা আছে প্রত্যেকের মনে মোটামুটি এইরূপ একটি ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা আছে। বাজারের সকল ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা এক রকম নহে। আয়, রুচি, পছন্দ ও অভ্যাস, পরিবর্ত ও পরিপূরক সামগ্রীর দাম ও যোগ্যতা—এই সকল বিষয়ের উপর কোন একটি দ্রব্যের জন্য ব্যক্তির চাহিদা নির্ভর করে ; দ্রব্যটির দামে পরিবর্তন হইলে চাহিদাতেও উঠানামা হয়।

বাজারের সকল ব্যক্তির ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা আমরা যদি যোগ করিতে পারি তাহা হইলে জানিতে পারা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট বাজারের সকল ক্রেতা মিলিয়া মোট কিরূপ চাহিদা করিতেছে। ইহাকে বাজার-চাহিদা বলে। বিভিন্ন দামে বাজারের সকল ক্রেতারা মিলিয়া একত্রে সেই দ্রব্যের মোট যে-সকল পরিমাণ চাহিদা করে, তাহাকে বাজার-চাহিদা-তালিকা বলা হয়। যেমন,

দাম (প্রতি পাউণ্ড)	বাজারের মোট চা-এর চাহিদা
6 টাকা	1000 পাউণ্ড
5 টাকা	1900 পাউণ্ড
4 টাকা	3000 পাউণ্ড
3 টাকা	4500 পাউণ্ড
2 টাকা	6000 পাউণ্ড

চাহিদা রেখা (Demand Curve) : কোন দ্রব্যের বাজারে এইরূপ চাহিদার তালিকাকে আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্রে চাহিদার রেখা কিরূপে আঁকিতে হয়, তাহা দেখানো হইতেছে।

বীজগণিতের রেখাচিত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যখন দুইটি বিষয়ের পরিমাণগত সম্পর্ক বোঝানো হয় তখন এইরূপ রেখাচিত্রের (Graph) সাহায্য গ্রহণ করিতে পারা যায়। OX রেখা চাহিদার পরিমাণ বুঝাইতেছে, OY রেখা দামের পরিমাণ বুঝাইতেছে। OY রেখার প্রতিটি দাগ এক একটি টাকার পরিমাণসূচক।



OX রেখার একটি '×' চিহ্ন চাহিদার এক হাজার এবং এক একটি দাগ পাঁচ শত পরিমাণ বুঝাইতেছে। এখন পূর্বের বাজার-চাহিদা তালিকাকে রেখাচিত্রে বসানো হইল। যখন দ্রব্যের দাম 6 টাকা তখন মাত্র 1 হাজার দ্রব্যের চাহিদা হইতেছে। OY রেখায় দাম মাপা হইতেছে, 6 টাকা পর্যন্ত গণনা করা হইল। OY রেখায় দ্রব্যের চাহিদা মাপা হইতেছে, একটি '×' চিহ্ন পর্যন্ত গ্রহণ করা হইল। দুই দিক হইতে দুইটি সরলরেখা টানিলে উভয়ে D^1 বিন্দুতে মিলিত হইল। এই D^1 'বিন্দুটি' উভয়ের পরিমাণগত সম্পর্ক প্রকাশ করে।

চাহিদারেখা কিরূপে আঁকিতে হয়

দাম যখন 5 টাকা, দ্রব্যের চাহিদা তখন 1900 পাউণ্ড। এই দাম ও এই পরিমাণের প্রকাশ বিন্দু হইল D^2. দাম যখন 4 টাকা তখন চাহিদা 3000 পাউণ্ড; উভয়ের প্রকাশ বিন্দু হইল D^3, দাম যখন 3 টাকা, চাহিদা তখন 4500 পাউণ্ড, উভয়ের প্রকাশ বিন্দু হইল D^4, দাম 2 টাকা হইলে চাহিদা 6000 পাউণ্ড, উভয়ের এই সম্পর্ক প্রকাশ পাইয়াছে D^5 বিন্দুতে। এখন আমরা $D^1D^2D^3D^4D^5$ এই সকল বিন্দুকে

একটি রেখা দ্বারা যুক্ত করিলে DD রেখা পাইতেছি ; ইহাই চা-এর বাজারে চাহিদা রেখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত।*

OD^1 আয়তক্ষেত্র হইতে আমরা কি জানিতে পারি? প্রতি ইউনিটের দাম 6 টাকা এবং দ্রব্যদির মোট এক হাজার ইউনিটের জন্য চাহিদা আছে। অর্থাৎ বাজারের সকল ক্রেতা মিলিয়া মোট 6 টাকা × 1000 ইউনিট = 6000 টাকা সেই দ্রব্য ক্রয়ে খরচ করিতেছে। OD^1 আয়তক্ষেত্র এই 6000 টাকা প্রকাশ করিতেছে। ক্রয়ের অপর দিক হইল বিক্রয়, সুতরাং 6 টাকা দামে বাজারের সকল বিক্রেতারা মিলিয়া নিশ্চয়ই এক হাজারটি দ্রব্য মোট 6000 টাকায় বিক্রয় করিতেছে, অর্থাৎ ঐ বাজারে ঐ দ্রব্য-বিক্রেতাদের মোট আদায় হইল 6000 টাকা। এই 6000 টাকাকে মোট রেভিনিউ বলে। কোন নির্দিষ্ট দামে বাজারের সকল ক্রেতা মিলিয়া সেই দ্রব্য কিনিতে যত টাকা মোট ব্যয় করে বা সকল বিক্রেতা মিলিয়া মোট যে পরিমাণ টাকা আদায় করে, তাহাই সেই দামে মোট রেভিনিউ। দামে পরিবর্তন হইলে আমরা দেখিতে পাই, মোট রেভিনিউতে পরিবর্তন হইতেছে। দাম যখন 5 টাকা, তখন মোট রেভিনিউ হইল OD^2 ; দাম 4 টাকা হইলে মোট রেভিনিউ হইল OD^3 ; দাম 3 টাকা হইলে মোট রেভিনিউ হইল OD^4 ; দাম 2 টাকা হইলে মোট রেভিনিউ হইল OD^5

মোট রেভিনিউ কাহাকে বলে

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand): চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী আমরা জানিতে পারি যে, কোন দ্রব্যের দাম বাড়িলে উহার চাহিদা কমিয়া যায় এবং দাম কমিলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ দ্রব্যের দামে পরিবর্তন হইলে উহার চাহিদাতেও পরিবর্তন আসে। কিন্তু সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামে পরিবর্তনের হার ও চাহিদার পরিবর্তনের হার সমান হয় না। খুব দরকারী জিনিসের, যেমন, লবণের দাম বাড়িলেও চাহিদা কমিবে না, আবার লবণের দাম কমিলেও উহার চাহিদা বিশেষ বাড়িবে না। কিন্তু অনেক বিলাস-সামগ্রী আছে, যেমন—স্নো, পাউডার, ফাউণ্টেন পেন প্রভৃতি—ইহাদের ক্ষেত্রে দাম একটু কমিলেই লোকে উহা বেশি পরিমাণ কিনিতে থাকে, আবার দাম একটু বাড়িলেই কেনা খুব বেশি কমাইয়া দেয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে

* চাহিদার রেখাকে সাধারণত অবিচ্ছিন্ন (continuous) একটি রেখারূপে আঁকা হয়, যেন একই ভাবে উহা নামিয়া আসিতেছে, মধ্যে কোন খাঁজ বা ভাঙাচোরা নাই। বাস্তবে কোন দ্রব্যের জন্য চাহিদা ঐরূপ না-ও হইতে পারে। তবে আলোচনার ও বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য এইরূপ আঁকা হইয়া থাকে।

দামে পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে ধনবিজ্ঞানের ভাষায় চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা (price-elasticity of demand) বলে। বলা চলে,

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের হার}}{\text{দামে পরিবর্তনের হার}}$$

অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় "The elasticity of demand is a measure of the relative change in amount purchased in response to a relative change in price on a given demand curve" অপর এক অর্থনীতিবিদ্ বলিয়াছেন, "The elasticity of demand at any price or at any output, is the proportional change of amount purchased in response to a small change in price, divided by the proportional change in price."

দামে পরিবর্তনের হার ও চাহিদায় পরিবর্তনের হার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমান নয়। দামে অল্প একটু পরিবর্তন চাহিদায় খুব বেশি বা খুব কম পরিবর্তন আনিতে পারে। যে-হারে দাম-পরিবর্তন হয়, যদি ঠিক একই হারে চাহিদায় পরিবর্তন ঘটে, তবে তাহাকে সমহার স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Unit-elasticity of demand) বলা হয়। দাম-পরিবর্তনের হারের তুলনায় চাহিদায় অধিক হারে পরিবর্তন ঘটিলে তাহাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (elastic demand) বলা হয়। দাম-পরিবর্তনের হারের তুলনায় যদি চাহিদায় পরিবর্তনের হার কম হয়, তবে তাহাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic demand) বলা হয়। যেমন, শতকরা 5% হারে দাম পরিবর্তনের ফলে ঠিক যদি 5% হারে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, তবে তাহাকে সমহার স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হইবে, এই দুই পরিবর্তনের অনুপাত একের সমান। যদি 5% হারে দাম-পরিবর্তনের ফলে ইহা হইতে অধিক, যেমন 7% হারে চাহিদায় পরিবর্তন হয়, তবে তাহাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়, এই ক্ষেত্রে দুই পরিবর্তনের হারের অনুপাত একের অধিক। অপর দিকে দাম 5% পরিবর্তনের ফলে, ইহা হইতে কম, যেমন 3% হারে পরিবর্তন ঘটিলে তাহাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা যাইতে পারে, উভয় পরিবর্তনের হারের অনুপাত এক হইতে কম।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, কোন দ্রব্যের জন্য চাহিদা-রেখার উপরস্থ বিভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পৃথক্ হইবে। দাম 5 টাকা হইতে কমিয়া 4 টাকা হইলে দ্রব্যটির চাহিদা যে-হারে পরিবর্তিত হইবে, দাম 4 টাকা হইতে 3 টাকা হইলে চাহিদার পরিমাণ সম্পূর্ণ অন্য হারে পরিবর্তিত হইতে পারে, কারণ চাহিদা-রেখার ঢাল (slope)

চাহিদা-রেখার প্রত্যেক বিন্দুর স্থিতিস্থাপকতা পৃথক, কারণ রেখার ঢাল প্রতিটি বিন্দুতে বদলাইতেছে

প্রতিটি বিন্দুতেই বদলাইতেছে। সুতরাং একই চাহিদা-রেখার প্রতিটি বিন্দুর এক একটি নিজস্ব স্থিতিস্থাপকতা আছে (point elasticity)।

পরিমাপ-পদ্ধতি (Method of measurement): অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় "The elasticity (or responsiveness) of demand in a market is great or small according as the amount demanded increases much or little for a given rise in price." অর্থাৎ দাম-প্রভাবের তীব্রতা বা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করার উপায় হইল দাম-পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যটির বিক্রয় হইতে বিক্রেতাদের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা মোট রেভিনিউর (Total revenue) পরিমাণ কিরূপভাবে পরিবর্তিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করা। একটি নির্দিষ্ট দামে বাজারের সকল ক্রেতা মিলিয়া উহা ক্রয় করিবার জন্য মোট যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় (Total outlay) করেন তাহাকে, অর্থাৎ ঐ দামে সকল বিক্রেতাদের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থকে, মোট রেভিনিউ (Total revenue) বলে। দাম-পরিবর্তনের দরুন চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিলে তাহার ফলে সেই দ্রব্যটির মোট রেভিনিউর পরিমাণেও পরিবর্তন হয়।

এই মোট রেভিনিউর পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া কোন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা চলে। যেমন ধরা যাউক,

দাম (প্রতি পাউণ্ড)	চাহিদা	মোট রেভিনিউ
5 টাকা	1000 পাউণ্ড	5000 টাকা
4 "	1250 "	5000 "
2 "	2500 "	5000 "

এই ক্ষেত্রে দামে পরিবর্তনের ফলে মোট রেভিনিউতে কোনরূপ পরিবর্তন আসিল না, যদিও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমহারবিশিষ্ট। অপরপক্ষে, ধরা যাউক,

দাম (প্রতি পাউণ্ড)	চাহিদা	মোট রেভিনিউ
5 টাকা	1000 পাউণ্ড	5000 টাকা
4 "	1500 "	6000 "
3 "	2200 "	6600 "

এক্ষেত্রে দাম-পরিবর্তনের হার হইতে চাহিদার পরিবর্তনের হার বেশি। তাই দাম বাড়িলে চাহিদা উহা অপেক্ষা অধিক হারে কমিয়া যায়, মোট রেভিনিউও কমে। দাম কমিয়া গেলে উহা অপেক্ষা অধিক হারে চাহিদা বাড়িয়া যায়, মোট রেভিনিউও বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে চাহিদাও স্থিতিস্থাপক। কিন্তু যদি এইরূপ ঘটে :

যদি অন্যান্য উপাদানকে বাড়ানো যায় তাহা হইলে উৎপাদন-ধারায় পরিবর্তনীয় উপাদানের সাহায্য করার ক্ষমতা বা উহার প্রদান-ক্ষমতা ক্রমে কমিয়া আসিতে থাকে। অর্থাৎ যে উপাদানের নিয়োগ বাড়ানো হইতেছে তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমশ কমিয়া আসে। জমির পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইলে কিভাবে শ্রমিকের প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পায়, নিচের তালিকায় তাহা দেখানো হইতেছে। জমির পরিমাণ 1 বর্গ কিলোমিটার ধরা হইয়াছে ; উহা স্থির উপাদান।

পরিবর্তনীয় উপাদানের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন-শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসে

শ্রমিকের পরিমাণ	মোট ধান উৎপাদন, মণের হিসাবে	শ্রমিক-প্রতি গড় উৎপাদন, মণের হিসাবে	শ্রমিক-প্রতি গড় উৎপাদন, মণের হিসাবে
1	50	50	50
2	160	80	11
3	285	95	125
4	400	100	115
5	500	100	100
6	582	97	82
7	630	90	48
8	656	82	26
9	656	প্রায় 78	0
10	650	64	—6

মোট উৎপন্ন-দ্রব্যকে শ্রমিক-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে শ্রমিক-পিছু গড় উৎপাদনের পরিমাণ পাওয়া যায়। 5 জন শ্রমিক পর্যন্ত গড় উৎপাদন বেশি, তাহার পর উহা কমিয়া যাইতেছে।

একজন অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। 4 জন শ্রমিক পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িতেছে। তাহার পর উহা কমিয়া যাইতেছে।

গড় ও প্রান্তিক উভয় ব্যয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে

1 হইতে 4 জন শ্রমিকের নিয়োগ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন বাড়িতেছে। তাহার পর ক্রমহ্রাসমান নিয়মের প্রভাব শুরু হইয়াছে। ইহার কারণ হইল যে, 1 জন, 2 জন, 3 জন, 4 জন শ্রমিক ওই জমি ক্রমে আরও ভালভাবে চাষ করিতে পারায় প্রত্যেকটি শ্রমিক নিয়োগের ফলেই প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন বাড়িতেছে। কিন্তু 5 জনের বেশি

হইলেই জমির নির্দিষ্টতার দরুন শ্রমিকের প্রদান-ক্ষমতা কমিতেছে; তাই মোট উৎপাদন-বৃদ্ধির হারও ক্রমহ্রাসমান। শ্রমিকের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা উভয়ই কমিতেছে।

যখন উভয়ই বাড়ে, তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড় হইতে বেশি (2 হইতে 4 পর্যন্ত); যখন উভয়ই কমে, তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড় হইতে কম (6 হইতে 10 পর্যন্ত) সুতরাং ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

"কোন উপাদান-সম্মিলনে যদি একটি উপাদানের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে, একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে প্রথমে সেই পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা ও পরে তাঁহার গড় উৎপাদন-ক্ষমতা উভয়ই কমিতে থাকে।"

শ্রম

সংজ্ঞা (Definition): বিনিময়ের জন্য দ্রব্যসামগ্রী বা কার্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত মানুষ কর্তৃক প্রদত্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলা হয়। অধ্যাপক মার্শাল শ্রম বলিতে বুঝিয়াছেন "any exertion of mind or body undergone partly or wholly with a view to some good other than the pleasure derived from the work." এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, (ক) ইহা মানুষের পরিশ্রম হইতে হইবে। জীবজন্তুর পরিশ্রমকে ধনবিজ্ঞানে শ্রম বলা চলে না। (খ) এই শ্রম শারীরিক বা মানসিক উভয় প্রকারের হইতে পারে। (গ) নিছক আনন্দ পাওয়া এই শ্রমের উদ্দেশ্য নয়, বিনিময়ের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমকেই ধনবিজ্ঞানে শ্রম বলা চলে। আনন্দের জন্য ফুলবাগানে কাজ করিলে তাহা শ্রম নহে, কিন্তু মালী অর্থের বিনিময়ে সেই একই কাজ করিলে তাহা শ্রম

শ্রমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics): উপাদান হিসাবে শ্রমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে: (ক) শ্রমিক হইতে শ্রমকে পৃথক্ করা চলে না। যদি শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে তাহা হইলেও শ্রমশক্তির উৎস তাহার শরীর সে নিজের নিকটেই রাখে। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় "The worker sells his work but he himself retains his own property." এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য ফল হইল যে, অন্যান্য উপাদানের মালিক যত খুশি উপাদানের উপর মালিকানা স্থাপন করিয়া আয় বাড়াইতে পারে, কিন্তু শ্রমকে পৃথক্ করা চলে না বলিয়া শ্রমিক তাহা পারে না। (খ) কোথাও শ্রম বিক্রয় করিতে হইলে শ্রমিককেও সেই স্থানে উপস্থিত হইতে হয়।

শ্রমিক নিজে উপস্থিত না হইয়া শ্রম করিতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে অন্যান্য উপাদানের তুলনায় শ্রমিকদের চলনশীলতা (mobility) অপেক্ষাকৃত কম থাকে। (গ) কাজ না করিয়া শ্রমশক্তি জমাইয়া রাখা যায় না। একটি দিন কাজ না করিলে সেই দিনটি আর ফিরিয়া আসে না, অন্যদিন বেশি কাজ করিলেও পূর্বের দিনটি শ্রমিকের নিকট লোকসান হইয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন মালিকেরা শ্রমিকদের অনেক সময়ে কম মজুরিতে কাজ করাইতে পারে এবং মালিকদের সহিত দরকষাকষির ব্যাপারে শ্রমিকদের অসুবিধা হয়। (ঘ) দেশে শ্রমিকের যোগান অতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। জন্মহার, কারিগরি শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা শ্রমিকের যোগান প্রভাবান্বিত হয়, সুতরাং শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে হওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকের যোগান শীঘ্র কমেও না ; কারণ, শ্রমিকেরা সহসা একটি কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে যাইতে চাহে না বা হঠাৎ দেশে জন্মহার কমিয়াও যায় না। (ঙ) কেয়ার্নক্রস্ বলেন যে, শ্রমিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বুদ্ধি ও বিচারশক্তি। তাঁহার মতে পরিশ্রম ও খাটুনি হইল যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, উহা সর্বক্ষণ অবিরাম চলিতে পারে। কৃষিপ্রধান সমাজেও ঘোড়া ও গরুতেই প্রধানত খাটুনির কাজটা করিয়া দেয়। যে কাজে কোন বুদ্ধির প্রয়োজন নাই, নিছক খাটুনি, তাহা মূলত যান্ত্রিক ধরনের এবং ক্রমশ যন্ত্রের সাহায্যে সে কাজ সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু মানুষের মনের কাজ বা বুদ্ধির কাজ যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। যন্ত্রকে চালাইবার উপযোগী বুদ্ধি বা বিচারশক্তি শ্রমের অঙ্গ বলিলেও চলে।

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (The Malthusian Theory of Population)*

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকে 1798 সালে ইংলণ্ডের টমাস রবার্ট ম্যালথাস নামে এক ধর্মযাজক "Essay on the Principle of population as it effects the future improvement of society" নামক এক পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তাঁহার জনসংখ্যা সম্পর্কীয় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে, "The power of population is infinitely greater than the power in the earth to produce subsistence for men" জনবৃদ্ধির প্রবণতা এত বেশি যে, প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যা প্রতি 25 বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ

* দেশের মোট সম্পদ্ উৎপাদনে শ্রম কি-পরিমাণ সাহায্য করিবে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর—শ্রমিকের যোগান এবং শ্রমিকের দক্ষতা। দেশে শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর : দেশের মোট জনসংখ্যা, জনসংখ্যার কত অংশ শ্রম বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, প্রতিটি শ্রমিক গড় কত ঘণ্টা কাজ করে। জনসংখ্যা কিসের উপর নির্ভর করে সেই বিষয়ে সর্বপ্রধান মত হইল ম্যালথুসীয় তত্ত্ব।

হইবার ঝোঁক দেখা যায়। দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বদাই অধিক থাকে। তাঁহার ভাষায় "By nature human food increases in a slow arithmetical ratio; man himself increases in a quick geometrical ratio unless want and vice stop him." ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের ফলে জমির যোগান সীমাবদ্ধ থাকার দরুন খাদ্যোৎপাদন দ্রুত এবং যথেচ্ছ হারে বাড়ানো সম্ভব হইয়া উঠে না, কিন্তু জনসংখ্যা বাড়িতেই থাকে। তাঁহার মতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় সমান্তর অগ্রগতির হারে (Arithmetic Progression, যেমন, 1, 2, 3, 4, 5···), জনসংখ্যা বাড়িতে থাকে জ্যামিতিক অগ্রগতির হারে (Geometric Progression, যেমন, 1, 2, 4, 8, 16··· ·)। সুতরাং কিছুকাল পরেই জনসংখ্যা অধিক হইয়া উঠে, খাদ্যোৎপাদন তাহার পিছনে পড়িয়া থাকে। ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনশন, রাষ্ট্রবিপ্লব ও গৃহবিবাদ শুরু হইয়া যায়। দেশের খাদ্যশস্য যে-পরিমাণ লোককে ভরণ-পোষণ করিতে সক্ষম তাহার অধিক লোকসংখ্যা নিঃশেষ হইয়া যায়, খাদ্য ও জনসংখ্যার ভারসাম্য পুনরায় ফিরিয়া আসে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির দৌড় শুরু হয় এবং কিছুকাল পরেই প্রকৃতির এই নিয়ম আবার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার অবলুপ্তি ঘটাইয়া খাদ্যের সহিত উহার সমতা আনে। মানুষ যদি বিবাহ হইতে বিরত থাকে, সংযম অভ্যাস করে, তাহা হইলে সে এরূপ ভয়াবহ ভবিষ্যতের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। যদি সে এই সকল প্রতিষেধক পদ্ধতি (preventive checks) গ্রহণ না করে, তবে প্রকৃতি উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা কমাইবার জন্য নিজেই প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (positive checks) গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষ নিজের চেষ্টায় যদি জন্মের হার না কমাইয়া দেয়, তবে প্রকৃতি মৃত্যুর হার বাড়াইয়া খাদ্যোৎপাদন ও জনোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে থাকে। ম্যালথাসের ভাষায় বলিতে গেলে "By law of our nature which makes food necessary to the life of man the effect of these unequal powers must be kept equal."

খাদ্যের ক্রমবৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি দ্রুততর

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সমালোচনা (Criticisms): (ক) এত প্রভাব সত্ত্বেও, ইতিহাস কিন্তু ম্যালথাসের তত্ত্বকে সর্বতোভাবে ভুল প্রমাণিত করিয়াছে। ঘটনার গতি দেখাইয়াছে যে, ম্যালথাস খাদ্যোৎপাদন ও জনোৎপাদন বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি কৃষির ক্ষেত্রে নূতন উৎপাদন-কৌশল ও যন্ত্রের প্রচলন করিয়া খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পথ সুগম করিয়াছে। (খ) খাদ্যোৎপাদন ও জনোৎপাদন সম্পর্কীয় আঙ্কিক সূত্রগুলিও বাস্তব জগতে সঠিক

বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই ; খাদ্যোৎপাদন সমান্তর অগ্রগতির হার অপেক্ষা দ্রুত লয়ে বৃদ্ধি পায়, জনোৎপাদনও জ্যামিতির অগ্রগতির হার অপেক্ষা ধীর লয়ে বৃদ্ধি পায়। (গ) তাহা ছাড়া ক্যানান বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের পরিমাণ বাড়ে, কৃষি ও শিল্পে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়মও কার্যকর হইতে পারে। (ঘ) ইহা মনে রাখিতে হইবে, জনসংখ্যার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ শুধু খাদ্যোৎপাদনের নহে, দেশের সকল প্রকার মোট সম্পদের। মোট সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন ভয়ের নহে, যেমন, ইংলণ্ডের খাদ্যোৎপাদন জনসংখ্যার তুলনায় কম হইলেও ইংরাজদের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উঁচু। সেলিগ্ম্যান তাই বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যার আসল সমস্যা পরিমাণগত নহে, সুদক্ষ উৎপাদনের এবং সুষম বণ্টনের।

সুতরাং বলা চলে, ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্ব গ্রহণের পক্ষে আজকাল কোন যুক্তি নাই। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করিয়া ইউরোপে, প্রধান সমস্যা হইল কি করিয়া জনসংখ্যার হ্রাস ঠেকানো যায়। জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, অধিক বয়সে বিবাহ, বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনে অনিচ্ছা, জীবনযাত্রার মান উঁচুতে রাখার প্রচেষ্টা, সকল কিছু মিলিয়া জন্মহার হ্রাস করিয়া দিয়াছে। এশিয়ার বহু অনুন্নত দেশে, যেমন ভারতে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পাইয়াছে, অথচ শিল্পায়নের প্রাথমিক স্তরে জন্মহার অত্যন্ত অধিক রহিয়াছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই অধিক, জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত নীচু। এই সকল দেশে এখনও প্রচুর পরিমাণে ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সমর্থক রহিয়াছেন এবং জনসংখ্যাধিক্য (over-population) বাস্তব সমস্যারূপে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনুন্নত দেশসমূহে ইহার প্রভাব : বর্তমানের বাধা বটে তবে ভবিষ্যতের উদ্বৃত্ত

সর্বোন্নত বা কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব (Theory of Optimum Population)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কার-সণ্ডার্স ও ক্যানান কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি বৈজ্ঞানিক মান নির্ধারণ করা যাহার দ্বারা দেশের জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে উপযোগী বা অনুপযোগী তাহার সঠিক বিচার করা যায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে যে-পরিমাণ জনসংখ্যা থাকিলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম এরূপ হয় যাহাতে অধিবাসীদের মাথাপিছু আসল আয় সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহাকে কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) বলে। দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা যদি কাম্য জনসংখ্যা হইতে বেশি হয়, তাহা হইলে মাথাপিছু আসল আয় কমিয়া যাইবে। এই অবস্থাকে জনাধিক্যতা (over-population) বলা চলে। যদি দেশের

সর্বোন্নত বা কাম্য জনসংখ্যা

প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যা হইতে কম হয়, তাহা হইলেও মাথাপিছু আসল আয় কমিয়া যাইবে। এই অবস্থাকে জন-অপূর্ণতা (under-population) বলা হয়।

কাম্য জনসংখ্যা দেশের সকল প্রকার সম্পদ্‌কে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতে পারে, যাহাতে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। মনে রাখিতে হইবে যে শ্রমবিভাগ, যন্ত্র উৎপাদন-কৌশল, প্রাকৃতিক সম্পদ্ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান, ধারণা এবং শিক্ষা-দীক্ষার পরিবর্তন হইলেই কাম্য জনসংখ্যা আর পূর্বের ন্যায় থাকিবে না, পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। কাম্য বিন্দু তাই কোন স্থির বিন্দু নহে, পরিবর্তশীল বিন্দু।

এই বিন্দু সর্বদা পরিবর্তনশীল

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা (Efficiency of Labour) : কোন দেশে জাতীয় আয় কম কি বেশি হইবে তাহা নির্ভর করে দেশে মোট সম্পদ্ উৎপাদনের উপর। জাতীয় সম্পদ্ উৎপাদন করে দেশের শ্রমিকেরা, প্রাকৃতিক উপকরণের সহিত শ্রম মিশাইয়া দ্রব্যসামগ্রী সৃষ্টি করে। কতজন শ্রমিক দেশে নিযুক্ত আছে কেবলমাত্র তাহাই বিচার করিলে চলিবে না, প্রতিটি শ্রমিক কিরূপ নিপুণতা ও তৎপরতার সহিত যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা চালাইতে পারে, সেই বিচারও করা দরকার।

জাতীয় আয় প্রভাবিত হয় কর্মকুশলতার দ্বারা

শ্রমিকদের নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতার সহিত তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা (productivity) অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা প্রকাশ পায় তাহাদের উৎপাদনক্ষমতার মাধ্যমে। কর্মনৈপুণ্যের মাপকাঠিই হইল তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা। শ্রমিকের গড় কর্মকুশলতা বেশি হইলে অল্প শ্রমিকেও প্রভূত জাতীয় সম্পদ্ উৎপন্ন করিতে পারে। মনে কর দুইটি দেশের শ্রমিকসংখ্যা ও উপকরণের পরিমাণ সমান। একটি দেশের শ্রমিকেরা রোজ 8 ঘণ্টা কাজ করিয়া গড়ে 1 জোড়া কাপড় তৈয়ারি করে ; অপর দেশে একই সময়ে তাহারা গড়ে 2 জোড়া কাপড় তৈয়ারি করে। তাহা হইলে দ্বিতীয় দেশটিতে জাতীয় সম্পদের উৎপাদন নিশ্চয় বেশি হইবে। ওই দেশের শ্রমিকদের গড় উৎপাদনক্ষমতাও বেশি।

কর্মকুশলতার পরিমাপ হয় গড় উৎপাদন ক্ষমতার হিসাবে

শ্রমিকদের এই গড় উৎপাদনক্ষমতা কিরূপে পরিমাপ করা যায়? দেশের সকল শ্রমিক সমান দক্ষ নয়, তাই শ্রমিকদক্ষতার একটি সাধারণ মানদণ্ড হিসাব করিয়া উহার সাহায্যে দেশের সকল শ্রমিকদের দক্ষতা পরিমাপ করা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ কোন মানদণ্ড পাইলে দেশের গড় ও মোট দক্ষতার ভাণ্ডার আমরা পরিমাপ করিতে পারি। শ্রমিকের ক্ষেত্রে এই সাধারণ মানদণ্ডের ইউনিট হইল একটি স্বাভাবিক-ইউনিট দক্ষতা

গড় উৎপাদন ক্ষমতা ও মোট দক্ষতার ভাণ্ডার

(natural unit of efficiency)—যেমন কোন একটি অনিপুণ শ্রমিকের 1 ঘণ্টা কাজের ফল। সেই কাজের ফলকে স্বাভাবিক-ইউনিটের তুলনায় পরিমাপ করা সম্ভব। যেমন একজন অনিপুণ শ্রমিক যদি 1 ঘণ্টায় 2 খানা কাপড় তৈয়ারি করে, তবে যে শ্রমিক ঘণ্টায় 6 খানা কাপড় উৎপাদন করিতেছে, সে তিনজন অনিপুণ শ্রমিকের সমান। গড় উৎপাদন হইল প্রতি ঘণ্টায় 4 খানা কাপড়। এইভাবে বিভিন্ন স্তরের দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিককে একই হিসাবের মধ্যে আনিয়া দেশের মোট দক্ষতা পরিমাপ করাও সম্ভব।

শ্রমিকের দক্ষতা কিসের উপর নির্ভর করে? শ্রমের দক্ষতার প্রধান ভিত্তি হইল শ্রমিকের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য ও শক্তি। ইহা ছাড়া মালিকের দক্ষতা, কাজের অবস্থা (condition of work) ও প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের উপরও ইহা নির্ভরশীল। শ্রমিকের কর্মকুশলতার বা দক্ষতার প্রশ্নটিকে দুইদিক হইতে বিচার করিতে হইবে। যথা—শ্রমিকের কর্মদক্ষতা (power of work) ও কর্মপ্রবৃত্তি (will to work)। শ্রমিকের কর্মক্ষমতা নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহার মধ্যে প্রধান হইল শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি। আবার স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করে মজুরি ও জীবনযাত্রার মানের উপর। গড়পড়তা একজন ইউরোপীয় শ্রমিক যে ভারতীয় শ্রমিক হইতে দক্ষতর ইহার একটি কারণ হইল, তাহার জীবনযাত্রার মান উন্নততর।

শ্রমের দক্ষতার প্রধান ভিত্তি

জীবনযাত্রার মান ও মজুরি

শ্রমিকের দক্ষতার নির্ণায়ক আর একটি প্রধান উপাদান হইল শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষা শ্রমিকের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত করে ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে এবং কারিগরী শিক্ষা (technical education) তাহাকে সুদক্ষ কর্মীতে পরিণত করে। নৈতিক শিক্ষা তাহাকে সৎ, স্বাবলম্বী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করিয়া তোলে। বর্তমানে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি ইত্যাদির এত উন্নতি ঘটিয়াছে যে কারিগরী শিক্ষা ভিন্ন কোন রকমে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

শিক্ষা—সাধারণ কারিগরি ও নৈতিক

যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শর্তাবলীর মধ্যে শ্রমিক কাজ করে তাহাও তাহার কর্মদক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকিলে, কাজের সময় অত্যন্ত দীর্ঘ না হইলে, ইউনিয়ন গড়া ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারের অস্তিত্ব থাকিলে এবং সর্বোপরি সন্তোষজনক মজুরির ব্যবস্থা থাকিলে শ্রমিকের দক্ষতা বহুগুণে বাড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে এই সমস্ত

পারিপার্শ্বিক অবস্থা

সুযোগ-সুবিধার অভাবে শ্রমিকের দক্ষতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজন, শ্রমিকদের মধ্যে কাজ সম্বন্ধে যত বেশী ইচ্ছা ও উৎসাহ জাগানো যাইবে, ততই শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। এইজন্য প্রয়োজন, জীবনধারণের উপযোগী মজুরি, কাজের স্থায়িত্ব এবং উন্নতির নিশ্চয়তা। পরিচালনা কার্যে শ্রমিকের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা, বেকারী বীমা এবং বার্ধক্য বীমা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার (social security measures) প্রচলন শ্রমিকশ্রেণীর কর্ম করিবার প্রবৃত্তিকে বাড়াইয়া তোলে।

মালিকের ভূমিকা

মালিকশ্রেণীর উপর শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নির্ভরশীল। মালিক যদি উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রমবিভাগ সংগঠিত করেন তাহা হইলে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা অনেকগুণে বাড়িয়া যাইবে।

শ্রমিকের কর্মক্ষমতার নির্ণায়ক হিসাবে উপরে উল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও আরও দুই একটি কারণ রহিয়াছে। যেমন—জলবায়ু, জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি।

জলবায়ু ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব

জলবায়ু যে কিয়দংশে শ্রমিকের কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অত্যন্ত গরম, কনকনে শীত অথবা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া শ্রমিকের কর্মক্ষমতা কমাইয়া দেয়। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াই কর্মক্ষমতার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল।

কেহ কেহ মনে করেন যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে। কারণ, তাঁহাদের মতে দৈহিক শক্তি ও মানসিক দৃঢ়তা প্রধানত জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ফল। অবশ্য অনেকে এতটা চরম মত গ্রহণ না করিলেও এই বিষয়ে একমত যে শারীরিক শক্তির সঙ্গে অন্তত আংশিক ভাবে হইলেও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের (racial qualities) একটা সম্পর্ক আছে। যেমন পাঞ্জাবীরা সাধারণত শারীরিক দিক হইতে অধিকতর শক্তিশালী।

শ্রমবিভাগ (Division of Labour): আধুনিক কালের উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনের সম্পূর্ণ ধারা বা সকল স্তরের কাজ করিতে পারে না। নিজে গাছ কাটিয়া তক্তা বানাইয়া সেই তক্তা হইতে চেয়ার,

শ্রমবিভাগ কাহাকে বলে

টেবিল তৈয়ারি করা এবং উহা পালিশ করা—উৎপাদনের এইরূপ সকল ধারা বা সকল স্তরের কাজ আজকাল কেহ একা করিতে পারে না। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোন দ্রব্য উৎপাদনের মোট কাজকে বিভিন্ন স্তর বা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। কেহ সারাজীবন গাছ কাটে, কেহ বা উহা হইতে তক্তা বানায়, কেহ সেই তক্তা হইতে চেয়ার, টেবিল

তৈয়ারি করে, আবার কেহ বা শুধুমাত্র পালিশ করিয়া দিন গুজরান করে। দ্রব্য উৎপাদনের সম্পূর্ণ ধারাটি ওইরূপ স্তরে স্তরে বিভক্ত হওয়া এবং এক একদল লোক কর্তৃক কেবল এক একটি অংশ সম্পূর্ণ করাকে শ্রমবিভাগ বলে।

এই শ্রমবিভাগের দরুন সমাজে বৃত্তি-বৈশিষ্ট্য বা বিশেষায়ণ (specialisation) দেখা দিয়াছে। মোট উৎপাদন-ধারাকে ছোট ছোট অংশ বিভক্ত করা হইলে একজন শ্রমিক ছোট একটি অংশের কাজ করিতে থাকে। ইহার ফলে সেই বৃত্তিতে কাজ করা শ্রমিকটির মজ্জাগত হইয়া পড়ে, সে উহাতেই অভ্যস্ত হইয়া উঠে। এইরূপ বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি-বিভাগ বা বিশেষায়ণ দেখা দেয়।

বৃত্তি-বৈশিষ্ট্য বা বিশেষায়ণ

আদিম সমাজে যখন কোন শ্রমবিভাগ ছিল না তখন প্রত্যেকটি ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠী ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতার কোন প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে যখন সমাজে শ্রমবিভাগ দেখা দেয়, তখন বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কাজে তাহাদের সম্পূর্ণ সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে থাকে। ইহার ফলে বিভিন্ন অংশে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সহযোগিতা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। চাষীর ধান না হইলে তাঁতীর চলে না; আবার তাঁতীর কাপড না হইলে চাষী অচল হইয়া পড়ে।

সহযোগিতা দেখা দিতে বাধ্য

শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল বা প্রভাব হইল বিনিময়। শ্রমবিভাগ হওয়ার দরুনই বিনিময় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। তাঁতী সারাদিন ধরিয়া কাপড় তৈয়ারি করিল; চাষী মাঠে শস্য উৎপাদন করিল তাঁতী তাহার কাপড়ের বিনিময়ে চাল পাইবে; চাষী তাহার চালের বিনিময়ে কাপড় পাইবে। তাই বলা চলে যে, শ্রমবিভাগ সফল হইতে পারে যদি উপযুক্ত বিনিময়-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে।

শ্রমবিভাগের ফল হইল বিনিময়

মনে রাখা দরকার যে, কোন দ্রব্য উৎপাদনের ধারাতে শ্রমবিভাগ কতদূর প্রসারিত হইবে তাহা নির্ভর করে সেই দ্রব্যটির বাজার বড় কি ছোট উহার উপর। বাজার প্রশস্ত বা বড় হইলে, বেশি দ্রব্য তৈয়ারি করিতে শ্রমবিভাগের প্রসার ঘটাইতে হয়, অর্থাৎ উৎপাদন ধারাকে আরও ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলা দরকার। শ্রমবিভাগ প্রসারিত হইলে দক্ষতা বাড়ে, নানা প্রকারে ব্যয় হ্রাস পায় এবং অতি দ্রুত বেশি পরিমাণ উৎপাদনের ভিত্তি গড়িয়া উঠে। দ্রব্যটি বেশি বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে, অর্থাৎ বাজার বড় না হইলে তাই শ্রমবিভাগ প্রসার করা সম্ভব হইয়া উঠে না।

শ্রমবিভাগের প্রসার বাজারের বিস্তৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ

একটু লক্ষ্য করিলে শ্রমবিভাগের বিভিন্ন ধরন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে একরূপ শ্রমবিভাগ প্রচলিত ছিল। সেইরূপ শ্রমবিভাগকে আদিম শ্রমবিভাগ বলে। মহাভারতে দেখা যায় পাণ্ডুপুত্রেরা যুদ্ধবিগ্রহ ও খাদ্য সংগ্রহ করিতেন এবং দ্রৌপদী ঘরে বসিয়া রান্না করিতেন। ক্রমে সমাজে বৃত্তিবৈশিষ্ট্য বা বিশেষায়ণ দেখা গেল। উহার নাম হইল সরল শ্রমবিভাগ। একদল লোক ছিল কামার, একদল কুমার, কেহ তাঁতী, কেহ বা চাষী—পুরুষ-পরম্পরায় তাহারা নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে কাজ করিয়া যাইত। এরূপ বৃত্তিবিশেষায়ণের ফলে আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের সমগ্র ধারা লোকেরা নিজেরাই সম্পন্ন করিত বলিয়া ইহাকে বলা হয় সরল শ্রমবিভাগ (simple division of labour or division into complete processes)। কিন্তু আধুনিক কালে আমরা দেখিতে পাই যে একটি দ্রব্য-তৈয়ারীর মোট ধারা বহু ছোট ছোট অংশে ভাগ হইয়াছে, এক একটি অংশে এক একদল লোক কাজ করে, সম্পূর্ণ দ্রব্যটির অতিক্ষুদ্র একটি অংশ উৎপাদন করিয়া লোকে উহার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে। উৎপাদনের ধারাকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিলে প্রতি অংশের উৎপন্ন দ্রব্যই অসম্পূর্ণ, কেবলমাত্র শেষ অংশে উহা সম্পূর্ণ দ্রব্যে পরিণত হয়। ইহাকে তাই বলে জটিল শ্রমবিভাগ বা অসম্পূর্ণ অংশে বিভাগীকরণ (complex division of labour or division into incomplete processes)। তাহা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলও বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন করিতে দক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সুইজারল্যাণ্ড ভাল ঘড়ি উৎপাদন করে, বাংলা দেশ ভাল পাটজাত দ্রব্য ও চা উৎপাদন করে। মিশর উৎকৃষ্ট তূলা উৎপাদনে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে বলে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (territorial division of labour)।

শ্রমবিভাগের প্রকারভেদ

শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of Division of Labour): "Wealth of Nations" নামক বিখ্যাত পুস্তকে অ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন যে, শ্রমবিভাগ না থাকিলে উৎপাদন বেশি হইতে পারে না। কোন শ্রমিক একা উৎপাদনের সকল অংশ করিতে গেলে দিনে একটি কি দুইটি আলপিন তৈয়ারি করিতে পারে। কিন্তু উৎপাদনের ধারা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া মাত্র দশজন শ্রমিক দিনে চল্লিশ হাজারের বেশি পিন প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়। তাই আধুনিক কালে সমাজের প্রায় প্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যায় বলিয়াই শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ এত বেশি বাড়িতে পারে।

উৎপাদন প্রভূত পরিমাণ বাড়ে

শ্রমবিভাগের প্রথম সুবিধা হইল যে, শ্রমিক অল্প একটু কাজে নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত রাখে বলিয়া তাহার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অল্প একটু অংশের কাজ ক্রমাগত করিতে থাকিলে এই কাজ অভ্যাসে পরিণত হয়, সেই কাজের খুঁটিনাটি সকল কিছু শ্রমিকের জানা হইয়া যায়। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে, ফলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

অভ্যাস দক্ষতা বাড়াইয়া তোলে

ইহার দ্বিতীয় সুবিধা হইল, নিজের ঝোঁক ও পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তিকে কাজকর্মে নিয়োগ করা যায়, ফলে উন্নত ধরনের দ্রব্য এবং বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন সম্ভবপর হইয়া থাকে। সকল লোক সকল কাজ করিতে পারে না, কোন কোন ধরনের কাজে কোন কোন ব্যক্তির বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। কেহ যন্ত্রপাতি চালাইতে পছন্দ করে, কেহ-বা চারুশিল্পের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক লইয়া বড় হইয়াছে। শ্রমবিভাগের প্রসার হইলে নানা ধরনের কাজকর্ম সৃষ্টি হয়; প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ঝোঁক অনুযায়ী কাজ পাইবার সুযোগ দেখা দেয়। যে ধরনের কাজে তাহার স্বাভাবিক যোগ্যতা বেশি, ব্যক্তি সেই কাজ সহজে করিতে পারে। এই কারণের ফলে শ্রমিকের উৎপাদন-যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

শ্রমিকেরা স্বাভাবিক ঝোঁক অনুযায়ী কাজ পায়

শ্রমবিভাগের তৃতীয় সুবিধা হইল যে, ইহার ফলে শ্রমিকের কাজের সময় ও শিক্ষানবিশীর সময় বাঁচিয়া যায়। একজন শ্রমিককে একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া কাজ করিতে হয় বলিয়া যন্ত্রের পরিমাণও কম লাগে। একজন তাঁতী যদি কাপড় তৈয়ারির সকল স্তর নিজেই করিতে চায় তাহা হইলে প্রত্যেক স্তরের কাজ শেষ করিয়া পরবর্তী স্তরে কাজ শুরু করার মধ্যে শারীরিক শক্তি ও সময়ের বহু অপব্যয় হয়; অখণ্ড মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু শ্রম বিভাগ থাকার দরুন আজকালকার কারখানায় শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট একটি যন্ত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সর্বক্ষণ কাজ করে। একজন শ্রমিকের জন্য একটি যন্ত্র হইলেই চলে, সকল স্তরের যন্ত্র তাহার একার দরকার হয় না। ছোট একটু কাজ করিতে হয় বলিয়া কোন শ্রমিককে উৎপাদনের সকল স্তর বা ধারা না শিখিলেও চলে। ইহার ফলে শ্রমিকের শিক্ষানবিশীর খরচ ও সময়—উভয়ই কম লাগে।

সময়, পরিশ্রম ও যন্ত্র বাঁচে

শ্রমবিভাগের চতুর্থ সুবিধা হইল যে, উৎপাদনের মোট কাজ ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হইয়া যায় বলিয়া প্রতিটি কাজে সোজাসুজি ও রুটিন-মাফিক হইয়া পড়ে। প্রত্যেকটি অংশের কাজ সরল ও যান্ত্রিক ধরনের হইয়া পড়ায় যন্ত্রের আবিষ্কার ও উহার প্রয়োগ সম্ভব

যন্ত্র আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা যায়

হয়। প্রয়োজনই আবিষ্কারের উৎস। রুটিন-মাফিক কাজ বার বার করার প্রয়োজন হইতেই যন্ত্রপাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রমবিভাগের অসুবিধা ঃ

অনেকে শ্রমবিভাগের কতকগুলি অসুবিধার কথাও বলিয়া থাকেন। যেমন, (ক) প্রতিদিন অল্প ছোট একটু কাজের অংশ বারবার করিতে থাকার ফলে শ্রমিকের কাজ একঘেয়ে ও নীরস ধরনের হইয়া উঠে। দিনের পর দিন একই ধরনের কাজে একঘেয়েমি দেখা দেয়। ইহাতে বহু প্রকার মানসিক রোগ ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। (খ) দ্রব্যটি পুরাপুরি তৈয়ারি করিতে পারিলে সৃষ্টির আনন্দ, তৃপ্তি ও গর্ব শ্রমিক পাইতে পারিত। এক্ষেত্রে সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। (গ) শ্রমিক সারাজীবনে একটি বিশেষ অংশের কাজ শেখে। যদি কখনও চাকরি যায় তাহা হইলে, অন্য কোন কাজ না জানায় তাহার বেকার হইয়া পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। (ঘ) অনেকে বলেন যে, শ্রমবিভাগের ফলেই শিল্প-কলকারখানার প্রবর্তন হইয়াছে। আর কলকারখানা আসিলেই উহার সহিত অপরিচ্ছন্নতা, জনবহুল নগর-জীবন, বস্তি জীবন, শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ প্রভৃতি আসিয়া পড়ে।

কি কি অসুবিধার কথা বলা চলে

তবে মনে রাখা দরকার যে, এই সকল অসুবিধার জন্য শ্রমবিভাগ নিজে ততটা দায়ী নয়। কারখানার মালিকেরা বেশি লাভ করার উদ্দেশ্যে কম মাহিনাতে শ্রমিকদের বেশিক্ষণ খাটাইতে চায়। কাজের মধ্যে মধ্যে ছুটি দেয় না। আমার পরিশ্রমের ফল সমগ্র সমাজ পাইবে না, ব্যক্তিগত একজন মালিক পাইবে—এই চিন্তার ফলেই নিরানন্দ দেখা দেয়। বেকারির সম্ভাবনা দূর করিতে পারাও উন্নত ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার কাজ। বস্তি-জীবন বা অপরিচ্ছন্নতার জন্য রাষ্ট্র বা সমাজ যতটা দায়ী, শ্রমিক বা শ্রমবিভাগ ততটা দায়ী নয়। এই সকল অসুবিধা দূর করাও সম্ভব। কিন্তু শ্রমবিভাগ না থাকিলে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা এত কম হয় যে, সমগ্র দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু গড় আয় ও জীবনযাত্রার মান খুবই কম থাকে।

ইহাদের জন্য দায়ী সমাজ-সংগঠন

মূলধন

মূলধন কাহাকে বলে ? (What is Capital ?) ঃ সভ্যতার প্রথম দিকে প্রকৃতিদত্ত উপকরণকে মানুষ খুব ভালভাবে ব্যবহার করিতে পারিত না। এখন প্রকৃতির দেওয়া উপকরণ লইয়া মানুষের শ্রমের দ্বারা বহু বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর

সম্পদ্‌ভাণ্ডার সৃষ্টি হইতেছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার দ্বারা। প্রথম যুগে মানুষের বেশি হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি ছিল না। সম্পদ্‌ও কম উৎপন্ন হইত। কিন্তু ক্রমে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার তৈয়ারী হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ খুব বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে।* খালি হাতে বেশি সম্পদ্‌ উৎপাদন করা যায় না; উপযুক্ত যন্ত্রপাতি থাকিলে অধিক পরিমাণে ও বিভিন্ন ধরনের সম্পদ্‌ সৃষ্টি করা যায়। শুধু কিছু জমি আর মানুষ থাকিলেই চলে না, তাহার জন্য লাঙল চাই, গরু চাই, বীজ চাই, জল চাই। শুধু তুলা আর তাঁতী থাকিলেই কাপড় তৈয়ারি হয় না, তাহার জন্য চরকা চাই, তাঁত চাই। কাপড় তৈয়ারি হইলেই হয় না, লোকের কাছে তাহা পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য রাস্তাঘাট, রেল লাইন, গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতি দরকার; হাটে-বাজারে দোকানঘর, আসবাবপত্র সবই দরকার। এই সকল বিভিন্ন রকম জিনিসপত্রের সাহায্যে শ্রমিক কাজ করে, ইহাদের উৎপাদনের কাজে খাটানো হয়, ফলে বেশি পরিমাণ, সম্পদ্‌ উৎপাদন সম্ভবপর হয়। এই সকল জিনিসকে মূলধন বলে। নিজেদের অভাব মিটাইবার কাজে মানুষেরা ইহাদের সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করে না; অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার কাজে ইহাদের নিয়োগ করা হয়। প্রকৃতির দেওয়া উপকরণ (যেমন, কাঠ) ও মানুষের শ্রম (মিস্ত্রীর শ্রমশক্তি)—ইহাদের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া এই সকল দ্রব্য (যেমন, তাঁত) নূতন সম্পদ্‌ সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হয় (যেমন, কাপড় উৎপাদনে)। ইহাকে মূলধনী দ্রব্য বলে। মূলধনকে তাই আদি উপাদান বলা হয় না। ইহা ভূমি ও শ্রমের মিলিত ফল, আরও অধিক বা নূতন ধরনের সম্পদ্‌ উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত। সুতরাং, ইহাকে উৎপাদনের উপাদান বলে।

যে সকল জিনিস উৎপাদনের কাজে খাটানো হয়

মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন করিলে বেশি পরিমাণে উৎপাদন করা যায়, তাই যে উৎপাদন করে সেই উৎপাদকের বেশি আয় হয়। মূলধন বেশি থাকিলে উহাকে উৎপাদনে খাটাইয়া বেশি আয় করা চলে। মূলধনের কাজই হইল আয় সৃষ্টি করা। সুতরাং মানুষের দ্বারা তৈয়ারী সম্পদের যে-অংশ হইতে আয় সৃষ্টি হয়, তাহাকেই আমরা মূলধন বলিতে পারি।

এবং যে সম্পদ আয় সৃষ্টি করে তাহাই মূলধন

কিরূপে মূলধনের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে আমরা মূলধনের প্রকৃতি ভালভাবে বুঝিতে পারিব। মনে কর, একব্যক্তির কোন মূলধন নাই। সে খালি হাতে মাছ ধরিয়া জীবন ধারণ করে। রোজ সে দুইটি করিয়া মাছ ধরিতে পারে, ইহার বেশি উৎপাদন করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সে সাতদিন রোজ একটি

* জীববিজ্ঞানীরা তাই বলেন যে, মানুষ হইল হাতিয়ার তৈয়ারি করিতে পারে এমন জীব (Man is a tool-making animal)।

করিয়া মাছ খাইয়া কষ্ট করিয়া সাতটি মাছ সঞ্চয় করিয়া রাখিল, উহা সে ভোগ করিল না। পরবর্তী সাতদিন ধরিয়া সে কোন মাছ ধরিতে গেল না, পূর্বের জমানো বা সঞ্চিত সাতটি মাছ রোজ একটি করিয়া খাইতে থাকিল। সাতদিন সে মাছ না ধরিয়া তাহার সকল সময় ও সঞ্চয়ের সাহায্যে বড়শি তৈয়ারি করিতে শুরু করিল। বঁড়শি তৈয়ারি হইয়া গেলে উহার সাহায্যে সে এখন রোজ 5টি করিয়া মাছ ধরিতে পারে। বঁড়শি হইল তাহার মূলধন, উহাকে নিয়োগ করায় উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে, বঁড়শির মালিকের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 5টি মাছের 3টি সে রোজ খাইয়া ফেলে, আয় বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার ভোগও একটু বাড়িয়াছে।

প্রথমে সঞ্চয় তাহার পরে সেই সঞ্চয়ের সাহায্যে মূলধন তৈয়ারি করা

দুইটি মাছ সে জমাইয়া রাখে, তাহার সঞ্চয়ও বাড়িয়া গিয়াছে। রোজ দুইটি করিয়া মাছ সঞ্চয় করিয়া 3 মাস পরে তাহার মোট সঞ্চয় যখন বাড়িয়া গিয়াছে তখন সে দুই মাস মাছ না ধরিয়া সেই সময়ের মধ্যে একখানা জাল তৈয়ারি করিয়া ফেলিল। অথবা সঞ্চিত মাছ বিক্রয় করিয়া অপর কাহারও নিকট হইতে জাল কিনিয়া আনিল। এই জালের সাহায্যে এখন সে আরো বেশি মাছ ধরিতে পারে। তাহার আয় বাড়িয়া গেল। আয় বেশি হওয়ায় সে আরও বেশি পরিমাণ সঞ্চয় করিয়া ক্রমে নৌকা কিনিবে বা তৈয়ারি করিবে। উহাতে তাহার আয় আরও বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং মূলধন হইল অতীতের ভূমি ও শ্রমের সঞ্চিত ফল, বর্তমানের উৎপাদন ও আয় বাড়াইতেছে, ভবিষ্যতের ভোগ ও সঞ্চয় বাড়ানোই ইহার লক্ষ্য।

সেই মূলধন নিয়োগ করিয়া আয় বাড়ানো, ফলে সঞ্চয় ও মূলধনের আরও বৃদ্ধি

টাকাকড়ি ও মূলধন (Money and Capital) ঃ সাধারণ ভাষায় মূলধন বলিতে টাকা পয়সা বুঝায়। একটি শিল্পকারখানার মূলধন হয়তো 10 লক্ষ টাকা। ব্যবসায়ীরাও তাহাদের মূলধনের পরিমাণ টাকার অঙ্কে প্রকাশ করে। কিন্তু অর্থনীতিতে টাকাকড়িকে সরাসরি মূলধন বলা হয় না। মানুষের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদ্ উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হইলে তাহাকে মূলধন বলা হয়। যে-সকল সম্পদ্ উহার মালিককে আয় প্রদান করে, কিংবা সরাসরি উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া আরও সম্পদ্ সৃষ্টি করে, তাহাকেই মূলধন বলে। যন্ত্রপাতি, কারখানা, কাঁচামাল, ব্যাঙ্কে রক্ষিত অর্থ, দোকানে মজুত করা জিনিসপত্র ইত্যাদি সকল সম্পদকেই মূলধন বলা যায়, কারণ, ইহারা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কৃষকের মূলধন, বীজশস্য, সার, লাঙল, বলদ প্রভৃতি আসল মূলধন (real capital)। অবশ্য এই সকল জিনিসের দাম হিসাব করিয়া টাকার অঙ্কে মূলধনের পরিমাণকে প্রকাশ করা চলে।

অর্থের হিসাবে প্রকাশিত, কিন্তু অর্থ ই মূলধন নয়

মূলধন ও সম্পদ্ (Wealth and Capital) : সুতরাং সম্পদের সহিত মূলধনের একটু পার্থক্য আছে। সম্পদের যে-অংশ মানুষের দ্বারা উৎপন্ন এবং অপর দ্রব্যাদি উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত হয় তাহাকে মূলধন বলে। সমস্ত মূলধনই সম্পদ্, কিন্তু সমস্ত সম্পদ্ মূলধন নহে। ভোগ-কার্যে নিয়োজিত দ্রব্যাদি সম্পদ্ এবং উৎপাদন-কার্যে নিয়োজিত দ্রব্যাদি হইল মূলধন। ধান যদি চাউল করিয়া ভোগে নিয়োগ করা যায়, তবে তাহা সম্পদ্ ; আর ধান যদি বীজরূপে ক্ষেত্রে বপন করিয়া উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয় তবে তাহা মূলধন।

সম্পদের যে অংশ হইতে আয় হয়

মূলধনের প্রকার ভেদ (Classification of Capital) : নানা শ্রেণীতে মূলধনকে ভাগ করা যায়। প্রথমত, সামাজিক মূলধন ও ব্যক্তিগত মূলধন। সমষ্টিগতভাবে সমাজ যে-জিনিস হইতে আয় করে তাহাকে সামাজিক মূলধন বলে। যেমন, সিন্ত্রি সার উৎপাদন কারখানা সামাজিক মূলধন। লোকেরা যে সকল জিনিস হইতে আয় করে তাহাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে। যেমন, বাড়ি, কোম্পানির কাগজ, কলকারখানা প্রভৃতি ব্যক্তিগত মূলধন।

দ্বিতীয়ত, মূলধনকে স্থির মূলধন ও সঞ্চরণশীল মূলধনে ভাগ করা চলে। যন্ত্রপাতি, কারখানার দালান প্রভৃতি জিনিসের আকার একবার ব্যবহারে পরিবর্তিত হয় না। উৎপাদনকার্যে ইহাদের একাধিকবার ব্যবহার করা চলে। এই শ্রেণীর মূলধনকে স্থির মূলধন (fixed capital) বলে। যে মূলধন উৎপাদনে মাত্র একবার ব্যবহার করিলে আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা চলে না, তাহাকে সঞ্চরণশীল মূলধন (circulating capital) বলা হয়। তুলা, চামড়া, কয়লা ইত্যাদি একবার ব্যবহার করিলেই ভিন্ন আকার ধারণ করে। সুতরাং এইরূপ মূলধনকে সঞ্চরণশীল মূলধন বলা হইয়া থাকে। যেমন, তাঁতকে বারবার কাপড় উৎপাদনে খাটানো যায় ; ইহা স্থির মূলধন। কিন্তু সুতার সাহায্যে একবারই কাপড় তৈয়ারি হইতে পারে, ইহা সঞ্চরণশীল মূলধন।

স্থির ও সঞ্চরণশীল মূলধন

তৃতীয়ত, অনেকে মূলধনকে আরও দুইভাগে ভাগ করেন, যেমন—বিশিষ্ট মূলধন (specialised or sunken capital) এবং নির্বিশিষ্ট বা ভাসমান মূলধন (non-specialised or floating capital)। যে-যন্ত্রপাতি বা দ্রব্য কেবল বিশেষ একটি বা এক ধরনের দ্রব্য উৎপাদনেই নিযুক্ত হইতে পারে তাহাকে বিশিষ্ট মূলধন বলে, যেমন ব্লাস্ট্ ফার্নেস। আবার যে-সকল যন্ত্রপাতি বা মূলধন বহু প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে খাটিতে পারে তাহা নির্বিশিষ্ট বা ভাসমান মূলধন। যেমন—কয়লা, বিদ্যুৎ, কোদাল, ঘরবাড়ি প্রভৃতি।

বিশিষ্ট ও নির্বিশিষ্ট মূলধন

চতুর্থত, মূলধনকে অনেক সময় সহায়ক বা উৎপাদক মূলধন (auxiliary or producers' capital) বলে। যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট প্রভৃতি এইরূপ মূলধন। ইহা ব্যতীত শ্রমিকের খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, বাসস্থান প্রভৃতিও উৎপাদনে সাহায্য করে—ইহাদের ভোগ করিয়া শ্রমিকেরা উৎপাদন কার্যে সাহায্য করিতে পারে। ইহাদের ভোগ্য মূলধন (Consumers' capital) বলে।

উৎপাদক ও ভোগ্য মূলধন

মূলধনের কার্য (Functions of Capital): মূলধনের তিনটি প্রধান কাজ: উৎপাদন ও আয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তোলা; উৎপাদনের সময়ে শ্রমিকের ভোগের কাজে ব্যবহৃত হওয়া; কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া উৎপাদনের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখা।

আধুনিক উৎপাদনকে পুঁজিবাদী উৎপাদন বলা হয়। কারণ, উৎপাদন-ক্রিয়ায় মূলধন বা পুঁজি প্রধান অংশ গ্রহণ করে। মূলধন অতীতের সঞ্চয়ের ফল এবং কিছুকাল ভোগকার্য হইতে বিরত থাকিলেই সঞ্চয় সম্ভব। মূলধনের সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক এবং উৎপাদনে মূলধনের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মনে কর, এক শিকারী শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহার শিকার করিবার ভাল অস্ত্র নাই, পাথর ছুঁড়িয়া অথবা গাছের ডাল দিয়া লাঠি তৈয়ারি করিয়া সে পশু শিকার করে। ভাল অস্ত্র বা উন্নত ধরনের মূলধন তৈয়ারি করিতে হইলে তাহাকে দুই সপ্তাহকাল শিকার হইতে বিরত থাকিয়া পাথর বা লোহা হইতে নূতন অস্ত্র তৈয়ারি করিতে হইবে। এই দুই সপ্তাহ সে পূর্বের শিকারের সঞ্চয় দ্বারা চালাইয়া লইবে। সে জানে ঐ মূলধন তৈয়ারির পরে সেই অস্ত্রের সাহায্যে সে অধিক শিকার বা উৎপাদন করিতে পারিবে। সুতরাং মূলধন উৎপাদন করিতে পারিলে অধিক দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব। আবার অধিক উৎপাদনে মূলধন বাড়ে, কারণ, সেই অধিক উৎপাদন অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করা সম্ভব। সেই বাড়তি মূলধন বিনিয়োগ করিলে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। এইরূপে চক্রের আকারে একটি আর একটিকে বাড়াইয়া চলে।

উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো

দ্বিতীয়ত, কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে যথেষ্ট সময় পার হইয়া যায়। সেই সময়ের পরে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া শ্রমিকদের কাজের মূল্য দিলে তাহাদের চলে না। মনে কর, 1958 সনে ইংলণ্ডে একটি দ্রব্য তৈয়ারি হইল, তাহা 1961 সনে ভারতবর্ষে বিক্রয় হইল। কারখানার মালিক মজুরদের বলিতে পারে না যে, আগে দ্রব্যটি বিক্রয় হউক, পরে উহার মূল্য হইতে মজুরি দেওয়া হইবে। শ্রমিকেরা দৈনিক

উৎপাদনের সময় মজুরদের বাঁচাইয়া রাখা

অথবা সাপ্তাহিক অথবা মাসিক মজুরি পাইয়া যাইবে। এই মজুরির সাহায্যে তাহারা খাদ্য, বস্ত্র বা ভোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিবে। এই অগ্রিম মজুরি দেওয়া হয় মালিকের মূলধন হইতে। মূলধন ব্যতীত শ্রমিকের পক্ষে জীবন ধারণ কঠিন হইত। এই ভাবে মজুরি দিবার ব্যবস্থা করিয়া মূলধন উৎপাদনের কার্যে পরোক্ষভাবে সহায়তা করা হয়। এইরূপে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সংযোগ সাধন করা মূলধনের একটি কাজ।

কাঁচামাল ক্রয় করিয়া, মজুরের মজুরি দিয়া উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা মূলধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত যদি উৎপাদককে বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের গতিতে বাধা পড়ে, বহু উপাদান অলস ও বেকার হইয়া পড়ে এবং উৎপাদনের ব্যয়ও বাড়িয়া যায়। মূলধন থাকিলে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় সম্পূর্ণ না হইলেও উৎপাদন চলিতে পারে এবং একই সঙ্গে দ্রব্যের বিক্রয় ও উৎপাদন সচল রাখা সম্ভবপর হয়।

উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা

সঞ্চয় (Saving) : অর্জিত আয়ের অংশবিশেষকে ভোগ না করিয়া তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য জমাইয়া রাখার নাম সঞ্চয়। সঞ্চয়ের উপরেই মূলধন নির্ভর করে। মানুষ যদি তাহার সমস্ত আয়ই ভোগে ব্যয় করে তবে সঞ্চয় হয় না। তিনটি বিষয়ের উপরে সঞ্চয় নির্ভর করে—মানুষের সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা, তাহার সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা এবং দেশে সঞ্চয় করিবার সুবিধা।

ভোগ হইতে বিরত থাকা

সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা থাকিলেই সঞ্চয় হয় না, ক্ষমতা থাকা চাই। যে গরীব কেরানীর বা শিক্ষকের 200 টাকা আয়ের দ্বারা সংসার চালাইতে হইবে, তাহার শত ইচ্ছা থাকিলেও, ক্ষমতা না থাকায় সঞ্চয় হয় না। আবার যে অমিতব্যয়ীর যথেষ্ট আয় কিন্তু মোটেই সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি নাই, তাহার সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকিলেও ইচ্ছার অভাবে সঞ্চয় হয় না। সুতরাং ইচ্ছা ও ক্ষমতা উভয়ই প্রয়োজন। সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে প্রধানত ব্যক্তির আয়ের উপর। যদি সাধারণভাবে দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মোট সঞ্চয়ও বাড়িবে। লোকের আয় কম থাকিলে মোট সঞ্চয়ও কম হইবে। তাহা ছাড়া দেশে সঞ্চয় জমা করিবার সুবিধাও থাকা চাই। এইজন্য ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, টাকা লগ্নীতে খাটাইবার মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার; সুতরাং দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, টাকা খাটাইবার সুযোগ প্রভৃতির উপর সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে। আর সঞ্চয়ের ইচ্ছা নির্ভর করে সুদের হার, পরিজনের প্রতি স্নেহ ও তাহাদের ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের ব্যবস্থার ইচ্ছা, দূরদর্শিতা, ভবিষ্যৎ উন্নতির চিন্তা, সম্ভাবনা ইত্যাদির উপরে।

সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা

মূলধন-গঠন (Formation of Capital) : **সঞ্চয়ের ফলে মূলধন বাড়ে।** তিনটি উপায়ে দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়ানো যায়। যাহারা ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করিতেছে তাহারা কয়েকদিন কঠিন পরিশ্রম করিয়া কিছু অতিরিক্ত জিনিস তৈয়ারি করিতে পারে। এই অতিরিক্ত জিনিস হইতে মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারা যায়। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকেরা প্রতিদিন কিছু সময় ভোগ্যদ্রব্য ও কিছু সময় যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিতে পারে। ইহাতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন কিছু কমিয়া যাইবে এবং কিছুটা উৎপাদকদ্রব্যও তৈয়ারি হইবে। তৃতীয়ত, দেশে একদল শ্রমিক ভোগ্যদ্রব্য ও অপর একদল শ্রমিক উৎপাদকদ্রব্য তৈয়ারি করিতে পারে। এক্ষেত্রে যাহারা ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবে তাহারা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের সবটুকু ভোগ করিতে পারিবে না। কারণ, যাহারা যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতেছে, তাহাদিগকেও কিছু অংশ দিতে হইবে। স্নতরাং মূলধন বাড়াইতে হইলে সঞ্চয়ের দরকার এবং সঞ্চয় করিতে হইলে ভোগ হইতে বিরত থাকা দরকার। কিন্তু কি কারণে মানুষ ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া সঞ্চয় করিবে? কারণ, সঞ্চয় হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উৎপাদক দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। এই সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে উৎপাদন বাড়ে। স্নতরাং বর্তমানে উৎপাদনের সবটুকু ভোগ না করিয়া সঞ্চয় করিলে ভবিষ্যতের উৎপাদন বাড়িতে পারে।

মূলধন গঠনের তিনটি স্তর

দেশের মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারি করার তিনটি ধাপ আছে। প্রথম স্তরে দেশের লোককে সঞ্চয় করিতে হইবে। ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় কমাইয়া কিছু অংশ সঞ্চয় করা দরকার। দ্বিতীয় স্তরে, লোকের হাতে ছড়ানো সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রে জড়ো করিতে হইবে। সেইজন্য ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি সঞ্চয়-সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা দরকার। তৃতীয় স্তরে সেই সঞ্চয়ের সাহায্যে যন্ত্রপাতি উৎপাদন বা মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারি করিতে হইবে। রাষ্ট্র বা উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীরা এই কাজ করিয়া থাকে। দেশের লোকের নিকট হইতে করের (taxation) সাহায্যে বা ঋণের (borrowing) সাহায্যে রাষ্ট্র এই সঞ্চয় নিজের হাতে লইয়া আসে এবং উহার সাহায্যে মূলধনী দ্রব্য তৈয়ার করে। ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্ক বা কোম্পানীর নিকট হইতে ঐ সঞ্চিত অর্থ ঋণ করিয়া লইয়া আসে এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানা গড়িয়া তোলে। এইরূপে দেশের মূলধন-গঠন চলিতে থাকে।

ভারতে মূলধনের অভাব এবং মূলধন-গঠনের সমস্যা (Shortage of Capital and Problem of Capital-formation in Indian Economy) : **ইংলণ্ডের ন্যায় উন্নত দেশে মূলধনের অভাব নাই। এই সকল দেশে বহুপূর্বে**

শিল্প প্রসার শুরু হওয়ায় তাহারা অনেকদিন ধরিয়া মূলধন গঠনের সুযোগ পাইয়াছে। তাহাদের প্রাথমিক সঞ্চয় হইয়াছিল উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এবং শিল্প-বিপ্লবের প্রথম সুযোগ গ্রহণ করিয়া ও দেশ-বিদেশে শিল্পদ্রব্য চালান দিয়া প্রচুর মুনাফা করিয়া। ফলে তাহাদের সঞ্চয়ও বেশি। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় অনুন্নত দেশসমূহে মূলধন-গঠনের উপায় সীমাবদ্ধ। অনুন্নত দেশে জীবনযাত্রার মান এবং আয়ের স্তর এত নীচু যে আয়ের সকল অংশ ভোগ্যদ্রব্য কিনিতেই ব্যয় হইয়া যায়, সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে, গড়ের হিসাবে, মাথাপিছু আয়ের ⅔ অংশ কেবল খাদ্যের পিছনেই ব্যয় করিয়া কিছু সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। যদি-বা অল্প কিছু সঞ্চয় করা সম্ভব হইল তাহাও শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও বারোমাসে তেরো পার্বণে ব্যয় হইয়া যায়। তাহা ছাড়া কৃষিপ্রধান দেশে মূলধনের বৃদ্ধি মন্থর। ভারতে প্রতিবৎসর বহু পরিমাণে 'সম্পদের' উৎপত্তি হয়, যেমন—ধান, গম, ডাইল, ইক্ষু প্রভৃতি। কিন্তু চাষীদের গোলায় রক্ষিত এই উৎপন্ন সম্পদ্ ধীরে ধীরে ব্যয়িত হয় অর্থাৎ সারা বছর ধরিয়া একটু একটু করিয়া ভোগ হইতে থাকে। ফলে উহা মূলধনে পরিণত হয় না, অর্থাৎ উহাকে একত্র করিয়া আরও অধিক সম্পদ্ সৃষ্টির কার্যে নিয়োগ করা হয় না। প্রতি সপ্তাহে চাষী তাহার গোলা হইতে সঞ্চিত ধান কিছু কিছু বাহির করিয়া হাটে গিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিয়া লয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহার সঞ্চিত ধন নিঃশেষিত হইয়া যায়, উহা আর মূলধনে পরিণত হইতে পারে না, অর্থাৎ নূতন ধন অর্জনে নিযুক্ত হয় না।

মূলধন কম বলিয়া আয় কম, এবং আয় কম বলিয়াই মূলধন কম

দ্বিতীয়ত, আমাদের মত অনুন্নত দেশের লোকের হাতে যতটুকু সঞ্চয় সৃষ্টি হয় তাহা দিয়া লোকেরা জমি কেনে, অথবা সোনা কিনিয়া ঘরে জমাইয়া রাখে। ইহার ফলে সেই সঞ্চয়ের সাহায্যে যন্ত্রপাতি বা মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না। তাহা ছাড়া, ভারতের লোকেরা তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে প্রধানত নিজেদের ঘরের মধ্যেই মজুত করিয়া রাখে। দেশের সঞ্চয় বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে ছড়ানো ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। উহাদের একত্র করিবার মত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, শেয়ারের বাজার প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় দেশের মোট সঞ্চয় একত্রে জড়ো করা যায় না ; মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারি করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, ভারতে আর্থিক মূলধনের সাহায্যে আসল মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি তৈয়ার করার পথে অনেক বাধা আছে। দেশে কলকারখানা চালাইবার উপযুক্ত প্রচুরসংখ্যক দক্ষ বা নিপুণ উদ্যোক্তা এবং শ্রমিকও আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। দেশের দক্ষতার অভাব মূলধন-গঠনের পথে প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখা দেয়।

সঞ্চয়ের রূপ জমি ও সোনা, ঘরেই জমানো

শ্রমিকের ও উদ্যোক্তার দক্ষতার অভাব

আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জনসংখ্যা আছে বলিয়া কৃষিতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণ লোকজন নিযুক্ত আছে। এই প্রকার অনুন্নত দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বেকারি (disguised unemployment) দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের কৃষিক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়া আসিলে শস্য উৎপাদন কমিয়া যায় না। চাষের কাজ হইতে এইরূপ কিছু অপ্রয়োজনীয় লোক সরাইয়া আনিয়া আমাদের মত দেশে মূলধন গঠনের কাজে (যেমন—রাস্তাঘাট, জলসেচ বা বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রভৃতি কাজে) নিয়োগ করা চলে। যাহারা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের কাজে রহিয়া গেল তাহারা অন্তত পূর্বের পরিমাণ জিনিসপত্র উৎপাদন করিবে, ফলে দেশে ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ কম হইবে না।* এইভাবে ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশে মূলধন-গঠন হইতে পারে। তবে সবচেয়ে বাধা হইল দক্ষতার অভাব। চাষেয় কাজ হইতে লোক সরাইয়া আনিলেই তাহারা কলকারখানাতে যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করার উপযুক্ত দক্ষতা লইয়া আসে না। দক্ষতার অভাবে আমাদের দেশে মূলধন-গঠন মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

সংগঠক (The Entrepreneur): উৎপাদন-ব্যবস্থায় সূক্ষ্ম কর্মবিভাজনের মাধ্যমে ও নানাপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ যতই বৃহৎ ফ্যাক্টরী ও অনুরূপ বিশালকায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠান চালু করিয়াছে, ততই উৎপাদনের অন্যতম উপাদান 'সংগঠকের' (Organizer বা Entrepreneur) গুরুত্ব বাড়িয়াছে। বস্তুত ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগাইয়া ও নানাবিধ নবাবিষ্কৃত যন্ত্র ব্যবহার করিয়া দিকে দিকে অগণিত ফ্যাক্টরী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা যে আমূল পাল্টাইয়া গেল, যে-পরিবর্তনকে ঐতিহাসিকগণ শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) নামে অভিহিত করিয়াছেন,—সেই পরিবর্তন আনয়নে সংগঠক-শ্রেণীর বিশেষ ভূমিকা ছিল, তাহা সর্বজনস্বীকৃত। যে শ্রমিক গ্রামে মাটি চষিতে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে শহরে টানিয়া আনিয়া বিরাটাকার ফ্যাক্টরীতে বাষ্প বা বিদ্যুৎ-চালিত নূতন ধরনের কলকব্জার সম্মুখে কে হাজির করিয়াছিল, প্রকৃতি হইতে আহরিত কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া কে-ই বা তাহাকে নূতন ধারায় উৎপাদন করিতে লাগাইয়া দিল, অর্থনীতির আলোচনায় তাহা না ভাবিলে চলিবে না। এই যে কর্মকর্তা, যিনি 'জমি' 'শ্রম' ও 'মূলধনের' যোগাযোগ সাধন করিলেন, অর্থনীতিতে তাঁহাকেই আমরা 'সংগঠক' বলি।

অবশ্য শুধুমাত্র 'সংগঠক'কে খুঁজিয়া পাইবার জন্য শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজন ছিল না।

* লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কৃষিতে নিযুক্ত লোকজন যাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত আয় বা ভোগ তৎক্ষণাৎ না বাড়াইতে পারে, কারণ তাহা হইলে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা উপযুক্ত পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবে না।

কারণ, যে চাষী তখন নিজ জমিতে চাষ-বাস করিয়া ফসল তুলিতেছিল এবং তাহার বিনিময়ে জমিদারের খাজনা ও মহাজনের সুদ চুকাইয়া নিজের প্রয়োজন মিটাইতে-ছিল, সে একাধারে শ্রমিক ও সংগঠক উভয়ের কাজই করিতেছিল। কিন্তু ইহা খুবই স্পষ্ট যে আধুনিক ফ্যাক্টরীপ্রথায় উৎপাদন চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সংগঠকের গুরুত্ব এত বাড়িয়াছে।

সংগঠকের কাজ (Functions of an Entrepreneur)

1. কোন্ জিনিস কোন্খানে কত পরিমাণ তৈয়ারী হইবে, কি কি যন্ত্র বসিবে, কত মূলধন লাগিবে এবং সে মূলধন আসিবেই বা কোথা হইতে, কি সংখ্যায় এবং কি ধরনের শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে, কাঁচামাল কোথা হইতে কি দরে কিনিতে হইবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ই বা হইবে কোথায় এবং কি দরে,—এই সমস্ত পরিকল্পনা করা এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব সংগঠকের। এক কথায় পরিকল্পনা (planning) ও গোড়া পত্তন (promotion) করেন সংগঠক।

2. কারবারটিকে নিয়মিতভাবে পরিচালনা (management) করার দায়িত্বও তাঁহার। কাঁচামাল খরিদ করা, শ্রমিকদিগের মধ্যে যে যে-কাজে বেশি দক্ষ তাহাকে সেই কাজে নিয়োগ করা, শ্রমবিভাগের এই নীতির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা, জিনিস বিক্রয় করা—সব তিনিই করেন বা করান। তাহা ছাড়া সর্বদাই উৎপাদনব্যয় কমানো বা অন্য কোন উপায়ে উন্নতি করার বিষয়ে তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হয়; নতুবা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতে হইবে। বিশেষ করিয়া নূতন আবিষ্কার ব্যবহারের জন্য তাঁহাকেই অগ্রণী হইতে হইবে।

3. সংগঠক জমির জন্য খাজনা (Rent), শ্রমিককে মজুরি (Wages), মূলধন ব্যবহার বাবদ সুদ (Interest) বণ্টন করিয়া নিজস্ব প্রাপ্য মুনাফা (Profits) রাখিয়া থাকেন।

4. এইভাবে প্রত্যেকের পাওনা মিটাইতে গিয়াই সংগঠকের উপর এক গুরুদায়িত্ব পড়িয়াছে,—তাহা হইল ঝুঁকি-বহনের (risk-taking) দায়িত্ব। আধুনিক উৎপাদন সময়সাপেক্ষ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দুর্গাপুর বা ভিলাই-এর ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্য শেষ করিতেই কত সময় লাগিয়া গেল। তাহার পর কারখানায় উৎপাদন শুরু হইলেও তাহার বিক্রয়লব্ধ মূল্য উৎপাদকের হাতে ফিরিয়া আসিতে হয়ত ছয় মাস, একবছর বা তদপেক্ষা দীর্ঘকাল লাগিয়া যাইবে। এত দিন ধরিয়া মহাজনের সুদ, শ্রমিকের মজুরি বা জমির খাজনা,—কিছুই বাকি ফেলিয়া রাখা যাইবে না; সংগঠককে সবই মিটাইতে হইবে। কিন্তু ওদিকে এই

সময়ের মধ্যে কোন অচিন্তিতপূর্ব কারণে হয়ত লোকের রুচি ও পছন্দ পাল্টাইয়া গিয়াছে। শখ-শৌখিনতা বদলের সাথে উৎপন্ন জিনিসের চাহিদা হয়ত এমন পড়িয়া গেল যে কিছু পরিমাণ অবিক্রিত রহিল এবং উহাকে জলের দরে বিকাইতে হইল। এই অবস্থায় প্রচুর লোকসান হইবে। এই ভবিষ্যৎ আন্দাজ করিয়া উৎপাদন করিতে গেলে যে ঝুঁকি আসিয়া পড়ে সংগঠককেই তাহা বহন করিতে হয়।

বর্তমান যুগে এই ঝুঁকিবহনের কাজকে সংগঠকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলিয়া বলা হইতেছে। বিশেষ করিয়া যৌথ মূলধনী-ব্যবসায় চালু হওয়ার পর দেখা যাইতেছে যে পরিচালকের কাজ মাহিনাভোগী কর্মচারীদের দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু এখানে 'শেয়ার-হোল্ডার' হিসাবে যাঁহারা অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন লাভ-লোকসানের ঝুঁকি একমাত্র তাঁহারাই বহন করেন। কাজে কাজেই ঝুঁকিবাহক হিসাবেই তাঁহারা সংগঠকের প্রাপ্য 'মুনাফা' গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কেয়ার্নক্রস (Cairncross) প্রমুখ অনেক লেখক অবশ্য 'সংগঠককে' উৎপাদনের স্বতন্ত্র উপাদান হিসাবে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে যেহেতু বেতনভোগী ম্যানেজার দিয়া পরিচালনার কাজ চলে সেইজন্য ইহাকে স্বতন্ত্র উপাদান হিসাবে না দেখাইয়া 'শ্রমেরই' প্রকারভেদ বলিয়া বিচার করা উচিত। মানসিক শ্রম হইলেও ইহা শ্রমই। 'উদ্যোগ' লইবার ক্ষমতাকে বিশেষ গুণ বলিয়া অভিহিত করিয়া যদি স্বতন্ত্র উপাদানের মর্যাদা দিতে হয়, তবে নিয়মিত রুটিন বাঁধা কাজের একঘেয়েমি মানিয়া লইবার যে সহনশীলতা আছে তাহাকেই বা স্বতন্ত্র উপাদান বলা হইবে না কেন? সমাজে উভয় কাজেরই তো প্রয়োজন আছে। উপরন্তু কয়লা-খাদের গভীরে যে শ্রমিক কাজ করিতেছে সে কি জীবনের ঝুঁকি বহন করে না? বিপজ্জনক কাজ না হইলেও সব শ্রমিককেই তো বেকার হইবার বা পদোন্নতি-না ঘটিবার ঝুঁকি-বহন করিতে হয়। আসলে ঝুঁকি জিনিসটা অন্যান্য উপাদানের সহিত জড়িত থাকিলেও, ধনতান্ত্রিক সমাজে ঝুঁকিকে মূলধনের সাথী হিসাবেই দেখা হয় এবং মুনাফাকে সেই ঝুঁকির পুরস্কার হিসাবে মূলধনের লগ্নীকারকের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

Questions to be discussed

1. What are the different factors of production ?
   উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানসমূহ কি কি ?
2. What is meant by Land in economics ?
   অর্থনীতিতে ভূমি বলিতে কি বুঝায় ?

3. Explain the Law of Diminishing Returns. What are its limitations ? Is it applicable only in agriculture ?

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম ব্যাখ্যা কর। ইহার সীমাবদ্ধতা কি কি ? ইহা কি কেবল কৃষিতেই প্রযোজ্য ?

4. What are the factors that determine the Supply of Labour in a country ?

কোনো দেশে শ্রমিকের যোগান কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ?

5. Explain the Malthusian Theory of Population.

ম্যালথাসের জনসংখ্যা সম্পর্কীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

6. Discuss the factors that determine the Efficiency of labour.

শ্রমিকের দক্ষতা নির্ণয়কারী শক্তিসমূহ আলোচনা কর।

7. What do you mean by Division of Labour ?

শ্রমবিভাগ কাহাকে বলে ?

8. Discuss the advantages and disadvantages of Division of Labour.

শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

9. What is Capital ? Discuss the functions of Capital.

মূলধন কাহাকে বলে ? উহার কার্যাবলী বর্ণনা কর।

10. Distinguish between : (1) Money and Capital, (2) Wealth and Capital.

পার্থক্য নির্ণয় কর : (১) টাকাকড়ি ও মূলধন, (২) সম্পদ্ ও মূলধন।

11. Discuss the Formation of Capital with special reference to Indian conomy.

ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশে মূলধন গঠন হয় কিরূপে ?

12. What do you mean by Entrepreneur ? Discuss the functions of an ntrepreneur.

উদ্যোক্তা কাহাকে বলে ? উদ্যোক্তার কার্যাবলী বর্ণনা কর।

৫

উৎপাদনের আয়তন

The Scale of Production

বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা (Advantages of Large Scale Production) ঃ দেশে ছোট ও বড় ফার্ম পাশাপাশি থাকিলেও দেখা যায় যে, আধুনিক কালে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বা ফার্মগুলির আয়তন বড় আকারের হইতেছে। বিরাট কারখানা, হাজার হাজার মজুর, লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন, বাষ্পচালিত বা বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রপাতি, প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিদর্শন। আধুনিক কালের এই প্রকার উৎপাদক-সংগঠনকে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন (large-scale production) বলে।

বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন কাহাকে বলে

বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন সংগঠন ক্রমশ বেশি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহার কারণ হইল, কোন ফার্ম বা কোন শিল্পে উৎপাদনের মাত্রা (scale of production) বড় হইলে কতকগুলি দিকে খরচা কমিয়া যায়। ইহাদের ব্যয়সংকোচ (economy) বলে। অধ্যাপক মার্শাল এই ব্যয়সংকোচগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ ও বাহ্য ব্যয়সংকোচ (internal economies and external economies)।

বৃহৎ আয়তন, বড় যন্ত্র, অধিক মূলধন ও উন্নত ধরনের পরিচালনা ও সংগঠন-ব্যবস্থার জন্য কোন একটি ফার্মের উৎপাদনমাত্রা বড় হইতে পারে। তাহাতে সেই ফার্মটি কিছু কিছু নূতন সুযোগ-সুবিধা পাইতে থাকে, এই সকল সুযোগ-সুবিধার জন্য দ্রব্যের ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় বা গড়-ব্যয় কমিয়া আসে; এই সকল সুযোগ-সুবিধাকে একত্রে আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ বলে।

অনেক দিক হইতে এইরূপ আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ দেখা দিতে পারে। প্রথমত, যন্ত্রগত ব্যয়সংকোচ (technical economies)। তুলনামূলকভাবে বড় যন্ত্র বেশি উৎপাদনক্ষম। বৃহৎ যন্ত্র ব্যবহার করিলে যে খরচ পড়ে তাহা বেশি দ্রব্যের মধ্যে ভাগ হইয়া যায় বলিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের ইউনিট-পিছু খরচা কম। বাষ্প ও বিদ্যুৎশক্তিকে পূর্ণভাবে কাজে খাটানো যায়। বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক আবিষ্কার ও গবেষণার সুযোগ পাওয়া যায়। আনুষঙ্গিক দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হয়, যেমন, কাপড় তৈয়ারীর ফার্মটি শার্ট ও কোট তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করিতে পারে, একই যন্ত্রশক্তির সাহায্যে এইরূপ আনুষঙ্গিক দ্রব্যের কারখানাও চালানো যায়। ফলে খরচ কম পড়ে।

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ কাহাকে বলে

ছোট কারবারে যে-সব অতিরিক্ত জিনিস ফেলিয়া দেওয়া হয়, বড় ব্যবসায়ে তাহার সাহায্যে বহু প্রকার উপদ্রব (byproduct) উৎপন্ন করা যায়। বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনে উৎপাদন-ধারায় সংযুক্তি ঘটে (linked process); ফলে সময়, যানবাহন ব্যয়, শ্রমিক, জ্বালানিশক্তি প্রভৃতির ব্যয়সংকোচ ঘটে। শ্রমবিভাগ আরও প্রসারিত হইতে পারে, শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

1. যন্ত্রজনিত বিভিন্ন ব্যয়সংকোচ

ক্ষুদ্র ফার্মের মালিক একা সকল কিছু পরিচালন করেন। বড় ফার্মে মাহিনাভোগী উপযুক্ত কর্মচারীদের হাতে অনেক ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া যায়। ইহাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, প্রত্যেক দপ্তরে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা সম্ভব হয় (managerial economies)।

2. পরিচালনগত ব্যয়সংকোচ

বড় ফার্ম ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে বহুপ্রকার সুযোগ-সুবিধা (trading or commercial economies) লাভ করে। একসঙ্গে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল পাইকারী দরে ক্রয় করিলে ইউনিট-প্রতি দাম কম পড়ে। বিক্রেতারা শীঘ্র যোগান দেয়, সতর্ক মনযোগ দেয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর তুলনায় বৃহৎ ব্যবসায়ীদের বেশি দিনের জন্য ধারও দিয়া থাকে। একসঙ্গে অধিক কাঁচামাল ক্রয় করায় উৎপাদনের ধারা অবিচ্ছিন্ন (continuity) থাকে। বিজ্ঞাপন বাবদ গড়-ব্যয় হ্রাস পায়। নিপুণ বিক্রেতা নিয়োগ করিতে পারে।

3. ব্যবসাগত ব্যয়সংকোচ

বড় ফার্ম প্রয়োজনের সময় (ছোট ফার্মের তুলনায়) সুবিধাজনক শর্তে ও কম সুদে ঋণ পাইতে পারে। উহার ফলে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থার সহিত তাহার নিকটতর যোগাযোগ থাকে। তুলনামূলকভাবে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের সুবিধাও (financial economies) সে বেশি পায়।

4. আর্থিক ব্যয়সংকোচ

বৃহৎ ফার্ম আনুপাতিকভাবে কম ঝুঁকি (risk-spreading economies) বহন করে। বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন কখনও একটি দ্রব্যের উপর নির্ভর করে না, যেমন বৃহৎ ফার্ম শাড়ি, ধুতি, কোটের কাপড়, শার্টের কাপড় সব কিছু তৈয়ারি করে একটির চাহিদা কমিয়া গেলে বা বাজার খারাপ হইয়া গেলে সে অন্য দ্রব্যের বিক্রয় দ্বারা লোকসান পোষাইয়া লইতে পারে। কাঁচামাল বা শক্তি যোগানের বিভিন্ন উৎস সে ব্যবহার করে; উৎপাদনের গতিধারা হঠাৎ ব্যাহত হয় না। উৎপাদন-পদ্ধতি এবং বাজারও সে এই উদ্দেশ্যে বিভক্ত করিয়া রাখে।

5. ঝুঁকি বণ্টনগত ব্যয়সংকোচ

একটি শিল্পের মধ্যে মোট ফার্মের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে বা মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেকটি ফার্ম কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা পায় ; তাহাদের বাহ্য ব্যয়সংকোচ বলে।' যেমন, কোন অঞ্চলে অনেক কলকারখানা গড়িয়া উঠিলে ঐ অঞ্চলে (i) যানবাহনের সুবিধা, (ii) দক্ষ শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা, (iii) মেশিন মেরামতির কারখানা, ও (iv) আনুষঙ্গিক দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী কলকারখানার সুবিধা পাওয়া যায়। এই সকল স্থানিকতার সুবিধা। তাহা ছাড়া, ফার্মগুলি কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সুবিধাও পাওয়া যায়। নিজের প্রসার নয়, পরিবেশের প্রসারেই প্রতিটি ফার্ম নানা সুযোগ-সুবিধা পাইতে থাকে। এই সকল কারণের ফলে দ্রব্যের ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয় কমিয়া যায়।

বাহ্য ব্যয়সংকোচ কাহাকে বলে এবং কি কি

বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনের সীমা (Limits to Large-scale Production) : এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ফার্মগুলি যত খুশি বড় হয় না ; মাত্রাবৃদ্ধির একটা সীমা আছে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ব্যয়-সংকোচগুলি কিছু দূর পর্যন্ত পাওয়া যায়, ক্রমে এমন একটি আয়তনে ফার্মটি পৌছায় যাহার পরে উৎপাদনের মাত্রা আরও বাড়াইলে ব্যয়বাহুল্য (dis-economies) ঘটিতে থাকে, তখন ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় বা গড়-ব্যয় বাড়িয়া যায়। উৎপাদন-মাত্রা যতখানি বাড়াইলে দ্রব্য-প্রতি ব্যয় সবচেয়ে কম, সেই মাত্রার নাম হইল সর্বোত্তম (optimum scale) এবং এইরূপ ফার্মের নাম হইল সর্বোত্তম ফার্ম (optimum firm)।

সর্বোত্তম বিন্দুতে পৌছাইয়া ফার্ম আর বাড়ে না

ফার্মগুলির মাত্রাবৃদ্ধির এই সীমা অনেক দিক হইতে দেখা যায়। ফার্মের মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালনগত সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। খুঁটিনাটি সমস্যার বোঝা বিরাট হইয়া দাঁড়ায়, দায়িত্বশীল অধস্তন কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করাও সহজসাধ্য নয়। পরিচালকের যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধির বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

পরিচালনগত বাধা

দ্বিতীয়ত, অ্যাডাম্ স্মিথ বলিয়াছেন যে, শ্রম-বিভাগের প্রসার বাজারের আয়তন দ্বারা সীমাবদ্ধ। যে দ্রব্যের বাজার বড় নয় উহা বেশি পরিমাণে উৎপাদন করিয়া লাভ নাই ; তাই সেই দ্রব্যের উৎপাদনকারী ফার্ম বড় মাত্রায় গঠিত হইতে পারে না।

বাজার ছোট হওয়া

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে মূলধন না পাওয়াতে ফার্মের মাত্রা আর বাড়ানো যায় না। দেশে সুদের হার বেশি থাকিলে এবং শিল্পে টাকা খাটাইবার উপযোগী প্রতিষ্ঠান না থাকিলে, ফার্মগুলির মাত্রা

মূলধনের স্বল্পতা

বড় হইতে পারে না। অনেক সময় উপযুক্ত ধরনের যন্ত্রপাতির অভাবের জন্য এইরূপ ঘটে।

বৃদ্ধির মাত্রা এবং ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদনী ফার্মের অস্তিত্বের কারণ (Obstacles to expansion and why small scale firms still exist) : প্রায় সকল শিল্পেই কোন ফার্ম যখন নূতন উৎপাদন সুরু করে তখন তাহাদের উৎপাদন-মাত্রা কম থাকে। তবে সে সময়ের ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, ভবিষ্যতে অবস্থা বুঝিয়া সে তাহার উৎপাদনমাত্রা বাড়াইয়া ফেলে। কিন্তু অনেক শিল্প আছে যাহাতে সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন ও মাত্রা ক্ষুদ্র। ইহার অর্থ হইল যে, সে-শিল্পে উৎপাদন-মাত্রায় বৃদ্ধির অনেক বাধা আছে। কোন শিল্পে এই বাধাগুলি প্রবল, কোথাও প্রবল নহে। আয়তন ও মাত্রা-বৃদ্ধির কোন এক স্তরে এই বাধাগুলি কার্যকরী হইয়া উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেয়। এই বাধাগুলি অনেক দিক হইতে আসিতে পারে।

বৃদ্ধির বাধাসমূহ

(1) **পরিচালন সংক্রান্ত বাধা :** ফার্মের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালনগত সমস্যার জটিলতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। যে ধরনের শিল্পে সর্বদা পরিদর্শনের এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন থাকে, সেখানে পরিচালনগত অসুবিধাগুলি বেশি; ফলে ফার্মসমূহের আয়তন সাধারণত ছোট থাকে, যেমন দোকান, কৃষি ইত্যাদি।

যে ক্ষেত্রে পরিচালনার কাজ সহজ সরলভাবে রুটিন মাফিক করিলে চলে সেই সকল শিল্পে ফার্মের আয়তন বাড়ান সহজ, যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেলওয়ে, পোস্ট অফিস ইত্যাদি। এই সকল নূতন শিল্পে নীতি-নির্ধারণ বা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুব কম ক্ষেত্রেই করিতে হয়।

আধুনিক কালে পরিচালনার কার্যের সুবিধার জন্য নূতন ধরনের সংগঠন-পদ্ধতি ও বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনার (Scientific Management) উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বহু শিল্পে এই সকল পদ্ধতির সফল প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না। এই সকল শিল্পে সাধারণত ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন চলিতে থাকে।

সর্বশেষে, ফার্মের বৃদ্ধির কোন স্তরে পরিচালনগত বাধা আসিবেই, কারণ, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। খুঁটিনাটি সমস্যার বোঝা বিরাট হইয়া দাঁড়ায়, দায়িত্বশীল অধস্তন কর্মচারীদের নিয়োগ করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখাও সহজসাধ্য নহে। সুদক্ষ দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাবান্ কর্মচারীদের আয়ত্তে রাখাও শক্ত। সুতরাং পরিচালকদের যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির বাধাস্বরূপ হইয়া পড়ে।

পরিচালনগত বাধা মনস্তাত্ত্বিক স্তরেও থাকিতে পারে। মানুষের মনের বহু প্রকার খেয়াল-খুশির ফলে ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন পরিচালনা চলিতে পারে। অন্য

স্থানে বেশি মাহিনায় চাকুরি পাইলেও সেখানে না যাইয়া পরিচালক নিজেই ক্ষুদ্র ফার্মের পরিচালনা চালাইয়া যাইতে পারে। স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি আকর্ষণ, অনিশ্চয়তার রোমান্স, গর্ব, অহমিকা, নিজের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, সকল কিছু মিলিয়া ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদন চালানো সম্ভবপর। সুতরাং যোগ্যতা থাকিলেই সে অন্য ফার্মে কাজ করিয়া উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, এমন বলা যায় না।

(2) **বাজারজনিত বাধা** : অ্যাডাম্ স্মিথ বলিয়াছিলেন যে, শ্রম-বিভাগের প্রসার বাজারের আয়তনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্থানীয় বাজারে অল্প পরিমাণে বিক্রয় হইবে, এইরূপ দ্রব্যের বাজার খুবই ছোট এবং এমতাবস্থায় উৎপাদনের মাত্রাও ছোট হইবে, ফার্মের পক্ষে সর্বোন্নত স্তরে পৌঁছান সম্ভব না-ও হইতে পারে। বাজার-জনিত বাধা তিন দিক হইতে আসিতে পারে ঃ ভৌগোলিক, মানসিক ও উপাদানগত।

অনেক শিল্পে একটি ফার্মের কেন্দ্রীয়ভাবে উৎপাদন সম্ভব নয়, কারণ, ক্রেতারা ছড়ান থাকে এবং বিক্রয়ের ব্যয় অধিক, যেমন পাঁউরুটি উৎপাদন, আসবাব প্রস্তুত করা ইত্যাদি। তাহা ছাড়া, অনেক শিল্পে কাঁচামাল ছড়ান থাকে এবং তাহাদের একটি উৎপাদন-কেন্দ্রে একত্রে সংগ্রহ করা খুবই ব্যয়সাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন কোন একটি বাজারের বা কোন একটি কাঁচামালের নিকটবর্তী স্থানে ক্ষুদ্রমাত্রায় হইতে থাকিবে।

মানসিক বাধা আসে দ্রব্য পৃথকীকরণের (Product Differentiation) মধ্য দিয়া। অনেক সময় একই শিল্পের মধ্যে প্রত্যেকটি ফার্ম নিজের দ্রব্যকে পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া প্রচার করে এবং হয়তো বা অল্প একটু আকৃতিগত গুণের তারতম্য করিয়া ক্রেতাদের মনে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া তোলে। ক্রেতাদের মধ্যেও তাহাদের রুচি, আয় ও পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন দল ও উপদলে ভাগ হইয়া, কেহ একটি দ্রব্য, বা কেহ অপর দ্রব্যটি ক্রয় করিতে থাকে। এইরূপে প্রত্যেক দ্রব্যেরই এক একটি নিজস্ব বাজার তৈয়ার হইয়া উঠে। ফলে, অনেক সময় ক্ষুদ্রমাত্রার উৎপাদন চলে ; উৎপাদনের মাত্রা বাড়ান সম্ভব হয় না।

ফার্মগুলি দুইটি উপায়ে এইরূপ বাজারজনিত সীমাবদ্ধতা অপসারণের চেষ্টা করে : (i) মালপত্র চলাচলের অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে কোন ফার্ম বিভিন্ন শাখা ও উপশাখা স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ প্রসার করিলে কিছুদিন পরে পরিচালনজনিত বাধা উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। (ii) ফার্মটি বহু প্রকার পৃথক্ রুচিসম্পন্ন ক্রেতাদের লক্ষ্য করিয়া অনেক ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে সেই ফার্ম প্রত্যেক ধরনের দ্রব্যই ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদন করিতে থাকিবে, মাত্রাবৃদ্ধিজনিত ব্যয়সঙ্কোচ লাভ করিতে পারিবে না।

বাজারজনিত বাধার আর একটি দিক হইল উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা। ফার্মের চাহিদা থাকিলেও বাজারে সেই উপাদান না-ও থাকিতে পারে এবং উপাদান দুষ্প্রাপ্য হইলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করা চলে না। উৎপাদন-সূত্রে স্থির উপাদান থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধি চালাইয়া গেলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম শুরু হয়, ফলে ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় বাড়িয়া যায়।

(3) **মূলধনের দুষ্প্রাপ্যতাজনিত বাধা:** অনেক ক্ষেত্রে মূলধন না পাওয়াতে ক্ষুদ্র ফার্মের বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। অতিরিক্ত সুদের হার থাকিলে বা শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের ভাল প্রতিষ্ঠান না থাকিলে এরূপ ঘটে। তবে এই ক্ষেত্রে আসল বাধা মূলধনী দ্রব্য বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতা। অর্থের দুষ্প্রাপ্যতাকে গুরুত্বপূর্ণ বাধা বলা চলে না।

ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদনের সুবিধা (Advantages of Small-scale Production): বড় শিল্পের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে ছোট প্রতিষ্ঠানের সুবিধাও বিচার করা দরকার। আমরা দেখিতে পাই, বর্তমান যুগেও শিল্পপ্রধান দেশে, যেমন—ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় শিল্পোন্নত দেশেও, বহু ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠান বর্তমান। এমন কি, বড় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি। এখনও এমন অনেক ব্যবসায় আছে যেখানে বড় প্রতিষ্ঠানের মোটেই প্রাধান্য হয় নাই। নানা কারণে বড় প্রতিষ্ঠানের পার্শ্বে ছোট প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়া আছে। প্রথমত, কারবারের আয়তন বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনার কাজ ক্রমশই কঠিন হইয়া পড়ে। খুব বড় কারবার দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে পারে এইরূপ উদ্যোক্তার সংখ্যা পৃথিবীতে কম। ফোর্ড, কার্নেগী, টাটার ন্যায় উদ্যোক্তা কমই জন্মে। সুতরাং কারবার বেশি বড় করিতে গেলে পরিচালনায় ত্রুটি ঘটে। কিন্তু ছোট প্রতিষ্ঠানে মালিকের সতর্ক দৃষ্টি থাকার ফলে কাজে ত্রুটি কম হয়, জিনিসেরও অপচয় ঘটে না। দ্বিতীয়ত, যে সব জিনিসের চাহিদা কম, তাহাদের বেশি মাত্রায় উৎপাদন করিলে ক্ষতি হইবে। সেই সব স্থলে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানই ভাল। তৃতীয়ত, দূরের ক্রেতাদের অভাব মিটাইবার জন্য শিল্পকেন্দ্র হইতে উৎপন্ন দ্রব্য পাঠাইতে যদি খরচ বেশি পড়িয়া যায়, তবে এক জায়গায় একটি বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন না করিয়া বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করাই স্বাভাবিক। চতুর্থত, চারুশিল্প অথবা চাষের কাজে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সুবিধা কম। কারণ যন্ত্রচালিত বৃহৎ শিল্পে শিল্পীর প্রতিভা বা ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখাইবার সুযোগ নাই। কিন্তু চারুশিল্পে এই প্রতিভা ও নৈপুণ্যের আবশ্যক। চাষের কাজ ও জমির তদারকি

ছোট প্রতিষ্ঠানের সুবিধা কি, কি কারণে উহা টিঁকিয়া আছে

করা, পরিচর্যা করা অনেক সময় স্বল্প জমির ফার্মেই ভালভাবে সম্ভব। পঞ্চমত, জাপানের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, অনেক আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি বৃহৎ ফার্ম নিজে উৎপাদন না করিয়া ক্ষুদ্র ফার্ম দিয়া উৎপাদন করাইলে কম খরচায় পাইতে পারে। সর্বোপরি যেখানে ব্যক্তিগত রুচি বা প্রয়োজন মিটাইবার দরকার, সেখানে ছোট কারবারেরই সুবিধা বেশি। যেমন, দরজির দোকান বা স্বর্ণালঙ্কার শিল্প প্রভৃতি।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটিরশিল্প কাহাকে বলে (What are Small-scale and Cottage Industries): ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটির-শিল্প উভয়ই হইল সাধারণত একমালিকী কারবার। যেখানে 50 জন পর্যন্ত বেতনভুক্ শ্রমিক কাজ করে সেই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আজকাল ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। ইহারা সাধারণত শহরের মধ্যে বা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত থাকে এবং ইহার কর্মিগণ বৎসরের সকল সময় কর্মে নিযুক্ত থাকে। অপরপক্ষে, নিজের পরিবার বা আশেপাশের লোকজন এবং নিজস্ব পুঁজি ও পরিচালন-দক্ষতা অনুযায়ী গ্রামে নিজের বাড়িতে যে-মাত্রায় (scale) উৎপাদন হইতে পারে তাহাকে কুটিরশিল্প বলে।*

ইহাদের মধ্যে পার্থক্য

শহরাঞ্চলে আজকাল নানাপ্রকার ক্ষুদ্রায়তন শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, ছোট ছোট ইন্‌জিনিয়ারিং কারখানা, ছাপাখানা, মৃৎশিল্প প্রভৃতি। আর শহরের কুটিরশিল্পের মধ্যে সোনারূপার কাজ, পিতল-কাঁসার কাজ; খেলনা, রং ও ছাপার কাজ প্রভৃতির নাম করা যায়। গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প হিসাবে নাম করা যায় ধানভানা, গুড় তৈয়ারি, ময়দা পেষাই ইত্যাদি। অবশ্য ইহাতে সারাবৎসর কাজ হয় না। গ্রামাঞ্চলে কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্প, রেশম শিল্প, ঝুড়ি বোনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গ্রামাঞ্চলে মৃৎশিল্প, কামারের কাজ, ছুতার ও ঘানির কাজও গুরুত্বপূর্ণ কুটিরশিল্প, অবশ্য ইহাদের কাজ মোটামুটি সারাবৎসর চলে।

শহর ও গ্রামের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান ও গুরুত্ব (Place and Importance of Small-scale and Cottage Industries in India): ইংরাজ-শক্তি ভারতে আসিবার পূর্বে আমাদের গ্রামাঞ্চলের কুটিরশিল্পসমূহ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। যন্ত্রশক্তির সহিত প্রতিযোগিতায় আজ তাহাদের অবস্থা করুণ হইয়া পড়িয়াছে।

* পরিকল্পনা কমিশনের মতে ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটিরশিল্পের কোন সংজ্ঞাতেই উহাদের সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখানো যায় না। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয় প্রধানত কোন বিশেষ নীতি বাস্তবে কার্যকরী করার সময়ে তৎকালীন কোন মানদণ্ড অনুযায়ী। তবে সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে, বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি অনেক বেশি শ্রমপ্রগাঢ় পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন করিয়া থাকে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইহাঁদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। 1951 সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় আমাদের জনসংখ্যার শতকরা 10·38 ভাগ মাত্র শিল্পে নিযুক্ত আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বৃহৎ শিল্পে কাজ করে মাত্র শতকরা 1·5 ভাগ। বাকি শতকরা 9·33 অংশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে নিযুক্ত আছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে বর্তমান অবস্থায় কুটিরশিল্পের গুরুত্ব কত বেশি।

বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইহার উপর নির্ভর করে

কেবল বর্তমান নহে, ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অবস্থা ও তাহার উন্নতির কথা ভাবিলেও ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের এই গুরুত্ব স্বীকার করিতে হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ (69·8%) কৃষিকার্যে নিযুক্ত, তথাপি কৃষির অবস্থা মোটেই উন্নত নহে। কৃষিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দারিদ্র্য ও অভাব লাগিয়াই আছে। সুতরাং যদি তাহারা অবসর সময়ে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের দ্বারা উৎপাদন বাড়াইতে পারে তাহা হইলে তাহাদের আয় বাড়ে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের সম্ভাবনাও বাড়ে।

চাষীরা আয় বাড়াইতে পারে

ভারতে যে-হারে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে সেই অনুপাতে শিল্প কারখানা সম্প্রসারিত হইতেছে না, এবং ইহার ফলে বেকারির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়িয়া যাইতেছে। প্রতিটি চাষীর মাথাপিছু যে-পরিমাণ জমি থাকিলে ভালভাবে চাষ সম্ভব হয়, সেই পরিমাণ জমি চাষীরা পাইতেছে না। এই অবস্থায় যদি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প প্রসারিত হয় তবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে। তাহা ছাড়া, আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রধানত দুই ধরনের বেকারি দেখিতে পাওয়া যায়: প্রচ্ছন্ন বেকারি ও মরসুমী বেকারি। কুটিরশিল্প দ্বারা এই দুই ধরনের বেকারিই দূর হইতে পারে।

জমির উপর জনসংখ্যার চাপ কমিবে

বেকারি দূর হইবে

আমাদের দেশে মূলধন-গঠনের বর্তমান হার খুব কম, ফলে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী সঞ্চয়ের অভাব। কুটির শিল্পের জন্য বেশি মূলধন প্রয়োজন হয় না। গ্রামের পরিচিত পরিবেশে এবং নিজ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া কুটিরশিল্পীরা উৎপাদন করিতে পারে, ফলে শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত থাকে। পরিবারে সকল ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইতে পারে। সকলে মিলিয়া একত্র উৎপাদন করে বলিয়া সৃষ্টির আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয় না, দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। বৃহৎশিল্পের পরিবেশ শ্রেণীসংঘর্ষ ও অর্থনৈতিক অসাম্যে কলুষিত থাকে, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে এই অবস্থা দেখা দেয় না, সামাজিক ঐকতান বজায় থাকে। ইহা "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের"

সমাজের ভিত্তি প্রস্তুত করে, কারণ, ইহাতে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও শক্তি সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।

ভারতের শ্রমিকরা অশিক্ষিত এবং তাহাদের মধ্যে যন্ত্রদক্ষতার অভাব আছে। তাহাদের পক্ষে এই ধরনের শিল্পে আত্মনিয়োগ করা সহজ এবং তাহারা ইহা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে। এই শিল্পে যোগদান করিয়া তাহাদের দক্ষতাও কিছুটা বাড়াইতে পারে।

ইহাতে কম মূলধন ও কর্মদক্ষতা দরকার

ভারতের বর্তমান অবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার একান্ত প্রয়োজন। আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে বৃহৎ ও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রচুর টাকা বিনিয়োগ হইতেছে। ইহারা লোকের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াইতেছে। ফলে ভারতে যে-মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে তাহা দূর করিতে হইলে কুটিরশিল্পের দ্বারা ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে, নহিলে দেশের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। তাহা ছাড়া, দেশের বড় বড় শিল্পগুলিতে অধিক লোকের কর্ম সংস্থান হওয়া সম্ভব নয়, কারণ, উহাদের উৎপাদন-পদ্ধতি প্রধানত মূলধন-প্রগাঢ় (capital-intensive)। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ও কুটিরশিল্পের অবস্থা উন্নত হইলে সকলের কর্মসংস্থানের সুবিধা হয়, কারণ, ইহাদের উৎপাদনপদ্ধতি শ্রম-প্রগাঢ় (labour intensive)।

ভোগ্যদ্রব্যের অভাব কিছুটা মিটিবে

অনেক অর্থনীতিবিদ্ কিন্তু এই সকল যুক্তি সত্ত্বেও ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্পজগৎ হইতে দ্রুত কুটিরশিল্পের অপসারণ পছন্দ করেন। তাঁহাদের মতে আমাদের দেশ জনবহুল, প্রতি বছরই এই জনসংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইতেছে। ফলে আমরা যত দ্রুত শিল্পপ্রসার করিতে পারি ততই ভাল। কারণ, ধীরগতিতে শিল্পোন্নয়ন করার অবস্থা আমাদের দেশে নাই। এই জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং শিল্পের উপর গুরুত্ব দিবার কথা হইয়াছে; শিল্পোন্নয়ন দ্রুত হইতে পারে নিত্য নূতন উন্নততর যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও প্রয়োগ দ্বারা। কুটিরশিল্পকে বাঁচান হইলে প্রাচীন অনুন্নত কম-উৎপাদনশীল উৎপাদনপদ্ধতিসমূহ রক্ষিত হইবে। ইহা দেশের দ্রুত শিল্পোন্নতিকে প্রতিপদে বাধা দিবে। দ্রুত শিল্পপ্রসারের তাগিদে আমাদের উচিত কুটিরশিল্পের বিলাস দূর করা এবং বিজ্ঞানের নূতনতর ফলগুলিকে উৎপাদনের কাজে খাটান। টেকনোলজির উন্নতিই শ্রমিক ও জনসাধারণের উৎপাদনক্ষমতা এবং আয় বাড়াইয়া ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান বাড়াইতে পারে। বর্তমানে কুটিরশিল্পকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে ভারতে শিল্পোন্নয়নের জয়যাত্রা সুরু হইতে পারিবে না। বিদেশী সাহায্য বাদ দিয়া স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের

অনেকে কিন্তু বলেন কুটির শিল্পের ভূমিকা ভাল নয়

পথে যাত্রা সুরু (take up to self-sustained growth) করিতে হইলে কুটির-শিল্পের আশু অপসারণ প্রয়োজন।)

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ত্রুটি ও অসুবিধা (Defects and difficulties of Cottage and Small-scale Industries): ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে কুটিরশিল্পের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু কতকগুলি অসুবিধা ও ত্রুটির জন্য এই শিল্পের উন্নতি হইতেছে না। প্রথমত, কুটিরশিল্পের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাইবার অসুবিধা। কম দামে, নিয়মিত-ভাবে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ও দালাল বিনা উহা প্রায়ই পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, কুটির-শিল্পীদের হাতে উৎপাদনে খাটাইবার মত মূলধনের অভাব দেখা যায়। মূলধনের অভাবে দরিদ্র কুটির-শিল্পিগণ মহাজন বা দালালদের নিকট হইতে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য সস্তা দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। তৃতীয়ত, কুটিরশিল্পের উৎপাদনপদ্ধতি অতি প্রাচীন। বর্তমানকালে লোকের রুচি ও চাহিদায় পরিবর্তন হইয়াছে। শক্তিচালিত ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের ধরন বদলানো দরকার। কিন্তু (শিল্পীদের মধ্যে রহিয়াছে প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র যন্ত্রের অভাব ও ঐ সকল ক্ষুদ্র যন্ত্র চালাইবার জ্ঞানের অভাব।) চতুর্থত, কুটিরশিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়সংগঠনের অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি ও অসুবিধা ইহাতে সন্দেহ নাই। দালাল ও ফড়িয়াদের মারফত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকায় এবং শহরে উপযুক্ত নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র না থাকায় কুটিরশিল্পিগণ সামান্য দামে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দেয়। ইহার ফলে তাহারা পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য লাভে বঞ্চিত হয়। পঞ্চমত, বৃহৎ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্পগুলি বাঁচিতে পারিতেছে না। বড় বড় যন্ত্রের সাহায্যে কম সময়ে ও কম খরচে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে ঠিকই, কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ ও নানা অসুবিধায় জড়িত কুটিরশিল্পের সঙ্গে তাহার প্রতিযোগিতা যে সমানে সমানে লড়াই নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা খুবই দরকার, কিন্তু আজও আমাদের দেশে তাহা সম্ভব হয় নাই। কুটিরশিল্পের পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষতিকারক হইয়াছে।

কাঁচামাল, মূলধন, যন্ত্রপাতি, বাজারে সকল কিছু দুষ্প্রাপ্য

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পে সমন্বয়

ত্রুটি ও অসুবিধার প্রতিকার ব্যবস্থা (Methods and measures to remove these defects): ভারতের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অবস্থা উন্নত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, (কাঁচামালের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে সমবায় ক্রয় সমিতি গঠন করা দরকার। তাহা হইলে সস্তায় নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে

কাঁচামাল পাওয়ার সুবিধা হয়। এইজন্য সরকার সমবায় সমিতি গঠন করিতে কুটিরশিল্পীদের উৎসাহ দিতেছেন। দ্বিতীয়ত, মূলধনের অভাব দূর করিতে হইলে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করা দরকার। ফোর্ড সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানের (Ford Foundation) আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের সুপারিশক্রমে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়ত, উৎপাদন পদ্ধতির প্রাচীনত্ব দূর করার উপায় হইল রুচি ও চাহিদার পরিবর্তনের খবর এবং যন্ত্রশিল্পের জ্ঞান কুটিরশিল্পীদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া। বর্তমানে সর্বভারতীয় খাদি ও গ্রাম শিল্প বোর্ড, হস্তচালিত তাঁত শিল্প বোর্ড, হস্তশিল্প বোর্ড প্রভৃতি যন্ত্রশিক্ষা প্রদান ও নক্শা (design) উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। চতুর্থত, বিক্রয় সংগঠনের অভাব দূর করিবার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন করা, প্রচার করা এবং শহরে ও বিদেশে সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। উপরে যে বোর্ডগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে উহারা এই বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। পঞ্চমত, বৃহৎ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতার অসুবিধা দূর করিতে হইলে যতদিন কুটিরশিল্পের উৎপাদন ব্যয় কমিয়া না যায় ততদিন বিদেশী ও বৃহৎ যন্ত্রের হাত হইতে ইহাদের আইনের সাহায্যে সংরক্ষিত করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে নূতন ফিস্কাল কমিশন ও কার্ভে কমিটি যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার ও কুটিরশিল্পকে সংরক্ষণ দান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। মিলের কাপড়ের উপর সেস (cess) বসাইয়া সেই অর্থে তাঁতশিল্পকে সাহায্য করা হইয়াছে। মিলের কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। কলে তৈয়ারি ও হাতে তৈয়ারি দ্রব্যের উপর পৃথক্ হারে কর ধার্য করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অম্বর চরখা প্রচলন করার সরকারী প্রচেষ্টা চলিতেছে। ষষ্ঠত, বৃহৎ ও ক্ষুদ্রশিল্পের সমন্বয়ে যে-অভাব আছে তাহা দূর করার জন্য উভয় শিল্পকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে পুনর্গঠিত করা দরকার। ইহার জন্য সরকার জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation) স্থাপন করিয়াছেন। সর্বোপরি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্ম-সংস্থান ও ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার কুটিরশিল্পের উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা-কমিশন 200 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছিলেন, সংশোধিত পরিকল্পনায় উহা কমাইয়া 160 কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হইয়াছিল 250 কোটি টাকা।

কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার

কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে

Questions to be discussed

1. What are the economies of large-scale production ? Can a firm increase ts scale as much as it likes ?

বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকোচগুলি কি কি ? কোন ফার্ম কি আপন উৎপাদনের মাত্রা ইচ্ছামত বাড়াইতে পারে ?

2. In spite of the advantages of increasing large-scale production why do the small-scale firms still survive ?

বৃহদায়তন উৎপাদনের অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন টিঁকিয়া থাকিবার কারণ কি ?

3. What are the small-scale and cottage industries ? Explain their differences.

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কাহাকে বলে ? তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় কর।

4. Under the present circumstances of India, discuss the place and importance of cottage and small-scale industries.

বর্তমান ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের স্থান ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

5. What are the difficulties and defects which check the progress of Indian small-scale and cottage industries ?

ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নতির পথে প্রধান প্রধান অসুবিধা ও ত্রুটি কি ?

6. What should be done to remove the defects of small-scale and cottage industries in India ? What steps are being taken by our government in this respect ?

ভারতের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ত্রুটিগুলি দূর করিবার জন্য কি করিতে হইবে ? এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কি কি পথ অবলম্বন করিয়াছেন ?

৬

বাজার ও মূল্য নিরূপণ

Market and Price Determination

দাম নিরূপণের ভূমিকা (Introduction to Pricing) **:** আমরা যে-ধরনের সমাজে বাস করি, সেখানে সকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম টাকার অঙ্কে বা অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হয়। কোন জিনিসের বিনিময়ে যে-পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় বা যে পরিমাণ অর্থ দিতে হয় তাহাকে উহার দাম (price) বলে। দাম দিয়া বা পাইয়া কোন জিনিস কেনা ও বেচার কাজ আমরা সম্পন্ন করি। দাম ছাড়া বর্তমান সমাজে কোন জিনিসের লেন-দেন হয় না।

দাম কাহাকে বলে

কোন বাজারে দ্রব্যের প্রচলিত দাম দুই দল লোকের কাজকর্মের রূপ প্রকাশ করে ; তাহা এই দুই দল লোকের কার্যফলও বলা চলে। বাজারে একদল ক্রেতা থাকে, তাহারা জিনিস কেনার জন্য বাজারে হাজির হয় ; আর একদল বিক্রেতা থাকে তাহারা জিনিস বেচার জন্য বাজারে উপস্থিত হয়। আমরা জানি বাজারে দাম বেশি থাকিলে ক্রেতারা কম পরিমাণে কিনিতে চায় এবং বিক্রেতারা বেশি পরিমাণে বেচিতে চায়। অথবা বাজারে দাম কম থাকিলে ক্রেতারা বেশি পরিমাণ কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং বিক্রেতারা কম পরিমাণে বেচিবার চেষ্টা করে। ক্রেতাদের চাহিদার পিছনে থাকে উপযোগিতা বা পছন্দ (utility or preference); বিক্রেতাদের যোগানের পিছনে থাকে উৎপাদন-ব্যয় ও মুনাফা। ক্রেতারা উপযোগিতার তুলনায় কম দাম দিবার চেষ্টা করে, কারণ, তাহা হইলে সে উদ্বৃত্ত তৃপ্তি পাইতে পারিবে ; বিক্রেতারা উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় বেশি দাম পাইবার চেষ্টা করে, কারণ, তাহা হইলে সে উদ্বৃত্ত মুনাফা পাইতে পারিবে। উভয়পক্ষের মধ্যে তাই দর কষাকষি চলে ; ক্রেতারা দাম কমাইতে চায়, বিক্রেতারা দাম বাড়াইতে চায়, অবশেষে উভয় দল বেচাকেনার জন্য একটি দামে রাজি হয়। ক্রেতাদের সামনে লক্ষ্য হইল সর্বাধিক তৃপ্তি (maximum satisfaction) ; বিক্রেতাদের সামনে লক্ষ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা (maximum profit)।

ক্রেতা ও বিক্রেতার দর কষাকষি বা চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম স্থির হয়

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ক্রেতা সর্বাধিক তৃপ্তি না পায়, ততক্ষণ সে নিজের ক্রয়ের পরিমাণ পাল্টাইতে থাকে, তাহার জিনিস কেনার কাজ তখনও শেষ হয় নাই বলিয়া মনে করা যায়। সে তখনও আরও বেশি বা কম কিনিবে কিনা চিন্তা করিতেছে, ক্রেতার বা ভোগকারীর ভারসাম্যের অবস্থা (position of equilibrium)

প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ক্রেতার লক্ষ্য হইল সর্বাধিক তৃপ্তি, সেই বিন্দুতে পৌঁছাইতে পারিলে আর কোন পরিবর্তনের দিকে তাহার ঝোঁক দেখা দিবে না। এইরূপ অবস্থায় ভোগকারীর বা ক্রেতার ভারসাম্য (consumer's or buyer's equilibrium) স্থাপিত হইয়াছে বলা হয়।

ভোগকারীর বা ক্রেতার ভারসাম্য

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিক্রেতা সর্বাধিক মুনাফা না পায়, ততক্ষণ সে নিজের উৎপাদনের ও বিক্রয়ের পরিমাণ পাল্টাইতে থাকে, তাহার যোগান পরিবর্তনের চেষ্টা তখনও শেষ হয় নাই বলিয়া মনে করা যায়। সে তখনও আরও বেশি বা কম বেচিবে কি-না চিন্তা করিতেছে, বিক্রেতার বা উৎপাদকের ভারসাম্যের অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিক্রেতার লক্ষ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা, সেই বিন্দুতে পৌঁছাইতে পারিলে আর তাহার কোন পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক দেখা দিবে না। এইরূপ অবস্থায় বিক্রেতার বা উৎপাদকের ভারসাম্য (producer's or seller's equilibrium) স্থাপিত হইয়াছে বলা হয়।

উৎপাদকের বা বিক্রেতার ভারসাম্য

দাম নিরূপণের তত্ত্বকে তাই ভারসাম্যে পৌঁছিবার পথের বা ধারার (equilibrating process) আলোচনা বলা যাইতে পারে। বাজারে যে-দাম আছে, উহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার ভারসাম্য স্থাপিত হয় কি না, তাহা ধরিয়া লইয়া আলোচনা করা হয়। কি-দামে বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ ভারসাম্যের বিন্দুতে পৌঁছে, কি অবস্থায় সেই ভারসাম্য বজায় থাকে, এবং সেই দাম কিরূপে নির্ধারিত হয় আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

কিরূপে ভারসাম্যে পৌঁছে তাহাই দাম নিরূপণ

বাজার কাহাকে বলে (What is market ?) : সাধারণ ভাষায় বাজার বলিলে কোন একটি জায়গাকে বোঝা যায়। যেখানে অনেক লোক একত্র হয়, অনেক দোকান থাকে, সকল বিক্রেতা তাহাদের জিনিসপত্র লইয়া আসে, সকল ক্রেতা টাকা-পয়সা লইয়া জিনিসপত্র কেনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসে, বাজারে আসিয়া ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য দর কষাকষি করে—এই রকম জায়গার নামই সাধারণ ভাষায় বাজার। শহরে সেই জায়গাকে 'বাজার' বলে, রোজই যেখানে জিনিসপত্র কেনা-বেচা চলে। গ্রামে তাহাকে 'হাট' বলে, সপ্তাহে দুইদিন বা তিনদিন সকালে বা বিকালে যেখানে কেনা-বেচা হয়। মধ্যে মধ্যে গ্রামে 'মেলা' বসে, সেখানে বহু দূর-দূরান্তর হইতে লোকজন ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য মিলিত হয়, পরস্পরের শ্রমজাত দ্রব্যসামগ্রী কেনা-বেচা চলে।

সাধারণ ভাষায় বাজার হইল কোন স্থান

অর্থনীতিতে কিন্তু বাজার বলিলে ঠিক কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না। যে-জিনিসের

ক্রয় বা বিক্রয় হইতেছে, তাহার নামে বাজারের নামকরণ করা হয়। যেমন—মাছের বাজার, পাটের বাজার, চা-এর বাজার, ধানের বাজার, শ্রমের বাজার, মূলধনের বাজার, শেয়ারের' বাজার প্রভৃতি। কোন ক্রেতা জিনিস কিনিবার জন্য কোন বিক্রেতার কাছে, বা কোন বিক্রেতা জিনিস বেচার জন্য কোন ক্রেতার কাছে আসে; তাহাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়, জিনিসটি কেমন, উহার দাম কি, এই সকল বিষয় লইয়া কথাবার্তা হয়। জিনিস এবং দাম সম্বন্ধে উভয়ের মতৈক্য ঘটিলে দ্রব্যের বদলে অর্থের আদান-প্রদান হয়, কেনা-বেচার কাজ সম্পূর্ণ হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার এইরূপ পারস্পরিক সংযোগ, উহাদের মিলন, ক্রয়-বিক্রয় সাধন—এই মোট সম্পর্ককেই বাজার বলে। শুধু যে ভোগের দ্রব্যই লোকে বেচা-কেনা করে তাহা নহে। কোন উদ্যোক্তা উৎপাদন শুরু করিতে গেলে উপাদানসমূহের বাজার হইতে তাহাকে উপাদানও ক্রয় করিতে হয়। যেমন, শ্রমের বাজারে শ্রমশক্তি বিক্রয় করার জন্য অনেক শ্রমিক আছে, উদ্যোক্তা তাহাদের মজুরি দিয়া সেই শ্রম ক্রয় করে। মূলধনের বাজারে অনেকে টাকা বিক্রয় করিতে চাহে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপরের নিকট টাকা বিক্রয় করে। ইহারই আর এক নাম হইল টাকা ধার দেওয়া। যে সে-টাকা কেনে সে উহার দাম হিসাবে সুদ দেয় (সুদ হইল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপরের টাকা নিজের ব্যবহার করার দরুন প্রদত্ত দাম)। এইরূপে, দ্রব্য হউক বা উপাদান হউক, উহাদের কেনা-বেচা চলে। সুতরাং কোন জিনিসের বাজার বলিলে আমরা বুঝি ক্রয়-বিক্রয়ের এই সম্পর্ক। একদিকে ক্রেতা ও অপর দিকে বিক্রেতা ইহাদের মধ্যে কোন জিনিসের লেন-দেন—তাহাকে সেই দ্রব্যের বাজার বলে।

অর্থনীতিতে বাজার হইল কোন জিনিসের বাজার, উহাকে লইয়া কেনাবেচার জটিল সম্পর্ক-জাল

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classifications of Markets): সকল দ্রব্য-সামগ্রীর বাজারকেই আমরা বিষয় অনুযায়ী মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করিতে পারি। ইহারা হইল—(ক) স্থান, (খ) কাল ও (গ) প্রতিযোগিতার রূপ।

(ক) **স্থান অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ**—স্থান অনুযায়ী বাজারকে ভাগ করা যায় ঐ দ্রব্যের বাজার কত বড় বা ছোট ইহা বিচার করিয়া। অনেক জিনিস যে-স্থানে উৎপন্ন হয় তাহার কাছাকাছি বিক্রয় হইয়া যায়; দূরের ক্রেতাদের কাছে সেই দ্রব্যটি বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত হয় না। দ্রব্যটির প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। অনেক দ্রব্য আছে যাহা ক্ষণস্থায়ী, বেশিক্ষণ সেই জিনিস টিঁকিবে না, যেমন শাক-সবজি, দুধ, মাছ প্রভৃতি। ইহাদের বাজার স্থানীয় (local) বা বিস্তৃতির দিক হইতে সংকীর্ণ। যদি

স্থানীয়

দামের তুলনায় দূরে পাঠাইবার খরচ খুব বেশি পড়ে, তাহা হইলেও সেই দ্রব্যের বাজার স্থানীয় ধরনের হয়, যেমন—ইঁট প্রভৃতি।

আঞ্চলিক

কোন দ্রব্যের বাজার যদি উহা হইতে বড় হয়, যদি দেশের কোন অঞ্চলে উহার কেনা-বেচা চলে তাহা হইলে সেইরূপ বাজারকে আঞ্চলিক বাজার (regional market) বলে।

জাতীয়

যদি কোন দেশের মধ্যে সকল অঞ্চলেই সেই দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় চলে, তাহা হইলে সেই দ্রব্যের বাজারকে জাতীয় বাজার (national market) বলে।

আন্তর্জাতিক

কোন দ্রব্য পৃথিবীর যে-কোন দেশেই উৎপন্ন হউক না কেন, যদি সকল দেশেই উহার ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহা হইলে তাহার বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার (international market) বলে।

স্থান অনুযায়ী বাজারের আয়তন বা পরিধিকে বাজারের বিস্তৃতি (the extent of the market) বলে। আমরা জানি কোন শিল্পের শ্রমবিভাগের প্রসার নির্ভর করে বাজারের আয়তন বা বিস্তৃতির উপর। বাজার বড় হইলে উদ্যোক্তা বেশি শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতির সাহায্যে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন শুরু করিতে পারে। বাজার সংকীর্ণ হইলে শ্রম বিভাগ প্রসার করার সুযোগ পাওয়া যায় না।

কি কারণে কোন দ্রব্যের বাজারের আয়তন বড় হয়

বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে—দ্রব্যটির স্থায়িত্ব (durability), সহজে স্থানান্তরিত করার সুবিধা বা বহনযোগ্যতা (portability), সহজে চেনার যোগ্যতা (cognizability), ব্যাপক চাহিদা (wide demand), বিদেশে নমুনা পাঠাইবার (sampling) এবং বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করার সুবিধা (grading), দেশে-বিদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রসার (expansion of banking facilities), যানবাহন বা পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি (development of transport) প্রভৃতির উপর।

(খ) কাল অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ—সময়ের দিক হইতে বাজারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, অত্যল্পকালীন বাজার, স্বল্পকালীন বাজার ও দীর্ঘকালীন বাজার।* এই সময় বলিতে ঘড়ির সময় বা ক্যালেণ্ডারের

* সময় অনুযায়ী আরও একরকম বাজারের কথা প্রাচীন লেখকগণ বলিয়াছেন, উহা হইল অনতিদীর্ঘকালীন বা যুগব্যাপী বাজার (secular market)। বহু বৎসর ধরিয়া জনসংখ্যা, রুচি, উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন পদ্ধতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ—এই সকল মৌলিক বিষয়ে পরিবর্তন আসিলে যে-বাজারের রূপ পরিবর্তন হয় সেই বাজারকে যুগব্যাপী বাজার বলা হয়। ধনবিজ্ঞানীরা কোন দ্রব্যের বাজারে এইরূপ পরিবর্তন এবং দাম নিরূপণ সাধারণত আলোচনা করেন না, উহাকে অর্থনৈতিক ইতিহাসের কোঠায় ফেলিয়া দেন।

সময় বোঝায় না। কোন বাজারে জিনিসের দাম বাড়িয়া গেলে বা কমিয়া গেলে উৎপাদকগণ দ্রব্যের চাহিদা কেমন করিয়া বাড়ায় বা কমায় সেই অনুযায়ী 'সময়'-কে বিচার করা হয়। যেমন, ধরা যাউক সকালে ৪টার মধ্যে বাজারে 30 মণ মাছ বিক্রয়ের জন্য হাজির হইয়াছে। যদি মাছের দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলেও মাছ-বিক্রেতারা তৎক্ষণাৎ মাছের যোগান বাড়াইতে পারিবে না। যে-সময়ের মধ্যে বিক্রেতারা বা উৎপাদকগণ দ্রব্যের যোগান বাড়াইতেও পারে না অথবা কমাইতেও পারে না, সেই সময়টুকুর নাম অত্যল্পকাল (extremely short period) এবং সেইরূপ বাজারের নাম অত্যল্পকালীন বাজার।

অত্যল্পকালীন বাজার কাহাকে বলে

আবার কখনও দেখা যায় যে, কিছুটা সময় অতিবাহিত হইলে উৎপাদকেরা দ্রব্যটির যোগানে কিছুটা পরিবর্তন আনিতে পারে। আমরা জানি, উৎপাদন করিতে হইলে দুই প্রকার উপাদান দরকার হয়ঃ স্থির উপাদান (fixed factors) ও পরিবর্তনীয় উপাদান (variable factors)। যেমন তাঁতের সাহায্যে কাপড় তৈয়ারি হইয়াছে। তাঁত হইল স্থির উপাদান; তুলা ও সূতা হইল পরিবর্তনীয় উপাদান। কাপড়ের দাম বাড়িলে তাঁতী কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু সে প্রথমেই নূতন তাঁত বসাইবে না। যে-কয়টি তাঁত তাহার আছে উহাদের দ্বারাই বেশি সূতার সাহায্যে সে বেশি কাপড় তৈয়ারির চেষ্টা করিবে। তাঁতগুলিকে সে বেশি পরিমাণ খাটাইবে, জিনিসের দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই উহাদের অর্থাৎ স্থির উপাদানের পরিমাণ সে বাড়াইবে না। স্থির উপাদানের পরিমাণ সমান রাখিয়া সে পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। জিনিসের দাম কমিলে সে তৎক্ষণাৎ স্থির উপাদানের (তাঁত) পরিমাণ কমাইয়া দিবে না, পরিবর্তনীয় উপাদানের (সূতা) পরিমাণ কম খাটাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবে। দামে পরিবর্তন হইলে যে-সময়ের মধ্যে যোগানদারেরা স্থির উপাদান সমান রাখিয়া পরিবর্তনীয় উপাদান বাড়াইয়া বা কমাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে তাহার নাম **স্বল্পকাল** (short period) এবং এইরূপ অবস্থায় সেই বাজারের নাম হইল **স্বল্পকালীন বাজার**।

স্বল্পকালীন বাজার কাহাকে বলে

যখন উৎপাদকেরা দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো বা কমানোর জন্য স্থির উপাদানের পরিমাণও বাড়াইয়া বা কমাইয়া ফেলিয়া দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইয়া বা কমাইয়া ফেলে, সেই সময়ের নাম হইল **দীর্ঘকাল** (long period) এবং সেইরূপ বাজারের নাম হইল **দীর্ঘকালীন বাজার**। কাপড়ের

দীর্ঘকালীন বাজার কাহাকে বলে

উৎপাদন বাড়াইবার জন্য তাঁতীরা যতক্ষণ সময়ের মধ্যে নূতন নূতন তাঁত বসায় এবং আরও সূতা লইয়া কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সেই সময়কে দীর্ঘকাল বলে।

(গ) **প্রতিযোগিতা অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ**—দ্রব্যের বাজারে ক্রয়ের দিকে এবং বিক্রয়ের দিকে কিরূপ প্রতিযোগিতা আছে সেই অনুযায়ী বাজারকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) পূর্ণ বাজার, (২) একচেটিয়া বাজার ও (৩) অপূর্ণ বাজার।

যখন কোন জিনিসের বাজারে প্রচুর ক্রেতা থাকে এবং প্রচুর বিক্রেতা থাকে তখন তাহাদের মধ্যে দ্রব্যটি ক্রয় করিবার জন্য এবং বিক্রয় করিবার জন্য প্রতিযোগিতা হয়। ক্রেতাগণ জিনিসটি পাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে এবং বিক্রেতাগণ জিনিস বিক্রয় করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। যদি কেবল প্রচুরসংখ্যক ক্রেতা ও প্রচুরসংখ্যক বিক্রেতা থাকে, তাহা হইলেই তাহাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলা চলে না। বাজারের সকল বিক্রেতা ঠিক একজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে এরূপ হওয়া দরকার। ক্রেতাদের মনেও এইরূপ ধারণা থাকা দরকার যে, সকল উৎপাদকের দ্রব্যই সমান প্রকার। প্রত্যেক ক্রেতা জানে সকল বিক্রেতা কি দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতেছে। যে-কোন উৎপাদক ফার্ম সেই শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে বা সেই শিল্প হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। উহার পথে কোনরূপ বাধা নাই। দ্রব্যের এইরূপ বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কি অবস্থায় দেখা যায়

যখন কোন দ্রব্যের বাজারে কেবল একটিমাত্র বিক্রেতা থাকে; একটি ফার্মই সকল দ্রব্য উৎপাদন করে অথবা সেই দ্রব্যের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন সেই বাজারে প্রতিযোগিতা থাকে না। এইরূপ বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়। সেই দ্রব্যের উৎপাদনে অপর কোন ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ একচেটিয়া বিক্রেতাকে একচেটিয়াদার (monopolist) বলে। সে নিজে দ্রব্যের দাম স্থির করিতে পারে। যদি বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকে তাহা হইলে সেইরূপ অবস্থাকে একচেটিয়া ক্রেতা (monopoly) বলা হয়।

একচেটিয়া বাজার কাহাকে বলে

যখন কোন দ্রব্যের বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ, শিল্পে নূতন ফার্ম প্রবেশের পথে কোন-না-কোন বাধা আছে, প্রত্যেক বিক্রেতাই অন্য বিক্রেতার দ্রব্য হইতে একটু পৃথক্ দ্রব্য বিক্রয় করে এবং বাজারে ঐ দ্রব্যটির বিভিন্ন দাম চালু থাকে, তখন তাহাকে অপূর্ণ বাজার (imperfect market) বলে।

অপূর্ণ বাজার কাহাকে বলে

দুইটি কারণের ফলে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা প্রচলিত থাকে না; অপূর্ণ বাজার দেখা দেয়। (ক) যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা কম থাকে তাহা হইলে তাহারা প্রত্যেকেই বাজারের বৃহৎ অংশকে আয়ত্তে রাখে। তাহাদের মধ্যে কেহ ক্রয়-বিক্রয় বাড়াইলে অথবা কমাইলে দামের উপর তাহার প্রভাব পড়ে। মাত্র কয়েকটি বিক্রেতা থাকায় তাহারা নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে থাকে অথবা নিজেদের মধ্যে আপস করিয়া দাম স্থির করে। বাজারের এইরূপ অবস্থাকে অলিগোপলি (oligopoly) বলা হয়। ক্রয়ের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিলে সেই বাজারকে অলিগোপ্‌সনি (oligopsony) বলে।

অপূর্ণ বাজারের দুইটি রূপ: (১) অলিগোপলি বা অলিগোপ্‌সনি

(খ) অনেক সময় দেখা যায়, কোন-দ্রব্যের বাজারে অসংখ্য উৎপাদনকারী বা উদ্যোক্তা আছে কিন্তু উহারা কেহই একেবারে সমান ধরনের জিনিস বিক্রয় করে না, প্রত্যেকে নিজের দ্রব্যের একটি পৃথক্ নাম বা মার্কা দিবার চেষ্টা করে। ক্রেতাদের মনে উহারা এইরূপ ধারণা জন্মায় যে, ওই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি ঠিক অপরটির সমান নহে। যেমন, চা-এর বাজারে লিপ্‌টন, ব্রুকবণ্ড, টস্ প্রভৃতি; সাবানের বাজারে মার্গো, লাক্স, হামাম, পামঅলিভ প্রভৃতি; সুগন্ধি তেলের বাজারে হিমকল্যাণ, কেশরঞ্জন, জবাকুসুম, কোকোলা প্রভৃতি। এইরূপ বাজারে একই দ্রব্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় হয়। অনেক সময় ক্রেতারা জানিয়া-শুনিয়াই একটু বেশি দামে কেনে; বিশেষ মার্কার, বিশেষ দোকানের বা বিশেষ ফার্মের জিনিসটি ক্রয় করে। এই অবস্থায় কোন বিক্রেতা-ব্যবসায়ী তাহার দ্রব্যের দাম অল্প একটু বাড়াইলে সকল ক্রেতা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অপর কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে যায় না। ক্রেতাদের পছন্দ অনেক সময় কেবল রং বা আকৃতি অনুযায়ী পৃথক্ হয়। বিক্রেতা খাতির করে বা হাসিয়া কথা বলে, বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেয় বা সুন্দর বাক্সে, সুন্দর ফিতায় দ্রব্যটি বাঁধিয়া দেয়, ধার দেয় এবং সহসা ফেরত চাহে না, জন্মদিনে উপহার পাঠায়—এইরূপ অনেক কারণে কোন ক্রেতা একটু বেশি দাম হইলেও বিশেষ কোন বিক্রেতার নিকট হইতে জিনিসটি ক্রয় করিতে পারে। ক্রেতা অন্য দ্রব্যের বা অন্য বিক্রেতার খবর রাখে না, অথবা একটু হাঁটিয়া গিয়া কম দামে জিনিসটি ক্রয় করিতে চাহে না, কোন বিশেষ দোকান হইতে জিনিস কেনাকে আভিজাত্য বলিয়া মনে করে, অথবা দোকানের মধ্যে বসিয়া বিনামূল্যে দৈনিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ পায়—এই সকল কারণেও কোন দ্রব্যের বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পরিণত হয়। এইরূপ বাজারকেই বলে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার (monopolistic competitive market)। এইরূপ

কি কি কারণে এইরূপ বাজার দেখা যায়

(২) একচেটিয়া প্রতিযোগিতা

বাজারে অনেক সংখ্যক উৎপাদক থাকে বটে, কিন্তু তাহারা ঠিক সমান প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে না। এইরূপ বাজারে একের দ্রব্য অপরের খুব ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী। ইহাদের মধ্যে তাই প্রতিযোগিতা চলে, যদিও দ্রব্যের মোট বাজারকে প্রত্যেকে ছোট ছোট একচেটিয়া অধিকারে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে।

বাস্তব জগতে কোন দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই, পূর্ণ একচেটিয়া বাজারও বিশেষ দেখা যায় না, প্রায় সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই অপূর্ণ বাজার দেখা যায়, ইহা হয় অলিগোপলি অথবা একচেটিয়া প্রতিযোগিতার রূপ গ্রহণ করে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নিরূপণ ঃ সমগ্র শিল্পটির ভারসাম্য (Pricing under Perfect competition : Equilibrium of the Industry as a whole) : কোন দ্রব্যের বাজারে কতকগুলি অবস্থা বর্তমান থাকিলে উহাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়। এইরূপ বাজারে প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা এবং প্রচুর সংখ্যক বিক্রেতা থাকে। তাহার ফলে কোন একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা এককভাবে ক্রয় বা বিক্রয় বাড়াইয়া বা কমাইয়া দামের উপর প্রভাব ফেলিতে পারে না। প্রত্যেকটি বিক্রেতা ঠিক একই জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে। ক্রেতাদের মনেও কোন বিক্রেতা সম্বন্ধে কোন পক্ষপাতিত্ব থাকে না, সকল বিক্রেতার দ্রব্য তাহারা একই রকম মনে করে। সকল ক্রেতা সবচেয়ে কম দামে ক্রয় করার চেষ্টা করে এবং সকল বিক্রেতা সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রয়ের চেষ্টা করে। সকল ক্রেতা জানে প্রত্যেকটি বিক্রেতা কি দামে জিনিসটি বিক্রয় করিতেছে এবং সকল বিক্রেতা জানে প্রত্যেকটি ক্রেতা কি দামে জিনিসটি ক্রয় করিতেছে। এই সকল কারণের ফলে বাজারে দ্রব্যটির একটি দাম বজায় থাকে, বিভিন্ন দামে উহা বিক্রয় হইতে পারে না। সেই বাজারে যে-কোন ফার্ম প্রবেশ করিতে পারে বা সেই বাজার হইতে যে-কোন ফার্ম বাহির হইয়া যাইতে পারে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে

এইরূপ বাজারে কোন দ্রব্যের দাম স্থির হয় উহার যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা। বাজারের সকল ক্রেতা মিলিয়া বিভিন্ন দামে দ্রব্যটির যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা করে, তাহাকে উহার বাজার চাহিদা-তালিকা বলে। বাজারের সকল বিক্রেতা মিলিয়া বিভিন্ন দামে দ্রব্যটির যে-সকল বিভিন্ন পরিমাণ যোগান দেয় তাহাকে উহার বাজার-যোগান-তালিকা বলে। এইরূপ উভয় তালিকাকে পাশাপাশি রাখিলে এমন একটি দাম পাওয়া যায় তাহাতে বাজারের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের পরিমাণ সমান চাহিদা ও যোগানের সমতার বিন্দুতে, অর্থাৎ যে দামে চাহিদা ও যোগান সমান হইয়া পড়ে সেই দামকে ভারসাম্যের দাম বলে।

যোগান ও চাহিদার সমতার বিন্দুই ভারসাম্য-বিন্দু

কারণ, বাজারে এইরূপ দাম থাকায় কোন দিকে কোন পরিবর্তনের ঝোঁক দেখা যায় না। পূর্বের বাজার চাহিদা-তালিকা ও বাজার-যোগান তালিকাকে নিচের উদাহরণে পাশাপাশি সাজাইলে দেখা যায় :

চাহিদা	দাম (প্রতি পাউণ্ড)	যোগান
1000 পাউণ্ড	6 টাকা	4500 পাউণ্ড
1900 „	5 টাকা	4000 „
3000 „	4 টাকা	3000 „
4500 „	3 টাকা	2000 „
6000 „	2 টাকা	1000 „

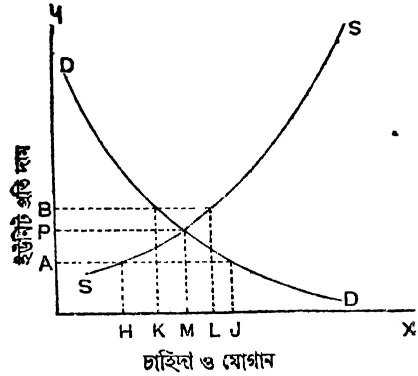
যদি দাম 4 টাকা হইতে বেশি, যেমন 5 টাকা থাকে, তাহা হইলে সেই শিল্পে ভারসাম্য স্থাপিত হইতে পারে না। দাম 5 টাকা থাকিলে বাজারে চাহিদা থাকে 1900 পাউণ্ড, কিন্তু যোগান থাকে 4000 পাউণ্ড। প্রচুর দ্রব্য অবিক্রীত থাকিয়া যায়, বিক্রেতাগণ বিক্রয়ের জন্য অধীর হইয়া উঠে, উহার মধ্যে যাহাদের উৎপাদন-ব্যয় কম তাহারা দাম কমাইয়া দেয়। দাম কমিতে থাকিলে চাহিদাও বাড়িতে থাকে, অবশেষে 4 টাকাতে চাহিদা ও যোগান সমান হইয়া পড়ে। আবার, যদি দাম 4 টাকা হইতে কম, যেমন 3 টাকা থাকে, তাহা হইলেও ভারসাম্যের অবস্থা স্থাপিত হয় না। দাম 3 টাকা থাকিলে বাজারে চাহিদা থাকে 4500 পাউণ্ড, কিন্তু যোগান থাকে 2000 পাউণ্ড। প্রচুর পরিমাণে চাহিদা মেটে না, বহু ক্রেতা দ্রব্যটি পায় না। তাহারা দ্রব্য পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠে, উহার মধ্যে যাহাদের আকাঙ্ক্ষা বেশি থাকে তাহারা দাম বাড়াইয়া দ্রব্যটি কিনিতে চাহে। এইরূপ দাম বাড়িতে থাকিলে উহার যোগানও বাড়িতে থাকে, অবশেষে 4 টাকাতে চাহিদা ও যোগান সমান হইয়া পড়ে। সুতরাং 4 টাকাতে পৌঁছিয়া দাম স্থির থাকিতে চাহে, ওই দামে সকল চাহিদা মিটিতেছে এবং ওই দামে সকল যোগান বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। এমন কোন ক্রেতা নাই যে ওই দামে দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহে অথচ বিক্রেতা খুঁজিয়া পাইতেছে না, এবং এমন কোন বিক্রেতা নাই যে ওই দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে অথচ ক্রেতা খুঁজিয়া পাইতেছে না।

কিরূপে ভারসাম্যের বিন্দুতে পৌঁছায়

এবং উহা হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, অর্থাৎ উহা স্থায়ী ভারসাম্য

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপে দাম স্থির হয় তাহা আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারি। OY অক্ষে আমরা দ্রব্যটির ইউনিট-প্রতি সম্ভাব্য দাম পরিমাপ করি এবং

OX অক্ষে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগান পরিমাপ করি। এই দুই অক্ষের মধ্যে চাহিদারেখা ও যোগানরেখা উভয়কেই স্থাপন করা হইয়াছে। OP হইল ভারসাম্যের দাম, এই দামে OM পরিমাণ চাহিদা হইতেছে এবং ওই পরিমাণই বিক্রয় হইতেছে। অন্য কোন দাম থাকিলে চাহিদা ও যোগানের সমতা আসিতে পারে না। দ্রব্যটির বাজারে অর্থাৎ সমগ্র শিল্পটিতে ভারসাম্য স্থাপিত হয় না। যেমন দাম যদি OA হয় তবে সকল ফার্ম মিলিয়া OH পরিমাণ যোগান দিতে প্রস্তুত থাকে; কিন্তু সকল ক্রেতা মিলিয়া OJ পরিমাণ চাহিদা করিতে থাকে। এই অবস্থায় HJ পরিমাণ চাহিদা মেটে না। অপরপক্ষে, দাম যদি OB হয়, তবে সকল ক্রেতা মিলিয়া মাত্র OK চাহিদা করে, কিন্তু সকল ফার্ম মিলিয়া যোগান দেয় OL পরিমাণ। এই অবস্থায় KL পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ কোন অবস্থাতেই বাজারে ভারসাম্যের দাম পাওয়া গিয়াছে, এমন বলা চলে না। একমাত্র OP দামেই যোগান ও চাহিদা সমান, ঐ দামই ভারসাম্যের দাম। যতক্ষণ পর্যন্ত যোগান ও চাহিদায় কোন পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ ঐ রেখাগুলির অবস্থান ও আকৃতি সমান থাকে ততক্ষণ দ্রব্যটির বাজারে দামও সমান থাকে, ভারসাম্য বজায় থাকে অর্থাৎ দামে উঠানামার ঝোঁক আর দেখা যায় না।



সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য

চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এমন একটি দাম দেখা যায় যাহাতে দ্রব্যটির বাজারে ভারসাম্য আসে। শুধু তাহাই নহে, ঐ দামে সমগ্র শিল্পটিও ভারসাম্যে পৌঁছে। সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য বলিলে কি বোঝা যায়? ইহা দ্বারা আমরা বুঝি যে, সেই শিল্পটির মোট উৎপাদন বাড়িবার বা কমিবার দিকে কোনো ঝোঁক দেখা যাইতেছে না। একটি শিল্প গঠিত থাকে অনেকগুলি স্বাধীন বা পৃথক্ ফার্ম লইয়া, উহাদের প্রত্যেকের

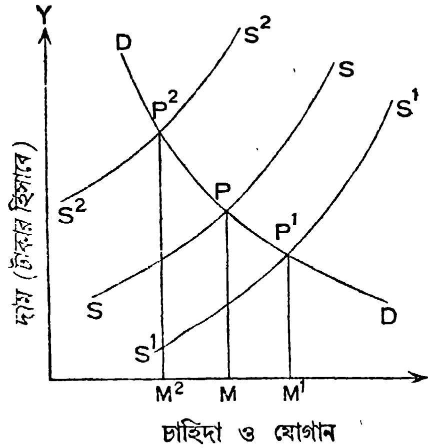
সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য কাহাকে বলে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণ উৎপাদন যোগ করিয়াই তো শিল্পটির মোট উৎপাদন এবং বাজারে দ্রব্যটির মোট যোগান। তাই সমগ্র শিল্পটি ভারসাম্যে আছে বলিলে আমাদের বুঝিতে হইবে যে উহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

রেখা স্থির অবস্থায় যোগান বাড়িলে, নূতন S^1S^1 রেখা সৃষ্টি হইল। দাম কমিয়া P^1M^1 হইল। যদি যোগান কমিয়া যায়, তবে নূতন S^2S^2 রেখা সৃষ্টি হইল, দাম বাড়িয়া P^2M^2 হইল।

চাহিদা ও যোগানের একই সঙ্গে পরিবর্তন হইলে দামেও পরিবর্তন হইবে। উভয়ের বৃদ্ধি হইলে দামের উপর কি প্রভাব হইবে তাহা নির্ভর করিবে বৃদ্ধির তুলনামূলক পরিমাণের উপর। যদি চাহিদার বৃদ্ধির তুলনায় যোগানের বৃদ্ধি বেশি হয়, তাহা হইলে দাম কমিবে, যদি চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় যোগানের বৃদ্ধি কম হয়, তাহা হইলে দাম বাড়িবে। যদি চাহিদা ও যোগানের সমান বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িলেও দাম একই থাকিবে।

উভয়ের একসঙ্গে পরিবর্তন



এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে, যেখানে কোন ক্রেতা বা কোন বিক্রেতা একা দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না এবং বাজারে একটি দামই বিরাজ করে, সেইখানে ভারসাম্যের দাম স্থির হয় বাজার-চাহিদা ও বাজার-যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে, উহাদের সমতার বিন্দুতে। প্রতি মুহূর্তেই বাজারে যোগান ও চাহিদা নিজেদের টানাটানিতে আপনা-আপনি উঁঠা-নামার মধ্য দিয়া এই ভারসাম্যের দাম প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু বাস্তবে বাজারে যোগান ও চাহিদা নির্ধারণকারী কোনো-না-কোনো বিষয়ে অবিরাম পরিবর্তন ঘটে, তাই ভারসাম্যের দামও সদা-সর্বদা নূতন নূতন বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। দামে উঠা-নামার অন্তরালে গভীরে তাকাইলে দেখা যায় সময়ের প্রতিটি ক্ষণ-বিন্দুতেই তৎক্ষণাৎ যে নূতন-দামটি দাঁড়াইয়া আছে, উহাই সেই মুহূর্তের ভারসাম্যের দাম। অতি অল্পক্ষণের জন্য হইলেও সেই দামেই যোগান ও চাহিদার ক্ষণকালীন সমতা ঘটিয়া যাইতেছে। ব্যক্তিগত কোন ক্রেতা বা ব্যক্তিগত কোন বিক্রেতার চক্ষুর অন্তরালে, তাহাদেরই ব্যক্তিগত লক্ষ্য-সাধনের চেষ্টা (তৃপ্তি বা মুনাফা বাড়াইবার প্রয়াস) বাজার-চাহিদা ও বাজার-যোগানের রূপ লইয়া কোন একটি দ্রব্যের বাজারে (অর্থাৎ কোন একটি শিল্পে) অনুক্ষণ ভারসাম্যের দাম বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

ভারসাম্যের দাম অপসারণের গতিপথ (The process and path of shift in Equilibrium Price), **অথবা, বাজার দাম, স্বল্পকালীন দাম ও দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক্ দাম : সময় ও দাম নিরূপণ** (Market Price, Short-run Normal Price and Long-run Normal Price : Element of Time and Pricing Analysis) : বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে চাহিদা ও যোগানে ভারসাম্য-বিন্দুতে দাম স্থির হয় এবং উহাদের পরিবর্তন হইলে দামেও পরিবর্তন ঘটে। চাহিদা বদলাইয়া গেলে দামও বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু এইরূপে দাম বদলাইয়া গেলে নূতন দামে যোগান নিজেকে বদলাইয়া খাপ খাওয়াইয়া লইতে চেষ্টা করে। দাম বদলাইয়া গেলে বিক্রেতারাও নিজেদের যোগানের পরিমাণ বাড়াইবার ও কমাইবার চেষ্টা করিবে। বিক্রেতাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার দরুণ সমগ্র বাজারের যোগানে এরূপ পরিবর্তন আসিয়া পড়ে যাহাতে স্থায়ী ভারসাম্য পুনরায় স্থাপিত হইতে পারে। নিজেদের যোগান পরিবর্তন করিতে যোগানদারের কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। সেই সময়ের মধ্যে দাম কিরূপ থাকে ? দামে পরিবর্তন হইলে নূতন দামের সহিত নিজেদের যোগান খাপ খাওয়াইয়া লইতে যোগানদারের যে সময় দরকার, সেই সময়কে বিশ্লেষণ না করিলে তাই দাম-নিরূপণ তত্ত্ব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

দাম বদলাইলে যোগান নিজেকে বদলাইয়া লয়

কিন্তু তাহাতে কিছুটা সময় লাগে

চাহিদা ও দামে পরিবর্তন ঘটিলে যোগানের পরিবর্তন হইয়া পুনরায় ভারসাম্যে পৌঁছিবার মোট সময়কে ধনবিজ্ঞানীরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন : অত্যল্পকাল বা বাজার-সময়, স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল। এইরূপ প্রত্যেকটি অংশ অনুসারে বাজারকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে : অত্যল্পকালীন বাজার (extremely short period market), স্বল্পকালীন বাজার (short period market) ও দীর্ঘকালীন বাজার (long period market)। এইরূপে বিভিন্ন সময়াংশের বিভিন্ন বাজারে দ্রব্যটির দামের নামও পৃথক্, যেমন অত্যল্পকালীন দাম ও বাজার দাম (extremely short period price or market-price) ; স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (short-run normal price) ; দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম বা মূল্য (long-run normal price or normal value)।

সেই সময়কে তিন স্তরে ভাগ করা হয়

(ক) **অত্যল্পকাল বা বাজার-সময় : বাজার দর** (Market-Price) : চাহিদা বদলাইয়া গেলে দাম বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু দাম পরিবর্তিত হইলে ঠিক তখনই যোগান নিজেকে বদলাইতে পারে না। ইহার জন্য কিছুটা সময় দরকার।

যতক্ষণের মধ্যে যোগান নিজেকে মোটেই বদলাইতে পারে না, সেই সময়ে উৎপাদন-ব্যয় স্থির থাকে। সেই সময়ের নাম হইল অত্যল্পকাল; সেইরূপ বাজারের নাম হইল অত্যল্পকালীন বাজার এবং সেইরূপ বাজারে জিনিসের দামকে বলে উহার বাজার-দর। এইরূপ অবস্থায় যোগান স্থির আছে, তাই চাহিদা যত বাড়িবে বাজার-দরও তত বেশি হইবে; চাহিদা যত কমিবে বাজার-দরও তত কমিয়া যাইবে। দামের উপর চাহিদার প্রভাব প্রত্যক্ষ ও বেশি। প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানী মার্শাল মাছের বাজারের উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আজ সকালে যে-পরিমাণ মাছ বাজারে আসিয়াছে, সেই যোগান এখনই বাড়ানো বা কমানো যায় না। এই অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে দাম বাড়িবে। দাম ততখানি বাড়িবে যে-দামে আজিকার যোগানের সমস্তটা বিক্রয় হইয়া যায়। অর্থাৎ, বর্ধিত দামে চাহিদা ও যোগানের এক সাময়িক বা বাজার-ভারসাম্যের (temporary or market equilibrium) সৃষ্টি হইবে।

(খ) **স্বল্পকাল: স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম** (Short-run normal price): যখন বিক্রেতারা বা যোগানদাররা নিজেদের কার্যের আয়তন বা মাত্রা বদলাইয়া যোগান বদলাইবার মত বেশি সময় পায় না, তাহাকে বলে স্বল্পকাল। কিন্তু ঐ সময়টুকুর মধ্যে বর্তমান যন্ত্রপাতিকে বা শ্রমিককে বেশি বা কম খাটাইয়া উৎপাদনে কিছুটা পরিবর্তন আনিতে পারা যায়। ফার্মের স্থির ব্যয় (fixed costs) বদলাইবার সময় নাই; পরিবর্তন ব্যয় (variable costs) কিছুটা বদলানো হইয়াছে।

মার্শালের উদাহরণ অনুযায়ী বর্তমান নৌকা, জাল ও শ্রমিকদের বেশি পরিমাণে খাটাইয়া মাছের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে। তৎক্ষণাৎ নূতন নৌকা, জাল ইত্যাদি তৈয়ার করা হইবে না, অর্থাৎ স্থির ব্যয় সমান আছে। এই অবস্থায় মাছের দাম পূর্বের বাজার-দামের তুলনায় একটু নামিয়া যাইবে। কারণ, যোগান অল্প হইলেও, কিছুটা বাড়িতেছে। এই সময়ের মধ্যে বাজারে যে দাম স্থায়ী হইবে তাহার নাম স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (short-run normal price)।

(গ) **দীর্ঘকাল: দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম বা স্বাভাবিক মূল্য** (Long-run normal price or normal value): যে-সময়ের মধ্যে ফার্মগুলির স্থির ব্যয় বা স্থায়ী যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের মাত্রা প্রয়োজনমত বদলানো যায়, অর্থাৎ সকল বিক্রেতা সাধ্যমত নিজেদের যোগান বদলাইয়া ফেলিতে পারে—সেই অবস্থার নাম হইল দীর্ঘকাল। মাছ-বিক্রেতারা নূতন নৌকা, নূতন জাল তৈয়ারির সুযোগ পায়। নূতন নূতন ফার্মও সেই বাজারে প্রবেশ করিতে পারে। মাছের যোগান বাড়ে, দাম কমিয়া আসে, দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের দাম স্থাপিত হয়। প্রত্যেকটি

মাছ-বিক্রেতা ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফার বেশি মুনাফা করিতে পারে না। দীর্ঘকালে প্রতিটি ফার্ম মাত্র স্বাভাবিক মুনাফাটুকু পাইতে পারে। এইরূপে প্রত্যেকটি ফার্ম ও সকল ফার্ম মিলিয়া সমগ্র শিল্পে ভারসাম্য স্থাপিত হইলে সেই শিল্পের মধ্যে নূতন কোন ফার্ম প্রবেশ করিতেছে না, পুরাতন কোন ফার্ম সেই শিল্প ছাড়িয়া যাইতেছে না। সেই শিল্পের মোট উৎপাদন বাজারের মোট চাহিদা মিটাইতেছে। সেই দামে সকল ক্রেতার অভাব মিটিতেছে এবং কোন বিক্রেতার কিছু অবিক্রীত থাকিতেছে না। প্রত্যেকটি বিক্রেতা ফার্মই সর্বোন্নত স্তরে থাকিয়া উৎপাদন ও বিক্রয় করিতেছে। দীর্ঘকালে এইরূপ চাহিদা ও যোগানের যে-ভারসাম্য স্থাপিত হয় তাহার নাম দীর্ঘকালীন ভারসাম্য এবং বাজারে যে-দাম প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহার নাম দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম বা স্বাভাবিক মূল্য (normal value)।

বাজার দর ও স্বাভাবিক দরের পার্থক্য (Distinction between Market Price and Normal Price) : অতি অল্পকালের মধ্যে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা যে দর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে বলা হয় বাজার দর। আর দীর্ঘকালের মধ্যে চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা যে দর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে বলা হয় স্বাভাবিক দর। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার হইবে। ধরা যাউক, দৈনিক মাছের বাজারে কোন কারণে চাহিদা অনেকটা বৃদ্ধি পাইল। যেহেতু সঙ্গে সঙ্গেই মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি সম্ভব নহে, তাই মাছের বাজার দর অনেকটা বাড়িয়া যাইবে। পূর্বে মাছের যে বাজার-দর ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর দরেই এখন চাহিদা ও যোগানের সমতা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা হইল অত্যল্পকালীন বাজারদরের প্রকৃতি। কিন্তু স্বাভাবিক দরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্যরূপ দাঁড়াইবে।

মাছের চাহিদা-বৃদ্ধি সাময়িক না হইয়া দীর্ঘস্থায়ী হইলে যোগানদানেরা মাছের যোগান বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিয়া মাছ ধরিবার অভিযান চালাইবে, ফলে মাছের যোগান বৃদ্ধি পাইবে, এবং চাহিদা-বৃদ্ধির ফলে গোড়ায় মূল্যের যে বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা আর থাকিবে না। তাহার পর চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নূতন একটি দরে চাহিদা ও যোগানের সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই হইল দীর্ঘকালীন দাম বা স্বাভাবিক দর। চাহিদা বৃদ্ধির পূর্বের অবস্থায় যে দর ছিল তাহা অপেক্ষা এই স্বাভাবিক দর বেশি হইতে পারে, কম হইতে পারে, আবার সমানও হইতে পারে। দীর্ঘকালের মধ্যে চাহিদা ও যোগানের যে সমতার অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহাকে বলা হয় স্থায়ী ভারসাম্য (stable equilibrium); কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যে চাহিদা ও যোগানের সাম্যাবস্থার নাম

অস্থায়ী ভারসাম্য (temporary equilibrium)। অর্থাৎ, (i) কোন দ্রব্যের বর্তমান যোগান ও চাহিদার মধ্যে সাময়িক সাম্যাবস্থা সৃষ্টির ভিত্তিতে যে দরে বিশেষ সময়ে বাজারে দ্রব্যটি বিক্রিত হয় তাহাই হইল বাজার দর। অপরপক্ষে দীর্ঘকালের মধ্যে চাহিদা ও যোগানের সমতার ফলে যে দর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব তাহাই হইল স্বাভাবিক দর। (ii) বাজার-দর অস্থায়ী, কারণ, প্রতিটি ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন এখনও শেষ হয় নাই, শিল্পে নূতন নূতন ফার্মের আগমন বা পুরাতন ফার্মের বহির্গমন উভয়ই চলিতেছে। ফলে ইহা অনবরত উঠানামা করিতেছে। অপরপক্ষে স্বাভাবিক দর স্থায়ী, কারণ, এইরূপ সকল পরিবর্তনের পালা শেষ হইয়াছে এবং দাম, মুনাফা, উৎপাদন সকলই স্থায়ী কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছিয়াছে।

দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম (Long-run Normal Value) কাহাকে বলে সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। একটু কল্পনার সাহায্যে বিষয়টি বুঝিতে হইবে। কোন দ্রব্যের স্বাভাবিক দাম হইল এমন একটি স্তর যাহার চারিপাশে দৈনন্দিন দামগুলি উঠানামা করে, ওই স্তরে পৌছিয়া স্থির থাকিতে তাহাদের অবিরাম চেষ্টা। অপরপক্ষে, বাজার-দরের উপর ক্ষণস্থায়ী প্রভাবগুলি বেশি কাজ করে। যেমন, মাছের যোগান হঠাৎ বাড়িলে উহার বাজার দর কমিয়া যাইবে, হঠাৎ গরম বাড়িলে বরফের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম বাড়িবে। এই সকল হইল ক্ষণস্থায়ী প্রভাব, বাজার-দরে ক্ষণস্থায়ী অস্থিরতা সৃষ্টি করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু গুরুত্ব ইহাদের নাই। এই সকল স্থিতিভঙ্গকারী বিষয়সমূহ না থাকিলে, অথবা ইহাদের সকল প্রভাব মিটিয়া গেলে, দ্রব্যটির বাজারে দাম কোন একটি স্তরে স্থির হইয়া পড়ে। দামের এই স্তরটি সকল সময়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন একটি স্তর নয়। কিন্তু উৎপাদনের পদ্ধতি ও মাত্রা (scale) মোটামুটি সমান থাকিলে এই স্তরকে একটি স্থির নোঙর বলিয়া মনে করা চলে। এই নোঙর ঘিরিয়া বাজার-দর দৈনন্দিন উঠানামার সময়ে ঘোরাঘুরি করে। উহার সকল উঠানামার মূল ঝোঁক ওই কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছাইবার দিকে। অ্যাডাম স্মিথ এই স্তরকে বলিয়াছেন "প্রাকৃতিক দাম" (Natural Price) এবং মার্শাল ইহাকে বলিয়াছেন "স্বাভাবিক দাম" (Normal Price)। মার্শালের ভাষায় বলা চলে যে, "Normal or Natural Value of a commodity is that which economic forces would tend to bring about in the long run".

স্বাভাবিক দাম হইল কেন্দ্রবিন্দু, স্বল্পকালীন দামগুলি উহাকে ঘিরিয়া উঠানামা করে

স্বাভাবিক দর ও উৎপাদন ব্যয় (Normal Value and the Cost of Production) **:** দ্রব্যের স্বাভাবিক দর সব সময়ই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের সমান

হইতে বাধ্য। স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। স্বল্পকালীন দর বা বাজার দর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম বা বেশি হইতে পারে। চাহিদার তারতম্য অনুসারে সাময়িকভাবে কোন ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম দামে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লোকসান বহন করিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকসান বহন করা সম্ভব নহে। অনুরূপভাবে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশি দামে বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা অধিক দিন ধরিয়া অর্জন করিতে পারে না। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুনাফার লোভে অনেক নতুন নতুন উৎপাদক ঐ দ্রব্যের উৎপাদন স্থরু করিবে, ফলে শেষ পর্যন্ত যোগান বৃদ্ধি হইয়া দর নামিয়া আসিয়া উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে।

এখানে উৎপাদন ব্যয় বলিতে অবশ্যই প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় বুঝিতে হইবে। কারণ, দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রের চাহিদার সঙ্গে যোগানের সমতা আনিবার জন্য বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের যে শেষ একক পর্যন্ত উৎপাদন করিতে হয় তাহার উৎপাদন ব্যয় অবশ্যই মূল্য দ্বারা পোষাইতে হইবে। দীর্ঘকালের মধ্যে উৎপাদন যেহেতু বাড়ানো বা কমানো সম্ভব, তাই প্রতিটি ফার্ম নিজ উৎপাদনকে সেই সীমা পর্যন্ত আনিয়া থামিবে যেখানে জিনিসের দর তাহার প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। উৎপাদন এই স্তরে পৌছিলে ফার্ম আর উৎপাদনের পরিবর্তন করিবে না, কারণ, যেখানে দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয় সেইখানে সর্বাধিক মুনাফা হয়। উৎপাদনের এবং পরিমাণকে বলা হয় কাম্য উৎপাদন (optimum output) এই ফার্মটিকে বলা হয় কাম্য ফার্ম। যেহেতু প্রতিটি ফার্মই চায় সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিতে, তাই প্রতিটি ফার্মেরই লক্ষ্য হইবে কাম্য উৎপাদনের স্তরে পৌছানো অর্থাৎ কাম্য ফার্মে (optimum firm) পরিণত হওয়া। স্থতরাং আমরা এক কথায় বলিতে পারি, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক দর হইল কাম্য ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান।

কাম্য উৎপাদন ও কাম্য ফার্ম

আবার ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কাম্য ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় উহার গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে। কারণ, একটি ফার্ম তখনই কাম্য আয়তন প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি লাভ করে) যখন ইহার গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় কমিতে কমিতে নিম্নতম-স্তরে আসিরা পৌছায় এবং উহা বৃদ্ধি পাইতে স্থরু করে নাই। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যখন প্রান্তিক ব্যয় (marginal cost) গড়পড়তা ব্যয়কে বাড়াইতেছে বা কমাইতেছে না, অর্থাৎ গড়পড়তা ব্যয়ের সমান। তখনই

স্বাভাবিক দর কাম্য ফার্মের প্রান্তিক ও গড়পড়তা ব্যয়ের সমান

ফার্মটি কাম্য আয়তন প্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ কাম্য ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ও গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় সমান। সুতরাং স্বাভাবিক দর হইল কাম্য ফার্মের প্রান্তিক ও গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় দুইয়েরই সমান।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় মূল্য ও উৎপাদন ব্যয়ের সম্বন্ধ (Relation between value under perfect competition and cost of production) : সমস্যাটিকে দুইভাগে আলোচনা করিতে হইবে। উৎপাদনের ব্যয়ের সঙ্গে (১) বাজার দরের সম্পর্ক এবং (২) স্বাভাবিক দরের সম্পর্ক।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে উৎপাদক ও বিক্রেতা যে কোন দ্রব্য বিক্রয়ের মধ্য দিয়া অন্ততঃ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় পোষাইয়া লইতে চাহিবে, কিন্তু বাজার দর অর্থাৎ স্বল্পকালীন দর কখনও দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের বেশি হইতে পারে, আবার কখনও-বা কম হইতে পারে। ইহা মূলত নির্ভর করে যোগানের তুলনায় দ্রব্যটির চাহিদার আপেক্ষিক পরিমাণের উপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে কোন বিশেষ দিনে বাজারে একটি দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া গেলে উক্ত দ্রব্যের বাজার দর বাড়িয়া যাইবে। কেননা ঐ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রব্যটির যোগান বাড়ানো সম্ভব নহে। এ ক্ষেত্রে হয়ত দ্রব্যটির একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় ছিল 1 টাকা, কিন্তু দর বাড়িয়া তখন একক প্রতি হইল 2 টাকা। সুতরাং এক্ষেত্রে বাজার দর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশি হইল। অনুরূপভাবে হঠাৎ দ্রব্যটির চাহিদা কমিয়া গেলে ঐ দ্রব্যটি উহার উৎপাদন ব্যয়ে অর্থাৎ একক প্রতি 1 টাকার বিক্রেতার পক্ষে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। হয়তো 75 পয়সায় বিক্রয় করিল। এক্ষেত্রে দ্রব্যটির বাজার দর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হইল।

প্রশ্ন উঠিতে পারে দ্রব্যের বাজার দর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হইলে বিক্রেতা তো তাহার দ্রব্যের দর না ওঠা পর্যন্ত ধরিয়া রাখিয়া অপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে অনেক সময় ইহা সম্ভব হয় না। কারণ, দ্রব্যটি যদি স্বল্পকাল স্থায়ী হয় (যেমন, মাছ) তাহা হইলে যথাসময়ে বিক্রয় না করিলে উহা পচিয়া নষ্ট হইবে। শাক-সবজির ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথা বলা যায়। স্বল্পকালস্থায়ী দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যও অনেক সময় বিক্রেতাকে বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া বিলম্ব না করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। যেমন, মজুত দ্রব্যের পরিমাণ বেশি হইয়া গেলে, ভবিষ্যতে আরও দর পড়িয়া যাইতে পারে এই ভয়ে উৎপাদন ব্যয়ের অপেক্ষা কম দরে বিক্রেতা তাহার মজুত দ্রব্য কালবিলম্ব না করিয়া বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। আবার অনেক সময় মজুত দ্রব্যের মধ্যে বিক্রেতার প্রায় সমস্ত মূলধন আটকা পড়িয়া গেলে পাওনাদারদের

বাজার দরের সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই

তাগাদায় বিব্রত হইয়া দেনা পরিশোধ করিবার জন্য বা অন্যান্য কারণে টাকার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হইলে বিক্রেতা তাহার মজুত দ্রব্য উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে, দ্রব্যের বাজার দরের সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই এবং কদাচিৎই একে অপরের সমান হইতে পারে।

স্বাভাবিক দর উৎপাদন ব্যয়ের সমান

স্বাভাবিক দরের অবস্থা স্বতন্ত্র, ও দীর্ঘকাল পর্যন্ত উৎপাদক বা বিক্রেতা তাহার উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিয়া লোকসান দিতে পারে না। ঐরূপ অবস্থায় উৎপাদক উৎপাদন কমাইবে বা বন্ধ করিয়া ফেলিবে। এইরূপে উৎপাদন কমিয়া গেলে দ্রব্যের মোট যোগান পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যাইবে, ফলে দ্রব্যের দর বাড়িয়া উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে। অপরপক্ষে কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যের দর উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বেশি হইলে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় অনেকে উক্ত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মূলধন নিয়োগ করিবে; ফলে দ্রব্যটির যোগান বৃদ্ধি পাইবে। তখন উক্ত দ্রব্যের দর হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং পরিশেষে দ্রব্যের দর উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হয় যে, শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক দর উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে।

মূল্যের উপর উৎপাদন বিধি তিনটির প্রভাব (Influence on Value of the three Laws of Returns): পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি দ্রব্যের স্বাভাবিক দর উৎপাদনের ব্যয়ের সমান। সুতরাং মূল্যের উপর উৎপাদন বিধি-সমূহের প্রভাবও যথেষ্ট।

ধরা যাউক একটি জিনিসের চাহিদা বাড়িল, ইহার ফলে নিশ্চয় তাহার অত্যল্পকালীন দর বা বাজার দর বাড়িবে, কেননা, যোগান তখনই পরিবর্তন করা যাইতেছে না। কিন্তু সময় দীর্ঘ হইলে উহার উৎপাদন ও যোগান বাড়ানো যাইবে এবং দীর্ঘকালীন দর বা স্বাভাবিক দর উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে। যদি দ্রব্যটির উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি অনুযায়ী হয় তবে দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িলে গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় বাড়িবে। সুতরাং চাহিদা বৃদ্ধিহেতু বর্ধিত উৎপাদনের ফলে স্বাভাবিক দরও বাড়িবে, আর যদি দ্রব্যটির উৎপাদন ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি অনুযায়ী হয় তবে উৎপাদন বাড়িলে উৎপাদন ব্যয় কমিবে, সুতরাং স্বাভাবিক দরও কমিবে; দ্রব্যটির উৎপাদন যদি সমহারে উৎপাদন বিধি অনুযায়ী

হয় তবে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় একই থাকিবে সুতরাং স্বাভাবিক দরও অপরিবর্তিত থাকিবে।

অপরপক্ষে যদি চাহিদার হ্রাস হয় তবে বাজার দর হ্রাস পাইবে। কিন্তু স্বাভাবিক দর, দ্রব্যটির উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান বিধি অনুযায়ী হইলে, হ্রাস পাইবে, ক্রমবর্ধমান বিধি অনুযায়ী হইলে, বৃদ্ধি পাইবে, এবং সমহারে উৎপাদন বিধি অনুযায়ী হইলে, একই থাকিবে; কারণ, চাহিদা হ্রাসের ফলে সঙ্কুচিত উৎপাদনের গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় প্রথম ক্ষেত্রে কমিবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাড়িবে এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে একই থাকিবে।

Questions to be discussed

1. Define Market. What are the conditions of a Perfect Market ?

বাজার কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ অবস্থা বর্তমান থাকিলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়?

2. Define Market in Economics. What are the conditions on which the size (or extent) of the market depends ?

ধনবিজ্ঞানে বাজার কাহাকে বলে? কোন্ বিষয়ের উপর বাজারের পরিধি বা বিস্তৃতি নির্ভর করে?

3. Classify Market according to space, time and the degree of competition prevailing in the market.

স্থান, কাল ও বাজারের প্রতিযোগিতা অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ কর।

4. Show how value is determined under Perfect Competition.

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কিভাবে মূল্য নিরূপিত হয়?

5. Show how equilibrium between demand and supply is established in a Perfect Market.

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

6. Distinguish between Market Price, Shortrun Normal Price, and Longrun Normal Price ; and how they are established.

অত্যল্পকালীন, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন বাজার দরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর, এবং ইহারা কিরূপে নিরূপিত হয় লিখ।

7. Distinguish between Market Price and Normal Price. What is meant by Normal Price ?

বাজার দর ও স্বাভাবিক দরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। স্বাভাবিক দর বলিতে কি বোঝায়?

8. What is Normal Price and how it is determined ?

বাজার দর কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে নির্ধারিত হয়?

9. Show how Normal Price is equal to the Cost of Production,

দেখাও যে বাজার দর উৎপাদন ব্যয়-এর সমান।

10. What is the influence of the three Laws of Returns on Value ?

মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে উৎপাদন বিধির প্রভাবগুলি আলোচনা কর।

৭

টাকা ও টাকার মূল্য

Money and the Value of Money

পণ্য বিনিময় প্রথা (The Barter System)

দ্রব্য-সামগ্রী কেনা-বেচার জন্য অথবা দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য কোন দেশের লোকেরা যে জিনিসকে সর্বদা ব্যবহার করে এবং যাহা সকলেই সকল সময়ে এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিতে সম্মত থাকে, তাহাকে অর্থ বলা যাইতে পারে। সাধারণ ভাষায় অর্থ বলিলে আমরা টাকা-পয়সা ও কাগজী নোট বুঝি। কিন্তু সকল মুদ্রা বা কাগজী নোটই অর্থ নহে। ব্রহ্মদেশের একটি মুদ্রা বা চীন দেশের একটি কাগজী নোট আমাদের দেশের বাজারে অর্থ হিসাবে চলে না। কারণ, জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিবে না। অর্থ সর্বদাই কেনা-বেচার সময়ে এক হাত হইতে অন্য হাতে যায় এবং সকলেই তাহা অর্থ বলিয়া মানিয়া লয়।

অর্থ কাহাকে বলে

পৃথিবীতে এমন একদিন ছিল যেমন অর্থ বা মুদ্রা বলিয়া কোন জিনিস ছিল না। তখনকার দিনে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য দেওয়া হইত। ইহাকে বলা যায় পণ্য-বিনিময় প্রথা (Barter)। মনে কর, একজনের বাড়তি চাউল আছে, তাহার কাপড়ের দরকার, অপর কোন ব্যক্তির বাড়তি কাপড় আছে, তাহার চাউলের দরকার। তখন প্রথম ব্যক্তির চাউল দ্বিতীয় ব্যক্তির কাপড়ের সহিত বিনিময় হইবে। এখনও আমাদের গ্রামাঞ্চলে কোন কোন ব্যাপারে পণ্য বিনিময় প্রথা দেখা যায়। যেমন, জেলে এক সের ধানের বিনিময়ে একটি মাছ দিবে, অথবা ফেরিওয়ালা পুরানো কাপড়ের বিনিময়ে একটি চায়ের কাপ দিবে।

বার্টার বা পণ্য বিনিময় প্রথা

কিন্তু এইরূপ দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থার অনেক অসুবিধা ছিল। এইজন্যই আজকাল ইহার প্রচলন নাই। প্রথমত, বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অভাবগুলি একে অন্যের পরিপূরক হওয়া দরকার। একজন লোকের হয়তো নিজের দরকার অপেক্ষা বেশি কাপড় আছে। তাহার চাউলের দরকার তাহাকে এমন একজন লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহার কাপড় দরকার এবং বিনিময়যোগ্য অতিরিক্ত চাউলও আছে। কিন্তু এই প্রকার লোক সব সময়েই পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অবস্থায় বিনিময়ের গতিধারা নিয়মিতভাবে চলিতে পারে না, যদি পরস্পরের অভাবযুক্ত ব্যক্তি জুটিয়া যায়, তবেই ইহা সম্ভব। ফলে বিনিময়ের ক্ষেত্রে একধরনের অনিশ্চয়তা ও

অর্থবিহীন পণ্য—বিনিময়ের অসুবিধা

আকস্মিকতা আসিয়া যায়। দ্বিতীয় অসুবিধা হইল, এমন অনেক জিনিস আছে যাহাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা নাই। মনে কর, যাহার কাপড় আছে তাহার হয়তো মাত্র এক সের চাউলের দরকার। কিন্তু, এক সের চাউলের জন্য পুরা কাপড়খানা দিলে ক্ষতি হইবে। কিন্তু কাপড়খানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেওয়াও চলে না। কারণ, কাপড়টি ছোট ছোট অংশে ভাগ করিলে তাহার উপযোগিতা থাকিবে না। তৃতীয়ত, অর্থ না থাকিলে সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থাকিতে পারে না। কারণ, দ্রব্যসামগ্রী বেশিদিন সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে না। চাউল সঞ্চয় করিলে তাহা বেশিদিন থাকিবে না, নষ্ট হইয়া যাইবে। সর্বোপরি, এইরূপ বার্টার প্রথায় প্রতিটি দ্রব্যের সহিত প্রতিটি দ্রব্যের বিনিময়-হার গণনা করিতে হয়। গরুর বদলে চাউল, কাপড়ের বদলে গরু, জুতার বদলে ধান, গরুর বদলে জুতা, আমের বদলে আপেল—এইরূপ অসংখ্য বিনিময় হার (exchange-ratios) সমাজে উদ্ভূত হয়। প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য পরিমাপের কোনো সাধারণ মানদণ্ড (standard) থাকে না বলিয়া এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়। কোনো ব্যক্তি এইরূপ অসংখ্য বিনিময় হার কিরূপে স্মরণ রাখিবে ? ফলে বিনিময়ের কাজ সরলভাবে চলিতে পারে না।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য নানাপ্রকার বিনিময়ের মাধ্যমের ব্যবহার সুরু হইয়াছিল। বিভিন্ন সমাজে বা একই সমাজে বিভিন্ন সময়ে গরু, কড়ি, তামাক, লবণ ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম হইল। ক্রমে ক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি ধাতু অর্থরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বর্তমানে কাগজের দ্বারা তৈয়ারী বিভিন্ন ধরনের কাগজী নোট পৃথিবীর সকল দেশেই অর্থ হিসাবে প্রচলিত আছে।

অর্থ কাহাকে বলে : অর্থ বা টাকার প্রকৃতি (What is money : The nature of Money) :

সমাজের প্রতিটি মানুষের সহিত অপর মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্কের মূল কথা বা ভরকেন্দ্র হইল টাকাকড়ির বা অর্থের লেনদেন। কোন ব্যক্তি টাকা দিতেছে এবং অপর কোন ব্যক্তি সেই টাকা পাইতেছে—এই টাকার লেনদেনই উভয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রকাশ করে। টাকার প্রকৃতি ভাল ভাবে বুঝিতে হইলে ইহার তিনটি বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমত, আধুনিক সমাজে বেশির ভাগ দেনাপাওনা মিটানো হয় টাকা দিয়া। জিনিসপত্র বা সেবাকার্য কেনা, শেয়ার ও বণ্ড কেনা, সরকারকে কর দেওয়া—সকল দেনা ও পাওনাই টাকার মাধ্যমে মেটে। এই কথাটির গভীর তাৎপর্য আছে। আমরা সকলে আমাদের সকল আয় পাই টাকার মাধ্যমে।

টাকার দুইটি বৈশিষ্ট্য
1. আয় ও ব্যয় দেখা দেয় টাকার রূপে

আমরা টাকা আয় করি এবং টাকাই ব্যয় করি। উপকরণ বিক্রয় করিয়া আমরা টাকা আয় করি, আবার আমরা যখন টাকা খরচ করি, তখন দ্রব্য-সামগ্রীর মালিকেরা টাকা আয় করে। আয় ও ব্যয়ের স্রোত সমাজে টাকার স্রোতেরই রূপ লয়।

দ্বিতীয়ত, লোকেরা বহু বিভিন্ন আকৃতিতে সম্পদ্ (wealth) হাতে জমাইয়া রাখে, ইহাদের আমরা এক একপ্রকার সম্পত্তি (asset) বলি। যেমন, সোনাদানা, ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি, কল-কারখানা, শেয়ার-বণ্ড প্রভৃতি। কোন ব্যক্তির হাতে ইহাদের মধ্যে কোনো একটি বিষয় বা সম্পত্তি থাকিলে তাহার মনে হয় যেন কোনো কিছুর উপর তাহার এক ধরনের অধিকার বা দাবি (claim) আছে। এই অধিকারবোধই সম্পত্তির মূল কথা। টাকাও এক ধরনের সম্পদ্ বা সম্পত্তি। ইহারও মূল কথা এই অধিকারবোধ। কাগজের নোট হাতে থাকিলে আমার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অধিকার বা দাবি থাকে, আবার চেক বই হাতে থাকিলে ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে।

2. টাকা দাবি বা অধিকার প্রকাশ করে

দাবি বা অধিকার বলিলে আরও একটি কথা বোঝা যায়। টাকার সাহায্যে যে-কোনো জিনিসপত্র কেনা যায় বলিয়া আমরা বলিতে পারি যে, টাকা হাতে থাকিলে সমাজের সকল দ্রব্যের উপরই অধিকার বা দাবি জন্মায়। অর্থের বা টাকার সংজ্ঞা হিসাবে তাই বলা যায়, সমাজের সকল প্রকার বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের উপর সাধারণভাবে যে-জিনিসটির দাবি বা অধিকার আছে, তাহাই টাকা।

তৃতীয়ত, সকল প্রকার সম্পত্তিকেই আমরা টাকা বলি না কেন? সোনা, জমি, শেয়ার, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতি সকলেই সম্পত্তি (asset)। প্রতিটি সম্পত্তিরই একটি প্রধান গুণ হইল উহার বিনিময়যোগ্যতা। অর্থাৎ প্রয়োজনমত উহাকে অন্য প্রকার সম্পত্তিতে পরিণত করা চলে। লোকে নানা ধরনের সম্পত্তি হাতে রাখে, প্রয়োজনমত এক ধরনের সম্পত্তি বদলাইয়া অন্য ধরনের বা অন্য আকারের সম্পত্তিতে পরিণত করে। টাকাও একটি সম্পত্তি। কিন্তু ইহাদের মতন সম্পত্তি হইলেও উহার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকায় উহা টাকা। টাকার এই বৈশিষ্ট্যের নাম উহার তরলতা (Liquidity)। এক ধরনের সম্পত্তিকে যত দ্রুত যত সহজে এবং বিনা খরচায় অন্য ধরনের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহাই সেই সম্পত্তির তরলতা। জমি অপেক্ষা শেয়ার, শেয়ার অপেক্ষা সোনা, সোনা অপেক্ষা নগদ টাকার তরলতা বা Liquidity সর্বাধিক। যখন খুশি বিনাব্যয়ে ইহাকে অন্য সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তাই আমরা বলিতে পারি, সমাজের সকলপ্রকার সম্পত্তির মধ্যে তুলনামূলক বিচারে সর্বাধিক তরল সম্পত্তিই টাকা। টাকা এমন সম্পত্তি যাহার পূর্ণ তরলতা আছে।

3. সর্বাধিক তরল সম্পত্তিকে টাকা বলে

অর্থের কার্যাবলী (Functions of Money): পণ্যবিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করিয়া পণ্য বিনিময়ের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা ও মসৃণ করা টাকার প্রধান কাজ। বার্টার প্রথায় অভাবের পারস্পরিক পরিপূরকতা না থাকিলে বিনিময় হইতে পারে না, টাকার প্রচলন ঐরূপ আকস্মিকতা হইতে বিনিময়প্রথাকে মুক্তি দেয়। সমাজে পণ্য-বিনিময়ের স্রোতধারার মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া টাকা এক পণ্যের সহিত অপর পণ্যের বিনিময় ঘটাইতে থাকে।

দেশে টাকাকড়ির রূপে যে অর্থ প্রচলিত আছে উহার বহুরকম কাজ আছে।

প্রথমত, অর্থ সর্বদা গৃহীত হয় বলিয়া লোকে অর্থের বিনিময়ে জিনিস দিতে আপত্তি করে না। এইজন্যই জিনিস বেচা-কেনা অর্থের সাহায্যে অতি সহজে হইয়া থাকে। সর্বদা এই বিনিময়ের কাজ করিতে গিয়া অর্থ এক হাত হইতে অন্য হাতে চলিয়া যাইতেছে। মনে কর, আমি একটি টাকা দিয়া মাছ কিনিলাম। জেলে সেই টাকাটির বিনিময়ে চাউল কিনিল। চাউলের বিক্রেতা সেই টাকাটি অন্য কাজে খরচ করিল। এইভাবে একই দিনে টাকাটি চার পাঁচটি বিনিময়ের কাজ করিল। সকলেই টাকাটি গ্রহণ করিল। কেহই নিতে বা দিতে আপত্তি করিল না। এইরূপে অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমরূপে (medium of exchange) কাজ করে।

1. বিনিময়ের মাধ্যম

দ্বিতীয়ত, মূল্যের মাপকাঠি হইল অর্থ (measure of value)। যেমন, স্থানের মাপ আমরা সেন্টিমিটার, মিটার, কিলোমিটার ইত্যাদির সাহায্যে প্রকাশ করি; যেমন, সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা দিয়া সময়ের মাপ প্রকাশ করি, সেইরূপ মূল্যের মাপ করিয়া থাকি টাকা-পয়সা দিয়া। ইহা তাই মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড। বিনিময়যোগ্য অসংখ্য দ্রব্য-সামগ্রী ও কাজকর্মের মূল্য পরিমাপের জন্য সাধারণ কোন মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন। টাকার মানেই সকল দ্রব্যের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়। এইরূপ কোন মানদণ্ড না থাকিলে বিনিময় হইবে কি উপায়ে? দুইটি জিনিসের মূল্যের তুলনা করিতে হইলে আমরা অর্থের সাহায্যেই করিয়া থাকি। যেমন, একখানা চেয়ারের দাম যদি 8 টাকা হয়, আর একখানা টেবিলের দাম যদি 16 টাকা হয় তবে আমরা বলিতে পারি যে, টেবিলের মূল্য চেয়ারের মূল্যের দ্বিগুণ।

2. মূল্যের পরিমাপ

তৃতীয়ত, সমাজে দেনাপাওনার হিসাব রাখার ব্যাপারে টাকা একটি মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে (standard of deferred payments)। সমাজে আজকাল অনেক কাজই ঋণের সাহায্যে হইয়া থাকে। যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য কোন ব্যক্তি বর্তমানে ঋণ দিতেছে, সে ভবিষ্যতে অন্তত সেই সমান মূল্যটুকু ফেরত পাইতে চায়।

অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। এই জন্য অর্থ ঋণ করিলে ও তাহা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সুদসহ ফিরাইয়া দিলে ঋণদাতাও ঠকিবে না। সুতরাং অর্থই ঋণের বাজার সৃষ্টি করিয়াছে। এই ঋণের বাজারে প্রতিদিন ঋণের লেনদেন হইতেছে। তাহাতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। ঋণের ক্রেতা, বিক্রেতা ও দাম অর্থাৎ সুদ দেখা দিয়াছে। যাহারা টাকা ধার নেন তাঁহারা ক্রেতা, যাহারা ধার দেন তাঁহারা বিক্রেতা এবং সুদ হইল টাকার দাম। ঋণের বাজার সচল রাখিয়াছে টাকা।

3. দেনাপাওনার মানদণ্ড

চতুর্থত, সঞ্চয়ের অন্যতম একটি উপায় হইল টাকা। যাহার সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা আছে, সে অর্থ সঞ্চয় করে। কারণ, অর্থের আকারেই মূল্যকে ব্যক্তি নিজের হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে (store of value)। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহা সহজে নষ্ট হইয়া যায় না। ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য বা কোথাও খাটাইবার উদ্দেশ্যে লোকে ইহাকে জমাইয়া রাখিতে পারে। টাকা হইল জমাট বাঁধা ক্রয়শক্তি, ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য বা অপর কাহাকেও ঋণ দিবার জন্য সে এই ক্রয়শক্তি হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে। দ্রব্য-সামগ্রী সঞ্চিত রাখিলে উহা কিছুকাল পরে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু টাকার আকারে পরিণত করিয়া ক্রয়শক্তিকে জমাইয়া রাখা সম্ভব। অন্য কোন আকৃতিতে এই সম্পত্তি বা ক্রয়শক্তি পরিবর্তিত করা যায়, তাই টাকা হইল তরল সম্পত্তি (Liquid assert)। এইরূপে টাকার কাজই হইল মূল্যকে সঞ্চিত করিয়া তরল সম্পত্তির রূপে আবদ্ধ রাখা। সমাজে উৎপন্ন পণ্যের মূল্যসমূহ যেন টাকার আকারে লোকের হাতে ক্রয়শক্তি রূপে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে !

4. মূল্যের সঞ্চয়

টাকার এই সকল কাজ হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সমাজে ইহার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি ; টাকা প্রচলনের দরুন লোকেরা অর্থনৈতিক দিক হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। টাকার ব্যবহারের দরুন পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের কাজ, বাজার-যোগান ও বাজার-চাহিদায় রূপান্তরিত হয়। জিনিসপত্রের লেনদেন মূলত নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) হইয়া উঠে। দ্রব্যগুলিকে আর মানুষের শ্রমজাত সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না ; মানুষের শ্রম-নিরপেক্ষ নিজস্ব গতিসম্পন্ন কোন জিনিসপত্র বলিয়া ইহারা প্রতিভাত হয়। যোগান চাহিদা ও বাজারের শক্তিসমূহের প্রভাব প্রবল হইয়া উঠে। দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শ্রমের বদলে অদৃশ্য এই সকল বাজারী শক্তিসমূহ দ্রব্যের দাম নির্ধারণে প্রধান প্রভাব বলিয়া মনে হয়।

সমাজের উপর টাকার প্রভাব

ভাল অর্থের গুণাবলী (Qualities of Good Money) : কেন রূপা বা কাগজ প্রভৃতির দ্বারা অর্থ তৈয়ারি হইতেছে ? বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ভালভাবে

কাজ করিতে হইলে সেই দ্রব্যের কয়েকটি গুণ থাকা আবশ্যক। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর এই সকল গুণ আছে বলিয়াই ইহাদের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করা সুরু হইয়াছিল। ভাল অর্থের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা দরকার:

(১) দ্রব্যটিকে বহন করিবার সুবিধা থাকা আবশ্যক। অর্থ এমন জিনিসে তৈয়ারি হওয়া চাই, যাহার আয়তন ও ওজন কম, কিন্তু মূল্য অধিক। তাহা হইলে ইহা স্থানান্তরে বহন করা সুবিধাজনক, এই জন্যই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়।

(২) বিনিময়ের মাধ্যমটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই। অল্পদিন ব্যবহারেই যদি ক্ষয় হইয়া যায়, তবে ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইবে।

(৩) বস্তুটি বিভাগযোগ্য হইবে। উহাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া কম মূল্যের মুদ্রায় পরিণত করা চলে।

(৪) জিনিসটি যেন সহজে গলাইয়া উহার উপরে সীলমোহর ও মুদ্রণ সম্ভব হয়।

(৫) বস্তুটি এমন হওয়া দরকার যে সকলেই উহা সহজে চিনিতে পারে ও সহজেই বিনিময়ের কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৬) বিনিময়ের মাধ্যমটি এমন জিনিস হওয়া দরকার যে উহার নিজস্ব মূল্য স্থির থাকে। উহার মূল্য ঘন ঘন বদলাইলে মূল্যের মানদণ্ড স্থির থাকিবে না এবং তাহাতে বিনিময়ের অসুবিধা হইবে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের এই সকল গুণ ছিল বলিয়া পূর্বে তাহা সকল দেশে অর্থরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু আজকাল ধাতুনির্মিত মুদ্রার পরিবর্তে সকল দেশেই কাগজী নোটের প্রচলন হইয়াছে। কারণ, অধিক মূল্যের মাধ্যম হওয়ার পক্ষে কাগজী নোটই সুবিধাজনক। তবে, খুচরা বিনিময়ের জন্য অল্পমূল্যের ধাতুমুদ্রাও আছে।

অর্থের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Money): অর্থকে নানা উদ্দেশ্যে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন, ধাতব অর্থ বা মুদ্রা, প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বা কাগজী নোট। ধাতব অর্থ ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত। ধাতব অর্থ বা মুদ্রার উপরে লিখিত মূল্য, সাধারণত, অন্তর্নিহিত ধাতুর মূল্যের সমান। এই ধাতব অর্থ যেমন বিনিময়ের মাধ্যম তেমনই মূল্যের সঞ্চয়। কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ অর্থাৎ কাগজী নোট, বিনিময়ের মাধ্যম হইলেও মূল্যের সঞ্চয় নহে। এই কাগজী নোটকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—রূপান্তরযোগ্য (convertible) এবং রূপান্তরের অযোগ্য (inconvertible)। যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষ সেই কাগজী নোটকে ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে বাধ্য থাকেন, তবে সেই অর্থকে রূপান্তরযোগ্য কাগজী নোট বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষ কাগজী

নোটের পরিবর্তে মুদ্রা দিতে বাধ্য না থাকেন, তবে তাহাকে অপরিবর্তনীয় নোট বলা হয়। অন্য এক উদ্দেশ্যে অর্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, আইন-সিদ্ধ অর্থ (legal tender money) এবং ঐচ্ছিক অর্থ (optional money)। যে অর্থের সাহায্যে যে-কোনরূপ বিনিময় করা সম্ভব এবং সমাজের সকল ব্যক্তি দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে এই অর্থ আইনত গ্রহণ করিতে বাধ্য, তাহাকে আইনসিদ্ধ অর্থ বলে। ইহাকে প্রামাণিক অর্থও (standard money) বলা হয়। যে-অর্থ গ্রহণ করা না-করা লোকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কোন আইনের বাধ্যবাধকতা নাই, তাহাকে ঐচ্ছিক অর্থ বলা যায়। ব্যাঙ্কের চেক্ এই জাতীয় অর্থ। যে কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া তাহার উপর চেক্ কাটিয়া দিতে পারে। যে চেক্ কাটে তাহার উপর আস্থা আছে বলিয়াই ব্যক্তি চেক্ গ্রহণ করে। আইন তাহাকে জোর করিয়া চেক্ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারে না।

অর্থকে আর এক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—প্রামাণিক অর্থ (standard money) ও নিদর্শক অর্থ (token money)। একটি দেশে যাহা বিনিময়ের মান সেই মুদ্রাকে প্রামাণিক অর্থ বলা যায়। সকল মূল্যের হিসাবই এই মুদ্রায় রাখা হয়। ভারতের প্রামাণিক অর্থ টাকা, ইংলণ্ডের স্টার্লিং, আমেরিকার ডলার ইত্যাদি। সাধারণত, প্রামাণিক মুদ্রার উপরে লিখিত মূল্য ও অন্তর্নিহিত ধাতব মূল্য সমান। কিন্তু আমাদের দেশের টাকার ক্ষেত্রে উপরে লিখিত মূল্য, ধাতব মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। প্রামাণিক অর্থের সাহায্যে যে-কোন পরিমাণের মূল্য আইনত দেওয়া যায় এবং পাওনাদার এই অর্থ নিতে আইনত বাধ্য থাকে। সাধারণত প্রামাণিক অর্থ সোনা, রূপা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুতে নির্মিত হয়। নিদর্শক অর্থে যে পরিমাণ ধাতু থাকে, তাহার মূল্য মুদ্রার উপরে লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম নয়। সাধারণত খুচরা লেন-দেনে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের আধুলি, সিকি, পয়সা, ইংলণ্ডের শিলিং, পেনি ইত্যাদি নিদর্শক অর্থ। এই মুদ্রার সাহায্যে লেনদেনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন, পয়সার সাহায্যে এক টাকার বেশি দেনা দিতে চাহিলে পাওনাদারগণ আইনগতভাবে নিতে বাধ্য নহে। সাধারণত, নিদর্শক মুদ্রা অল্প মূল্যের ধাতুর দ্বারা (যেমন—তামা, নিকেল, দস্তা ইত্যাদি) প্রস্তুত।

কাগজী মুদ্রা (Paper Money): দেশের প্রধান আইন-সিদ্ধ টাকা হিসাবে কাগজী নোট প্রচলিত থাকিলে তাহাকে কাগজী মান বলা হয়। এই কাগজী নোট আজকাল সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচলিত হয় এবং সরকারী আর্থিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। চেক বা বিনিময়-বিলকে কখনই নোট বলা হয় না, কারণ, তাহা সীমাবদ্ধভাবে আইন-সিদ্ধ

কাগজী মান

(limited legal tender)। এই কাগজী নোট রূপান্তরযোগ্য (convertible) বা রূপান্তরহীন (inconvertible) হইতে পারে।

কাগজী নোটের বহু সুবিধা আছে। একসঙ্গে বহু টাকার লেনদেন করিতে হইলে ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার তুলনায় কাগজী টাকা বিশেষ সুবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, ধাতুমুদ্রার তুলনায় ইহাতে ব্যয় অনেক কম। এবং ক্রমাগত হস্তান্তরের ফলে ধাতুর প্রভূত অপব্যয় কাগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। তৃতীয়ত, কাগজী মান ব্যবস্থাতে দেশের অর্থনৈতিক নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া টাকা প্রচলনের নীতি গঠন করা চলে। কেইন্‌সের মতে দেশের কর্মসংস্থানের স্তরোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে আর্থিক নীতির সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, সুতরাং উহা এরূপ নমনীয় হওয়া উচিত যে, আভ্যন্তরীণ নিয়মকানুনের দ্বারা টাকা প্রচলনের পরিমাণকে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা চলে। ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মানের পক্ষে এরূপ নমনীয়তা সম্ভবপর নয়। বাণিজ্যচক্র বা ব্যবসায়-সংকট দূর করিতে হইলে অর্থের পরিমাণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য রাখা প্রয়োজন। কাগজীমান ব্যবস্থাতে প্রভূত ধাতু মজুত রাখার প্রয়োজন নাই, ফলে ইহার নমনীয়তা (flexibility) এবং স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) অধিক।

সুবিধা

কাগজী অর্থের অসুবিধা হইল, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও জাগরূক আছে। তাই তাহাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা উৎপাদন করা কাগজী মানের দ্বারা মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, পরিচালনার ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে পারে। শ্রেণীস্বার্থে বা দলগত স্বার্থে টাকার নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক নীতি পরিচালিত হওয়াও সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, কাগজী মান ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠা-নামার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, কাগজী মান ব্যবস্থায় টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যের স্থিরতা বা স্থায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু টাকার বহির্মূল্যকে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় যোগান ও চাহিদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চতুর্থত, টাকার পরিমাণ যথেচ্ছ বৃদ্ধি করিলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস (devaluation) ঘটাইতে হয়, এবং রপ্তানি বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিতে পারে। অন্যান্য সকল দেশও আত্মরক্ষামূলক বা প্রতিশোধমূলক বহির্মূল্য হ্রাসের (devaluation) চেষ্টা করিবে এবং এই ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইবে।

অসুবিধা

এইরূপে প্রতিযোগিতামূলক বহির্মূল্য হ্রাসের দৌড় শুরু হইবে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃংখলা দেখা দিবে। কাগজী টাকা প্রচলনের এই সকল বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে।

টাকার মূল্য (Value of Money) : অন্যান্য জিনিসের যেমন মূল্য আছে, সেইরূপ অর্থেরও মূল্য আছে। জিনিসের মূল্য অর্থের দ্বারা প্রকাশ পায়। যেমন, আমরা বলি যে, একটি বই-এর মূল্য 3 টাকা। সেইরূপ অর্থের মূল্য বলিতে আমরা বুঝি অর্থের বিনিময়ে কি পরিমাণ অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যায়। একটি টাকার মূল্য বলিতে আমরা বুঝি যে, একটি টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণ জিনিসপত্র পাওয়া যাইতেছে। যেমন, একটি টাকার মূল্য দুই সের চাউল, একখানা তোয়ালে, আধ পাউণ্ড চা, এক সের চিনি ইত্যাদি। একটি টাকার বিনিময়ে যদি আগের তুলনায় এখন বেশি পরিমাণ জিনিস পাওয়া যায় তবে আমরা বলিব যে টাকার মূল্য বাড়িয়াছে। সেইরূপ যদি টাকার বিনিময়ে এখন কম জিনিস পাওয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে, অর্থের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। যেমন একশত বৎসর পূর্বে এক টাকায় একমণ চাউল, পাঁচ সের সরিষার তৈল, একসের ঘি ইত্যাদি পাওয়া যাইত। আজকাল টাকার মূল্য কম। কারণ, এক টাকায় কম জিনিস পাওয়া যায়—যথা, এক সের চাউল, আধ পোয়া ঘি, এক পোয়া তৈল ইত্যাদি। সুতরাং জিনিসপত্রের দাম চড়া হইলে অর্থের বিনিময়ে কম জিনিস পাওয়া যায়, অর্থাৎ অর্থের মূল্য কম হয়। আর জিনিসপত্র সস্তা হইলে অর্থের বিনিময়ে বেশি দ্রব্য পাওয়া যায়, অর্থাৎ অর্থের মূল্য বেশি হয়।

অর্থের বিনিময়ে কি পরিমাণ জিনিস পাওয়া যায়

দামস্তর (Price-level) : টাকার হিসাবেই জিনিসের মূল্যের পরিমাপ হয়। যখন কোন জিনিস ক্রয় করিতে পূর্বাপেক্ষা বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন সেই জিনিসের দাম বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি। যখন অল্প অর্থের প্রয়োজন, তখন মূল্য হ্রাস হইয়াছে বলা যাইতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, জিনিসের দামবৃদ্ধির অর্থ টাকার মূল্য হ্রাস, আর জিনিসের দাম হ্রাসের অর্থ টাকার মূল্য বৃদ্ধি। সাময়িক চাহিদা যোগানের ব্যতিক্রম ঘটিলে কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। অন্য যে-সকল জিনিসের সঙ্গে এই জিনিসের সম্পর্ক নাই, সেই সব জিনিসের দামের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে, প্রায় সব জিনিসের দামই বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতেছে। তখনই আমরা বুঝি যে, অর্থের ক্রয়-শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতেছে। সমাজের সকল জিনিসপত্রের দামের যে-গড় (average) তাহাকে দামস্তর (price-level) বলে। এই দামস্তর বা

দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড় বাড়িতে থাকিলে অর্থের মূল্য কমিয়া আসে এবং দামস্তর কমিতে থাকিলে অর্থের মূল্য বাড়িয়া যায়। দামস্তরকে আমরা যদি বলি P, তবে টাকার মূল্য T. উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে 1939 খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে জিনিসপত্রের দাম যাহা ছিল, আজকাল প্রায় চতুর্গুণ হইয়াছে। কেবল যে দুই-একটি জিনিসের দাম বাড়িয়াছে, তাহাই নহে। প্রায় সকল জিনিসের দামই ক্রমে ক্রমে চড়িতেছে। শুধু ভারতবর্ষেই দামস্তর চড়িতেছে মনে করা ভুল। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই দামস্তর উর্ধ্বগামী। কিন্তু সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে বাড়ে নাই। কোনটির মূল্য বাড়িয়াছে পাঁচগুণ, কোনটির তিনগুণ, কোনটির দ্বিগুণ, এমন কি, কোন কোন জিনিসের দাম হয়তো বাড়ে নাই বা সামান্য বাড়িয়াছে। কিন্তু গড়ে দামস্তর বাড়িয়াছে। এই দামস্তর কতটা বাড়িল বা কতটা কমিল তাহা মোটামুটি হিসাব করিয়া বলা যায়। এই হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপের জন্য যে-কৌশলটি অবলম্বন করা হয় তাহাকে বলে সূচক-সংখ্যা (index number)।

সূচক-সংখ্যা তৈয়ারির নিয়ম (The Method of constructing an Index Number) ঃ কোন বিশেষ সময়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর গড়পড়তা দামকে, অপর কোন সময়ের একই দ্রব্যসামগ্রীর গড়পড়তা দামের সহিত তুলনা করিয়া পূর্ববর্তী কালের তুলনায় পরবর্তী কালে দামস্তরের শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস তাহা দেখাইলে, সেই হিসাবকে সূচকসংখ্যা বলে। কি করিয়া সূচক-সংখ্যা গঠন করা হয় তাহা একটি উদাহরণের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হইল। যে বৎসর দামস্তরের সহিত তুলনা করিয়া পরবর্তী বৎসরের দামস্তরের পরিবর্তন হিসাব করা হয়, সেই বৎসরকে মূল বৎসর (base year) বলে। এই মূল বৎসরের কয়েকটি দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা তৈয়ারি করিতে হয়, প্রত্যেকটি দামকে 100 হিসাবে ধরিতে হয়। ঠিক ঐ জিনিসগুলির পরবর্তী দাম আলোচ্য বৎসরে কত হইয়াছে তাহা বাহির করিতে হয়। মূল-বৎসরের দামের তুলনায় পরবর্তী আলোচ্য বৎসরে সেই সকল জিনিসের দামে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। দামের সেই পরিবর্তনকে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা হিসাবে গণনা করিতে হয়। তাহার পরে এই শতকরা হিসাবগুলি যোগ দিয়া মোট শতকরা পরিবর্তন বাহির করা হইবে। উহাকে দ্রব্যসংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া দামের গড়পড়তা স্তর পাওয়া গেল। এখন এই দুইটি গড়পড়তা দামের স্তরকে তুলনা করিলেই দামস্তর শতকরা কত বাড়িল বা কমিল তাহা পাওয়া যাইবে। মনে কর, 1965 সালে দ্রব্যমূল্যের স্তর কত বৃদ্ধি পাইল তাহা সূচক-সংখ্যার দ্বারা হিসাব করিতে হইবে। 1939 সনকে আমরা মূল বৎসর ধরিয়া লইয়া নিত্য ব্যবহার্য চারিটি জিনিস বাছিয়া লইলাম, যথা—চাউল, ধুতি, কয়লা, চা।

1939 সালের (মূল বৎসর) দাম		1965 সালের (আলোচ্য বৎসর) দাম
চাউল প্রতিমণ	5 টাকা = 100	25 টাকা = 500
ধুতি প্রতি জোড়া	2 টাকা = 100	12 টাকা = 600
কয়লা প্রতি মণ	50 পয়সা = 100	2 টাকা = 400
চা প্রতি পাউণ্ড	1 টাকা = 100	3 টাকা = 300
	400 ÷ 4 = 100	1800 ÷ 4 = 450

স্তুতরাং 1939 সনের তুলনায় 1965 সনের দাম শতকরা 350 ভাগ বৃদ্ধি পাইল (450—100 = 350)। 1939 সনে দামস্তর ছিল 100 সংখ্যা কিন্তু 1965 সনে দামস্তর হইল 450 সংখ্যা। স্তুতরাং শতকরা 350 ভাগ বৃদ্ধি পাইল। এই স্চক-সংখ্যার সাহায্যেই এই তথ্যটি পাওয়া গেল। এইরূপে জানা গেল যে অর্থের মূল্য কতখানি হ্রাস পাইয়াছে।

সূচক-সংখ্যা তৈয়ারির অসুবিধা ঃ স্চক-সংখ্যা তৈয়ারি করিতে কয়েকটি অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং ইহাতে কয়েকটি ত্রুটিও থাকিয়া যায়।

প্রথমত, মূল বৎসর নির্বাচনের অসুবিধা—কাহাকে মূল বৎসর ধরা উচিত? এমন একটি বৎসরকে মূল বৎসর ধরা কর্তব্য, যে-বৎসরটি স্বাভাবিক অর্থাৎ কোন অস্বাভাবিক কারণে (যুদ্ধ, সংকট, মুদ্রাস্ফীতি) জিনিসপত্রের দাম প্রভাবিত হয় নাই। কিন্তু আজকাল এমন স্বাভাবিক বৎসর পাওয়া কঠিন। গত মহাযুদ্ধের পর প্রায় সকল বৎসরই নানাপ্রকার কারণে অস্বাভাবিক হইয়া আছে। 1939 সনে যুদ্ধের পূর্বের বৎসরটা মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল বলিয়া উহাকে মূল বৎসর ধরা হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, কোন্ কোন্ জিনিস নির্বাচন করা হইবে তাহা বলা কঠিন। ব্যবহার অনুযায়ী জিনিস নির্বাচন করিতে হইবে। যেমন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে এমন জিনিস নির্বাচন করিতে হইবে, যাহা তাহারা সর্বদা ব্যবহার করে। এই উদ্দেশ্যে মোটর গাড়িকে লইলে চলিবে না। কারণ, মোটর গাড়ি ব্যবহার করিবার শক্তি তাহাদের নাই। অপর পক্ষে বড়লোকের জীবনযাত্রার মানের পরিমাপের জন্য বিড়ি বা ছোলাভাজা নির্বাচন করিলে চলিবে না। কারণ, বড়লোকেরা ঐ সকল জিনিস ব্যবহারই করে না।

তৃতীয়ত, জিনিসের দাম কত তাহা সঠিকভাবে জানিবার অনেক অসুবিধা আছে। দ্রব্যের পাইকারী দাম একপ্রকার এবং খুচরা দাম আর এক প্রকার। দেশের কোন অঞ্চলে একটি জিনিসের দাম অন্য অঞ্চলের দামের তুলনায় পৃথক্

হইতে পারে। কলিকাতায় চাউলের দাম, বোম্বাই-এর চাউলের দাম অপেক্ষা বেশি বা কম হইতে পারে। এমতাবস্থায় কয়েকটি জায়গার চাউলের দামের গড়পড়তা হিসাব ধরিতে হইবে।

চতুর্থত, নিত্য নূতন জিনিসের ব্যবহার হইতেছে ও পুরাতন জিনিসের ব্যবহার লোপ পাইতেছে। বহুপূর্বে চা-এর ব্যবহার অনেকেই জানিত না। আজকাল তাহা নিত্য-ব্যবহার্য জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ জিনিসের দামের তুলনা করা কঠিন। পূর্বে লোকে খাঁটি ঘি ব্যবহার করিত, আজকাল তাহা পাওয়া কঠিন। সেই স্থলে ডাল্‌দা বনস্পতির ব্যবহার চলিতেছে। এই অবস্থায় এই দুই ঘিয়ের দাম লইয়া কোন তুলনাই চলে না।

কোন কোন জিনিস এক শ্রেণীর লোকেরা বেশি ব্যবহার করে, অন্য শ্রেণীর লোক তাহা ব্যবহার করে না। আয়, অভ্যাস, রুচি ও পরিবেশের পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের ব্যয়-কাঠামো পৃথক্ থাকে। দার্জিলিং-এর শ্রমিকদের জুতা ও গরম কোট ব্যবহার না করিলে চলে না। কিন্তু কলিকাতার শ্রমিকদের তাহা না হইলেও চলে। এইজন্য একই শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার মানও বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পূর্ণ এক স্তরের হয় না। এইজন্যই জিনিস নির্বাচন করা কঠিন।

আবার একই শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় যে, এক একটি জিনিসের দামের পরিবর্তনের এক এক প্রকার গুরুত্ব। সুতরাং, সকল জিনিসের দামের গড় বাহির করিয়া তুলনা করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা। চাউলের প্রয়োজনীয়তা চায়ের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা অনেক বেশি। লোকে চা না খাইলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু চাউল ব্যবহার না করিলে বাঁচা কঠিন। সুতরাং উভয়ের দাম-বৃদ্ধিকে সমান গুরুত্ব দিলে চলিবে না।

গুরুত্বশীল সূচক-সংখ্যা

উভয়ের দাম সমান ভাবে বাড়িলেও লোকের চাউলের জন্য ও চায়ের জন্য ব্যয় সমানভাবে বাড়িবে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আজকাল কোন লোকসমষ্টির ব্যয়ের মধ্যে কোন্ জিনিসের কি গুরুত্ব তাহা বিচার করিয়া প্রত্যেকটি বস্তুকে যথারীতি গুরুত্ব (weight) দিয়া দামস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়। চাউলের দাম পাঁচগুণ বাড়িলে হয়তো তাহা দশগুণ বৃদ্ধি বলিয়া ধরা হয়। আর চায়ের দাম তিনগুণ বাড়িলে তাহা হয়তো তিনগুণই রাখা হইবে, চা-এর তুলনায় চাউল দুইগুণ গুরুত্বপূর্ণ ধরিয়া লইয়া দেশের মধ্যে সেই লোকসমষ্টি কোন্ জিনিসের জন্য কতখানি ব্যয় করে, এবং তাহাদের কোন্ জিনিসের কি তাৎপর্য তাহা বুঝিয়া দ্রব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলে সূচক-সংখ্যা অনেকটা খাঁটি হয়। যত বেশি সংখ্যক জিনিসের মূল্যের গণনা করা যায়, সূচক-সংখ্যা ততই নির্ভুল হয়।

অর্থের মূল্যে বা দামস্তরে কোন্ শক্তি পরিবর্তন ঘটায়ঃ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব (Factors bringing short period changes in the value of Money or the Price Level: The Quantity Theory of Money): অর্থের মূল্য বলিলে বোঝা যায় ইহার বিনিময়ে কিরূপ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাইতেছে। অর্থের এই ক্রয়শক্তি হইল দামস্তরের বিপরীত। দামস্তর বাড়িলে, অর্থাৎ সকল জিনিসপত্রের গড় দাম বাড়িলে অর্থের মূল্য কমে, আবার দামস্তর কমিলে অর্থের মূল্য বা ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পায়। অর্থের মূল্য তাই দামস্তরে উঠানামার উপর নির্ভরশীল।

অর্থের মূল্য ও দামস্তর বিপরীতাভিমুখী

দামস্তরে উঠানামা হয় কেন? প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা বলিতেন যে, দেশে জিনিসপত্রের পরিমাণের সমান অবস্থায় টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া গেলে দামস্তর বাড়িবে, আবার টাকাকড়ির পরিমাণ কমিয়া গেলে দামস্তর কমিয়া যাইবে। একটি সহজ উদাহরণের দ্বারা ইহা বোঝা যাইতে পারে। যেমন ধরা যাউক, দেশে 5টি বিক্রয়যোগ্য জিনিস আছে। আরও দেখা যাউক যে, 40টি টাকা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, ইহাই সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ। 5টি জিনিস কিনিতে এই 40টি টাকা খরচ হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় প্রত্যেকটি জিনিসের পিছনে নিশ্চয় $\frac{40}{5}=8$ টাকা খরচ, অর্থাৎ প্রতিটি দ্রব্যের গড় দাম হইল 8 টাকা। ইহাই হইল দামস্তর। এইরূপ অবস্থায় যদি 5টি জিনিসের পরিমাণ সমান থাকে, কিন্তু সমাজে 60টি টাকা দেখা দেয়, তবে এখন 60টি টাকাই 5টি জিনিসের পিছনে ছুটিবে, প্রত্যেকটি জিনিসের গড় দাম অর্থাৎ দামস্তর বাড়িয়া $\frac{60}{5}=12$ হইবে। অপরপক্ষে যদি জিনিস 5টিই থাকে কিন্তু টাকার যোগান কমিয়া 20টি হয়, তবে দামস্তরও কমিয়া $\frac{20}{5}=4$ হইবে। তাই দেখা যায়, অর্থের পরিমাণে পরিবর্তনের সহিত একই ভাবে দামস্তরে পরিবর্তন আসিবে।

ইহার পরিবর্তন নির্ভর করে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তনের উপর

প্রাচীন ধনবিজ্ঞানী ফিশার এই পরিমাণ-তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। তিনি এই তত্ত্বটিকে একটি সমীকরণের সাহায্যে আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অন্যান্য দ্রব্যের মতই অর্থের মূল্য নির্ভর করে অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগানের উপর। জিনিসপত্র হইতেই অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয়, সমাজে জিনিসপত্র বাড়িলে অর্থের চাহিদা বাড়ে, জিনিসপত্র কমিলে অর্থের চাহিদা কমে। বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের পরিমাণ অর্থাৎ অর্থের জন্য চাহিদাকে T বলিয়া মনে করা যাউক। অর্থের যোগান বলিতে ফিশার নগদ টাকা ও ব্যাঙ্কঋণ উভয়ই বুঝিয়াছেন, কারণ, এই দুই ধরনের অর্থ দিয়াই জিনিস-

ফিশারীয় সমীকরণের ব্যাখ্যা

পত্র কেনাকাটা করা চলে। সমাজে নগদ টাকা যতটুকু ছাড়া হইয়াছে তাহাকে M বলিয়া ধরা হউক। কিন্তু কেবলমাত্র এই M-ই নগদ টাকার যোগান নয়। প্রত্যেকটি টাকা সারাদিনে বা সপ্তাহে বা সারা মাসে গড়ে অনেক টাকার কাজ করে। প্রত্যেক টাকা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড়ে যতবার হাত-বদল হয় তাহাকে বলে নগদ টাকার প্রচলন-বেগ। ইহাকে V বলা হইল। এইরূপে $M \times V = MV$ হইল মোট নগদ টাকার যোগান। ব্যাঙ্কের টাকার চিহ্ন হইল M' এবং এইরূপ ব্যাঙ্কের টাকার প্রচলন-বেগ হইল V', অর্থাৎ $M' \times V' = M'V'$ হইল মোট ব্যাঙ্ক-অর্থের যোগান। উভয়কে যোগ দিলে সমাজে অর্থের মোট যোগান পাওয়া যায়। ধরা যাউক P হইল দামস্তর। ফিশার সমীকরণটি এইভাবে লিখিয়াছেন ঃ

$$P = \frac{MV + M'V'}{T} \text{ অর্থাৎ,}$$

$$\text{দামস্তর} = \frac{\text{নগদ অর্থ ও ব্যাঙ্ক অর্থের যোগফল বা টাকার যোগান}}{\text{জিনিসপত্র বা টাকার চাহিদা}}$$

ফিশারের মতে স্বল্পকালে T, V, M', V'—এইগুলি বদলায় না। সুতরাং একমাত্র M-এ পরিবর্তন হইলেই P-তে পরিবর্তন হইবে। অর্থাৎ সমাজে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বাড়িবে; এবং নগদ টাকার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমিবে। দামস্তর কমিবার তাৎপর্য হইল টাকার মূল্য বাড়িয়া যাওয়া; আবার দামস্তর বাড়িবার তাৎপর্য টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়া।

আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীরা অর্থের পরিমাণতত্ত্বকে সম্পূর্ণ সঠিক বলিয়া মনে করেন না। তাঁরা এই তত্ত্বের অনেক ত্রুটি বাহির করিয়াছেন। প্রথমত, এই তত্ত্ব বলে যে টাকার পরিমাণ যে-হারে বা যতটা পরিবর্তন হইবে, টাকার মূল্যেও সমহারে বা ততটা-ই পরিবর্তন আসিবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ ঘটে না। কারণ, M বদলাইলেই M', V', T এবং V কিছু কিছু বদলাইয়া যায়। ফলে M যে-হারে বদলাইল P ঠিক সেই অনুপাতে বদলায় না। দ্বিতীয়ত, এই সমীকরণের দ্বারা টাকার পরিমাণ (M) ও দামস্তরের (P) মধ্যে সম্পর্কটি খোলাখুলি জানা যায় না। এই তত্ত্ব শুধু বলে যে M বাড়িলে P বাড়ে, আবার M কমিলে P কমে। কিন্তু কেন, কোন্ পথে, কোন্ কোন্ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে M-এ পরিবর্তনের ফল P পর্যন্ত পৌঁছায় তাহা আমরা এই তত্ত্ব হইতে জানিতে পারি না। তাই কেইন্‌স এই তত্ত্বকে সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা "কার্যকারণ শৃঙ্খলের অনেক গ্রন্থিকে ঢাকিয়া রাখে" (hides many links in the chain of causation)। সর্বোপরি, বাস্তব

পরিমাণ তত্ত্বের সমালোচনা

জগতে অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে যে, দেশে টাকার পরিমাণ বেশি থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে নিরাশভাব বজায় আছে, উৎপাদন নাই, চাকুরী নাই, লোকের আয় নাই, দাম দিয়া জিনিসপত্র কেনার মত পয়সা লোকের হাতে নাই। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়াইলেও লোকে অলসভাবে সেই টাকা আলমারিতে আটকাইয়া (hoarding) রাখিতে পারে। ফলে ঐ বাড়তি টাকা দ্রব্যের বাজারে চাপ না-ও সৃষ্টি করিতে পারে। এই সকল কারণে আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীরা একমাত্র টাকার পরিমাণে পরিবর্তনই টাকার মূল্যে বা দামস্তরে পরিবর্তন আনে তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তনই (দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বদলাইয়া) প্রধানত দামস্তরে পরিবর্তন আনে।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation): দেশে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ার দরুন যদি দেশে বেশির ভাগ জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইতে থাকে, অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তবে সেই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

সংজ্ঞা

অন্যান্য অনেক কারণে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়া গেলে, শ্রমদক্ষতা হ্রাস পাইলে, উৎপাদনের খরচ বাড়িয়া যাইতে পারে। যুদ্ধের জন্য বা অন্য কোন কারণে জিনিসপত্রের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলেও দামস্তর বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল কারণে দামস্তর বৃদ্ধি হইলে তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে না। শুধু তাহাই নহে।

অন্যান্য কারণে দামস্তর বাড়িতে পারে

অর্থের পরিমাণ বাড়িলেই যে দামস্তর সর্বদা বাড়িবে, ইহা সত্য নহে। অর্থের বা মুদ্রার পরিমাণ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যদি জিনিসপত্রের উৎপাদন বাড়িয়া যায় তাহা হইলে দামস্তর বাড়িবে না। কারণ, টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা বাড়িল তাহা দিয়া অধিক পরিমাণ জিনিসপত্র কেনা সম্ভব হইল। বেশি জিনিসপত্র পাওয়া গেল বলিয়া জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে পারিল না। সুতরাং, কেবলমাত্র মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলেই দামস্তর বাড়ে না, মুদ্রাস্ফীতিও ঘটে না।

টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দামস্তর বাড়িতে পারে

যদি অর্থের পরিমাণ বাড়ে, অথচ উহার বিনিময়ে ক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র না বাড়ে, তবে বেশি পরিমাণ টাকা দিয়া লোকেরা আগের পরিমাণ জিনিসপত্রই কিনিতে চাহিবে। দেশে জিনিসপত্র বাড়ে নাই, কিন্তু লোকের হাতে টাকা বাড়িয়া গিয়াছে, এইরূপ অবস্থায় তাহারা সেই দ্রব্যসামগ্রী-গুলি পাইবার জন্য আগের তুলনায় বেশি টাকা দিতে চাহিবে, এইরূপে প্রায় সকল জিনিসের দাম বাড়িবে এবং ফলে দামস্তর

সমান পরিমাণ জিনিসের জন্য বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইতে থাকিলে দামস্তর বাড়ে

বৃদ্ধি পাইবে। দেশে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলে উহা লোকের হাতে আয় হিসাবে যায়, অর্থাৎ লোকের আর্থিক আয় আগের তুলনায় বাড়ে। আয় বাড়িলেই তাহারা কিছুটা ব্যয় বাড়াইয়া দিতে চায়। কিন্তু আয়ের তুলনায় জিনিসপত্র বেশি না পাওয়ায়, সেই পরিমাণ জিনিসই কিনিবার জন্য লোকে বেশি চাপ দিতে থাকে, উহাদের দাম বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জিনিসপত্রের যোগান বৃদ্ধির তুলনায় যখন লোকেদের ব্যয় বেশি পরিমাণে বাড়িতে চায় তখন দামস্তর বাড়ে—এই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

দেশে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রাস্ফীতি শুরু হইয়া যায় না। অর্থের পরিমাণ বাড়িলে (সুদের হার কমিয়া যাওয়ায়), দেশের ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের উৎপাদন বাড়াইতে থাকে। তাই তখনই জিনিসপত্রের দাম বাড়ে না। কিন্তু উৎপাদন বাড়িতে থাকায় ক্রমে দেশের সকল উপাদান নিযুক্ত হইয়া যায়; সকল উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ ঘটে বা পূর্ণ কর্মসংস্থান হয়। তাহার পরেও টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন আর বাড়ানো যায় না, কারণ, দেশে আর বেকার উপাদান নাই। উপাদান পাওয়া না গেলে কি করিয়া উৎপাদন বাড়ানো যাইবে? তখন দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে থাকে; কারণ, টাকার পরিমাণ বাড়িতেছে কিন্তু জিনিসপত্রের পরিমাণ সমান আছে, বা ততটা বাড়িতেছে না। এই অবস্থাকেই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) বলে।*

পূর্ণ কর্মসংস্থানের পরে অর্থের পরিমাণ বাড়িলে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়

মুদ্রাস্ফীতি দুইভাবে ঘটিতে পারে; ঘাট্‌তি ব্যয়ের চাপে, অথবা, মজুরি বৃদ্ধির চাপে। যুদ্ধের প্রয়োজন অথবা আর্থনীতিক পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য যদি সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তখন অনেক সময়ে নূতন করের সাহায্যে বাজেটের ঘাট্‌তি পূরণ করা যায় না। তখন সরকার নোট ছাপাইয়া নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া এই

* অনেক সময় দেশে সকল উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ ঘটিবার আগেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যে-সকল দেশ শিল্পবাণিজ্যে অনুন্নত, সেই সকল দেশে বেশি পরিমাণ শ্রমিক থাকে, কিন্তু মূলধন বা যন্ত্রপাতি কম থাকে। টাকার পরিমাণ বাড়াইলেও ব্যবসায়ীরা যন্ত্রপাতি, বেশি দরকারী কাঁচামাল বা দক্ষ শ্রমিকের অভাবে উৎপাদন বাড়াইতে পারিতেছে না, এইরূপ ঘটিতে পারে। শ্রমিকেরা চাকরি পায় নাই, উহারা বেকার বসিয়া আছে, অথচ যন্ত্রপাতির পূর্ণনিয়োগ হইয়া গিয়াছে বলিয়া জিনিসপত্র বাড়ানো যাইতেছে না। তখন অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরেই দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। ইহাকে ভুয়া মুদ্রাস্ফীতি (False Inflation) বা আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (Partial Inflation) বলে। ভারতবর্ষে এখন এই মুদ্রাস্ফীতি দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশে যন্ত্রপাতির অভাবে জিনিসপত্রের উৎপাদন বাড়ানো যাইতেছে না, অনেক লোক বেকার হইয়া আছে। পরিকল্পনার কাজে সরকারী খরচ বৃদ্ধি হওয়ায় লোকের হাতে আর্থিক আয় বাড়িতেছে, কিন্তু তাহার ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। উৎপাদন বাড়ানোই এইরূপ অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি কমাইবার একমাত্র উপায়।

ঘাট্‌তি পূরণ করিতে পারে। তাহাতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে ও দামস্তর বাড়ে। অনেক সময়ে দামস্তর অল্প একটু বাড়িলে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া ধর্মঘট করিয়া বা ভয় দেখাইয়া মজুরি বাড়াইয়া লয়। তাহাতে উৎপাদনব্যয় বাড়ে, ফলে দামস্তর আরও বাড়ে। দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য বাড়িবার দরুন আবার মজুরেরা মজুরি বাড়াইবার জন্য চাপ দেয়। পুনরায় মজুরি বাড়াইলে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে ও মূল্য বৃদ্ধি হয়। এইভাবে একটা দুষ্টচক্রের (vicious circle) সৃষ্টি হয়।

ঘাট্‌তির চাপ বা মজুরির চাপ

বেশি মুদ্রা চালু করার ফলে লোকের আয় বাড়ে। লোকের আয় বাড়িলেই বেশি ব্যয় করিবার ঝোঁক হয়। কিন্তু উৎপাদন যদি সঙ্গে সঙ্গে না বাড়ে তবে জিনিসের যোগান একই থাকে। কাজেই জিনিসের দাম বাড়ে। সুতরাং জিনিসের যোগানের তুলনায় সমাজের আয় যখন বেশি পরিমাণে বাড়িতে থাকে, তখনই মুদ্রাস্ফীতি হইয়া থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল (The Effects of Inflation): মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে এমন কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ হয়, যাহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ক্রমেই বাড়িতে থাকে। একবার মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে তাহা কমানো কঠিন। জনসাধারণ যখন দেখে যে মুদ্রাস্ফীতির জন্য অর্থের মূল্য কমিয়া আসিতেছে তখন তাহারা টাকা হাতে রাখিতে চাহিবে না। টাকা হাতে রাখিয়া দিলেও ইহার মূল্য কমিলে ক্ষতি। সুতরাং তাহারা মুদ্রা না ধরিয়া রাখিয়া মূল্যবান সামগ্রী ক্রয় করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। জনসাধারণ যতই অধিক ব্যয় করিয়া আসল দ্রব্যসামগ্রী হাতে রাখিতে চেষ্টা করিবে ততই তাহাদের ব্যয় বেশি হইবে, জিনিসের যোগানও কমিয়া আসিবে* এবং এই জন্য দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। সরকার দেখিবেন যে, তাঁহাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হইতেছে। সুতরাং বাজেটে ঘাট্‌তি হইবে। এই ঘাট্‌তি পূরণের জন্য তাঁহারা অধিক পরিমাণে নোট ছাপাইবেন। এই অতিরিক্ত নোট ছাপাইলে অসুবিধা আরও বাড়িবে। ব্যাঙ্কে লোকে বেশি টাকা আমানত রাখিবে। সুতরাং কর্জ-প্রার্থীদের ব্যাঙ্ক বেশি করিয়া কর্জ দিবে। অধিক ঋণ পাইলে ব্যয়ের মাত্রাও বাড়িবে, অধিক ব্যয় হইবে, মূল্যস্তরও বাড়িতে থাকিবে। মূল্যস্তর বাড়িলে লোকে আরও বেশি করিয়া কর্জ করিতে বাধ্য হইবে, কারণ, জীবন-যাত্রার খরচ বাড়িবে। এই ভাবে দামস্তর ও মুদ্রার পরিমাণ পরস্পরকে তাড়া করিয়া

সরকারী বাজেটের উপর প্রভাব

* টাকার প্রচলন-বেগও বাড়িবে।

চলিবে সুতরাং মুদ্রা বাড়াইলে মূল্য বাড়িবে এবং মূল্য বাড়িলে মুদ্রা বাড়িবে। মুদ্রাস্ফীতির ঘূর্ণিগতি (the spiral of inflation) দেখা দিবে।

মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে আর্থনীতিক কার্য়কলাপে নানা প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। উৎপাদনের প্রচেষ্টা নির্ভর করে উৎপাদনকারীর মুনাফার প্রত্যাশার উপরে। অধিক মুনাফার আশা থাকিলে উৎপাদনের চেষ্টা বাড়ে এবং মোট উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী যদি মুনাফা না হয়, তবে উদ্যোক্তারা উৎপাদন কমাইয়া দিবে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দামস্তর বাড়িলে মুনাফাও বাড়িয়া যায়। ইহাতে উৎপাদনকারীরা বেশি উৎপাদনে উৎসাহ পায়। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। যখন দেশের বেকার শ্রমিকদল ও অব্যবহৃত কাঁচামাল পূর্ণপরিমাণে নিযুক্ত হইয়া যায়, তখন আর উৎপাদন ততটা বাড়ে না। সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতির গোড়ার দিকে উৎপাদন তাড়াতাড়ি বাড়ে, পরে আর তেমন মুনাফা হয় না, উৎপাদনের গতিও কমিয়া আসে। ব্যবসায়ীরা হঠাৎ বেশি নিরাশ হইয়া পড়ে, উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয়, দেশে ব্যবসায় সঙ্কট দেখা দেয়।

উৎপাদন বাড়ে ও উদ্যোক্তার মুনাফা বৃদ্ধি পায়

মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজে একশ্রেণীর লোকের হাত হইতে অন্য শ্রেণীর লোকের হাতে উপার্জন চলিয়া যায়। একদলের উপার্জন বাড়ে এবং আর এক দলের কমে। দেশের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের আর্থিক উপার্জন স্থায়ী। তাহাদের উপার্জন সহসা পরিবর্তন হয় না। মুদ্রামূল্য পরিবর্তন হইলেও তাহাদের ব্যক্তিগত আর্থিক আয় সমান থাকে। মূল্য বৃদ্ধির ফলে এই শ্রেণীর লোকেদের যথেষ্ট দুর্দশা হয়। কারণ, পূর্বের ন্যায় সমান টাকা পাইলেও সেই টাকার বদলে তাহারা জিনিসপত্র কম পায়। অর্থাৎ তাহাদের আসল আয় হ্রাস পায়। অধিকাংশ মজুর এবং মাসিক বেতনের চাকরিওয়ালার এই অবস্থা হইবার আশঙ্কা। যদিও আন্দোলন করিয়া তাহারা কিছুটা বেতন বৃদ্ধি করাইতে পারে, কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া যে হারে দ্রব্যমূল্য বাড়ে, তাহাদের আর্থিক আয় তত বেশি হারে কখনই বাড়ে না। যাহারা খাজনা পাইয়া থাকে, তাহাদের আয়ও প্রায় স্থায়ী। খাজনার চুক্তির মেয়াদ শেষ না হইলে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতিতে তাহাদের দুর্গতি হয়। যাহারা নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়, তাহাদেরও একই দশা। দ্রব্যমূল্য বাড়িলেও সুদ বাড়ানো সম্ভব হয় না। দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়ে। সুতরাং তাহারা যত ধনী হয়, শ্রমিকেরা তত দরিদ্র হয়। এই ভাবেই সমাজের সম্পদ্ এক শ্রেণীর হাত হইতে অপর শ্রেণীর হাতে চলিয়া যায়।

স্থায়ী ও নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদের ক্ষতি হয়

আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পায়

ভারতের মুদ্রাস্ফীতি (Inflation in India): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে। এই মুদ্রাস্ফীতিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি ও যুদ্ধোত্তর যুগের মুদ্রাস্ফীতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার কিছুকালের মধ্যেই ভারতের মুদ্রাস্ফীতি আরম্ভ হয়। দুই কারণে যুদ্ধের সময়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, (ক) হঠাৎ অর্থের যোগান বৃদ্ধি, (খ) দ্রব্যাদির যোগান হ্রাস। 1939 সালে ভারতবর্ষে কাগজী নোট ছিল 169 কোটি টাকার, তাহা বাড়িয়া 1945 সালে 1942 কোটি টাকার নোটের প্রচলন হয়। 1939 সালে পাইকারী দামের সূচক-সংখ্যা 100 ধরিলে, 1948 সালে তাহা বাড়িয়া 382·2 সংখ্যায় আসিয়া পৌঁছিল। যুদ্ধের সময় টাকাকড়ির প্রচলন-বেগও অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল এবং চল্‌তি আমানতও বিশেষ বাড়িয়াছিল। অপর পক্ষে, যুদ্ধের জন্য উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হওয়া, শ্রমিক-বিক্ষোভ, যন্ত্রপাতির অভাব, পরিবহণের অভাব, আমদানির সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নানা কারণে ভোগ্য পণ্যদ্রব্যের যোগান কমিয়া গেল। এই দুই কারণেই দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া গেল এবং দেশে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিল। তাহাতে যুদ্ধের সময়ে জনসাধারণ বহু দুর্দশা ভোগ করিল।

যুদ্ধের সময় কেন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে ?

যুদ্ধোত্তর যুগে নানা কারণে এই মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধির দিকে গিয়াছে। যুদ্ধের পরেও অর্থের পরিমাণ বাড়িতেই লাগিল এবং দ্রব্যাদির পরিমাণ সেই তুলনায় বৃদ্ধি পাইল না। নোট ছাপাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ও প্রাদেশিক সরকারের বাজেটের ঘাটতি পূরণ করা হইয়াছিল। অপর দিকে উৎপাদনের পরিমাণ তেমন বাড়ে নাই। যন্ত্রপাতির অভাব, শ্রমিক ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পরিবহন ব্যবস্থায় গোলযোগ, দেশবিভাগের ফলে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের সরবরাহ হ্রাস প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে উৎপাদন ততটা বাড়িতে পারিল না। সরকার খাদ্যশস্যের উপর নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লইলেন। তাহাতে দামস্তর আরও বাড়িয়া গেল। অবশেষে, সরকার নানা প্রকারে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা স্থগিত থাকে।

যুদ্ধের পর অবস্থা

কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় দামস্তরে বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছে। যদিও ইহা প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকার নানা প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি শীঘ্রই মুদ্রাস্ফীতি দূর হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। আর্থনীতিক পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য ঘাটতি অর্থসংস্থানের বিশেষ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রায় 360 কোটি টাকার মত ঘাটতি অর্থসংস্থান করা

বর্তমানে ঘাটতি ব্যয়ের জন্য

হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও প্রায় 1200 কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতে এই ঘাটতি ব্যয় হইয়াছে প্রায় 550 কোটি টাকা। ইহাতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল ও ভারী শিল্পের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। ফলে দেশে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানা, লোহা, সিমেন্ট প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদনে রাষ্ট্র প্রভূত পরিমাণে ব্যয় করিয়াছিল। লোকের হাতে আয় বৃদ্ধি পাইতেছিল, কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের যোগান ততটা বাড়ে নাই। আমাদের দেশ অপূর্ণোন্নত, এখানে লোকের হাতে গড়পড়তা আয় খুব কম। তাই আয় বাড়িলে এদেশে বর্ধিত আয়ের বেশির ভাগই খাদ্য, বস্ত্র বা ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় হইতে চায়। তাহা ছাড়া, মূল ও ভারী শিল্পগুলি এমনই যাহাতে টাকা খাটাইলে খুব তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায় না, কারণ ঐ শিল্পজাত দ্রব্য দ্বারা ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন অনেক দিন পরে বাড়িবে। এই কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যেই মুদ্রাস্ফীতির বীজ নিহিত ছিল বলিয়া মনে করা চলে।

তৃতীয় পরিকল্পনাতেও দামস্তর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পরিকল্পনার তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যের দাম অতি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার অনেক কারণ আছে, কোন একটি কারণে এতটা দাম বৃদ্ধি ঘটে নাই। দেশরক্ষা ও উন্নয়ন—এই দুই উদ্দেশ্যে টাকার পরিমাণ বাড়িয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বিশেষ বাড়ে নাই, বরং কিছুটা হ্রাস-ই পাইয়াছে। যাহাদের হাতে প্রচুর টাকা পৌঁছাইয়াছে তাহারা শিল্প ও কলকারখানায় সেই টাকা বিশেষ খাটায় না। ওই টাকা দিয়া প্রধানত ফাট্‌কা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তাহারা খাদ্যশস্য মজুত করিয়া রাখিয়াছে। ধনী চাষীরাও খাদ্যশস্য বাজারে বিক্রয় না করিয়া উঁচু দামের আশায় গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছে। অতিরিক্ত সরকারী অর্থব্যয় এবং ব্যবসায়ীদের অত্যধিক মুনাফা-লাভ মিলিয়া দামস্তরে এইরূপ ঊর্ধ্বগতির ঘূর্ণাবর্ত (upward spiral) দেখা দিয়াছে। ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশে খাদ্যের দাম দেশের সমগ্র দামস্তরের ভরকেন্দ্র। খাদ্যের দাম বাড়িলে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর দামও বৃদ্ধি পায়। তাই খাদ্যের দামস্তর নিম্নে রাখা অতীব প্রয়োজনীয়। সরকার তাই খাদ্য দ্রব্যের রাষ্ট্রীয়করণ করার কথা চিন্তা করিতেছেন এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ঘাট্‌তি অঞ্চলে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলিতেছেন। উৎপাদনবৃদ্ধিই মুদ্রাস্ফীতি রোধের প্রধান উপায়। তাই সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কথা অধিকতর জোরের সহিত বলিতেছেন। ক্রেতা সমবায় সমিতির মাধ্যমে বণ্টন ও উৎপাদক সমবায় সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন—ইহাই সংকট ত্রাণের পথ।

ভারতে এই মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বহুপ্রকার। দেশের ধনিকশ্রেণী আরও ধনী হইয়াছে। গরীবশ্রেণী আরও গরীব হইয়াছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাইয়াছে। পরিকল্পনার ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকল উপকরণের দাম বাড়িয়া গিয়াছে, তাই কোন একটি কার্যসূচীর জন্য যে-ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছিল, উহাতে আর সেই কাজ করা যাইতেছে না। ফলে অনেক কাজ বাদ দিতে হইতেছে।

এই অভিজ্ঞতা স্মরণে রাখিয়া আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা করা হইতেছে। এই পরিকল্পনা আরও বড়। এই পাঁচ বছরে আরও বেশি টাকা লোকের হাতে আয় হিসাবে পৌঁছিবে। এই পরিকল্পনাতেও মূল ও ভারী শিল্পের প্রসারের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। তাই এই সময়ে মুদ্রাস্ফীতি কমিবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে। সরকার তাই চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে লোকে বর্ধিত আয়ের বেশির ভাগ ভোগব্যয় না করে। ঋণ লইয়া, কর বসাইয়া এই টাকা লোকের হাত হইতে তুলিয়া লওয়ার চেষ্টা সরকার করিতেছেন; দাম নিয়ন্ত্রণ, ফাট্‌কাবাজি নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতির সাহায্যে মূল্যস্তর রক্ষা (maintaining the price line) করার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিতেছেন।

Questions to be discussed

1. Define Money and discuss the difficulties of Barter.

অর্থের সংজ্ঞা লিখ। বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি কি কি?

2. What are the functions of Money?

অর্থের কার্যাবলী কি?

3. Discuss the advantages and disadvantages of Paper Money.

কাগজী মুদ্রার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

4. What is value of money? What is its relation to price level?

অর্থের মূল্য বলিতে কি বোঝায়? মূল্যস্তরের সহিত ইহার সম্পর্ক কি?

5. What is an Index number? Show how to construct an Index number.

সূচক-সংখ্যা কাহাকে বলে? সূচক-সংখ্যা কিভাবে তৈয়ারী করিতে হয় দেখাও।

6. What are the difficulties of construction of an Index Number? Why is it not fully correct?

সূচকসংখ্যা তৈয়ারীর অসুবিধাসমূহ কি কি? এই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ সঠিক পদ্ধতি বলা চলে না কেন?

7. Why are there short period changes in the Value of Money ?

Or, Discuss Fisher's Quantity Equation or Quantity Theory of Money.

মুদ্রামূল্যে কেন স্বল্পকালীন পরিবর্তন আসে? ফিশারীয় পরিমাণতত্ত্ব বা অর্থের পরিমাণতত্ত্ব আলোচনা কর।

8. What is meant by the term 'value of money' ? How is the 'value of money' related to the Quantity of money ?

মুদ্রামূল্য বলিতে কি বোঝায়? অর্থের পরিমাণের সঙ্গে মুদ্রামূল্যের সম্পর্ক কি?

9. What is inflation ? Why inflation arises ?

মুদ্রাস্ফীতি কি? মুদ্রাস্ফীতি কেন ঘটে?

10. Discuss the effects of inflation on different classes of society. How does inflation affect businessmen and wage-earners ?

বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর মুদ্রাস্ফীতির কিরূপ প্রভাব ঘটে? ব্যবসায়ী ও বেতন-ভোগী ব্যক্তিদের মুদ্রাস্ফীতি কিভাবে প্রভাবিত করে?

11. How are changes in the value of Money measured ? What are the effects of such change ?

মুদ্রামূল্যে পরিবর্তন কিভাবে পরিমাপ করা যায়? এই পরিবর্তনের প্রভাবগুলি কি কি?

12. Discuss the causes of present inflation in India.

ভারতে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ আলোচনা কর।

ঋণব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কব্যবস্থা

Credit and Banking

ঋণপ্রথা ও ঋণপত্র (Credit system and Credit Instrument)

কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি টাকার লেনদেন হয় তবে তাহাকে নগদ লেনদেন (Cash Transaction) বলা হয়। যদি ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়ের সময়েই দ্রব্যের মূল্য হিসাবে নগদ টাকা দিতে রাজি না হয়, কিছুদিন পরে দিবে এইরূপ আশ্বাস দেয় এবং তাহার এই অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখিয়া বিক্রেতা যদি দ্রব্য বিক্রয় করে, তবে তাহাকে ঋণভিত্তিক লেনদেন (Credit Transaction) বলা যাইতে পারে। এই ঋণভিত্তিক লেনদেনের মূল হইল আস্থা ও বিশ্বাস। ভবিষ্যতে ঋণগ্রহীতাদের নগদ অর্থ দিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর ঋণদাতার আস্থা ও বিশ্বাস এই প্রকার ঋণভিত্তিক লেনদেনের মূল ভিত্তি।

ঋণপ্রথা

কি উদ্দেশ্যে কেমনভাবে এই ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে সেই অনুযায়ী ইহাকে ভোগোদ্দেশ্যী ঋণ এবং উৎপাদনী ঋণ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যক্তির ভোগের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র ক্রয়ের দরুন যখন ঋণ গ্রহণ করা হয় তখন তাহা ভোগোদ্দেশ্যী-ঋণ এবং নূতন বা বর্ধিত উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত হইলে তাহাকে উৎপাদনী-ঋণ বলা চলে।

ঋণপত্র (Credit Instruments)

যে-ব্যক্তি ঋণগ্রহণ করে সে ভবিষ্যতে নগদ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতিসমূহ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দেয়, এই সকল বিভিন্ন প্রকার চুক্তিপত্রকে ঋণপত্র (Credit instruments) বলা হইয়া থাকে। সমাজে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র প্রচলিত আছে, যেমন—কাগজী নোট, চেক, হুণ্ডি বা বিনিময়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ ইত্যাদি। বর্তমানের বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন ও জটিল সম্পর্কজালে ঋণের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য।

ঋণপত্র

আধুনিক সমাজে বহু প্রকারের ঋণপত্র দেখিতে পাওয়া যায়। (ক) প্রমিসরি নোট, (খ) চেক, (গ) বিনিময়-বিল, (ঘ) ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ প্রভৃতি। কোন নির্দিষ্ট তারিখে বা চাহিদা অনুযায়ী নগদ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকিলে সেইরূপ ঋণপত্রকে প্রমিসরি নোট বলা হয়। পূর্বে কোন ব্যক্তি, কোন ব্যাঙ্ক বা সরকার নিজে এইরূপ প্রমিসরি নোট চালু করিতে পারিত। প্রমিসরি নোটের প্রচলনকারীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস থাকিলে এই সকল নোট এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হইতে থাকে এবং

বহুপ্রকার ঋণপত্র

ইহার সহায়তায় অর্থনৈতিক লেনদেন ঘটে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা গভর্ণমেণ্ট এইরূপ নোট চালাইবার অধিকার নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। (খ) আমানতকারী ব্যক্তি কর্তৃক কাহাকেও অর্থপ্রদান করিবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয়। এই চেকগুলি হস্তান্তরিত হইয়া অর্থনৈতিক লেনদেনে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে। এই চেকের সহিত কাগজী নোটের পার্থক্য আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার কর্তৃক প্রচলিত নোটগুলি হইল আইনসিদ্ধ মুদ্রা, চেক কখনই আইনসিদ্ধ নহে; ইহা গ্রহণ করিতে কেহ আইনত বাধ্য নহে। (গ) দ্রব্যের ক্রেতার উপরে দ্রব্যের-বিক্রেতা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার নির্দেশ দিয়া যে পত্র দেয় তাহাকে বিনিময় বিল বলে। সাধারণত, ক্রেতা 30 দিন, 60 দিন বা 90 দিন পরে বিক্রেতাকে অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নিদিষ্ট সময়ের পূবে দ্রব্যের বিক্রেতা ঐ বিল ভাঙাইতে পারে অথবা বন্ধক দিয়া অর্থ পাইতে পারে। (ঘ) যখন কোন ব্যাঙ্ক নিজের অপর কোন শাখাকে বা অপর কোন ব্যাঙ্ককে কিছু অর্থ দিবার জন্য নিদেশ দেয় তখন সেই নির্দেশ-নামাকে ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ বলে।

ঋণব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages & Disadvantages of Credit): ঋণব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল, ইহার ফলে নগদ টাকা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়। প্রভূত পরিমাণ অর্থ বহনের ও লেনদেনের ঝুঁকি এবং অসুবিধা থাকে না। সমাজে ব্যবসায় বাণিজ্য ও উৎপাদন সকল কিছু ঋণপ্রথার দ্বারা উপকৃত হয়; স্থান ও কালের মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসাবে ঋণপ্রথা কাজ করে। ধাতু ও ধাতব অর্থের বদলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ঋণপত্র দ্বারা লেনদেন অনেক বেশি সুবিধাজনক।

ঋণপ্রথার বিশেষ বিপদ ও ক্রটি হইল, ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা অধিক থাকে। ব্যাঙ্ক ঋণদানের পরিমাণ বাড়াইলে বা সরকার অধিক পরিমাণে প্রমিসরি নোটের প্রচলন করিলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে। হ'ট্রে বলেন যে, ব্যবসায়-সংকট বা বাণিজ্য চক্র সৃষ্টিতে এই প্রকার ঋণপ্রথাই প্রধানত দায়ী, ব্যাঙ্ক ঋণের সংকোচন ও প্রসারণই এইরূপ ব্যবসায়-চক্র ঘটাইয়া থাকে। ঋণপ্রথার ফলে সমাজে অনির্দিষ্টতা আসিয়া পড়ে; শেয়ার বাজারে বা দ্রব্যের বাজারে ফাটকা ব্যবসায় শুরু হইতে পারে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বা বৃহৎ একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে।

ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে (What is a Bank): ঋণ বা ধার লইয়া যে-সংগঠনের ব্যবসায় পরিচালিত হয় সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলা হয়। ব্যাঙ্ক

বলিতে বুঝি—'ধারের কারবারী' (Dealer in credit)। কারণ, এই ব্যবসার মূল কথাই হইল একদিকে সাধারণের নিকট হইতে টাকা-কড়ি জমা রাখা ও অপরদিকে যাহাদের প্রয়োজন আছে, বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ীদিগকে ঋণ দেওয়া।

ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে

এই উভয়বিধ কার্যের ভিত্তি হইল আস্থা। গচ্ছিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে এবং প্রয়োজন মত ফিরিয়া পাওয়া যাইবে এই ভরসা যদি সাধারণের না থাকিত তাহা হইলে তাহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিত না। অপরদিকে ব্যাঙ্কও প্রদত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার নিশ্চয়তা না পাইলে ঋণ দিবে না। লোকে ব্যাঙ্কে যাহাতে অর্থ গচ্ছিত রাখে সেই জন্য ব্যাঙ্ক সাধারণত কিছু সুদ দিয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ দেয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হারে সুদ আদায় করিয়া থাকে ঋণগ্রহণকারীদের নিকট হইতে। ব্যাঙ্কের নিজস্ব মুনাফা আসে এই দুই-এর পার্থক্য হইতে। আর ব্যাঙ্কব্যবসায়ী সর্বদাই মনে রাখে যে ব্যাঙ্কের উপর গচ্ছিতকারীদের আস্থা যদি একবার নষ্ট হইয়া যায়, তবে ব্যাঙ্ক চালু রাখা অসম্ভব। কাজে কাজেই ব্যাঙ্ক উপযুক্ত জামিন (Security) না রাখিয়া ঋণ দেয় না; সাধারণত স্বল্পমেয়াদী ঋণে টাকা লগ্নী করে। শিল্প, বাণিজ্য, সরকারী ঋণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মেয়াদের ঋণে ব্যাঙ্ক এমন ভাবে অর্থ লগ্নী করে যে, (১) একদিকে যে কোন মুহূর্তে সে গচ্ছিতকারীদের চাহিদা মিটাইবার জন্য ওই লগ্নী-গুলিকে দ্রুত নগদ টাকায় পরিণত করিতে পারে, আবার (২) সেই লগ্নীগুলি হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুদ আদায় করিতে পারে। কাহাদের নিকট হইতে আমানত জমা রাখা হইতেছে এবং কাহাদের মধ্যে টাকা ধার দেওয়া হইতেছে সেই বিষয়ে নানা পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্য অনুযায়ী দেশে বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্ক দেখা যায়। যেমন, পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র সরকারী ঋণপত্রে টাকা লগ্নী করে; শিল্পব্যাঙ্ক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী ঋণের চাহিদা মেটায়; কৃষিসমবায় ব্যাঙ্ক শুধু সমবায়ের সদস্য-কৃষকদের মধ্যেই ঋণ বণ্টন করে। ইহাদের অর্থসংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যেও পার্থক্য আছে। কিন্তু বর্তমান আলোচনাকে আমরা নিবদ্ধ রাখিব দুই ধরনের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে। আধুনিক শিল্পোন্নত দেশে ব্যাঙ্ক বলিতে প্রধানত বুঝায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে (Commercial Bank)। আর দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থার মণি হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank)।

ব্যাঙ্কের কাজ (Functions of a Bank): সাধারণের নিকট হইতে অর্থ জমা রাখা হইল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রথম কাজ। এই গচ্ছিত বা আমানত তিন

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের

ধরনের হইতে পারে,—চলতি, স্থায়ী ও সঞ্চয়ী (Current Deposit, Fixed Deposit and Savings Deposit)।

স্থায়ী আমানতের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা থাকে। ব্যাঙ্কও ইহার জন্য সুদ দেয়। টাকা তুলিতে গেলে নোটিশ দিতে হয়। চলতি আমানতের টাকা বিনা নোটিশেই যে কোন সময়ে উঠাইয়া লওয়া যায়। চলতি আমানতের জন্য সুদ দেওয়া হয় না, দিলেও তাহা খুবই সামান্য। সঞ্চয়ী আমানতের টাকাও ইচ্ছামত তোলা যায় না; বিশেষ নিয়ম কানুন জানিতে হয়। সুদের হারও স্থায়ী আমানত অপেক্ষা কম হয়।

ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় কাজ ধার দেওয়া। সোনা, সরকারী ঋণপত্র, ভাল ভাল কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতি জামিন রাখিয়া ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়; অনেক সময় কাঁচামালের জামিনেও ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিয়া থাকে।

তৃতীয়ত, ব্যাঙ্ক অর্থ সৃষ্টি করে। পূর্বে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক নিজস্ব ব্যাঙ্ক-নোট ছাপাইত। চাহিবামাত্র মুদ্রিত অঙ্কের অর্থ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে দাবিদারকে দিবার প্রতিশ্রুতি-পত্রই হইল ব্যাঙ্কনোট। কিন্তু ক্রমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের এই অধিকার বাতিল করা হয় এবং নোট ছাপাইবার একমাত্র দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত করা হয়। এখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অর্থ সৃষ্টি করে অন্য উপায়ে। যখন কেহ ব্যাঙ্ক হইতে ধার গ্রহণ করে ব্যাঙ্ক তখন তাহাকে সোজাসুজি টাকা দেয় না। সেই টাকা তাহার নামে ব্যাঙ্কের খাতায় আমানত দেখায়। ঋণ গ্রহণকারী তখন সেই আমানত হইতে টাকা তুলিয়া ব্যয় করে। এইভাবে অর্থ সৃষ্টি হয়।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক হুণ্ডি (Bill of Exchange) ভাঙ্গাইয়া দেশ দেশান্তরের ব্যবসায়ের পথ সুগম করে। এদেশের ব্যবসায়ী ওদেশে মাল পাঠাইয়াছে; তিনমাসের মধ্যেই ওদেশের ব্যবসায়ী জিনিস পাইয়া দাম পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে এদেশের ব্যবসায়ীকে ঐ প্রাপ্য অর্থের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইলে প্রভূত ক্ষতি। কাজেই অপর দেশের ব্যবসায়ী যে বিলটি তিনমাস পরে চুকাইয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছে, এখানকার ব্যবসায়ী সেই বিলটি ব্যাঙ্ককে বিক্রয় করিল। ব্যাঙ্ক এই সময়কার প্রাপ্য সুদ কাটিয়া রাখিয়া ব্যবসায়ীকে প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দিল এবং নিজে সময় উত্তীর্ণ হইলে টাকা আদায় করিয়া লইল। এই কাজকে 'বিল ডিস্কাউন্ট' (Discounting Bills) করা বলে। এই সব প্রয়োজনে ব্যাঙ্কগুলি আন্তর্জাতিক মুদ্রাও ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে।

উপরিউক্ত এই চারিটি মূল কাজ ছাড়াও ব্যাঙ্ক আরও অনেক রকম কাজ করিয়া থাকে। চেকে পাওনা মিটাইবার ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কের খাতায় আমানত-কারীদের লেনদেনের হিসাব সুন্দরভাবে রাখা হইয়া থাকে। তদুপরি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিলে ব্যাঙ্ক আমানতকারীর আমানত হইতে নির্দিষ্ট প্রাপ্য দিয়া থাকে,

অনেক সময় পাওনা আদায়ও করিয়া দেয়, আমানতকারীদের অর্থ লগ্নী করা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ক ট্রাস্টীর কাজও করিয়া থাকে, অনুরোধ করিলে আমানতকারীর চিঠিপত্র গ্রহণ করিয়া প্রকৃত ঠিকানায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এইরূপ নানা প্রকার আমানতকারীদের উপকার করিয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সুবিধা

ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে তিল তিল করিয়া সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে লাগাইয়া থাকে। ফলে যে অর্থ ব্যক্তি বিশেষের ভাণ্ডারে নিষ্ফল সঞ্চয় হিসাবে আট্কানো থাকিত, তাহাই আজ ফলপ্রসূ হইয়া উঠিতেছে। সুদ দিবার ফলে সঞ্চয়কারীর আয় বাড়িতেছে এবং তজ্জন্য সঞ্চয়ের প্রেরণাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। উপরন্তু ব্যাঙ্কে রাখিলে চুরি যাওয়া, হারানো বা নষ্ট হইবার ভয় থাকে না। টাকা দিবার ব্যাপারেও চেক্ কাটিলে তাহা বহন করা বা প্রেরণ করা সুসাধ্য; একটিমাত্র চেকের মারফতে যে কোন অঙ্কের অর্থই দেওয়া সম্ভব; তাহার উপর যদি চেকটি ক্রসড্ (crossed) করিয়া দেওয়া হয় তবে সে অর্থ অপহৃত হইবার ভয় থাকে না। তবে মনে রাখিতে হইবে যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় লোকের আস্থার উপর নির্ভর করিয়া পরিচালিত। অসৎ পরিচালক সে আস্থা ভঙ্গ করিলে বহু লোকের সর্বনাশ হইতে পারে। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে অর্থের ঋণদান প্রসারণ ও সঙ্কোচনের মধ্য দিয়া জাতীয় অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তাহাদের কার্যক্রমের দরুণ যাহাতে দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয়। এই কর্তৃত্ব অর্পিত থাকে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (Central Bank) উপর।

ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপকার

দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ছাড়া কোন দেশই শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না। অনুন্নত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা দেশের অনুন্নতির কারণ বলা চলে। ব্যাঙ্ক-প্রথার ফলে মূলধনের চলনশীলতা (mobility of capital) বৃদ্ধি পায়। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সংযোগ সাধন করাও ব্যাঙ্কের কাজ। যাহারা সঞ্চিত মজুত টাকা অলসভাবে জমাইয়া রাখে তাহাদের নিকট হইতে সেই টাকা লইয়া আসিয়া উদ্যোগী বিনিয়োগকারীদের নিকট (ঋণ হিসাবে) পৌঁছাইয়া দিয়া ব্যাঙ্ক উভয় পক্ষকেই সাহায্য করে। ব্যাঙ্কের সাহায্যে লোকের সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বাড়ে। ইতস্ততঃ ছড়ানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা উৎপাদনে বিনিয়োগ করা ব্যাঙ্কের কাজ। তাহাতে উৎপাদনশক্তি বাড়ে ও সমাজের আয়স্তর

ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। বাজারে চেক প্রচলন করিয়া ও আমানত গ্রহণ করিয়া দেশের ব্যাঙ্কগুলি যে প্রভূত পরিমাণে অর্থ সৃষ্টি করে তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রসারশীলতা (elasticity) ও নমনীয়তা (flexibility) বৃদ্ধি পায়। মালপত্রের উৎপাদন ও বণ্টন, ক্রয় ও বিক্রয় দ্রুত ও সহজে সম্ভব হয়। শুধু তাহাই নহে ; আমানত ব্যবস্থার সুযোগ থাকায় সমাজে সঞ্চয়-প্রবণতা (propensity to save) বৃদ্ধি পায় ; উহার সহিত বিনিয়োগ প্রবণতা (propensity to invest) বাড়ে। ফলে দেশের মূলধন-গঠনের বেগ (rate of capital formation) প্রসারিত হয়, দেশের শিল্পকাঠামোর বিভিন্ন অংশে মূলধনের পর্যাপ্ত যোগান পাওয়া যায়। এই সকল কারণে সুষ্ঠু ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাকিলে সারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত হারে ঘটে।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ সৃষ্টি (Creation of credit by the Banking system)

আধুনিককালে ব্যাঙ্কের আমানত দুই প্রকারে সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমত, আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ টাকা লইয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানতী হিসাব (Deposit account) খুলিয়া দেয় ; ইহাকে প্রকৃত আমানত বলে। দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতার নামে নিজের খাতায় হিসাব খুলিয়া দেয় ; সেই হিসাব হইতে ঋণের পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেকের সাহায্যে তুলিয়া লইবার অনুমতি দেয়। ইহাকে সৃষ্ট আমানত (created deposit) বলা হয়।

আমানত দুই ধরনে সৃষ্টি হয়

প্রথম প্রকার বা প্রকৃত আমানত সৃষ্টি হয় আমানতকারী ব্যক্তির উদ্যোগে, আর দ্বিতীয় প্রকার বা সৃষ্ট আমানত সৃষ্টির উদ্যোগ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে। এইরূপে আমানত সৃষ্টি করিয়াই ব্যাঙ্ক ঋণ দেয় (Loans create deposits)।

ব্যাঙ্ক কোথা হইতে ঋণ দেয় ? যে-পরিমাণ নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট আমানত হিসাবে আসে, উহার সম্পূর্ণ পরিমাণ সে ঋণ দিতে পারে না, কারণ, কোন আমানতকারী যদি তাহার জমা দেওয়া টাকা তুলিয়া লইতে চায় তবে ব্যাঙ্ককে তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে হইবে। ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক জানে যে সকল আমানতকারি একসঙ্গে তাঁহাদের সকল আমানত তুলিয়া লইতে চাহেন না। তাহা ছাড়া রোজই কেহ-না-কেহ টাকা তুলিয়া লইলেও কেহ-না-কেহ আবার টাকা জমাও দেয়। তাই মোট নগদ আমানতের সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যাঙ্কে সর্বদা মজুত না রাখিলেও দৈনন্দিন লেনদেনের কাজ চালানো যায়। এইজন্য নগদ-আমানতের কিছু

আমানতী টাকার নির্দিষ্ট হার ব্যাঙ্ক নিজের হাতে জমা রাখে

অংশ, শতকরা কিছু ভাগ টাকা দৈনন্দিন লেনদেনের উদ্দেশ্যে জমা রাখিয়া অধিকাংশ টাকাই ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। নগদ সঞ্চয়াংশের (cash reserve) পরিমাণ বেশি থাকিলে ব্যাঙ্ক কম ঋণ দিতে পারে, নগদ সঞ্চয়াংশের পরিমাণ কম হইলে সে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

ঋণগত অর্থ সৃষ্টি হয় কিরূপে

ব্যাঙ্ক যখন আমানত সৃষ্টি করে তখন ঋণগ্রহীতার নামে আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব লিখিয়া রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চেক কাটিয়া ঋণ-গ্রহণকারী ঋণ দেয়। সেই ঋণ পুনরায় নগদ আমানত হিসাবে, হয় ঋণপ্রদানকারী ব্যাঙ্কে, অথবা অপর কোন ব্যাঙ্কে জমা হইয়া পড়ে। এই নূতন জমার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক পুনরায় ঋণবৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়। এইরূপে প্রতিবার ঋণদানের ফলে নূতন আমানত সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবার নূতন আমানত সৃষ্টির ফলে নূতন ঋণদান সম্ভব হয়। এইরূপে ব্যাঙ্কগুলি মিলিয়া সামগ্রিকভাবে তাহাদের মোট নগদ আমানতের বহুগুণ বেশি মোট ঋণ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

মনে করা যাউক, A ব্যাঙ্ক কোন ব্যক্তির নিকট হইতে 1000 টাকার নগদ আমানত পাইল। ধরা যাউক, দেশে এইরূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা চালু আছে যে, মোট নগদ আমানতের 10% ব্যাঙ্ককে নিজের কাছে জমা রাখিতে হয়। এমতাবস্থায় A ব্যাঙ্ক নগদ আমানতের 10% অর্থাৎ 100 টাকা জমা রাখিয়া অবশিষ্ট 900 টাকা কাহাকেও ঋণদান করিবে।

কিন্তু বর্তমান ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাই এইরূপ যাহাতে ঘটনার স্রোত আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়া যায়। যাহারা 900 টাকা ঋণ পাইল তাহারা এই টাকা ব্যয় করার ফলে যাহাদের হাতে গিয়া ইহা নূতন আয়রূপে দেখা দিল, তাহারা A ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন ব্যাঙ্কে জমা দিবে। মনে করা যাউক, সেই 900 টাকা B ব্যাঙ্কে নগদ আমানত-রূপে জমা পড়িল। B ব্যাঙ্ক 900 টাকা নগদ আমানতের 10% অর্থাৎ 90 টাকা জমা রাখিয়া 810 টাকা অপর কাহাকেও ঋণ হিসাবে দিয়া দিল। সেই 810 টাকা, আবার ধরা যাউক, C ব্যাঙ্কে জমা পড়িল এবং C ব্যাঙ্ক ইহার 10% অর্থাৎ 81 টাকা, জমা রাখিয়া 729 টাকা নূতন ঋণ সৃষ্টি করিল। যতদিন না পর্যন্ত নগদ আমানতের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়া এত স্বল্প হইয়া পড়ে যে উহার ভিত্তিতে নূতন ঋণ সৃষ্টি করা আর সম্ভব নহে, ততদিন এইরূপে নূতন ঋণ সৃষ্টির ধারা চলিতে থাকিবে। এই ক্ষেত্রে 900 টাকার মোট প্রথম ঋণদানের ফলে সমগ্র সমাজে 9000 টাকার মোট ঋণ সৃষ্টি হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্যাঙ্কগুলি একত্রে মিলিয়া মোট অর্থের পরিমাণ অনেকটা বাড়াইয়া দিতে পারে।

ব্যাঙ্কগুলি এই টাকা কোথা হইতে তৈয়ার করিল ? একটু চিন্তা করিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। তাহারা নগদ টাকা ছাপায় নাই, সেই ক্ষমতাও তাহাদের নাই। কিন্তু সমাজে যে-সকল নানাবিধ মূল্যবান সম্পত্তি আছে উহাদের বন্ধক রাখিয়া সেই মূল্যকেই ব্যাঙ্কসমূহ আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থে পরিণত করিতে পারিয়াছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট এই অর্থ অর্থাৎ চেকসমূহ জিনিসপত্র বেচাকেনায় প্রায় নগদ টাকার মতই ঘোরাফেরা করে, সমাজের মোট অর্থের যোগানের একটি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল এই ব্যাঙ্ক-ঋণ। আকাশের শূন্যতা হইতে এই ঋণ সৃষ্টি হয় না, টাকা ছাড়া অন্যান্য সম্পত্তি (asset) সমাজে আছে, উহাদের অনেকগুলিই প্রায়-টাকা (quasi-money)। এই সকল সম্পত্তির অসম্পূর্ণ টাকাত্বই (imperfect moneyness) ঋণসৃষ্টির ভিত্তি। এই সকল সম্পত্তি আলমারিতে জমা রাখিয়া ব্যাঙ্ক নিজের খাতায় ঋণগ্রহীতার নামে আমানতের হিসাব খুলিয়া দেয় এবং তাহাকে চেক কাটিবার সুযোগ দেয়। এই চেকগুলি ব্যাঙ্কেরই ঋণ, কিন্তু উহারা টাকার মতই কাজ করে। ব্যাঙ্কসমূহের পারস্পরিক দেনা-পাওনা খাতায়-পত্রে কাটাকুটি হয় বলিয়া নিজেদের মধ্যে তত বেশি নগদ টাকা লেনদেনের দরকার হয় না।. এইরূপে সম্পত্তির মূল্যকে আমানতে রূপান্তরিত করিয়া ঋণ সৃষ্টির এই ধারা সম্ভব হয়। তাই বলা হয় যে, "the bank does not create money out of thin air ; it transmutes other forms of wealth into money."

সম্পত্তিগুলির মূল্যকে টাকায় রূপান্তরিত করা

ঋণ-সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা

দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা (Banking system) কর্তৃক ঐরূপ ঋণসৃষ্টির ক্ষমতার কিন্তু সীমা আছে। কোন ব্যক্তি যদি বেশি নগদ টাকা নিজের হাতে জমা রাখিয়া দেয়, তবে ভবিষ্যতে অন্য ব্যাঙ্কও নগদ-আমানত কম পাইবে এবং সমাজে মোট ঋণ সৃষ্টির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া সেই নগদ টাকা নিজের হাতে জমাইয়া রাখে তবে তাহা ঋণ সৃষ্টি করিতে পারিবে না। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি আর্থিক নীতির (খোলা বাজারে কার্যাদির) দ্বারা সমাজে নগদ টাকার পরিমাণ কমাইয়া দিলে মোট ঋণসৃষ্টির পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, ব্যাঙ্ক তখনই ঋণ দিতে রাজী থাকে যখন উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য পায়। উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য না থাকিলে ঋণ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই দেশে বন্ধক-যোগ্য উপযুক্ত শেয়ার সম্পত্তি থাকা দরকার ; তবেই ঋণের প্রসার সম্ভব। অধ্যাপক সেয়ার্স ঠিকই বলিয়াছেন যে, "The banks put this newly created money into the hands, not of everybody at

once, but of those individuals who can offer to the bank the kind of asset which it thinks attractive."

সর্বোপরি, মনে রাখা দরকার যে ব্যাঙ্কগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা নির্ভর করে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার উপর, অর্থাৎ দেশে উপর্যুক্ত আশাবাদী আবহাওয়া আছে কি নাই তাহার উপর। যদি বেশি সংখ্যক ব্যক্তি ঋণ লইতে না আসে, তবে ব্যাঙ্কের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও ঋণ প্রসারের এই ধারা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না। ঘোড়াকে জলের নিকট পৌছানো চলে, কিন্তু জলপানে বাধ্য করা যায় না; ঠিক সেইরূপ ব্যাঙ্কের ইচ্ছা থাকিলেও দেশে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তির অভাবে ঋণ প্রসারের ধারা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank): দেশের আর্থিক নীতি পরিচালনা করিবার জন্য ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আজকাল সকল দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া; ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড; জার্মানীর রাইখ্স ব্যাঙ্ক; আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। আজকাল, অধিকাংশ রাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সরকারী ব্যাঙ্ক করা হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার জাতীয়করণ হইয়াছে। 1948 সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হইয়াছে। রাষ্ট্রের অর্থনীতির লক্ষ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নানা প্রকার কাজ করিতে হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে

প্রথমত, কাগজী নোটের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই কাগজী নোট ছাপায় ও ইহার প্রচলন করে। ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একচেটিয়া অধিকার, অপর কোন ব্যাঙ্কের এইরূপ অধিকার থাকে না। সকল ব্যাঙ্কের নোট ছাপাইবার অধিকার থাকিলে দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি হওয়ার ভয় থাকিত। দেশের দরকার অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এককভাবে কাগজী নোট প্রচলন করে। যেমন আমাদের দেশে চাষের কাজ শুরু হওয়ার সময়ে ও ফসল কাটার সময়ে বেশি টাকা পয়সা দরকার হয়। অন্যান্য দেশে বড়দিনের উৎসবের আগে কেনাকাটার ধূম পড়িয়া যায়, তখন সমাজে বেশি টাকা থাকা দরকার। এই সকল সময়কে তেজী মরসুম (Busy season) বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই তেজী মরসুমে বাজারে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। আবার মন্দার মরসুমে (slack season) টাকার পরিমাণ কমাইয়া দেয়। দ্বিতীয়ত, সরকারের ব্যাঙ্করূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাজ করে। সরকারের সকল আয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই উহা ব্যয় হয়। সরকারী ঋণ পরিচালনাও

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরকার ঋণও করিতে পারে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অন্যান্য সকল ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার রূপে কাজ করে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নগদ আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। আবশ্যক হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে অন্যান্য ব্যাঙ্ক ঋণ করে। এইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে বলে সর্বশেষ স্তরের ঋণদাতা (Lender of the last resort)। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অল্প সময়ের জন্য ধার দিবার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক বিল বা বিল অব্ এক্সচেঞ্জ কেনে। কিন্তু তাহাদের নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে ওই বিলগুলি জমা লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর একটি কাজ হইল দেশের মধ্যে অর্থের মূল্য যাহাতে হঠাৎ বাড়িতে বা কমিতে না পারে তাহা নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ দামস্তর সমান রাখা। নানা উপায়ের সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণ দিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। যদি দেশে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা দেখা দিতে থাকে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্কগুলিও তখন তাহাদের সুদের হার বৃদ্ধি করে, ব্যবসায়ীদের বেশী ঋণ লওয়া বন্ধ হয়। অথবা এই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র বেচিয়া লোকের হাত হইতে নগদ টাকা নিজের হাতে তুলিয়া লয়। ফলে ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা কমিয়া যায়। আমানতের বেশি অংশ জমা রাখিতে হইবে বলিয়া ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। অপরপক্ষে, অর্থনৈতিক মন্দার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের সুদের হার কমাইতে পারে, ঋণপত্র কিনিয়া লইয়া লোকের হাতে নগদ টাকা দিতে পারে এবং আমানতের কম অংশ জমা রাখিতে নির্দেশ দিতে পারে। পঞ্চমত, অর্থের বৈদেশিক মূল্য বা বিনিময়হারে সমতা রক্ষা করার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের। বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না-হয়, তাহা লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তব্য। ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যান্য বহু ধরনের কাজকর্ম আছে। ব্যাঙ্কসমূহের পারস্পরিক দেনা পাওনা মিটাইবার জন্য ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনা করা, দেশের আর্থিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি নজর রাখা—এই সকল কার্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই করিতে হয়। সর্বোপরি, আজকাল অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুরু হয়। যে সকল দেশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজই হইল জাতীয় পরিকল্পনার কাজে টাকা যোগানো এবং উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক আর্থিক নীতি পরিচালনা করা।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Methods of credit control): আমরা জানি যে, দেশের টাকার মূল্য মোটামুটি স্থির রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরু দায়িত্ব। এই

দায়িত্ব পালন করিতে হইলে দেশের টাকার যোগান তাহাকে নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু যোগান বলিলে কেবল নগদ টাকা বুঝায় না, ব্যাঙ্কের যে আমানত হইতে চলতি লেনদেন চলে, উহা নিশ্চয় টাকার সমান কাজ করে। বস্তুত, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে দেশে টাকার মোট যোগানের মধ্যে বেশির ভাগ অংশই এইরূপ ব্যাঙ্কের আমানত। তাই দেশের ব্যাঙ্কগুলির ঋণপ্রসারের ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারের উপযোগী পদ্ধতি ও ক্ষমতা উভয়ই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে থাকা দরকার।

ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন কেন

ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল ব্যাঙ্ক-রেটে পরিবর্তন। যে-হারে সরকারীভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিনিময়-বিলসমূহের বদলে টাকা ঋণ দেয় তাহাকে ব্যাঙ্ক হার বা ব্যাঙ্ক রেট (Bank rate) বলে। এই ব্যাঙ্ক-হার হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার, এই হারেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেয়। সমাজে দ্রব্য-সামগ্রী বৃদ্ধির তুলনায় আর্থিক আয়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে বা সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্ক-হারের বৃদ্ধির ফলে বাজারে সুদের হারও বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে ঋণ-গ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হয়, ফলে ঋণ গ্রহণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ কম হইতে থাকে, সমাজে অধিক আয়ের স্রোতে ভাঁটা পড়ে। ব্যাঙ্ক-হার কমাইলে ঋণ গ্রহণের ব্যয় কমিয়া যায়, ঋণ গ্রহণ ও বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আয়ের স্রোতে জোয়ার আসে।

1. ব্যাঙ্ক রেটে পরিবর্তন

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয় করিয়া দেশে টাকার যোগান বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে; এই পদ্ধতির নাম খোলা বাজারের কার্যকলাপ (open market operations)। সমাজে টাকার পরিমাণ কমাইতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে, এইরূপে জনসাধারণের বা ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লয়, ফলে ব্যাঙ্কসমূহের ঋণ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও কমে। অপরপক্ষে, টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হইলে সে ঋণপত্রসমূহ ক্রয় করিয়া লয়, এইরূপে জনসাধারণের বা ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা তুলিয়া দেয়, ব্যাঙ্কসমূহের ঋণ-সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

2. খোলাবাজারে কার্যকলাপ

দেশের ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নিকট নগদ জমার কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে (Reserve Ratio)। ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সেই নগদ টাকা ঋণ-সৃষ্টি করিবার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণ-

সৃষ্টির পরিমাণ বাড়াইতে চান, তাহা হইলে জমার অনুপাত কমাইয়া দেন, ফলে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ বেশি থাকায় তাহার ভিত্তিতে অধিক 'ঋণ-সৃষ্টি' সম্ভব হয়। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমাইতে চান, তাহা হইলে জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেন, ব্যাকের হাত হইতে নগদ অর্থ সরাইয়া আনেন, ঋণ সৃষ্টির ভিত্তি কমিয়া যাওয়ায় ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমিয়া যায়।

3. রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন

অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইতে ও বাড়াইতে চাহিলে পৃথক্‌ভাবে তাহা করিতে পারেন (Rationing of credit)।

4. ঋণের রেশনিং

যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করে যে, ধরা যাউক, বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ অধিক হইতছে, কিন্তু ইস্পাত শিল্পে আশানুরূপ বিনিয়োগ হইতেছে না, তাহা হইলে সে ব্যাঙ্কসমূহকে নির্দেশ দিবে যে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ঋণ বস্ত্রশিল্পে দেওয়া চলিবে না। এইরূপে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন শেয়ার বাজারে ফাট্‌কাদারি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণত সকল ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুরোধ সকল প্রতিষ্ঠানই রক্ষা করিবে, এই আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনুরোধ-পদ্ধতি গ্রহণ করে, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ঋণ বাড়ানো বা কমানো উচিত কি না তাহা ব্যাঙ্কদের বুঝাইবার চেষ্টা করে (Moral persuasions)।

5. অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা

ইহা ব্যতীত শেয়ার বাজারে ফাট্‌কাদারি বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শেয়ার-বন্ধকী ঋণের মার্জিন পরিবর্তন করিতে পারে, কিস্তিতে ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House): অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কোন বিশেষ অঞ্চলের ব্যাঙ্কসমূহ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গ্রাহক, সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্যের কার্যে এক ব্যাঙ্কের আমানতকারিগণ অন্য ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের নিকট হইতে চেক পান এবং তাহাদের চেক দিয়া থাকেন। ফলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কই অন্য ব্যাঙ্কের নিকট দেনাদার ও পাওনাদার হইয়া পড়ে। কোন ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওয়া নগদ অর্থ লইয়া আসিল আবার সেই ব্যাঙ্কেই নগদ

ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার প্রতিষ্ঠান

অর্থ দিয়া দিল, এইরূপ পারস্পরিক লেনদেন অহেতুক পরিশ্রমসাধ্য ও অপব্যয়মূলক। সুতরাং, বিশেষ কোন স্থানে একত্র হইয়া ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক দেনা পাওনার হিসাব করিয়া খাতাপত্রে পারস্পরিক দেনা-পাওনা কাটাকুটি করিয়া নিজেদের হিসাব মিলাইয়া লয়; এই সংগঠনই ক্লিয়ারিং হাউস বলিয়া পরিচিত। সাধারণত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থানীয় অফিসে এই কার্য পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত জমা হইতে সকল ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াইয়া বা কমাইয়া ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মধ্যে লেনদেন করে।

ভারতের বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক (Different types of Banks in India) : ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান দেশীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়। ইহাবা ব্যতীত আরও বহু প্রকার ব্যাঙ্ক ভারতে আছে।

(ক) **দেশীয় ব্যাঙ্ক ও মহাজনী প্রথা** (Indigenous Bankers)—অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে ব্যাঙ্কিং প্রথা প্রচলিত আছে। শেঠ, সাহুকার, নিধি, চেট্টি ও মহাজনরা দেশীয় পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিত। দেশীয় ব্যাঙ্কারের হুণ্ডি এখনও দেশ-বিদেশে গৃহীত হয়। ইহারা বাণিজ্যবিল বাট্টা করে এবং ছোট ছোট শিল্পকে টাকা ধার দেন। দেশীয় কাজকারবারের প্রয়োজনীয় অর্থ ইহারাই যোগায়। ইহারা ভারতের টাকার বাজারে 90% অংশ অধিকার করিয়া আছে।

(খ) **সমবায় ব্যাঙ্ক** (Co-operative Banks)—এইগুলির উদ্দেশ্যে হইল গ্রামাঞ্চলের চাষীদেব কৃষি-ঋণ দেওয়া। ইহাদের বলে সমবায় ঋণদান-সমিতি (Co-operative Credit Society)। এই সকল ব্যাঙ্কের দায়িত্ব শহরে সীমাবদ্ধ (limited liability), কিন্তু গ্রামে সীমাহীন (unlimited liability)। ভারতের চাষীর প্রয়োজনের মাত্র 3 4 ভাগ ইহারা মিটাইয়া থাকে।

(গ) **জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক** (Land Mortgage Banks)—জমি বন্ধক রাখিয়া কৃষক যাহাতে দীর্ঘকালের জন্য অল্প সুদে ঋণ পাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারতে কিছু জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত, কতকগুলি সাধারণ ব্যাঙ্কপদ্ধতিতে গঠিত। নূতন জমি ক্রয়, জমির স্থায়ী উন্নতি, দেনা পরিশোধ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ইহা হইতে ঋণ দেওয়া হয়।

(ঘ) **সরকার কর্তৃক ব্যাঙ্কিং কাজ পরিচালনা** (Government Banking Activities)—অনেক ক্ষেত্রে সরকার নিজেও টাকা জমা রাখা এবং ঋণ দেওয়ার কাজ করিয়া থাকে, যেমন পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি। তাহা ছাড়া তাকাভি ঋণ (সাহায্যের উদ্দেশ্যে ঋণ) দান, ক্ষুদ্র ও শিশু-শিল্প সংরক্ষণের জন্য

আর্থিক সাহায্য করা, মিউনিসিপালিটি, জেলাবোর্ড ও সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দেওয়া প্রভৃতি কাজও সরকারী ব্যাঙ্কিং কাজের অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) **যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক** (Joint Stock Banks)—আধুনিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এইগুলি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলি বৈদেশিক পরিচালনায় এবং কতকগুলি ভারতীয় মূলধন ও পরিচালনায় কাজকর্ম করে। সাধারণত ইহারা ব্যবসায়ীদের স্বল্পকালের জন্য ঋণ দিয়া থাকে।

(চ) **বিনিময় ব্যাঙ্ক** (Exchange Banks)—এই শ্রেণীর প্রায় সকল ব্যাঙ্কই বিদেশী মূলধন ও পরিচালনার অধীন। ইহাদের কাজ হইল আমদানি-রপ্তানিতে একচেটিয়া ভাবে অর্থ লেন-দেন করা। বর্তমানে ইহারা ব্যাঙ্কিং এর অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের ক্ষতি করিতেছে।

(ছ) **স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া** (State Bank of India)—1955 সালের 1লা জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার আভ্যন্তরীণ শাখাগুলিকে জাতীয়করণ করিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া স্থাপিত হইয়াছে। উহার কাজ হইল গ্রামাঞ্চলে অধিকসংখ্যক শাখা স্থাপন এবং প্রধানত সমবায় সমিতিগুলিতে ঋণ দিয়া সাহায্য করা।

(জ) **ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক** (Reserve Bank of India)—সকল দেশের মত ভারতেও একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে, উহার নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া। দেশের ব্যাঙ্ক সংগঠনের শীর্ষে এই ব্যাঙ্কের স্থান। 1935 সালে বাজারে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা পাঁচ কোটি টাকা মূলধন লইয়া ইহা স্থাপিত হয়। 1948 সালে ভারত সরকার এই শেয়ারগুলি কিনিয়া লইয়া ইহাকে জাতীয়করণ করিয়াছেন। ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সকল কাজকর্ম করে এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা এত অপ্রচুর যে, কৃষি ও শিল্প সকলেই দরকার মত টাকা-পয়সা ঋণ পায় না। আমাদের দেশে প্রতি 3500 বর্গ মাইলে একটি ব্যাঙ্ক বর্তমান।

ভারতে ব্যাঙ্ক অপ্রচুর

অল্পমেয়াদী ঋণ ছাড়া ব্যাঙ্কগুলি অন্য দেশের মত বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্কিং-এর (mixed banking) কাজ করে না। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আকারও ক্ষুদ্র, উহাদের অর্থসামর্থ্যও কম। সর্বোপরি, শাখা ব্যাঙ্কিং (branch banking) না থাকাতে মফঃস্বলে কৃষককে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইতে হয়।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কঃ গঠন ও কার্যাবলী (The Reserve Bank of India : Composition & Function): ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার শীর্ষদেশে অবস্থিত থাকিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম পরিচালনা

করে। প্রথমে শেয়ার ক্রেতাদের ব্যাঙ্করূপে 1935 সালে এই ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। 1948 সালে ভারত সরকার সকল শেয়ার ক্রয় করিয়া লওয়ায় ইহা পূর্ণ সরকারী ব্যাঙ্করূপে পরিগণিত হয়। একটি কেন্দ্রীয় পরিচালকবর্গ ইহাকে পরিচালনা করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন গভর্নর, 10 জন ডিরেক্টর ও একজন সরকারী কর্মচারী, ইহাদের লইয়া এই পরিচালকমণ্ডলী ; ইহারা সকলেই রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত হন। গভর্নর ইহার প্রধান কর্মকর্তা। ডিরেক্টরগণ চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন।

গঠন

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম ও প্রধান কাজ হইল, ইহা ভারতের মুদ্রানীতিকে পরিচালনা করে। একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ভারতে মুদ্রা চালু করিতে পারে। কাগজী নোটের পিছনে জমা (reserve) হিসাবে অন্তত 200 কোটি টাকা রাখিতে হইবে, ইহার মধ্যে সোনার পরিমাণ 115 কোটি টাকার কম হইলে চলিবে না। অবশ্য সরকারের অনুমতি লইয়া কেবলমাত্র 115 কোটি টাকার সোনা রাখিয়া যে কোন পরিমাণ কাগজী নোট চালু করা চলিবে। ভারতের টাকার বাজারের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, বিভিন্ন মরসুমে নগদ টাকার চাহিদায় উঠানামা (seasonal variation in the demand for cash)। চাষের চেয়ে ফসল তোলার সময়ে ফসল কেনা-বেচার জন্য টাকার চাহিদা বাড়ে। ফসল কাটার মরসুমের পরে টাকার চাহিদা আবার কমে। তেজী মরসুমে (busy season) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার পরিমাণ বেশি চালু করে, আবার মন্দা মরসুমে (slack season) টাকার পরিমাণ কমাইয়া দেয়।

মুদ্রা ব্যবস্থার পরিচালনা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় কাজ হইল, ইহা সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে। দরকারের সময় এই ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ নেয়। এই ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে যথেচ্ছভাবে ও যে-কোন ব্যবসাতে ঋণ বাড়াইতে বা কমাইতে না পারে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেই দিকে লক্ষ্য রাখে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের চলতি আমানতের 5% এবং স্থায়ী আমানতের 2% অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখে। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই চারিটি কেন্দ্রের মধ্যে চেক বিনিময়ের কাজও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে।

ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তৃতীয় কাজ হইল সরকারের ব্যাঙ্কাররূপে কাজ করা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার তাহাদের সকল টাকাকড়ি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখে। সরকারী তহবিলে সাময়িক ঘাটতি দেখা দিলে এই ব্যাঙ্ক সরকারকে টাকা ধার দেয়। ইহার মাধ্যমে সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা ধার লয় ও পরিশোধ করে।

সরকারের ব্যাঙ্কাররূপে কাজ করা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চতুর্থ কাজ হইল টাকার বৈদেশিক মূল্য স্থির রাখার চেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্টার্লিং, ডলার ও বিদেশী মুদ্রা কেনা-বেচা করে।

বিনিময়-হার স্থির রাখা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পঞ্চম কাজ হইল কৃষিঋণ-বিভাগের মাধ্যমে ভারতের সমবায় সমিতিগুলিকে টাকা ঋণ দিয়া সময়মত সাহায্য করা।

বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হইতে পারে এইরূপ আর্থিক নীতি দেশে প্রয়োগ করা। 1949 সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের দ্বারা তাই ইহার ক্ষমতা অনেকখানি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও বর্তমানে উন্নয়নমূলক আর্থিক নীতি (developmental monetary policy) গ্রহণ করিয়া অার্থনীতিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

উন্নয়নমূলক আর্থিক নীতি পরিচালনা

Questions to be discussed

1. What is credit ? Discuss the different types of credit instruments.

ঋণ কাহাকে বলে ? বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্রগুলি আলোচনা কর।

2. What is a bank ? What are its functions ? What are its services to society for which you consider it useful ?

ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে ? ইহাদের কার্যাবলী কি ? সমাজে কোন্ অবদানের জন্য ব্যাঙ্ককে উপযোগী প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করা হয় ?

3. Explain how bank creates credit. What are its limitations ?

ব্যাঙ্ক কিভাবে ঋণ সৃষ্টি করে ? ইহার সীমা কি ?

4. What is a Central Bank ? Discuss its functions.

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে ? ইহার কার্যাবলী কি কি ?

5. Discuss the different types of bank in India. Or, Discuss the Banking system of India.

ভারতের বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর। অথবা, ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা আলোচনা কর।

6. Discuss the composition and functions of the Reserve Bank of India.

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গঠন ও কার্যপ্রণালী আলোচনা কর।

7. Write a short note on Clearing House.

ক্লিয়ারিং হাউস বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

৯

খাজনা ও বণ্টন

Rent & Distribution

উপাদানের দাম নিরূপণ বা বণ্টন (Pricing of the Factors of Production or Distribution): একটি দেশে যেমন বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার থাকে, সেইরকম বিভিন্ন উপাদানের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যও বাজার আছে। কোন উপাদানের মালিকরা সেই বাজারে নিজের উপাদান বিক্রয় করিতে চাহে, যাহারা উপাদানের বাজার হইতে সেই উপাদানসমূহ ক্রয় করে, তাহারা উপাদানের ক্রেতা। বিভিন্ন উপাদানের দামের বিভিন্ন নাম আছে। উৎপাদনের কাজে জমির ব্যবহার ক্রয় করিতে হইলে উহার দাম হিসাবে যাহা দিতে হয় তাহাকে খাজনা বলে। শ্রমশক্তির ব্যবহার ক্রয় করিতে হইলে উহার দাম হিসাবে দিতে হয় মজুরি। কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপরের নিকট হইতে নগদ টাকা ধার লইয়া আসিয়া মূলধন হিসাবে উহা ব্যবহার করিবার দরুন যে-দাম দিতে হয় তাহাকে সুদ বলে। উদ্যোগক্ষমতা ব্যবহার করিতে হইলে উহার দাম হিসাবে মুনাফা দিতে হয়। জিনিসের বাজারের ন্যায় প্রত্যেকটি উপাদানের বাজারেও পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহাদের সমতার বিন্দুতে ভারসাম্য দাম স্থির হয়। একচেটিয়া বিক্রেতা থাকিলে উপাদানের দাম এমন বিন্দুতে স্থির হয় যেখানে সে ঐ উপাদানের ব্যবহার হইতে সর্বোচ্চ মুনাফা করিতে পারিতেছে।

উপাদানের দাম নির্ধারিত হয় তাহাদের বাজারে

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদা ও যোগানের পিছনে বিভিন্ন প্রকার বিষয় প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাদের প্রত্যেকের বাজারের গঠনও অনেকটা পৃথক্। দেশে জমি ব্যবহারের জন্য বাজার, শ্রমের বাজার, মূলধনের বাজার, এবং উদ্যোগক্ষমতা বিক্রয়ের জন্য বাজার—ইহাদের গঠন, আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। তাই ইহাদের দাম সম্বন্ধে আলোচনা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করিতে হয়।

কিন্তু প্রত্যেকটি উপাদানের বাজারের রূপ পৃথক্

উপাদান সমূহের দাম নিরূপণকে বণ্টনও বলা হয়। সমাজের সকল লোকই কোন-না-কোন উপাদানের মালিক হিসাবে আয় করিয়া থাকে। সকল ব্যক্তির আয়ের উদ্ভব হয় খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা প্রভৃতির যে-কোন আকারে। প্রত্যেক ব্যক্তির কিরূপ আয় হয় তাহা নির্ভর করে সে কতটা উপাদানের মালিক এবং সেই উপাদানের দাম কি তাহার উপর। জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের আয়ের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায়, সেইজন্যই উপাদানের দাম-নিরূপণকে বণ্টনও বলা চলে।

ইহাকে বণ্টনও বলা হয়

খাজনা কাহাকে বলে (What is Rent) : সাধারণ অর্থে খাজনা বলিতে বোঝায় জমি, জায়গা ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে অর্থ বা ভাড়া দেওয়া হয়। ধনবিজ্ঞানে উহাকে বলা হয় "চুক্তি অনুযায়ী খাজনা বা মোট খাজনা (Contract Rent)।" যেমন এক ব্যক্তি মাসিক একশত টাকায় বাড়িঘরসহ একখণ্ড জমি ভাড়া করিল। এখানে মাসিক একশত টাকা হইল মোট খাজনা। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে খাজনা শব্দের আসল অর্থ এই 'মোট খাজনা' নহে, ধনবিজ্ঞানে খাজনা বলিতে বুঝায় অর্থনৈতিক বা "খাঁটি খাজনা" (Economic or pure Rent)। এখন অর্থনৈতিক খাজনা ও মোট খাজনার ভিতর পার্থক্য কি? মোট খাজনার ভিতর অর্থনৈতিক খাজনা ছাড়া অন্যান্য অনেক জিনিস থাকে, যেমন জমির পিছনে যে মূলধন খাটানো হইয়াছে তাহার সুদ (মূলধন খাটাইয়া জমির মালিক হয়তো জমিটিকে অনেক বেশি উর্বর করিয়াছে বা চাষের সুবিধার জন্য জমির উপর ঘরবাড়ি ইত্যাদি তুলিয়াছে) এবং জমি ভাড়া দিবার পর মালিকের যে জমির পিছনে তদারক কার্য করিতে হয় তাহার পারিশ্রমিক। সুতরাং মোট খাজনা হইতে সুদ, মজুরি প্রভৃতি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই খাঁটি বা অর্থনৈতিক খাজনা (Pure or Economic Rent)

ধনবিজ্ঞানে খাজনা বলিতে বোঝায় অর্থনৈতিক খাজনা

যেমন উপরিউক্ত দৃষ্টান্তে জমির মালিক হয়ত ঘরবাড়ি ইত্যাদি তুলিবার জন্য কয়েক সহস্র টাকা ধার করিয়া খরচ করিয়াছে যাহার জন্য তাহার প্রতিমাসে সুদ বাবদ দিতে হয় 20 টাকা (অথবা ঐ টাকা তাহার নিজের হইলে ঐ টাকা বাড়ীর পিছনে খরচ না করিয়া অন্যত্র খাটাইলে সে সুদ পাইত মাসিক 20 টাকা); তাহাছাড়া জমি ভাড়া দিবার পরও তাহার এই জমির পিছনে নিয়মিত যে তদারকের কার্য ও পরিশ্রম করিতে হয়, সেই পরিশ্রম ঐ জমিতে না করিয়া অন্যত্র করিলে হয়তো সে পারিশ্রমিক পাইত মাসিক 30 টাকা। সুতরাং এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক খাজনা হইল (100 – 20 – 30) টাকা অর্থাৎ 50 টাকা।

ইহা ছাড়া কোন কোন সময়ে অন্যান্য কারণে চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত মোট খাজনা অর্থনৈতিক খাজনা হইতে ভিন্ন হইতে পারে। যেমন, জমির উপর যদি একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকে (অর্থাৎ কোন ব্যক্তির হাতে যদি প্রচুর জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হয়) তবে মালিক তাহার সেই অবস্থার সুযোগ লইয়া অর্থনৈতিক খাজনা অপেক্ষা অনেক বেশি খাজনা আদায় করিতে পারে। আবার কোন কোন সময় হয়ত জমির মালিক আত্মীয়তা বা অন্যান্য কারণে অর্থনৈতিক খাজনা অপেক্ষা কম হারেও জমি

মোট খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনার পার্থক্য

ভাড়া দিতে পারে। মোট কথা যাহা বিশুদ্ধ প্রকৃতির দান তাহা ব্যবহারের জন্য যাহা দেয় তাহাই খাঁটি বা অর্থনৈতিক খাজনা এবং সাধারণত খাজনা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা খাঁটি খাজনা ও অন্যান্য অনেক কিছুর সংমিশ্রণ।

অর্থনৈতিক খাজনাকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত (Producer's Surplus) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। একজন চাষী যদি একখণ্ড জমি চাষ করে তবে ফসল বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা হইতে মজুরি ও স্বাভাবিক মুনাফা সমেত চাষীর উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকিবে তাহাই খাজনা। ধরা যাউক, একখণ্ড জমিতে উৎপাদিত ফসলের দাম হইল 100 টাকা, ঐ ফসল উৎপাদনের ও বিক্রয়ের জন্য বীজ, সার, লাঙ্গল, গরু, পরিবহণ ব্যয় ইত্যাদির খরচ পড়িয়াছে 60 টাকা, চাষী নিজের পারিশ্রমিক বাবদ ধরিয়াছে 30 টাকা এবং মুনাফা বাবদ 5 টাকা। এক কথায় মোট উৎপাদন ব্যয় হইল (60+30+5) বা 95 টাকা। সুতরাং এখানে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত হইল (100−95) টাকা অর্থাৎ 5 টাকা; জমিতে উদ্ভূত এই উদ্বৃত্তই হইল উৎপাদকের খাজনা। চাষী যদি নিজে জমির মালিক হয় তবে এই উদ্বৃত্ত সে নিজে ভোগ করিবে। আর যদি সে জমিদারের জমি চাষ করে তবে ইহা জমিদারই পাইবে, চাষী জমির মালিককে এই উদ্বৃত্ত দিতে রাজী না হইলে মালিক তাহার জমিতে অন্য চাষী বসাইবে বা নিজে কৃষি মজুর লাগাইয়া চাষ করিবে।

অর্থনৈতিক খাজনা ও উৎপাদকের উদ্বৃত্ত

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব (Ricardian Theory of Rent): জমির খাজনা বা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত কি কারণে উদ্ভূত হয় এবং তাহার পরিমাণ কি করিয়া নির্ধারিত হয় এ সম্বন্ধে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডো একটি তত্ত্ব উপস্থিত করিয়াছেন। রিকার্ডোর মতে "জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ প্রকৃতির আদি ও অবিনশ্বর গুণগুলির জন্য জমির মালিককে দিতে হয় তাহাই খাজনা।" নিম্নে তাঁহার তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

মনে কর, একটি নব আবিষ্কৃত দেশে কিছু লোক বসবাস করিতে গেল। লোকসংখ্যার তুলনায় দেশে চাষযোগ্য জমি যথেষ্ট এবং উর্বরতা বা গুণের দিক হইতে উহা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমে যে কিছু সংখ্যক লোক ঐ দেশে বসবাস করিতে গেল তাহারা খাদ্যোৎপাদনের জন্য সর্বাপেক্ষা ভাল জমি অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর জমিগুলি চাষ করিল এবং উহাতেই তাহাদের প্রয়োজন মিটিয়া গেল। যেহেতু প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ চাহিদার তুলনায় মোটেই কম নহে, স্বভাবতই উহার জন্য কেহ কোন খাজনা দিবে না।

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

কিন্তু ক্রমে যখন খাদ্যের চাহিদা বাড়িয়া গেল তখন আর কেবল প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া সকলের প্রয়োজন মিটিল না। সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষ শুরু হইল এবং যেহেতু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদিকা শক্তি প্রথম শ্রেণীর জমি অপেক্ষা কম, একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে যে ফসল পাওয়া যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে তাহা অপেক্ষা কম পাওয়া গেল। ধরা যাউক প্রথম ও দ্বিতীয় দুই শ্রেণীর জমিতে বিঘা-প্রতি 100 টাকা খরচ করিয়া যথাক্রমে 25 ও 20 মণ ফসল পাওয়া গেল। এক্ষেত্রে (25 – 20) মণ অর্থাৎ 5 মণ হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির তুলনায় প্রথম শ্রেণীর জমির উদ্বৃত্ত উৎপন্ন। অর্থাৎ ঐ 5 মণই হইল প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা। যে ব্যক্তি জমির মালিক, ঐ 5 মণ তাহারই প্রাপ্য, কেন না সমদক্ষতাসম্পন্ন দুইজন চাষী যখন একই পরিমাণ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া ফসল ফলাইতেছে (এবং ইহার ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে 20 মণ ও প্রথম শ্রেণীর জমিতে 25 মণ উৎপন্ন হইতেছে) তখন তাহাদের উপার্জনের কোন তারতম্য হইতে পারে না।

এখানে বোঝা দরকার যে, যেহেতু এই স্তরে লোকের খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা প্রয়োজন হইতেছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিই হইল প্রান্তিক জমি এবং ফসলের দর অন্তত এমন হইতে হইবে যাহাতে এই প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয় পোষানো যায়। কারণ, তাহা না হইলে এই জমি চাষ করা হইবে না। এক্ষেত্রে বিঘা-প্রতি উৎপাদন ব্যয় হইল 100 টাকা এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ 20 মণ। সুতরাং 5 টাকা মণ হইল ফসলের দর। 5 টাকা মণ দরে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে পাওয়া গেল 25 × 5 = 125 টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া মাত্র উৎপাদন ব্যয় পোষাইল। প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে উদ্বৃত্ত পাওয়া গেল 25 টাকা, সুতরাং প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা হইল 25 টাকা (ফসলের হিসাবে 5 মণ) দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অর্থাৎ প্রান্তিক জমির কোন খাজনা নাই।

ফসলের দাম প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের সমান

কালক্রমে ঐ দেশের লোকসংখ্যা আরও বাড়িয়া গেল এবং খাদ্যের চাহিদা আরও বাড়িবার ফলে তখন তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিতে হইল। ধরা যাউক, এই জমিতে বিঘা-প্রতি 100 টাকা উৎপাদন ব্যয়ে 16 মণ ফসল পাওয়া গেল, অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় হইল মণ প্রতি $6\frac{1}{4}$ টাকা। সুতরাং ফসলের দামও হইল $6\frac{1}{4}$ টাকা, কারণ, তাহা না হইলে এই জমি চাষ হইবে না। ইহার ফলে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে প্রাপ্ত বিঘা-প্রতি উৎপন্ন ফসলের দাম হইল যথাক্রমে $25 \times 6\frac{1}{4} = 156\frac{1}{4}$ টাকা এবং

প্রান্তিক জমির খাজনা নাই

$(20 \times 6\frac{1}{4})$ টাকা $= 125$ টাকা। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা হইল $(156\frac{1}{4} - 100)$ টাকা $= 56\frac{1}{4}$ টাকা (ফসলের হিসাবে 9 মণ)। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির $(125 - 100) = 25$ টাকা (ফসলের হিসাবে 4 মণ)। তৃতীয় শ্রেণীর জমিই হইল প্রান্তিক জমি (marginal land)।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব অনুসারে জমির উর্বরতা বা উৎপাদিকা শক্তির বিভিন্নতার জন্যই খাজনা সৃষ্টি হয় এবং প্রান্তিক জমির কোন খাজনা থাকে না। শেষোক্ত বক্তব্যকে ভিত্তি করিয়াই রিকার্ডো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। সিদ্ধান্তটি হইল এই যে খাজনা দামের অঙ্গীভূত নহে (rent does not enter into price)। উপরে আমরা যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি তাহা হইতে এই বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যখন তৃতীয় শ্রেণীর জমি পর্যন্ত চাষ করিতে হইল তখন ফসলের দাম হইল মণ প্রতি $6\frac{1}{4}$ টাকা, কারণ, ঐ জমির মণ প্রতি উৎপাদন ব্যয় উহাই। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদন ব্যয় ইহা অপেক্ষা কম, সুতরাং এই দুই শ্রেণীর জমিতেই খাজনার উদ্ভব হইল এবং ইহার মোট পরিমাণ হইল ($56\frac{1}{4}$ টাকা $+ 25$ টাকা) $= 81\frac{1}{4}$ টাকা। যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি পর্যন্ত চাষ করা হইয়াছিল তখন দাম ছিল মণ প্রতি 5 টাকা এবং একমাত্র প্রথম শ্রেণীর জমিতেই খাজনা ছিল এবং ইহার পরিমাণ ছিল 25 টাকা। আবার যখন একমাত্র প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করা হইয়াছিল তখন দাম ছিল মণ প্রতি 4 টাকা এবং খাজনার পরিমাণ ছিল শূন্য। উপরি-উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে আমরা দেখিতেছি যে জিনিসের দামের উপরই খাজনার পরিমাণ নির্ভর করে ; দাম যত বেশি, খাজনা তত বেশি ; দাম যত কম, খাজনা তত কম। রিকার্ডোর ভাষায় বলিতে গেলে, "খাজনা বেশি দিতে হয় বলিয়া ফসলের দাম উচ্চ নহে, ফসলের দাম উচ্চ বলিয়াই বেশি খাজনা দিতে হয়"।* সুতরাং দাম খাজনাকে নির্ধারিত করে, খাজনা দামকে নির্ধারিত করে না ("Rent is price-determined, not price-determining").

খাজনা দামের অঙ্গীভূত নহে

সমালোচনা (Criticisms): আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটিকে বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা করিয়াছেন।

প্রথমত, ইহা বলা হয় যে জমির কোন অবিনশ্বর মৌলিকশক্তি নাই, কারণ,

*"Corn is not high because rent is paid, but rent is paid because corn is high— Ricardo.

জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব ; তা ছাড়া শুধু বিভিন্ন জমির উর্বরা শক্তির তারতম্যের জন্যই খাজনার উদ্ভব হয় না, জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির ক্রিয়ার ফলেও খাজনার উদ্ভব হইতে পারে। (এই বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইতেছে)।

জমির কোন অবিনশ্বর শক্তি নাই

দ্বিতীয়ত, রিকার্ডো যে খাজনাহীন প্রান্তিক জমির কথা বলিয়াছেন তাহা ভুল। জমির যদি কেবলমাত্র একটি ব্যবহার থাকিত তবে এইরূপ খাজনাহীন প্রান্তিক জমি থাকিতে পারিত। কিন্তু বাস্তবে একখণ্ড জমি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। যে জমি গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রান্তিক সেই জমিই হয়ত তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রান্তিক নহে। সুতরাং ঐ জমি যদি গম উৎপাদনের কাজে লাগাইতে হয় তবে উহাকে তুলা উৎপাদনের কাজ হইতে সরাইয়া আনিতে হইবে এবং তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলে ঐ জমি যে খাজনা পাইত সেই খাজনা দিতে হইবে। ইহা ছাড়া সমগ্রভাবে জমির অপ্রাচুর্য হেতু অনেক সময় নিকৃষ্টতম জমিতেও খাজনা দিতে হয়। ইহাকে বলা হয় অপ্রাচুর্যজনিত খাজনা (Scarcity rent)।

খাজনাহীন প্রান্তিক জমির ধারণা ভুল

তৃতীয়ত, উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাও পরিষ্কার যে "খাজনা দামের অঙ্গীভূত নহে"—রিকার্ডোর এই বক্তব্য সঠিক নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোন জমি এক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রান্তিক হইতে পারে, অপর ক্ষেত্রে প্রান্তিক না-ও হইতে পারে, সুতরাং দ্বিতীয় উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে উহাকে প্রথম ক্ষেত্রে আনিতে হইলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উহা যে খাজনা পাইতে পারিত তাহা দিতে হইবে। এই যে খাজনা দেওয়া হইবে ইহা অবশ্যই প্রথম দ্রব্যটির উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, এবং ইহার ফলে দ্রব্যটির দাম প্রদত্ত খাজনা দ্বারা প্রভাবিত হইবে। ইহা ছাড়া অপ্রাচুর্যজনিত খাজনাও (Scarcity Rent) উৎপাদনব্যয় ও দামের অন্তর্ভুক্ত হইবে, কারণ, এই ক্ষেত্রে উৎপাদক যে খাজনা দেয় তাহা সে দ্রব্যমূল্য বাড়াইয়া পোষাইয়া নেয়।

খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে

খাজনা ও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধির সম্পর্ক (Rent and the Law of Diminishing Rent): রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর জমির গুণের তারতম্যের জন্য খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু খাজনার ইহাই একমাত্র কারণ নহে। খাজনার উদ্ভবের অপর প্রধান কারণ হইল জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধির ক্রিয়া। জনসংখ্যা ও খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের যোগান বাড়াইবার জন্য একদিকে যেমন নিকৃষ্টতর জমিতে চাষের বিস্তার (Extensive Cultivation) ঘটে, অপরদিকে উৎকৃষ্টতর জমিগুলিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া

প্রগাঢ়তর চাষের (more intensive cultivation) দ্বারা উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা হয়। ইহার ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি কার্যকরী হয় এবং জমির প্রান্তিক উৎপাদনব্যয়ও ক্রমশ বাড়িতে থাকে। আবার ইহা পরিষ্কার যে জনসংখ্যার খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য খাদ্যের উৎপাদন শেষ যে একক পর্যন্ত করিতে হয়, ফসলের দাম সেই এককের উৎপাদনব্যয়ের সমান হইতে হইবে। কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী এককসমূহের উৎপাদনব্যয় এই প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা কম। সুতরাং পূর্ববর্তী এককসমূহের উৎপাদনব্যয় ফসলের দাম অপেক্ষা কম এবং উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা দামের এই যে বাড়তি (surplus) ইহাই খাজনা। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধির সঙ্গে খাজনার অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে।

অন্য একদিক হইতেও বিষয়টিকে বিচার করা যায়। যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধির ক্রিয়া না থাকিত তবে একখণ্ড জমিতে ক্রমাগত অধিক হইতে অধিকতর শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়াই সমস্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করা যাইত। সুতরাং নিকৃষ্টতর জমি চাষ করার আবশ্যক হইত না; ফসলের উৎপাদন ব্যয়ও বাড়িত না, খাজনারও উদ্ভব হইত না। বস্তুত ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধির ক্রিয়ার ফলে একদিকে নিকৃষ্টতর জমি চাষ করিতে হয়, অপরদিকে উৎকৃষ্ট জমির ক্ষেত্রেও চাষের প্রগাঢ়তার (more intensive) জন্য প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যায় এবং উভয় কারণেই খাজনার উদ্ভব হয়।

খাজনা ও জনসংখ্যা : দেশে জনসংখ্যার যত বৃদ্ধি ঘটিবে ততই ফসলের চাহিদা বাড়িবে। ইহার ফলে একদিকে নিকৃষ্টতর জমিতে চাষ হইবে অপরদিকে উৎকৃষ্ট জমিতেও প্রগাঢ়তর (more intensive) চাষ হইবে এবং উভয় কারণেই জমির খাজনা বাড়িবে। ফলে মালিকেরা অনুপার্জিত আয়বৃদ্ধি (unearned increment) ভোগ করিবে।

শহরে গৃহনির্মাণ-জমির খাজনা : শহরে গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমির অবস্থান-সুযোগের (site advantage) তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং যে জমির অবস্থান-সুযোগ যত বেশি তাহার খাজনাও তত বেশি। এখানেও প্রান্তিক জমির তুলনায় উৎকৃষ্টতর জমির অধিকতর সুযোগ সুবিধা শেষোক্ত জমির খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ করে।

আধুনিক খাজনাতত্ত্ব (Modern Rent Theory) **:** আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীরা বলেন যে শুধু জমির ক্ষেত্রে নহে, অপরাপর সকল উপাদানের মালিকরাও কিছুটা খাজনা ভোগ করিয়া থাকেন। যে-সকল উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ, তাহাদের আয়ের মধ্যেই কিছুটা অংশ খাজনা। যতটুকু পারিশ্রমিক না পাইলে সেই

উপাদান মোটেই কাজ করিবে না বা উহার যোগান হইবে না, সেই পারিশ্রমিক হইল তাহার নিম্নতম যোগান দাম (minimum supply price)। নিম্নতম যোগান দাম হইতে উপাদানের মালিক যতটুকু বেশি পারিশ্রমিক পাইতেছে সেই পার্থক্যটুকুকে, অর্থাৎ তাহার আয়ের মধ্যে এইরূপ উদ্বৃত্ত অংশকে খাজনা বলা চলে। সকল উপাদানের আয়ের মধ্যেই তাই, এই খাজনাভাব (Rent element) থাকিতে পারে। যেমন, কোন শ্রমিক 1·50 টাকাতেই কাজ করিতে রাজী ছিল, ইহাই তাহার নিম্নতম যোগান দাম। কিন্তু সমাজে সাধারণভাবে মজুরির হার বাড়িয়া গেলে সে-ও, ধরা যাউক, 2·25 টাকা মজুরি পাইতে লাগিল। উদ্বৃত্ত এই ·75 পঃ হইল মজুরের আয়ের মধ্যে খাজনার রূপ বা খাজনাংশ (Rent-element)। যদি 1·50 টাকাতে যথেষ্ট পরিমাণে মজুর পাওয়া যাইত তাহা হইলে মজুরী বাড়িত না, শ্রমিকের আয়ের মধ্যে খাজনাভাব থাকিত না। 1·50 টাকাতে মজুরের যোগান সীমাবদ্ধ, সেইজন্য মজুরির বৃদ্ধি হইতেছে এবং এই খাজনা-ভাবের সৃষ্টি হইতেছে। সেইরূপ সুদ ও মুনাফার মধ্যেও খাজনার অংশ থাকিতে পারে। উপাদানের নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয় (minimum necessary earnings) হইতে উহার প্রকৃত আয় যতটুকু বেশি, উহাই খাজনা। জমির যোগান একেবারেই সীমাবদ্ধ বলিয়া জমি হইতে উহার মালিকের আয়কে সম্পূর্ণরূপে খাজনা বলা চলে।

সকল উপাদানের আয়ের মধ্যেই উদ্বৃত্ত অংশ

সুদ কাহাকে বলে (What is Interest ?) : উৎপাদন করিতে গেলে অনেক সময় কোন উদ্যোক্তা বা কোন ফার্মকে অন্যের নিকট হইতে নগদ টাকা ঋণ করিতে হয়। নিজের মূলধন কম পড়িলে কোন উদ্যোক্তা সাময়িকভাবে অপর কাহারও নিকট টাকা ধার করিয়া উৎপাদনের কাজে খাটাইয়া লয়। এইরূপ মূলধনকে বলা হয় ঋণপুঁজি (loan capital)। যাহার নিকট হইতে ঋণ করা হয় সে ঋণপুঁজির যোগানদার ; যে ঋণ গ্রহণ করে সে ঋণপুঁজির চাহিদাকারী। অপরের টাকা লইয়া আসিয়া নিজে খাটাইবার জন্য সে যে দাম দেয়, তাহার নাম হইল সুদ। ঋণপুঁজির বাজারে দাম না দিলে কেহ ধার দিতে চাহে না। দাম না দিলে বাজারে কোন দ্রব্যেরই যোগান হয় না।

সুদ কাহাকে বলে

ঋণপুঁজির দাম বা সুদকে এক বৎসরের হিসাবে এবং আসলের উপর শতকরা হিসাবে গণনা করা হয়। যেমন, তুমি কাহারও নিকট হইতে 500 টাকা ঋণ করিয়াছ। ইহাকে ঋণের আসল পরিমাণ (principal) বলে। এক বৎসরের জন্য এই ঋণপুঁজি ব্যবহার করিয়া পরিশোধ করার সময়ে তোমাকে ধরা যাউক, মোট 520 টাকা শোধ দিতে হইবে। 500 টাকা

সুদের হার কাহাকে বলে

আসলের উপর এক বৎসর ধরিয়া ঋণপুঁজি ব্যবহারের দরুন মোট 20 টাকা দিতে হইল। এইরূপে হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, সুদের হার হইল বৎসরে 4%।

(ক) কোন দেশের টাকার বাজারে যে সুদের হার প্রচলিত থাকে তাহাকে সাধারণত স্থূল সুদের হার (Gross rate of interest) বলে। ইহার মধ্যে নীট সুদ (Net interest) ছাড়া আরও অনেক কিছু বিষয় জড়ানো থাকে। ঋণপুঁজির ব্যবহারের জন্য উহার মালিককে যাহা দিতে হয়, তাহাই প্রকৃত সুদ বা নীট সুদ। স্থূল সুদের মধ্যে ইহা ছাড়া (খ) ঝুঁকি বহন করার দরুন ঋণদাতাকে যে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয় তাহাও নিহিত থাকে। ঝুঁকি বেশি হইলে স্থূল সুদের হার বেশি হইবে, ঝুঁকি কম হইলে স্থূল সুদের হারও কম হইবে। (গ) তাহা ছাড়া, ঐ ঋণ ফেরত পাওয়ার জন্য অনেক সময় ঋণদাতাকে বহু হাঙ্গামা পোহাইতে হয়, হিসাব রাখিতে হয়, লোকজন পাঠাইতে হয়। এই সকল কাজেই ঋণদাতার খরচপত্র হয়। এই খরচ সে নীট সুদের সঙ্গে যোগ করিয়া লইতে চেষ্টা করে। ইহাও স্থূল সুদের মধ্যে জড়ান থাকে।

স্থূল সুদ ও নীট সুদ

অতীতকালে অত্যন্ত কঠোর শর্তে লোকে অপরকে টাকা ধার দিত। ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে কারাগারে যাইতে হইত; এমন কি অনেক দেশে ঋণদাতার দাস হইয়া সারাজীবন কাটাইতে হইত। এইজন্যই মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, অঋণী থাকা সুখী হইবার একটি উপায়। প্রাচীন আমলে তাই প্রায় সকল দার্শনিকই সুদ গ্রহণ করাকে পাপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মমতে সুদ গ্রহণ করা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত। হিন্দুধর্মেও সুদ গ্রহণ করাকে খুবই ঘৃণ্য কাজ বলা হইয়াছে। সুদের উৎপত্তি হইল কুসীদ হইতে। 'কুসীদজীবী'র (যে সুদের দ্বারা জীবন যাপন করে) অর্থ হইল, যে কুৎসিৎভাবে জীবনযাপন করে। মনুসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে "বার্ধুষিক" অর্থাৎ বৃদ্ধির (সুদ) দ্বারা যাহারা জীবনযাপন করে তাহারা নিন্দনীয়।

প্রাচীন কালে সুদ সম্পর্কে লোকের ধারণা

আজকাল কিন্তু সুদকে ঘৃণ্য বলিয়া মনে করা হয় না। সেকালে লোকে ঋণ লইত প্রধানত আহার, বস্ত্র ও বাসস্থান সংগ্রহ করিবার জন্য, সেইজন্য গরীব লোকের নিকট হইতে সুদ লওয়া অনুচিত মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আজকাল লোকে ঋণ করিয়া তাহাকে উৎপাদনের কাজে, ব্যবসায় বাণিজ্যে নিয়োগ করে। সেই মূলধন নিয়োগ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, মূলধনের প্রধান কাজ হইল উৎপাদন বাড়াইয়া তোলা। সুতরাং ঋণপুঁজি আজকাল উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য, ইহাকে উৎপাদনের

আধুনিক কালে ইহা ঋণপুঁজির দাম হিসাবে গণ্য হয়

উপাদান হিসাবে মনে করা চলে। অন্যান্য সকল উপাদানকে ব্যবহার করিতে হইলে যেরূপ দাম দিতে হয়, ঋণপুঁজির ব্যবহার করিলেও উহার দাম বা সুদ দিতে হইবে।

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় (How rate of interest is determined ?) ঃ পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে সুদ হইল মূলধন ব্যবহারের দাম। সুতরাং অন্যান্য জিনিসপত্রের দামের ন্যায় সুদও নির্ধারিত হইবে মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা।

তিন শ্রেণীর লোকের মূলধনের চাহিদা রহিয়াছে। ব্যবসায়ী, সরকার ও সাধারণ লোক। ব্যবসায়ীরা শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার জন্য বা পুরাতন যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য মূলধন ধার চায়। সাধারণ লোকেরা ভোগদ্রব্য ক্রয়ের জন্য বা পুরাতন ধার শোধ দিবার জন্য ঋণ চায়। আর সরকারের বিভিন্ন কারণে মূলধনের প্রয়োজন হইতে পারে, যেমন, সরকারী আওতায় শিল্প প্রসার, বিভিন্ন জনহিতকর কার্যের সম্পাদন, যুদ্ধ পরিচালনা ইত্যাদি। উপরি-উক্ত তিনটি অংশে যাহাদের মূলধনের চাহিদা রহিয়াছে তাহাদের ভিতর সাধারণ লোকের চাহিদার পরিমাণ মোট চাহিদার সামান্য অংশ মাত্র, সুতরাং ইহার এমন কোন গুরুত্ব নাই। সরকারের চাহিদা সাধারণ লোকের চাহিদার তুলনায় বেশি, এবং এই চাহিদার পরিমাণ আংশিক ভাবে নির্ভর করিবে সুদের হারের উপর। উৎপাদনশীল বা জনহিতকর কাজের জন্য সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ সুদের হারের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের জন্য ঋণ, সুদের হার যাহাই হউক, করিতেই হইবে। ইহাও সত্য যে বর্তমান জগতে যখন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে তখন রাষ্ট্র কর্তৃক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ এবং সুদের হার নির্ধারণে ইহার গুরুত্ব দিন দিন বাড়িতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বে এখনও ব্যবসায়ীদের মূলধনের চাহিদাই হইল ঘটনার মূল নির্ধারক; অর্থাৎ সুদের হার প্রধানত তাহাদের চাহিদার উপর নির্ভর করে। এখন ব্যবসায়ী যখন মূলধন ধার করে তখন দুইটি বিষয় বিচার করে, (১) এই অতিরিক্ত মূলধন ধার করিয়া উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করিলে তাহার আয় কত বাড়িবে এবং (২) এই মূলধন পাইতে হইলে তাহার ব্যয় অর্থাৎ সুদ কত। যেখানে মূলধন হইতে আয় মূলধনের সুদের সমান হয় সেখানেই সে থামিয়া যায় এবং আর অতিরিক্ত মূলধন ধার করে না। বিষয়টি আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ধার-করা মূলধন অবশ্যই ব্যবসায়ী আরো বেশি যন্ত্রপাতি বা মূলধন দ্রব্য (capital goods) ক্রয়ের কাজে লাগাইতেছে, যাহাতে উহার সাহায্যে উৎপাদন

মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা সুদ নির্ধারিত হয়

চাহিদার দিক

আরও বাড়ানো যায় ; সুতরাং মূলধন হইতে আয় বলিতে বুঝাইবে এই মূলধন দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদন। আমরা জানি অন্যান্য উৎপাদক উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়া যদি একটিমাত্র উপাদানের পরিমাণ বাড়ানো হয় তবে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে যত মূলধন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ানো হইবে ততই তাহার প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে থাকিবে। এইভাবে কমিতে কমিতে যখন এই প্রান্তিক উৎপাদন মূলধনের সুদের সমান হয় তখন সে ধার করিবে না। সুতরাং চাহিদার দিক হইতে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে। সুদের হার যদি বাড়ে মূলধনের চাহিদা কমিবে, কারণ, সুদ বেশি হওয়ার অর্থ হইল মূলধন শুধু সেই সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইবে যেখানে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বেশি। অপরপক্ষে সুদের হার কমিলে মূলধনের চাহিদা বাড়িবে, কারণ, যেসকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা কম সে সকল ক্ষেত্রে তখন মূলধন ব্যবহৃত হইবে।

চাহিদার দিক হইতে সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান

এখন মূলধনের যোগানের দিক আলোচনা করা যাউক। মূলধনের যোগান নির্ভর করে লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ ও ধার দেওয়ার ইচ্ছার উপর। সুদের হার বেশি হইলে লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ ও মূলধনের যোগান বাড়িবে। সুদের হার কমিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ ও মূলধনের যোগান কমিবে। কারণ, লোকে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া তত বেশি ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করিতে অর্থাৎ সঞ্চয় করিতে রাজি হইবে যত সে প্রতীক্ষার বেশি পুরস্কার, অর্থাৎ বেশি সুদ পাইবে।

যোগানের দিক

মানুষ বর্তমানকে বড় করিয়া দেখে এবং ভবিষ্যৎকে একটু ছোট করিয়া দেখে, কারণ, বর্তমান জীবন্ত, ভবিষ্যৎ সুদূর ও অনিশ্চিত। সুতরাং একমাত্র অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশাই তাহাকে তাহার ঐ বর্তমান-প্রীতি জয় করিতে (overcome the preference for present) উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। এই জন্যই সুদের হারে হ্রাস ও বৃদ্ধি মূলধনের যোগান যথাক্রমে কমাইবে ও বাড়াইবে।*

সুতরাং দেখা গেল যে সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে মূলধনের চাহিদা কমে এবং যোগান বাড়ে ; অপরপক্ষে সুদের হার কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং যোগান কমে।

* অধ্যাপক কেইনস্ তাঁহার সুদ সম্পর্কিত নগদ পছন্দ তত্ত্বে (Liquidity Preference Theory) বলিয়াছেন যে বিভিন্ন কারণে মানুষ হাতে নগদ টাকা মজুত রাখিতে চায় ; এবং যাহাতে সে সঞ্চয়কে হাতে নগদ অর্থরূপে মজুত না করিয়া লগ্নী হিসাবে বিনিয়োগ করিতে রাজী হয়, সেই জন্যই সুদ দিতে হয়। সুদ হইল মানুষের নগদ পছন্দকে জয় করার আবশ্যকীয় দাম। সুদের হার যত বেশি হইবে ততই মানুষের নগদ পছন্দ হ্রাস পাইবে আর সুদের হার যত কম হইবে তত নগদ-পছন্দ বাড়িবে।

এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সুদের হার সেই স্তরে আসিয়া স্থির হইবে যেখানে মূলধনের চাহিদার পরিমাণ মূলধনের যোগানের পরিমাণের সমান হয়। এই হারকে বলা হয় সাম্যাবস্থার সুদের হার বা সুদের স্থিত হার (Equilibrium rate of interest)। সুদের হার ইহার উপরে উঠিলে মূলধনের যোগান চাহিদা অপেক্ষা বেশি হইবে, ফলে সুদের হার নামিয়া আবার সাম্যাবস্থায় পৌছিবে; অপরপক্ষে সুদের হার ইহার নীচে নামিলে মূলধনের চাহিদা যোগান অপেক্ষা বেশি হইবে এবং ফলে সুদের হার বাড়িয়া আবার সাম্যাবস্থার হারে উপস্থিত হইবে।

নিম্নে একটি কাল্পনিক হিসাবের সাহায্যে এই বিষয়টি বুঝান হইল।

সুদের হার	মূলধনের চাহিদা (টাকায়)	মূলধনের যোগান (টাকায়)
7%	20000	40000
6%	25000	35000
5%	30000	30000
4%	40000	25000

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে শতকরা 5 টাকা সুদের হারেই মূলধনের চাহিদা ও যোগান সমান হয়। সুতরাং শতকরা 5 টাকাই সুদের হার নির্দিষ্ট হইবে।

সুদের হারে তারতম্য : এখন আমরা আলোচনা করিব বিভিন্ন ধরনের ঋণের হার বিভিন্ন হয় কেন। সরকার শতকরা 3 অথবা 4 টাকা সুদে যত ইচ্ছা টাকা ধার করিতে পারে অথচ কৃষকদের ধার করিতে হইলে মহাজনদের অনেক বেশি হারে সুদ দিতে হয়। আর কাবুলিওয়ালাদের বেলায় তো কথা নাই। এই তারতম্যের কারণ কি?

সুদের হারে তারতম্যের কারণ

প্রথমেই বুঝিতে হইবে সব ক্ষেত্রে নীট সুদ সমান; পার্থক্য হইতেছে স্থূল সুদে (Gross interest) এবং ইহার কারণ বিভিন্ন ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতার ঝুঁকিবহন, পরিশ্রম ইত্যাদিতে তারতম্য। এখন বিস্তৃতভাবে এই কারণগুলি বুঝিতে হইবে।

১। ঝুঁকিবহনের তারতম্য

ঋণদাতা ঋণ দিতে গিয়া অল্পবিস্তর ঝুঁকি বহন করে ইহা সত্য। তাই যে ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি সে ক্ষেত্রে বেশি সুদ চাহিবে, এবং যে ক্ষেত্রে ঝুঁকি কম সে ক্ষেত্রে কম সুদ চাহিবে। সরকার খুব কম সুদে টাকা ধার পাইতে পারে, কারণ, এ ক্ষেত্রে ঋণদাতার ঝুঁকি খুব সামান্যই। কৃষকদের বেশি সুদ দিতে হয়, কারণ, দরিদ্র কৃষকরা ঋণ শোধ দিতে পারিবে কি না এ সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকে না, ফলে ঋণদাতার বেশি ঝুঁকি থাকে।

ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে সাধারণত ঋণগ্রহীতার জামিন (সিকিউরিটি) কোন-না-কোন রকমে রাখিতে হয়। যে ক্ষেত্রে কোন সিকিউরিটি থাকে না বা সিকিউরিটি নির্ভরযোগ্য নয় সে ক্ষেত্রে ঝুঁকি বহন করিতে হয় এবং সুদ বেশি হয়। আবার নির্ভরযোগ্য সিকিউরিটি থাকিলে সুদ কম হয়।

দ্বিতীয়ত, ঋণ দিলে সুদ-আসল আদায় করিবার জন্য অনেক সময় ঋণদাতার যথেষ্ট ঝামেলা পোহাইতে হয়। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই সুদের হার বেশি হইবে। এই কারণে ঋণদাতা, দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কৃষক ঋণগ্রহীতাদের কাছে বেশি সুদ দাবী করিয়া থাকে। কাবুলিওয়ালারা যে উচ্চ হারে সুদ আদায় করে তাহার আসল কারণ ইহাই। দীর্ঘ-মেয়াদী সুদের হার সাধারণত স্বল্পমেয়াদী সুদের হার অপেক্ষা বেশি হয়। টাকাটা বেশি সময় আটক থাকে বলিয়াই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের বেলায় ঋণদাতা বোশ সুদ দাবী করে। মোটামুটিভাবে একথা বলা যায় যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের চাহিদা বেশি, যোগান কম এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণের চাহিদা কম, যোগান বেশি। সুতরাং এইজন্য ইহাদের তারতম্য হয়। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা ভাল বন্ধক রাখিয়া অল্প সময়ের জন্য ঋণ নেয় বলিয়া ব্যাংকগুলি তাহাদের অল্প সুদে টাকা ধার দেয়, অপরপক্ষে কৃষকেরা দীর্ঘ সময়ের জন্য ধার নেয় এবং ঝুঁকি বেশি থাকে বলিয়া ঋণদাতারা তাহাদের কাছ হইতে বেশি সুদ আদায় করে।

২। আদায়ের পরিশ্রম ও খরচের তারতম্য

৩। ঋণের মেয়াদের তারতম্য

কিন্তু এই সমস্ত কারণ ছাড়া, সুদের হারের তারতম্যের অন্য কারণ আছে। অনেক সময় ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া তাহাদের শোষণ করে ও অন্যায়ভাবে বেশি সুদ আদায় করে। অনেক সময়ই আমাদের দেশে কৃষক ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর ঋণগ্রহীতাদের খুব উচ্চ হারে সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে হয়।

৪। দরিদ্র ঋণগ্রহীতার অসহায়ত্ব

মুনাফা কাহাকে বলে (What is Profit): অন্যান্য সকল উপাদানকে একত্রে মিলাইয়া-মিশাইয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করার নাম সংগঠন। উদ্যোক্তার কাজ হইল এইরূপ সংগঠন করা। তাহার উদ্যোগক্ষমতা, পরিচালন-যোগ্যতা, সংগঠনী-শক্তি—ইহারা উৎপাদনের অঙ্গ বিশেষ, তাই উদ্যোক্তাকে উৎপাদক বলিয়া মনে করা হয়। এই সকল কাজের দরুন উদ্যোক্তার যে প্রাপ্য তাহাকে মুনাফা বলে।

ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা মোট রেভিনিউ হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে অবশিষ্ট অর্থকে স্থূল মুনাফা (gross profit) বলা হয়। একক-মালিকানা-ফার্মের

উদ্যোক্তা অনেক সময়েই উৎপাদনের কাজে নিজের টাকা খাটায়, নিজেই মজুরদের সঙ্গে পরিশ্রম করে, আবার উৎপাদনের সংগঠন ও পরিচালনার কাজও চালাইয়া যায়। অনেক সময় নিজের জমিতেই সে উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করে। এই সকল বিষয়ের দরুন তাহার মোট আয়ের বা মোট মুনাফার মধ্যে আরও অনেক কিছু জড়িত থাকে। উদ্যোক্তা নিজে যে পরিশ্রম করেন, তাহার দরুন পারিশ্রমিক মোট মুনাফার মধ্যে আছে। অন্য কোন ফার্মে মাহিনা লইয়া পরিচালকের কাজ করিলে যে মাহিনা তিনি পাইতে পারিতেন, সেই পরিমাণ অর্থ মোট মুনাফা হইতে বাদ দিয়া হিসাব করা দরকার। তাহা ছাড়া উদ্যোক্তা নিজের টাকা মূলধন হিসাবে ব্যবসাতে খাটাইতেছেন, এইরূপ হইতে পারে। অন্য কোথাও টাকা খাটাইলে তিনি সুদ পাইতে পারিতেন, নিজের ব্যবসাতে টাকা খাটাইবার দরুন পৃথক্‌ভাবে সেই সুদ পান না, উহা মোট মুনাফার মধ্যে জড়িত থাকে। সেই সুদকে হিসাবের সময় বাদ দিতে হইবে। যদি নিজের জমি বা ঘরবাড়িকে তিনি অন্য কোথাও ভাড়া দিতেন, তাহা হইলে খাজনা হিসাবে তাঁহার কিছু আয় হইতে পারিত। নিজের ব্যবসাতে খাটাইলে নিজস্ব জমি হইতে পৃথক্‌ খাজনারূপে আয় পাওয়া যায় না, উহা মোট মুনাফার মধ্যে জড়িত থাকে। হিসাব করিয়া এইরূপ খাজনাকেও মোট মুনাফা হইতে বাদ দেওয়া দরকার। এই সকল বিষয় বাদ দিয়া নীট মুনাফা (net profit) পাওয়া যায়।

স্থূল মুনাফা
নীট মুনাফা

নীট মুনাফা কি কি বিষয় লইয়া গঠিত (Elements in net profit) **:** উৎপাদনের কাজে উদ্যোগ-শক্তি বা উদ্যোগ-ক্ষমতা যোগান দিবার জন্য উদ্যোক্তা যে দাম পায় তাহাই মুনাফা। আধুনিক ব্যবসা-জগতে উদ্যোক্তা কি কাজ করে? কিসের জন্য সে মুনাফা পাইয়া থাকে?

আমরা জানি যে, উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হইল ঝুঁকি বহন করা। প্রত্যেকটি ব্যবসাতেই অনেক রকমের ঝুঁকি আছে, কারণ, এই পৃথিবীতে ভবিষ্যতে কখন কি ঘটিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। গতিশীল জগতে ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত। কারখানায় আগুন লাগিতে পারে, উদ্যোক্তা নিজে মারা যাইতে পারেন, মালভর্তি জাহাজ ডুবিয়া যাইতে পারে। অবশ্য এইরূপ সকল প্রকার ঝুঁকির বিরুদ্ধেই উদ্যোক্তা বীমা (insurance) করিয়া রাখিতে পারেন।

কিন্তু সকল ব্যবসাতেই এক বিশেষ ধরনের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা আছে, যাহা বীমা করিয়া এড়ানো সম্ভব নয়। ইহা হইল ব্যবসাতে লোকসানের ঝুঁকি। কোন

বীমা কোম্পানী এই ঝুঁকির দায়িত্ব লইতে চাহে না। বাজার চাহিদা কেমন থাকিবে, এই সম্পর্কে উদ্যোক্তার ধারণা ভুল হইতে পারে, ব্যবসাতে যে-টাকা খাটানো হইয়াছে তাহা মারা পড়িতে পারে। দ্রব্যটি নতুন এবং বাজারে তখনও পরীক্ষিত হয় নাই, এইরূপ অবস্থায় সেই ঝুঁকি আরও বেশি। অনেক দিন ধরিয়া খুব ভাল বিক্রয় হইতেছে, এরূপ দ্রব্যের চাহিদাও হঠাৎ কমিয়া যাইতে পারে; চিরকাল ধরিয়া কোন দ্রব্যের চাহিদা সমানে চলিতে থাকিবে এমন কেহই বলিতে পারে না। কোন প্রতিযোগী ফার্ম হঠাৎ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়া দিতে পারে, অনেক কম দামে বাজারে দ্রব্যটি বিক্রয় করা শুরু করিতে পারে। ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে। এই সকল বিষয়ে চাহিদা কখন হঠাৎ কমিয়া যাইবে তাহা কেহ সঠিক করিয়া বলিতে পারে না, সুতরাং এই সকল ব্যবসায়িক ঝুঁকি কেহ বীমা করিয়া এড়াইতে পারে না।

কিরূপে ঝুঁকির উৎপত্তি হয়

এইরূপ ঝুঁকি বহন করাই উদ্যোক্তার প্রধান কাজ। এই সকল ঝুঁকি লওয়া সহজ নয় বলিয়াই তিনি পুরস্কার পান, মুনাফা করিতে পারেন। কি দ্রব্য কত পরিমাণে, কোন্ পদ্ধতিতে উৎপাদন করিবেন; কি দামে কোন্ বাজারে কাহার মারফত বিক্রয় করিবেন—এই সকল বিষয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত ভুল হইলেই তাঁহার ক্ষতি হইবে। ক্ষতির ঝুঁকি বহন করেন বলিয়াই তিনি মুনাফা করিতে পারেন।

মুনাফা হইল ঝুঁকি বহনের পুরস্কার, উহাই "স্বাভাবিক" মুনাফা

অনেক সময় কোন ব্যবসায়ী অবিরাম বিজ্ঞাপন ও প্রচারের দ্বারা বা রাষ্ট্রের সাহায্য লইয়া বাজারে একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া অবস্থা সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে পারেন। তখন সেই অবস্থায় তিনি "স্বাভাবিক" মুনাফা হইতে আরও কিছু বেশি মুনাফা পাইতে পারেন। তাহা ছাড়া অনেক সময় দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তনে ব্যবসায়ী অপ্রত্যাশিতভাবে মুনাফা লাভ করিতে পারেন। হঠাৎ কোন কারণে, যেমন—যুদ্ধ বাঁধিলে বা জনসংখ্যা বাড়িয়া গেলে, বিদেশ হইতে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে, প্রতিযোগী ফার্মের সংখ্যা কমিয়া গেলে তাঁহার মুনাফা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই সকল কারণে দ্রব্যের দাম সহসা বৃদ্ধি হয় এবং উদ্যোক্তাও প্রচুর মনাফা পাইয়া থাকেন। ঝুঁকি বহনের ফলে প্রাপ্ত "স্বাভাবিক" মুনাফা হইতে বাস্তবক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের "প্রকৃত" মুনাফা তাই বেশি হইতে পারে।

একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া অবস্থার দরুন এবং অপ্রত্যাশিত কারণেও মুনাফা লাভ হয়

মুনাফা দেখা দেয় কেন (Why do Profits arise ?): কেন মুনাফা দেখা দেয় সেই সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। ব্যবসায়ীরা মুনাফা পান কেন,

তাহা লইয়া বিভিন্ন ধনবিজ্ঞানী বিভিন্নরূপ চিন্তা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এই সমাজের বিভিন্ন দিকে সদা-সর্বদা পরিবর্তন চলিতেছে। জনসংখ্যা বাড়িতেছে, মূলধনের পরিমাণ বাড়িতেছে, ফ্যাশান, রুচি, বিজ্ঞাপন ও শিল্পজ্ঞান, সব কিছুই পরিবর্তিত হইতেছে। এই সকল বিষয় বদল হইলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা যোগান সকলের অজান্তে বদল হইয়া যায়। তাই ব্যবসায়ীদের লাভ হয়, এই পরিবর্তন হইতে তাহারা লাভ করিতে পারেন। সমাজ গতিশীল না থাকিলে মুনাফাও থাকিবে না, মুনাফাশূন্যতা দেখা দিবে (zero profit)। স্যুমপিটার নামে একজন প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, উদ্যোক্তারা সব সময় বাজারে নূতন নূতন জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি চালাইয়া লাভের চেষ্টা করে, তাহাতেই সমাজে গতির সঞ্চার হয়।

কেহ বলেন গতিশীলতা

আবার কেহ কেহ বলেন যে মুনাফার মূল কারণ ঝুঁকি বহন। এই সমাজে সকল সময়েই পরিবর্তন হইতেছে, তাই কোন কিছু তৈরার করা খুব ঝুঁকির ব্যাপার। কিন্তু পুরস্কার না পাইলে কেন উদ্যোক্তারা এই ঝুঁকি লইবেন? যিনি সবচেয়ে ভালভাবে ঝুঁকি লইতে পারেন, তাঁহার মুনাফা বেশি হয়; সকল ব্যবসায়ে ঝুঁকি সমান নয়, তাই মুনাফাও পৃথক্।

কেহ বলেন ঝুঁকি বহন

আজকাল আবার অনেকে বলেন যে, মুনাফা দেখা দেয় বর্তমান সমাজের বিশেষ এক ধরনের নিয়ম হইতে। তাহার নাম চুক্তি। ব্যবসায়ীরা বুদ্ধিমান, তাঁহারা জানেন কোন্ জিনিসের দাম বাড়িতে পারে। সেই দ্রব্য তৈয়ারির পূর্বে তাঁহারা উপাদানের মালিকদের সঙ্গে চুক্তি করিয়া রাখেন। জিনিসের দাম বাড়িল কিন্তু উপাদানের মালিকেরা চুক্তিতে আবদ্ধ থাকায় নিজেদের দাম বাড়াইতে পারিল না। তাই উদ্যোক্তাদের মুনাফা হইল। এই সকল ধারণার মধ্যে কাহাকেও একেবারে ভুল বলা চলে না, সকলের মধ্যেই কিছু কিছু সত্যদৃষ্টি লুকানো আছে।

কেহ বলেন চুক্তি ব্যবস্থা

মজুরি কাহাকে বলে : আর্থিক মজুরি ও আসল মজুরি (What are Wages : Money wages and Real wages) : উৎপাদনের কাজে শ্রমশক্তি খাটাইবার জন্য পারিশ্রমিক হিসাবে শ্রমিক যাহা পাইয়া থাকে, তাহাকে মজুরি বলে। মজুরি হইল শ্রমশক্তির দাম। নির্দিষ্ট সময় কাজ করিবার দরুন অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপাদান হিসাবে উৎপাদনের কাজে শ্রম-শক্তি বিক্রয় করার জন্য শ্রমিক এই মজুরি পাইয়া থাকে। অনেক সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের পর শ্রমিক মজুরি পায়।

ক্রেতা যেমন সবচেয়ে কম দামে জিনিস কিনিতে চায়, সেইরকম উদ্যোক্তারাও খুব কম মজুরিতে শ্রম-শক্তি কিনিতে চেষ্টা করে। বিক্রেতা যেমন সবচেয়ে বেশি দামে জিনিস বেচিতে চায়, সেই রকম শ্রমিকেরাও খুব বেশি দামে শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমের বাজারে উভয় পক্ষের শক্তি ঠিক সমান নয়। দর-কষাকষির ব্যাপারে শ্রমিকেরা মালিকের তুলনায় খুবই দুর্বল। ইহার কারণ হইল —শ্রমিকদের কোন সঞ্চয় থাকে না, কম মজুরি দিলেও আহার বস্ত্র জোটাইবার জন্য তাহাদের কাজ করিতেই হয়, যে দামে শ্রম-শক্তি বিক্রয়ের ইচ্ছা নাই, সেই দামে বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিতে হয়। মালিকেরা শ্রমিকের এই অবস্থার সুযোগ লইয়া কম মজুরি দেয়। শ্রমশক্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কাজ না করিয়া উহাকে জমাইয়া রাখা চলে না। অন্যান্য দ্রব্য যেমন মজুত করিয়া রাখা চলে, দামে পছন্দ না হইলে বিক্রয় না করিয়া তুলিয়া রাখিতে পারে, শ্রম-শক্তি সেরূপ তুলিয়া রাখা যায় না। যে কোন মজুরিতে কাজ করিয়া আহার বস্ত্র সংগ্রহ করিতে হয়। দরকষাকষির ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা তাই দুর্বল। শ্রমিকেরা অশিক্ষিত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া থাকার ফলেও মালিকেরা কম মজুরিতে তাহাদের খাটাইতে পারে। তাহা ছাড়া, মালিকেরা মোটামুটি সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে। ফলে, শ্রমিকেরাও সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ না করিলে শোষিত হইবেই।

শ্রমিকের সঞ্চয় নাই, শ্রমশক্তিকে সঞ্চিত করিয়া রাখা চলে না, শ্রমিকেরা অশিক্ষিত

শ্রমিক সংঘ বিভিন্নরূপে সংগঠিত হইতে পারে। কোন বিশেষ শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মের শ্রমিকেরা একত্র হইয়া শিল্পগত শ্রমিত সংঘ গঠন করিতে পারে (যেমন, পাটকল কর্মচারী সমিতি) অথবা কোন কোন বিশেষ মালিকের অধীনস্থ বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকেরা একত্র হইয়া মালিকগত শ্রমিক-সংঘ স্থাপন করিতে পারে (যেমন, বিড়লা কর্মচারী সমিতি)। শিল্পগত ও মালিকগত বিভিন্ন শ্রমিক সংঘ দেশের মধ্যে নিজেদের কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপন করে (যেমন, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস)। সেই কেন্দ্রীয় সংগঠনের মারফত নিজেদের স্বার্থে আইন-কানুন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকারের উপর চাপ দিবার চেষ্টা করে।

শ্রমিক সংঘের সাংগঠনিক রূপ

শ্রমিক সংঘের কাজকর্মকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে: (ক) শ্রমিক-মঙ্গলবিষয়ক কাজকর্ম এবং (খ) সংগ্রামী কাজকর্ম বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে শ্রমিকদের অর্থ সাহায্য করা, বেকার ভাতা দেওয়া, অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করা, শিক্ষার জন্য স্কুল বা কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, গৃহ নির্মাণ করা,

শ্রমিক সংঘের দুই ধরনের কাজ-কর্ম

আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও মনকে উন্নত করা, এই সকল কাজকে শ্রমিকমঙ্গলসংক্রান্ত কাজকর্ম বলে। মালিকের সঙ্গে মজুরি বা চাকুরির শর্তাদি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা, মালিককে সর্বদা চাপ দেওয়া, ধর্মঘটের ব্যবস্থা করা, এই সকল কাজকে সংগ্রামী কাজকর্ম বলে।

শ্রমিক সংঘের সুফল

শ্রমিক সংঘের সর্বাপেক্ষা সুফল হইল ইহা শ্রমিকদের দরকষাকষির শক্তি বাড়াইয়া দেয়। শ্রমিক সংঘ না থাকিলে মালিকেরা প্রত্যেক শ্রমিকের অভাবের ও দুরবস্থার সুযোগ লইয়া খুব কম মজুরি দিতে পারে। একতাই বল। শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস আসে এবং অসহায়বোধ কাটিয়া যায়। নিজেদের অধিকার ও সম্মান রক্ষার মনোভাব জাগিয়া উঠে। শ্রমিক সংঘের মারফতই মালিক শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ জানিতে পারে। শ্রমিক সংঘ আছে বলিয়াই সংঘবদ্ধভাবে পারস্পরিক আপস-মীমাংসা সম্ভব হয়। শ্রমিকমঙ্গলসংক্রান্ত কাজকর্ম শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতাকে বাড়াইয়া দিয়া মজুরি বৃদ্ধির সহায়তা করে।

শ্রমিক সংঘের কুফল

শ্রমিক সংঘের প্রধান কুফল হইল, ইহা অনেক সময় অধিক পরিমাণ শ্রমিকের নিয়োগে বাধা দেয়। মালিকের সহিত দরকষাকষি করিয়া অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘ এই নিয়ম করে যে একমাত্র সংঘের মারফত এবং উহার সহিত পরামর্শ করিয়াই মালিকেরা নূতন শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারিবে। নূতন মজুর নিযুক্ত হইলে পুরাতন শ্রমিকের আয় কমিয়া যাইতে পরে (যেমন, উপরি-সময় হইতে যে আয় পাওয়া যাইত)। এইজন্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিক সংঘ অধিক পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগে বাধা দেয়। শহরের রিক্‌শাচালক সংঘ বেশি পরিমাণ রিক্‌শার লাইসেন্স দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, বাজারের মাছ-বিক্রেতারা মাছ বিক্রয়ের আরও বেশি লাইসেন্স দেওয়া অপছন্দ করে। অনেক সময় নূতন ধরনের যন্ত্র প্রয়োগে শ্রমিক সংঘ বাধা দেয়, কারণ, তাহাতে সাময়িকভাবে বেকারির সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় তাহারা জবরদস্তি করিয়া এমন বেশি মজুরি দাবী করিতে থাকে যে ব্যবসা উঠিয়া যায়; ফলে সেই দেশে মোট মজুরের চাকুরির সংখ্যা হ্রাস পায়। শ্রমিক সংঘ ধর্মঘট করিলে কিছুসংখ্যক মজুরের মজুরি একটু বাড়িতে পারে বটে, কিন্তু সমাজের সম্পদ্ উৎপাদন ব্যাহত হয় ও জাতীয় আয় কমিয়া যায়।

সংঘবদ্ধ দরকষাকষি (Collective Bargaining): কোন একটি শিল্পের মধ্যে যত ফার্ম আছে তাহার মালিকেরা একত্র হইয়া মালিক সংঘ (employer's association) গঠন করে। সকল ফার্মের শ্রমিকেরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ফার্মগত অথবা একত্র হইয়া শিল্পগত শ্রমিক সংঘ গঠন করে। মালিক সংঘ সেই শিল্পে

মজুরির হার যথাসম্ভব কম রাখিবার চেষ্টা করে এবং শ্রমিক সংঘ মজুরির হার যথাসম্ভব বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। উভয় সংঘের আলাপ-আলোচনা, বিবাদ-বিসংবাদ ও দরকষাকষির মধ্য দিয়া সেই শিল্পে মজুরির হার স্থির হয়। উভয় প্রকার সংঘের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে শিল্পবিরোধ দেখা দেয়।

শ্রমিক সংঘের উপর চাপ দিবার জন্য মালিকেরা সর্বদা প্রচার ও বিজ্ঞাপনের সাহায্য লয়। তাহাদের হাতে সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে থাকে 'তালাবন্ধ' (lock-out) করা, অর্থাৎ সাময়িকভাবে কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া। মজুরদের কাজ থাকে না, মাহিনা পায় না—এইরূপে তাহাদের উপর মালিকেরা চাপ দিতে থাকে।

মালিক সংঘের উপরে চাপ দিবার জন্য শ্রমিকেরা সর্বদা প্রচার ও আন্দোলনের সাহায্য লয়। তাহাদের হাতে সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে থাকে ধর্মঘট (strike), অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃত ও সংঘবদ্ধভাবে কাজে যোগদান হইতে বিরত থাকা। উৎপাদন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে, মালিকদের মুনাফা কমিয়া যায়—এইরূপে মালিকদের উপর শ্রমিকেরা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য চাপ দিতে থাকে।

দরকষাকষির ক্ষেত্রে দুই পক্ষের যুদ্ধ-কৌশল (tactics) অনেকখানি নির্ভর করে ব্যবসার অবস্থার উপর। দেশে বেকারির পরিমাণ বেশি থাকিলে শ্রমিক সংঘ একটু দুর্বল হয়, কারণ, তাহাদের অর্থসম্পদ্ সেই সময় কম এবং শ্রমিকদের আনুগত্য একটু শিথিল। কারণ, ব্যবসার খারাপ অবস্থায় কোন কোন ফার্ম হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে এবং শ্রমিকেরা বেকার হইয়া পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যদি ব্যবসার অবস্থা দেশে ভাল থাকে, তাহা হইলে শ্রমিক সংঘ তুলনামূলকভাবে অধিকতর শক্তিশালী হয়, কারণ, দেশে শ্রমিকের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়। মালিকেরা শ্রমিকদের দাবি সহজে মানিয়া লইতে রাজী না হইয়া পারে না।

সাধারণভাবে পূর্ণ কর্ম-নিয়োগের সময় ছাড়া মালিক-সংঘই অধিকতর শক্তিশালী থাকে। কারণ, মালিকেরা সংখ্যায় অল্প, পরস্পরের সহিত সহজেই একমত হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর। নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতা অনেক বেশি। তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতিপত্তি, সহায়-সম্পদ্ এবং প্রচার-যন্ত্রের কৌশলী ব্যবহারের সম্মুখে শ্রমিকদের সংগঠন স্বভাবতই দুর্বল, কারণ, কোনমতে শ্রম বিক্রয় করিতে না পারিলে শ্রমিকদের জীবনধারণ চলিবে না।

শ্রমিক-সংঘ কিরূপ অবস্থায় মজুরি বাড়াইতে পারে? প্রাচীনকালের ধন-বিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, শ্রমিক সংঘ কখনই সকল মজুরের মজুরির হার বাড়াইতে পারে না। জোর করিয়া মজুরি বাড়াইলে মুনাফা কমিয়া যায়। স্বাভাবিক মুনাফা না পাইলে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয়, শ্রমিকেরা

ছাঁটাই হয়, তাহারা বেকার হইয়া পড়ে। মুনাফা "স্বাভাবিক" স্তরে রাখিতে গেলে জিনিসের দাম বাড়াইতে হইবে, বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে; এরূপ অবস্থায় উৎপাদন কমিবে, ফলে শ্রমিকেরা বেকার হইবে। সুতরাং, প্রাচীন ধন-বিজ্ঞানীরা বলেন যে, শ্রমিক সংঘ মজুরির হার বাড়াইলে দেশে বেকারি অনিবার্য।

শ্রমিক সংঘ কিরূপ অবস্থায় মজুরি বাড়াইতে পারে।

কিন্তু আমরা বাস্তব জগতে দেখিতে পাই যে, শ্রমিকদের দুর্বল ও অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া মালিকেরা তাহাদের খুবই কম মজুরি দিয়া থাকে। শ্রমিক সংঘ তাই মজুরি কিছুটা বাড়াইতে পারে। শ্রমিক-মঙ্গল সংক্রান্ত কাজ-কর্মের ফলে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, মজুরির হারও বাড়ে। তবে মনে রাখা দরকার, কয়েকটি বিশেষ অবস্থা বর্তমান থাকিলে একদল শ্রমিকের পক্ষে ধর্মঘট করিয়া মজুরির হার কিছুটা বাড়ানো সম্ভবপর। প্রথমত, যদি সেই শ্রমিকদল এমন হয় যে তাহাদের না হইলে উৎপাদনের কাজ কিছুতেই চলিবে না, উৎপাদন পণ্ড হইয়া যাইবে, তাহা হইলে সেই শ্রমিক সংঘ চাপ দিয়া সহজেই দাবি আদায় করিয়া লইতে পারে। যদি সেই শ্রমিকদের বদলে অন্য উপাদান ব্যবহার করা কিছুতেই সম্ভব না হয় তাহা হইলেই ইহা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকেরা যে-দ্রব্য উৎপন্ন করে তাহার চাহিদা বাজারে কিরূপ তাহাও দেখিতে হইবে। যদি দ্রব্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে জিনিসের দাম অল্প একটু বাড়িলেও চাহিদা বিশেষ কমিবে না। এরূপ অবস্থায় শ্রমিক সংঘ চাপ দিয়া মজুরি বাড়াইতে পারিবে। যদি দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে দাম অল্প একটু বাড়িলেই জিনিসের চাহিদা প্রচুর কমিয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় শ্রমিক-সংঘ চাপ দিলেও মজুরি বাড়িবার সম্ভাবনা কম, তৃতীয়ত, যদি ধর্মঘটী শ্রমিকদলের মোট মজুরির পরিমাণ দ্রব্যটির উৎপাদন-ব্যয়ের অল্প অংশ হয়, তাহা হইলে শ্রমিক সংঘের পক্ষে দাবি আদায় করা সহজ। চতুর্থত, যদি উৎপাদনে নিযুক্ত অপরাপর উপাদানসমূহের পারিশ্রমিক বা দাম কমানো সম্ভবপর হয় তাহা হইলে শ্রমিক-সংঘের পক্ষে মজুরি বৃদ্ধি করা সহজ হইবে।

1. উ�ৎপাদনে শ্রমিকদলের বিনিদিষ্টতা
2. দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপক
3. মোট মজুরির পরিমাণ
4. অন্যান্য উপাদানের মালিকদের উপর চাপ দেওয়া সম্ভব কিনা

জাতীয় আয় কাহাকে বলে (What is National Income) : "কোন দেশের শ্রম ও মূলধন, প্রকৃতি হইতে উপকরণ আহরণের দ্বারা এক বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তুজাত দ্রব্য ও বিভিন্ন কাজকর্মের নীট সমষ্টি (net aggregate) উৎপন্ন করে"—মার্শাল তাহাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন। সকল দেশেই প্রকৃতি

অনেক রকমের উপকরণ দিয়াছেন। জমি, নদী, পাহাড়, পর্বত, খান, সমুদ্র, উপত্যকা ও জলবায়ু, এই সকলই সম্পদ্ উৎপাদনের উৎস-স্বরূপ। এই সকল প্রাকৃতিক উপকরণের সহিত মানুষ তাঁহার শ্রম মিশাইয়া শ্রম উৎপাদন করে। যেমন,—সে পরিশ্রম করিয়া জমিতে শস্য উৎপাদন করে, কাঠ হইতে চেয়ার-টেবিল তৈয়ারী করে, তুলা হইতে কাপড প্রস্তুত করে, খনি হইতে লোহা তুলিয়া হাল লাঙল প্রভৃতি তৈয়ার করে। এইরূপে প্রকৃতির উপকরণের সহিত মানুষের শ্রম মিশাইয়া বিভিন্ন প্রকার সম্পদের সৃষ্টি হয়। এই সকল সম্পদের দ্বারাই মানুষের অভাব মেটে। এই প্রকার বস্তুজাত দ্রব্য ছাডাও কোন দেশে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করা হয়, যেমন—ডাক্তারি, শিক্ষকতা, নাচ, গান প্রভৃতি—ইহাদের দ্বারাও মানুষের বিভিন্ন প্রকার অভাব দূর হয়। সুতরাং ইহারাও সম্পদ্।

প্রকৃতি ও মানুষ মিলিয়া সম্পদ্ উৎপাদন করে

এক বৎসরের মধ্যে কোন দেশের সকল মানুষ মিলিয়া যত রকমের দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে ও অভাব মিটাইবার উপযোগী বিভিন্ন কাজকর্ম করিয়া থাকে, উহাদের সমষ্টিকে সেই দেশের সেই বৎসরের মোট বা স্থূল জাতীয় সম্পদ্ (Gross National Product) বলে। কিন্তু নানা ধরনের আসল জিনিসপত্রের মোট পরিমাণকে যোগ করা যায় না।* তাই এক বৎসরে উৎপাদিত সকল দ্রব্যের ও কার্যের মোট মূল্য টাকাকড়ির অঙ্কে হিসাব করিয়া জাতীয় সম্পদ্ পরিমাপ করা যায়। যেমন, মোট কৃষিজাত দ্রব্যের দাম 500 টাকা, মোট শিল্পজাত দ্রব্যের দাম 1000 টাকা, বিভিন্ন প্রকার কাজকর্ম হইতে আয় 900 টাকা। ইহাদের যোগ করিলে মোট 2400 টাকা পাওয়া যায়। ইহাই সেই দেশের সেই বৎসরের স্থূল জাতীয় সম্পদ্ (Gross National Product বা G. N. P.)।

এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্য ও কার্যের মূল্যকে মোট জাতীয় সম্পদ্ বলে

কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে গেলে অনেক যন্ত্রপাতি বা মূলধনী দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়; তাহার ফলে সেই সকল যন্ত্রপাতি কিছুটা ক্ষয় হইয়া যায়। ইহাতে দেশের লোকসান। এই সকল যন্ত্রপাতির ক্ষয় হইলে জাতির সম্পদ্ কিছুটা কমিয়া যায়। প্রত্যেক বৎসর তাই এই সকল ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য কিছু অর্থ যন্ত্রের মালিক আলাদা করিয়া রাখিয়া দেয়।† হিসাব

মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ বাদ দিলে নীট জাতীয় সম্পদ্ পাওয়া যায়

* যেমন 50000 জোড়া জুতা, 5 লক্ষ ঘণ্টা শিক্ষকতা, 25 লক্ষ গজ কাপড় প্রভৃতি একত্রে যোগ করা যায় কি উপায়ে? তাহা ছাড়া, 50000 জোড়া জুতার মধ্যে ছোট বড় আছে, উহাদের চামড়া ভাল বা খারাপ আছে—কোন্ মাপকাঠিতে ইহাদের আমরা যোগ করিতে পারি?

† কিরূপে এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হিসাব করা হয়? যেমন, একটি তাঁতের সাহায্যে 5 বৎসর কাপড় উৎপাদন করা যায়, ইহাই এই যন্ত্রটির আয়ু। মনে কর, উহার দাম 100 টাকা। একজন তাঁতী সেই

করিয়া ঠিকমত ক্ষয়ক্ষতিপূরণ করিতে পারিলে তবেই উৎপাদক ফার্মগুলির মূলধন অক্ষুণ্ণ থাকে (maintaining capital intact)। এইরূপে এক বৎসরে দেশের উৎপন্ন স্থূল সম্পদ্ হইতে সেই বৎসরের মধ্যে যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ বাবদ অর্থ বাদ দিয়া আমরা নীট জাতীয় সম্পদ্ (Net National Product বা N. N. P.) পাইয়া থাকি।

নীট জাতীয় আয়ের সহিত আরও দুইটি বিষয় যোগ-বিয়োগ করিতে হয়। (i) প্রথমত, দেশের সম্পদের উপর বিদেশী নাগরিকদের মালিকানা থাকিলে উহা জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতে বাদ দিতে হয়, কারণ নিজেদের পাওনা তাহারা নিজের দেশে লইয়া যায়। আবার বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় নাগরিকদের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয়ের সহিত যোগ দিতে হয়, কারণ সেই পাওনা তাহারা দেশে লইয়া আসিবে। (ii) দ্বিতীয়ত, আমদানি-রপ্তানি হইতে দেশের পাওনা বা উদ্বৃত্তকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করিতে হয়; এইরূপ দেনা বা ঘাটতিকে জাতীয় আয় হইতে বিয়োগ করিতে হয়।

এই জাতীয় আয় কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার নহে (not a fund or stock); ইহা স্রোতশীল ধারা (flow)। প্রতি বৎসর সকল উপাদানের কার্যের ফলে এই সম্পদ্ উৎপন্ন হয় এবং সকল উপাদানের মধ্যেই তাহা বণ্টিত হয়। উপাদানসমূহের মিসিত সহযোগে উৎপন্ন এই সম্পদ্ তাহাদের আয়ের উৎসও বটে। এই জাতীয় আয়ই চারিপ্রকার উপাদানের মালিকদের আয়ে বিভক্ত হইয়া যায়। উপাদানের মালিকেরা খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফার রূপে নিজেদের ব্যক্তিগত আয় পাইতে থাকে।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income): জাতীয় আয় হইল (ক) এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির মোট দাম; (খ) সকল উপাদানের আয় সৃষ্টি হইবার উৎস ও ভাণ্ডার, এবং (গ) সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল। সুতরাং ইহার পরিমাপ তিনভাবে হইতে পারে। প্রথমত, সেই বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির দাম যোগ করিয়া; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কার্যে সহায়তার দরুন উপাদানসমূহের সকল পাওনা

পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি

তাঁতটির সাহায্যে এক বৎসরের মধ্যে 1000 টাকা মূল্যের কাপড় উৎপাদন করিল। কিন্তু এই কাজে এক বৎসর তাহার তাঁতের $\frac{1}{5}$ অংশ ক্ষয় পাইল। এই ক্ষয় পূরণের জন্য সে কিছু টাকা আলাদা করিয়া রাখিয়া না দিলে পাঁচ বছর পরে তাঁতটি অকেজো হইয়া পড়িবে. উহার সাহায্যে সে আর কাপড় তৈয়ারি করিতে বা সম্পদ্ সৃষ্টি করিতে পারিবে না। সুতরাং সে তাঁতের এই ক্ষয় পূরণ করিবার জন্য 1000 টাকা হইতে যন্ত্রের মূল্যের $\frac{1}{5}$ অংশ, অর্থাৎ 20 টাকা আলাদা করিয়া রাখিয়া দিল। এই 980 টাকাই হইল তাহার নীট উৎপাদন বা নীট সম্পদ্।

(Payments) যোগ করিয়া, এবং তৃতীয়ত, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয় যোগ করিয়া। এই তিনটি হিসাব স্বভাবতই সমান হইবে, কারণ মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আয় সৃষ্টি হয়, মোট উৎপন্নের দাম সকল উপাদানের পাওনা লইয়াই গঠিত হয়; এবং সমাজের মোট আয় সকলের হাতে ভোগব্যয় ও সঞ্চয়রূপে ছড়াইয়া থাকে। প্রথমটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Final Products Total), দ্বিতীয়টিকে বলা হয় সম্পূর্ণ উৎপাদন পাওনার সমষ্টি (Factor Payments Total), এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ভোগ-সঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Savings Total)। প্রথম পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্য ও কার্যাদির (goods and services) দাম যোগ করিয়া; দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সকল উপাদানের পাওনা বা আয় যোগ করিয়া; এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে সকল ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা সম্ভব। সংখ্যাতাত্ত্বিকগণ (Statisticians) সাধারণত প্রথম দুইটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন, কারণ কোনো ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে হিসাব করা সুবিধা (যেমন শিল্প, কৃষি, খনি ইত্যাদি); আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি সুবিধাজনক (যেমন ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা ইত্যাদি)। পরিমাপের পক্ষে তৃতীয় পদ্ধতি বিশেষ সুবিধাজনক নয়।

(ক) উৎপাদন-সুমারী পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Census of Production Method or The Final Products Total)

এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্য ও কার্যাদির অর্থ-মূল্য যোগ করিলে আমরা মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) পাইতে পারি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবলমাত্র যোগ দিতে হইবে। যে সকল দ্রব্য অর্ধ-উৎপন্ন অথবা উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (intermediate stage) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না। যেমন আসবাব প্রস্তুতকারী যে কাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম যোগ দেওয়া হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে পৌছায় নাই। কিন্তু যদি পুড়াইবার জন্য কাঠ ব্যবহৃত হয় তবে সেই কাঠের দাম হিসাব করিতে হইবে, কারণ তাহা সম্পূর্ণ দ্রব্য (Final Product) হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। এইভাবে হিসাব করিলে ডবল-গণনার (double counting) হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানি হয়। রপ্তানি ও আমদানির মূল্যের পার্থক্যকে মোট জাতীয় আয় হিসাবের

সময়ে যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। যদি তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাহা হইলে বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহা হইলে যোগ হইবে।

এইভাবে মোট জাতীয়-আয় হিসাব করিয়া মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কিছু অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেশের সকলে মিলিয়া যে সকল ভোগদ্রব্য বা কার্যাদি ক্রয় করিয়াছে তাহাদের দাম, গভর্ণমেণ্ট যাহা ক্রয় করিল তাহার দাম, নূতন মূলধনী দ্রব্যের দাম, এই সকল যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

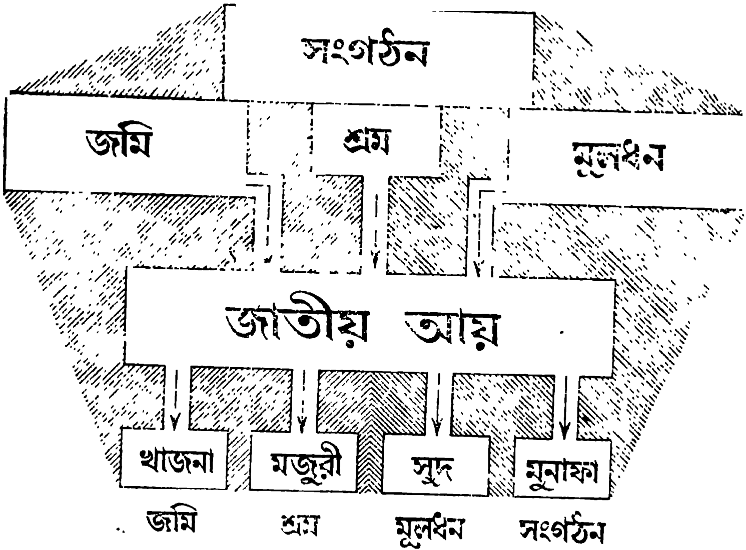
(খ) আয়-সুমারা পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Census of Income Method or The Factor Payments Total)

এক বৎসরে দেশের, (ক) সমগ্র মজুরি মাহিনা ইত্যাদি (খ) সকল ফার্ম বা ব্যবসায়ের নীট আয় [মজুরী মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহা অন্যত্র ('ক'-তে) হিসাব করা হইয়াছে], (গ) সকল ঋণ হইতে নীট সুদ, এবং (ঘ) সকল নীট খাজনা, এই সকল যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা চলে।

এই ভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। (ক) হস্তান্তর-পাওনাসমূহ (Transfer Payments) বাদ দিতে হইবে। যেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওনা জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আসিবে না, কারণ তাহা কোন নূতন আয় নহে, কোন নূতন দ্রব্য-সামগ্রীর অর্থমূল্য ইহা নয়। ভিক্ষুকের আয় বা কোন দান-গ্রহণও গণনার মধ্যে আসে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন-ধারায় কাজ করিবার দরুন সৃষ্টি হয় না। কোন দ্রব্যোৎপাদন বা কোন কাজকর্মের দরুন যে আয় তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে। (খ) মালিকের নিজের যে সকল উপাদান (যেমন নিজের বাড়ি, জমি, পরিচালন ক্ষমতা বা মূলধন) উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজারদরের হিসাবে অর্থ-মূল্যে রূপান্তরিত করিয়া গণনার মধ্যে আনা প্রয়োজন। (গ) বিনা দামে যে সকল দ্রব্য বা কার্যাদি পাওয়া যাইতেছে (যেমন, বাড়িতে স্ত্রীলোকের কাজ বা নিজের বাগানের তরিতরকারি) তাহাদের কোন আয় বা অর্থমূল্য সৃষ্টি না হওয়ায় জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আনা হইবে না। (ঘ) ফার্মের মোট মুনাফার যে অংশ মজুত-তহবিলে (Reserve Fund) জমাইয়া রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার-ক্রেতাদের আয় সৃষ্টি করে নাই), তাহাও যোগ দিতে হইবে। কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না গেলেও ঐ মূল্য সৃষ্টি হইয়াছে।

(গ) ভোগ-সঞ্চয় পদ্ধতি বা ভোগ-সঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption Savings Method or The Consumption Savings Total)

সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং অপর অংশ সঞ্চয় হয়। তাই এক বৎসরের মধ্যে সমাজের মোট ভোগব্যয় ও মোট সঞ্চয় যোগ করিতে পারিলে নীট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়। সাধারণত ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোনো সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, তাই এই পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুবিধা নাই।



জাতীয় সম্পদকে দুই ভাবে দেখা চলে: সকল প্রকার দ্রব্য ও কার্যাদির মোট মূল্য হিসাবে, আবার জাতীয় আয় হিসাবে। ইহার কারণ বোঝা দরকার। কোন দ্রব্যের দাম হইতেই বিভিন্ন ধরনের আয় সৃষ্টি হয়। যেমন একমণ ধানের দাম 20 টাকা। এই 20 টাকার মধ্য হইতেই চাষী জমিদারকে খাজনা দেয়, মহাজনকে সুদ দেয়, মজুর খাটাইলে তাহাকে মজুরি দেয় এবং নিজে লাভ করে। সুতরাং এই সকল খাজনা, সুদ, মজুরি ও লাভ মিলাইয়া জিনিসের দাম গঠিত হইয়াছে। জিনিসটির যে দাম তাহাই বিভিন্ন লোকের আয়ের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। যেমন, জমির মালিকের আয় হইল খাজনা, শ্রমশক্তির মালিকের আয় হইল তাহার মজুরি, মূলধনের মালিকের আয় হইল সুদ এবং যে উৎপাদন সংগঠন করে তাহার আয় হইল মুনাফা। সুতরাং দ্রব্য ও কার্যের মূল্য (উহারা মোট যে-দামে বিক্রয় হয়) অর্থাৎ

জাতীয় সম্পদ্ ও জাতীয় আয় একই, কারণ, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতেই আয় সৃষ্টি হয়

জাতীয় সম্পদ্, সেই দেশের সকল লোকের (এবং সরকারের) মোট আয়ের সমান। দেশের সকল চাষী, সকল শ্রমিক, সকল ডাক্তার, কেরানী ও কর্মচারী মিলিয়া এক বৎসরে যে আয় করে, তাহাদের সেই ব্যক্তিগত আয় যোগ করিলে সেই বৎসরের মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

জাতীয় আয়ের বণ্টন (Distribution of National Income) : আমরা জানি যে উৎপাদন করিতে হইলে চারিটি উপাদানের প্রয়োজন হয়; জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনী শক্তি। কোন উৎপাদন হইল এই সকল উপাদানের পরস্পরের মিলিত ফল। এই সকল উপাদানের মালিকেরা উৎপাদনের কাজে নিজেদের উপাদানকে খাটাইবার জন্য যে-অর্থ পাইয়া থাকেন তাহাই তাঁহাদের আয়। যেমন, জমির মালিক পান খাজনা, শ্রমের মালিক পান মজুরি, মূলধনের মালিক পান সুদ এবং সংগঠনী-শক্তির মালিক পান লাভ বা মুনাফা। দেশের সকল খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা যোগ করিয়াই জাতীয় আয় গঠিত; সুতরাং জাতীয় আয়কে এই চারি প্রকার আয়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উৎপাদন ধারার মধ্য দিয়াই এই সকল উপাদান সম্পদ্ সৃষ্টি করে, এবং এই সম্পদ্ সৃষ্টি করিবার পথে নিজেদের আয় সৃষ্টি করে। জাতীয় আয় হইতেই, তাই এই সকল উপাদানের মালিকদের অর্থাৎ দেশের লোকের ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি হয়। জাতীয় আয়ই বণ্টিত হইয়া ব্যক্তিগত আয় হিসাবে দেশের লোকের হাতে চলিয়া আসে।

বিভিন্ন উৎপাদনের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টিত হইয়া যায়, উৎপাদনের মালিক হইয়াই ব্যক্তি আয় করে

জাতীয় সম্পদ্ যত বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হইবে দেশের কল্যাণ তত বাড়িবে। কিন্তু যদি জাতীয় আয়ের বণ্টন এমন হয় যে, বেশির ভাগ আয় অত্যন্ত কমসংখ্যক লোকের হাতে চলিয়া যায় তাহা হইলে বেশির ভাগ লোকের হাতে কম আয় থাকিবে। ইহাতে কিছু লোক ধনী হইবে বটে, কিন্তু বেশির ভাগ লোক কষ্টে থাকিবে। সুতরাং কেবল জাতীয় সম্পদ্ বাড়াইলেই দেশের কল্যাণ বাড়ে না। আয়-বৈষম্য কমাইয়া ফেলা দরকার, যাহাতে সকলে প্রায় সমপরিমাণ আয় করিতে পারে। আমাদের জাতীয় আয়ের বণ্টন খুবই বৈষম্যমূলক। আমাদের দেশের জনসংখ্যার শতকরা 60 জন লোকের হাতে জাতীয় আয়ের মাত্র তিন ভাগের একভাগ আছে। জনসংখ্যার শতকরা 5 জন ধনী লোকের হাতে জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ আছে। বাকিটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে রহিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতের জাতীয় আয় শতকরা 18 ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে জাতীয় আয় শতকরা প্রায় 20 ভাগ বাড়িয়াছে, তৃতীয়

ভারতে বেশির ভাগ লোক কম আয় করে : কম লোক বেশি আয় করে

পরিকল্পনাতে শতকরা 25 ভাগ বাড়ানো হইবে বলা হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে জাতীয় আয়ের বণ্টনে বৈষম্য অনেক কমিয়া যায়, তাহারও চেষ্টা করা হইবে প্রতিটি পরিকল্পনাতেই সে-কথা বলা হইয়াছে।

ব্যক্তিগত গড় আয় (Per Capita Income): লোকেরা নানাভাবে যে-টাকা উপার্জন করে তাহা কোন উপাদানের মালিক হিসাবে ব্যক্তির আয় বলিয়া গণ্য হয়। তবু অনেক সময় দেখা যায় যে, উপাদানের মালিকের ব্যক্তিগত আয় ও উপাদানগত আয়—এই দুই-এর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। সরকার যাহাকে যে-অর্থ সাহায্য করে উহাকে সেই লোকটির ব্যক্তিগত আয় বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু উহা জমি, শ্রম, মূলধন বা সংগঠনের দ্বারা অর্জিত জাতীয় আয়ের অংশ নহে। যৌথ কোম্পানীগুলির যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয় না, সঞ্চিত ভাণ্ডাররূপে মজুত রাখা হয়—তাহা ব্যক্তিগত আয় হইতে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু জাতীয় আয়ের হিসাবে উহাকে ধরা হয়।

কোন ব্যক্তিগত আয় জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয় না

মোট জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে আমরা সেই দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মাথাপিছু আয় (per capita income) পাইয়া থাকি। 1960-61 সালে ভারতের মোট জাতীয় আয় হইল 13000 কোটি টাকা, এই সময়ে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল 43 কোটির উপরে। মোট জাতীয় আয়কে লোকসংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া বলা যায় যে, ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় হইল বৎসরে 301 টাকা।

মাথাপিছু আয় কাহাকে বলে

এই মাথাপিছু আয় হইতে আমরা যে-কোন দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান বুঝিতে পারি। মাথাপিছু আয় বাড়িয়া গেলে তাহারা বেশি জিনিসপত্র কিনিতে পারে (যদি অবশ্য জিনিসপত্রের দাম সমান থাকে)। মাথাপিছু আয় কমিয়া গেলে তাহারা কম জিনিসপত্র কিনিতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় খুবই কম। 1955 সালে যখন প্রত্যেক ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ছিল বৎসরে 281 টাকা, তখন আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে বৎসরে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে 8784 টাকা ও 4057 টাকা। ইহা হইতে বুঝা যায় ভারতবাসীর জীবন-যাত্রার মান কত অনুন্নত।

ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ও পরিকল্পনা

তৃতীয় পরিকল্পনায় ঠিক করা হইয়াছিল যে, পাঁচ বছরে (1966 সালের মধ্যে) আমাদের জাতীয় আয়কে 25% বাড়াইতে হইবে; অর্থাৎ 13000 কোটি টাকা হইতে 17000 কোটি টাকা পর্যন্ত করিতে হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের

লোকসংখ্যাও কিছু বাড়িয়া যাইবে, তাই মাথাপিছু আয় ততটা বাড়িতে পারিবে না; বেশি লোকের মধ্যে ভাগ হওয়ায় মাথাপিছু আয় 18% বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ 1965-66 সালে উহা হইবে বৎসরে 354 টাকা।

অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে এইরূপ মাথাপিছু আয়ের হিসাব দ্বারা আমাদের দেশের দারিদ্র্যের গভীরতা বোঝা যাইবে না; কারণ, ইহা গড়পড়তা হিসাব মাত্র। দেশের বেশির ভাগ লোক খুবই দরিদ্র, ধনীদের আয় খুব বেশি।

আয় ও জীবনযাত্রার মান (Income & Standard of living): আয়ের উপরেই প্রধানত জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। যাহাদের মোট আয় বেশি, তাহারা সচ্ছলভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। সন্তান-সন্ততির উপযুক্ত শিক্ষা, প্রচুর বিশ্রাম, অসুখে-বিসুখে সুচিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, ভাল আহার, বসন, ব্যসন, বিলাস-সামগ্রী ভোগ ইত্যাদি উচ্চ মানের লক্ষণ। যাহাদের জীবিকার মান নিম্নস্তরের তাহাদের আয়ের বেশির ভাগ শুধু খাদ্য আহরণ করিতেই ব্যয়িত হয়। পরিবারের আয় বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হয়, তাহা পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট হইতে জানা যায়। সাধারণত, আয় যত বেশি হইবে, খাদ্যের জন্য ব্যয়ের অনুপাত তত কম হইবে। বড়লোকেরা আয়ের অপেক্ষাকৃত কম অংশ খাদ্যের জন্য ব্যয় করে, এবং গরীবরা অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ খাদ্যের জন্য খরচ করে। আয় যত বেশি হইবে, জীবনযাত্রার মান তত উন্নত হইবে; স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির জন্য ব্যয়ের অনুপাত ততই বাড়িতে থাকিবে। সকল স্তরের জীবনযাত্রার মানেই আয়ের তুলনায় পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য ব্যয়ের অনুপাত মোটামুটি সমান হয়। সকল স্তরের জীবনযাত্রার মানেই আরাম বা বিলাস-সামগ্রী কিনিবার পূর্বে মানুষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে। যাহাদের আয় কম, তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিতেই প্রায় সমস্ত অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। সুতরাং আরাম-বিলাসের জিনিস ক্রয় করিবার সামর্থ্য থাকে না।

আয় বাড়িলে অধিকতর তৃপ্তি, আরাম ও সুখ পাইতে পারে, সুতরাং ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়

ভারতের একটি উদাহরণ দেখানো যাইতে পারে। বোম্বাই শহরের শ্রমিকদের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 30 টাকা আয় হইলে খাদ্যের জন্য ব্যয় হয় শতকরা 66 ভাগ এবং 76 টাকা হইলে শতকরা 52 ভাগ খাদ্যে ব্যয় হয়। সুতরাং আয়ের সহিত জীবনযাত্রার মানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অধিকাংশ ভারতবাসীর আয় কম বলিয়াই জীবনযাত্রার মান এত নিম্নস্তরের। এইজন্যই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে আয় বাড়াইয়া জীবনযাত্রার মান

ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় কম, জীবনযাত্রার মানও খুব নীচু

বাড়াইবার উদ্যম চলিতেছে। কিন্তু শুধু আর্থিক আয়-বৃদ্ধির উপরই জীবনযাত্রার মানের বৃদ্ধি নির্ভর করে না। আর্থিক আয় বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে যদি জিনিসের দরও বাড়ে, তবে বেশি আয়ে বেশি অভাব মিটাইবার ক্ষমতা হয় না। বর্তমানে ভারতে আর্থিক আয় যদিও কিছুটা বাড়িয়াছে কিন্তু তাহাতে জীবনযাত্রার মান বিশেষ বাড়িতে পারে নাই। কারণ, আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে আসল বা বাস্তব আয়ের (Real Income) উপরে, নিছক আর্থিক আয়ের উপর নহে। আর্থিক আয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যদি অর্থের ক্রয়শক্তি কমে, তবে সেই আয় বৃদ্ধির ফলে বেশি জিনিসপত্র কিনিতে পারা যায় না, জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পায় না।

ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান এত নীচু যে তাহা আলোচনা করিলে নিজেদেরই দুঃখিত হইতে হয়। গড়ে প্রত্যেক জন লোকে মাসে ভোগ্যদ্রব্যের জন্য মাত্র 22 টাকা ব্যয় করিতে পারে ; ইহার মধ্যে আবার নগদ মাত্র 13 টাকা এবং বাকি 9 টাকা নিজের বাড়িতে উৎপন্ন তরিতরকারি, শাকসব্জি প্রভৃতি। আয়ের $\frac{2}{3}$ অংশ ভোগেই ব্যয় হইয়া যায় ; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার অন্যান্য দিকে বাকি $\frac{1}{3}$ অংশ ব্যয় হয়। মাথাপিছু শিক্ষার জন্য ব্যয় প্রায় 25 পয়সা মাত্র, মাথাপিছু স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় 44 পয়সার কম।

আমাদের দারিদ্র্যের স্বরূপ

মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা গড় হিসাব। দেশের অর্ধেকের বেশি লোক, অর্থাৎ প্রায় 19 কোটি লোক মাসে 13 টাকার বেশি ব্যয় করিতে পারে না। উহার মধ্যেও আবার অর্ধেক টাকা ব্যয় হয় বাড়ির আশেপাশে উৎপন্ন শাকসব্জি ও বুনো লতাপাতায়। স্কুলে যাইবার বয়সের ছেলেদের মধ্যে অর্ধেকেরও কম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে, পাঁচভাগের একভাগও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে, গড় হিসাবে, 30000 লোক-প্রতি একজনও শিক্ষিত চিকিৎসক নাই। দেশের 85% বাড়িই কাঁচা এবং তাহা বাসের পক্ষে অনুপযোগী। পানীয় জল বা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একান্ত অভাবের মধ্যেই দেশের অধিকাংশ লোক কোনমতে উন্নতির অপেক্ষায় কাল কাটাইতেছে।

ভারতের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় (National Income and Per capita Income of India) : স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব হইতেই ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ও ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপ করার চেষ্টা হইতেছিল। সর্বপ্রথম 1870 সালে দাদাভাই নওরোজী হিসাব করিয়া বলেন যে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় হইল বৎসরে মাত্র 20 টাকা। লর্ড কার্জনের মতে 1900 সালের

হিসাবে ভারতবাসীর মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ছিল 30 টাকা। 1913-14 সালে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও যোশী হিসাব করিয়া বলেন যে ইহা হইল 44 টাকা 31 পয়সা। ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও-এর মতে 1931-32 সালে ইহা 65 টাকা। এই সকল হিসাবগুলিকে একেবারে সঠিক বলা চলে না, কারণ, এই সময়ে তথ্যসংগ্রহের অসুবিধা ছিল খুব বেশি। স্বাধীনতা পাইবার পরে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে 1949 সালে ভারত সরকার একটি জাতীয় আয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই কমিটি 1948 সাল হইতে প্রতি বৎসর ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব করিয়া উহা প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতের জাতীয় আয়ের প্রাচীন ও আধুনিক হিসাব

কমিটির প্রথম রিপোর্টে 1948-49 সালের হিসাব বাহির হইয়াছিল। সেই বছরের জাতীয় আয়ের হিসাব ছিল 8710 কোটি টাকা। কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্র হইতে 4150 কোটি ; খনি, যন্ত্রশিল্প ও হস্তশিল্প প্রভৃতি হইতে 1500 কোটি ; বাণিজ্য ও পরিবহণ হইতে 1700 কোটি এবং অন্যান্য কাজকর্ম হইতে 1380 কোটি—এইরূপে মোট 8730 কোটি টাকা পাওয়া যায়। উহা হইতে সেই বৎসরের প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স 20 কোটি টাকা বাদ দিয়া মোট 8710 কোটি টাকা হিসাব করা হইয়াছিল। ঐ বৎসরের মোট জনসংখ্যা ধরা হইয়াছিল 34 কোটির কিছু বেশী, ফলে 1948-49 সালে মাথাপিছু আয়ের হিসাব ছিল বৎসরে 255 টাকা*।

জাতীয় আয় ও উহার ক্ষেত্রভেদ

কোন্ পদ্ধতির সাহায্যে ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপ করা হইয়াছে তাহা জানা দরকার। ভারতের জাতীয় আয় কমিটি যে কোন একটি পদ্ধতির সাহায্যে সম্পূর্ণ হিসাব রচনা করিয়াছেন তাহা নহে। তৃতীয় পদ্ধতি (ভোগসঞ্চয় পদ্ধতি) তাঁহারা মোটে ব্যবহারই করেন নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতি তাঁহারা একযোগে ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষি, অরণ্য, পশুপালন, শিকার, মাছ-ধরা, খনি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্র (sector) হইতে উৎপাদন-সুমারী পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যাদির নীট পরিমাণ যোগ করা হইয়াছে। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী ও বেসরকারী অফিস-আদালতের বিভিন্ন চাকুরি প্রভৃতি হইতে আয় যোগ করিয়া আয়-সুমারী পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব করিয়াছেন।

হিসাবের পদ্ধতি

আমাদের দেশ অপূর্ণোন্নত দেশ হওয়ায় এই দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার অসুবিধা খুব বেশি। যেমন, প্রথমত, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে বা কাজকর্মকে গণনার

* সর্বশেষ রিপোর্টে এই হিসাব সংশোধিত করিয়া বলা হয় যে 1948-49 সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল 8670 কোটি টাকা এবং বৎসরের মাথাপিছু আয় ছিল 246·9 টাকা।

মধ্যে ধরিতে হইবে তাহার হিসাব করা খুবই অসুবিধাজনক, ইহার কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড পাওয়া যায় না। পারিবারিক কাজকর্মকে হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু কে না জানে ভারতের চাষী পরিবারে স্ত্রীলোকেরাই প্রধানত ধান মাড়াই, ঢেঁকির সাহায্যে চাল তৈয়ারী ও বাজারে বিক্রয়ের কাজ করিয়া থাকেন। এই সকল অর্থনৈতিক কাজের মূল্য হিসাব করা যায় কেমন করিয়া? দ্বিতীয়ত, অন্যান্য অপূর্ণোন্নত দেশের মত ভারতেও অনেক জিনিসপত্র বাজারে আসে না। উৎপাদকেরা হয় নিজেরা ভোগ করে বা অপর উৎপাদকের দ্রব্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করে। এই সকল ক্ষেত্রে অনেক সময়েই আন্দাজের সাহায্যে কাজ চালাইতে হয়, হিসাব নির্ভুল হইতে পারে না। তৃতীয়ত, আমাদের দেশে উৎপাদনে বৃত্তি-বিভাগ বা বিশেষায়ণ (specialisation) ততটা প্রসার লাভ করে নাই। যেমন, একই ব্যক্তি চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, অন্যের ক্ষেতে মজুর খাটিয়া আয় করে। এই অবস্থায় জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ (classification of sectors) করার কোন উপায় থাকে না। তাহা ছাড়া, যে-সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহা সঠিক নয়। তথ্যের আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও পার্থক্যও খুব বেশি।

হিসাবের অসুবিধা ও ত্রুটি

1948-49 সাল ও পরবর্তী বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় কিরূপে অগ্রসর হইতেছে নীচে উহা তালিকাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল:

বৎসর	নীট জাতীয় আয় (কোটি টাকার হিসাবে)	মাথাপিছু আয় (টাকার হিসাবে)
1948—49	8660	216·9
1949—50	8820	248·6
1950—51	1850	246·3
1951—52	9100	250·1
1952—53	9450	250·1
1953—54	10,030	268·7
1954—55	10,280	271·9
1955—56	10,480	273·6
1956—57	11,010	284·0
1960—61	13,000	301·0

ভারতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইয়াছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হইয়াছিল যে জাতীয় আয়কে প্রতিবৎসর প্রায় 5% হারে বাড়াইতে হইবে যাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 1965-66 সালে মোট জাতীয় আয় বর্তমানের তুলনায় 25% বৃদ্ধি পাইয়া 17000 কোটি টাকাতে পৌঁছাইতে পারে। দুঃখের বিষয় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি এই হারে ঘটিতে পারে নাই।

Questions to be discussed

1. Define Economic Rent.
   অর্থনৈতিক খাজনা কাহাকে বলে ?
2. Discuss the Ricardian theory of Rent.
   রিকার্ডীয় খাজনা-তত্ত্ব আলোচনা কর।
3. Discuss the relation between Rent and the Law of Diminishing Returns.
   খাজনা ও ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের বিধির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।
4. Why is it necessary to pay rent on Land, although it is a free gift of Nature ?
   জমি প্রকৃতির দান হওয়া সত্ত্বেও জমির খাজনা লওয়া হয় কেন ?
5. How is the growth of population in a country likely to affect the level of rent ?
   কোন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাজনার উপর কিরূপে প্রভাব বিস্তার করে ?
6. Define Interest. Why should interest be paid ?
   সুদ কাহাকে বলে ? সুদ কেন লওয়া হয় ?
7. How is the rate of interest determined ?
   কিভাবে সুদের হার নির্ণয় করা হয় লিখ।
8. Why rates of interest differ in different cases in a particular country ?
   একই দেশে বিভিন্ন অবস্থায় সুদের হারে তারতম্য কিভাবে ঘটে লিখ।
9. What are profits ? Distinguish between Gross and Net Profit.
   মুনাফা কাহাকে বলে ? মোট এবং নীট মুনাফার পার্থক্য কি ?
10. What constitutes profits ? Distinguish between Normal and Actual profits.
    মুনাফা কিভাবে পাওয়া যায় ? স্বাভাবিক ও আসল মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কি ?
11. What are wages ? Distinguish between Money Wages and Real Wages.
    মজুরি কাহাকে বলে ? আর্থিক মজুরি ও আসল মজুরির মধ্যে পার্থক্য কি ?
12. What factors determine the level of wages in a particular occupation ?
    কোন পেশায় মজুরির স্তর কি ভাবে নির্ধারিত হয় ?

13. Explain why wage rates vary in different occupations within a country.

একটি দেশে বিভিন্ন জীবিকার মধ্যে মজুরির হারে তারতম্য ঘটে কেন ?

14. What are Trade Unions ? Discuss their need.

শ্রমিকসংঘ কাহাকে বলে ? ইহাদের প্রয়োজনীয়তা কি ?

15. What is callective bargaining ? Show how wages are influenced by collective bargaining.

সংঘবদ্ধ দরকষাকষি কাহাকে বলে ? সংঘবদ্ধ দরকষাকষির দ্বারা মজুরি কিভাবে প্রভাবিত হয় ?

16. What is National Income ? Distinguish between Gross and Net National Income.

জাতীয় আয় কাহাকে বলে ? স্থূল এবং নীট জাতীয় আয় কাহাকে বলে ?

17. How the National Income of a country can be measured ?

কোন দেশে জাতীয় আয়ের পরিমাপ কিভাবে করা হয় ?

18. Write a note on the Distribution of the National Income of a country.

কোন দেশের জাতীয় আয়ের বণ্টন সম্বন্ধে টীকা লিখ।

19. What is per capita Income ?

মাথাপিছু আয় কাহাকে বলে ?

20. Write a note on the National Income of India.

ভারতের জাতীয় আয়ের উপর টীকা লিখ।

পৌরনীতি

১

পৌরনীতি ঃ বিষয়বস্তু ও পরিধি

Civics : Meaning and Scope

পৌরনীতি কাহাকে বলে (What is Civics)? মানুষ সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করা মানুষের স্বভাব ও প্রয়োজন। সে অপরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একত্রে বসবাস করিতে চায়, তাহার মনে একপ্রকার যূথবদ্ধতার আবেগ (gregarious instinct) দেখিতে পাওয়া যায়। এই মনোবৃত্তির দরুন সামাজিক জীবনযাপনের ইচ্ছা তাহার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। ইহা ব্যতীত নানাবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও তাহার সমাজে থাকা দরকার। নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য কোন ব্যক্তি একা উৎপাদন করে না। অপরের প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য বা কাজ যোগান দিয়া তবেই সে নিজের জন্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে পারে। অপরকে তাহার দরকারী জিনিস দিতে পারিলে উহার বিনিময়ে সে তাহার নিজের দরকারী দ্রব্যসামগ্রী পাইতে পারে। অপরকে কিছু না দিয়া তাহার নিজের প্রয়োজন মেটে না। অন্যে যেমন তাহার উপর নির্ভর করে, সে-ও তেমন অপরের উপর নির্ভরশীল। মানুষের স্বভাব ও প্রয়োজন দুই-এ মিলিয়া সমাজ সৃষ্টি হইয়াছে। Aristotle তাই বলিয়াছেন "Man is by nature and necessity a political animal".

মানুষের স্বভাব ও প্রয়োজনে সমাজের উদ্ভব

এই সমাজের মধ্যে সকলের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে হয় বলিয়া কোন এক ব্যক্তির অভ্যাস, চিন্তা ও ধারণাগুলি সমাজের দ্বারা প্রভাবিত। দৈনন্দিন চলাফেরা, কাজকর্ম ও লেনদেন—সব কাজেই কোন এক ব্যক্তিকে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে নানাবিধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। একের সহিত অপরের বা পারস্পরিক এই সকল সম্পর্ক বিচার করিলে দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির কিছু কিছু অধিকার জন্মে (rights), আবার অপরের উপর তাহার কিছু কিছু কর্তব্যও (duties) গড়িয়া উঠে। সামাজিক জীবনযাপন হইতেই ব্যক্তির মনে অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা গড়িয়া উঠে। এই সকল অধিকার ও কর্তব্য লইয়া গঠিত সামাজিক সম্পর্কগুলির নানাদিক লইয়া যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাহাই পৌরনীতি।

সমাজ মানুষের আবিষ্কার ও কর্তব্যগুলি লইয়া পৌরনীতি

পৌরনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু (Definition and Subject-matter of Civics) : 'পৌর' শব্দটি আসিয়াছে সংস্কৃত 'পুর' হইতে। পুরবাসী বা নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির কাজকর্ম, একের সহিত অপরের সম্পর্ক, প্রত্যেকের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ—এই সকল বিষয়ের আলোচনাই পৌরনীতি। ইংরাজীতে এই শাস্ত্রের নাম Civics, ল্যাটিন ভাষার দুইটি শব্দ Civis এবং Civitas হইতে Civics শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে। Civis শব্দটির অর্থ নাগরিক এবং Civitas শব্দটির অর্থ নগর-রাষ্ট্র। Civics বলিলে তাই বুঝা যায় 'রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে নাগরিক' যে-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

প্রাচীন গ্রীসে এক একটি নগরকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি রাষ্ট্র গঠিত ছিল। নগরের মধ্যে থাকিতেন নগরবাসী বা নাগরিকেরা। দেওয়াল বা পরিখা দ্বারা সাধারণত এই নগরগুলি বেষ্টিত ছিল। নগরগুলির বাহিরে দাস-শ্রমিকেরা কৃষিকার্য ইত্যাদি কাজ করিত। নগরের মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকেরা অনেক সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেন, অনেক অধিকার লাভ করিতেন, অনেক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতেন। এইরূপ এক একটি নগর-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের জীবন অতিবাহিত হইত। রাষ্ট্রের সহিত প্রতিটি নাগরিকের সম্পর্ক এবং এক নাগরিকের সহিত অপর নাগরিকের সম্পর্ক—ইহাদের লইয়া আলোচনাই Civics শাস্ত্রের বিষয়বস্তু ছিল। আজকালও অনেকে পৌরনীতির বিষয়বস্তু এইরূপ সঙ্কীর্ণ রাখিতে চান। যেমন, Mr. F. J. Gould বলেন, Civics হইল "the study of institutions, habits, activities and spirit by means of which a man or woman may fulfil the duties and receive the benefits of membership in a political community". অক্সফোর্ডের অভিধানের ভাষায় "Civics is that branch of Politics which deals with the rights and duties of a citizen."

সঙ্কীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের সম্পর্ক

কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলি বর্তমানে অসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানকালে পৌরনীতিশাস্ত্রের আলোচ্য সকল বিষয় অর্থাৎ এই শাস্ত্রের আলোচনার বর্তমান পরিধি ও পরিসীমা উপরের সংজ্ঞা দুইটি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় না। আজকালকার প্রতিটি নাগরিক কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সহিত নিকট-সম্পর্কে যুক্ত হয় না। সে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়া নিজেকে তৃপ্ত করে। কেবল রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব তাহার সর্বাঙ্গীণ চরিতার্থতার অন্তরায়। পাড়ার দল, অফিসের সমিতি, খেলার ক্লাব, গানের গোষ্ঠী, কি তাহাকে আকর্ষণ না করে? বিদেশের ও দেশের নানা প্রতিষ্ঠানকে সে

কিন্তু আলোচ্য বিষয় অনেক ব্যাপক

আনুগত্য দেয়। এই সকল সম্পর্ক ও আনুগত্যও পৌরনীতিশাস্ত্রের আলোচ্য। E. M. White-এর ভাষায় আমরা বলিতে পারি যে, "Civics is that branch of human knowledge which deals with everything (social, intellectual, economic, political and religious) relating to citizenship, its past, present and future ; local, national and human".

পৌরনীতির পরিধি (Scope of Civics): আজকালকার রাষ্ট্র প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বড়। নাগরিকের সংখ্যা বেশি, রাষ্ট্রের আয়তনও বিশাল। সমাজ-জীবন এখন অনেক বেশি জটিল, ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। নগর-ভিত্তিক সেই গ্রীক সমাজের সহিত বর্তমান সমাজপরিবেশের কোন তুলনাই চলে না। এই কারণে পৌরবিজ্ঞান বা Civics সম্বন্ধে সেই যুগের ধারণা বর্তমানে সংকীর্ণ এবং অচল। আধুনিক প্রতিটি রাষ্ট্রে আছে বহু সংখ্যক নগর এবং অসংখ্য গ্রাম। ফলে নগরের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য এবং নগর-নাগরিকের পরস্পর সম্পর্ক—কেবল ইহারাই আর Civics-এর আলোচ্য বিষয় নয়। এখন আলোচ্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের সম্পর্ক। দ্বিতীয়ত, আজকালকার নাগরিক কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য নয়, রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলেই তাহার সকল প্রয়োজন মেটে না। জীবনের পূর্ণতর বিকাশের জন্য পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন সকল কিছুর সভ্য হইতে হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের রূপ, উহাদের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক, উহাদের সম্পর্কে তাহার কর্তব্য ও অধিকার এই সকলও পৌরনীতি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। তৃতীয়ত, জীবনের পূর্ণতম ও সুন্দরতম বিকাশই প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য। রাষ্ট্র ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান—কেবল এই দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানই জীবনের সর্বোত্তম বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকটি মানুষের মনে নানাদিকে নিজেকে ফুটাইয়া তোলার সৃষ্টিশীল ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। মনের এই তাগিদ মিটাইবার জন্য সে সাহিত্যসভা, সঙ্গীত আকাদামী, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, খেলাধুলার ক্লাব, সেবাসমিতি, শ্রমিকসংঘ—নানাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিও মানুষের আনুগত্য থাকে। তাহার মোট আনুগত্যের কিছু অংশ ইহারাও পাইয়া থাকে। ইহাদের প্রতি মানুষের কর্তব্যও আছে। পৌরনীতিশাস্ত্র এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত নাগরিকদের সম্পর্কও তাই আলোচনায় না-আনিয়া পারে না। চতুর্থত, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে ভৌগোলিক দিক হইতে পৃথিবীর আয়তন আজ অনেক ছোট। রকেটের পাল্লার মধ্যে গোটা দুনিয়া আজ ছোট পরিসরে আটকা পড়িয়াছে। রেডিও, টেলিকমিউনিকেশন, সুপারসনিক জেট দূরকে নিকটে আনিয়া

আলোচনার পরিধি অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে

পরকে ভাই করিয়া তুলিতেছে। অর্থনৈতিক দিক হইতে সকল দেশই বহুল পরিমাণে পরস্পর-নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে; ভারতের চা না-পাইলে কানাডাবাসীর ভোরে ঘুম ভাঙে না, সুইডেনের কাগজ না-পাইলে ভারতে শিশুপাঠ্য পুস্তক ছাপা হয় না। সকল দ্রব্যের জন্যই আজকাল একটি আন্তর্জাতিক বাজার গড়িয়া উঠিতেছে। আমেরিকার শেয়ারবাজারে মন্দা দেখা দিলে ইতালিতে রাষ্ট্র-বিপ্লব দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্ন মানুষের সম্মুখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মতামতের বিনিময় প্রতিটি মানুষেব মনে মৌল মানবতাবোধকে জাগাইয়া তুলিতেছে, "মানুষের পার্লামেন্ট, পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র" (A Parliament of man, a Federation of the world) বাস্তবে রূপ লইতেছে। প্রতিটি মানুষ আজ এইরূপে আন্তর্জাতিক সমাজেব অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, শ্রমিকসংঘ ও শ্রমিকের অধিকার, স্বাস্থ্য, খাদ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বড় বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেব উদ্ভব হইয়াছে। আধুনিক নাগরিকজীবন ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এড়াইতে পাবে না—ইহাদের প্রতি নাগরিকেব আনুগত্য, ইহাদের সহিত তাহার সম্পর্ক তাহাও পৌরনীতিশাস্ত্রের অবশ্য আলোচ্য হইয়া পড়িয়াছে।

পৌরনীতি ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation of civics with other social sciences): পৌরনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ সমাজের মধ্যে মানুষের আচরণের বিভিন্ন দিক্ লইয়া আলোচনা করে। এই সকল বিজ্ঞানেরই মূল আলোচ্য বিষয় হইল মানুষ। তাই ইহারা একে অপরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। প্রত্যেকের আলোচনার পরিধির সীমারেখা অপরের সীমারেখা স্পর্শ করে। অপরের সাহায্য বিনা কেহ কোন একটি সমাজবিজ্ঞান চর্চা করিতে পারে না। বস্তুত, প্রতিটি সমাজবিজ্ঞান একই বৃক্ষের এক একটি শাখা, মূল বৃক্ষ হইল মানুষের সামাজিক আচরণ। আমরা একে একে পৌরনীতি-শাস্ত্রের সহিত অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করিব।

পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Civics and Political Science): রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সহিত পৌরনীতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ইংরেজী এই শব্দ দুইটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সমান। Civics শব্দটি আসিয়াছে ল্যাটিন Civis এবং Civitas শব্দ হইতে। ইহাদের অর্থ যথাক্রমে নাগরিক ও নগর-রাষ্ট্র। Politics শব্দটি আসিয়াছে গ্রীক শব্দ Politis এবং Polis হইতে, ইহাদের অর্থও যথাক্রমে নাগরিক ও নগর-রাষ্ট্র। সুতরাং স্বভাবতই পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকিতে পারে না। অনেকে বলেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে-অংশ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য লইয়া আলোচনা করে তাহাই পৌরনীতি ("that part of political science which

deals with the rights and duties of a citizen")। অনেকে বলেন যে পৌরনীতি হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সরল ও প্রাথমিক ভূমিকা ("Civics is elementary Politics")। অনেকে বলেন ইহারা একই, কেবলমাত্র, আলোচ্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপে পার্থক্যই ইহাদের দুইটি শাস্ত্রে পরিণত করিতে চাহিতেছে ("difference between them is one of accent and emphasis rather than of subject-matter")। পৌরনীতির আলোচনায় নাগরিকের আশেপাশে তাহার নিকটবর্তী পরিবেশের উপর গুরুত্ব বেশি, আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইল রাষ্ট্র ও উহার সম্পর্কিত বিষয়গুলি।

এই দুই শাস্ত্র মোটামুটি পরস্পর সংলগ্ন বা ঘনিষ্ঠ হইলেও ইহাদের পরিধির সীমারেখায় পার্থক্য মোটামুটি বোঝা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্র, উহার উৎপত্তি, বিবর্তন, প্রকৃতি, কাঠামো, কাজকর্ম ও লক্ষ্য। রাষ্ট্রের কাজকর্মের মৌলিক নীতিসমূহ এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক ইহা আলোচনা করে। কিন্তু পৌরনীতির মূল আলোচ্য বিষয় নাগরিক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর সহিত নাগরিকের সম্পর্ক, তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব। পৌরনীতিশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য সুনাগরিক সৃষ্টি করা, যাহাতে সমাজ স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর হইয়া উঠে।

পৌরনীতি ও ইতিহাস (Civics and History) : ইতিহাসই মূল, আর সকল সমাজবিজ্ঞানই এই বৃক্ষের বিভিন্ন ফলস্বরূপ। মানবসমাজ নানাস্তরের মধ্য দিয়া কিরূপ বিবর্তিত হইয়া বর্তমানের স্তর ধারণ করিয়াছে, ইতিহাস সেই ধারাবাহিক পরিবর্তনের আলোচনা করে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নানা বিচিত্র অবস্থার সম্মুখে নাগরিক বিভিন্নভাবে সাড়া দিয়াছে (response), নানা প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। বিশেষ কোন অবস্থার সম্মুখে মানুষ কি ভাবে সাড়া দিয়াছে, কিরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে, ইতিহাস তাহাই বর্ণনা করে। নানা দেশে বা নানা যুগে একই রূপ আচরণ করিলে বা প্রতিষ্ঠান গড়িলে নাগরিকের আচরণ সম্পর্কে আমরা কোন এক সাধারণ সূত্র গঠন করিতে পারি। এই সকল সূত্র লইয়াই পৌরনীতিশাস্ত্রের উদ্ভব। ইতিহাসের স্তূপ হইতে এইরূপে তত্ত্বের উদ্ভব হয়। কেহ কোন নূতন নীতি বা তত্ত্ব রচনা করিলে ইতিহাসের ঘটনা-ভাণ্ডার মন্থন করিয়া উহার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করিতে হয়। ইতিহাসের গবেষণাগারেই পৌরনীতিশাস্ত্রের তত্ত্বসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অবশ্য ইতিহাসে বর্ণিত সকল ঘটনা সকল কিছুই পৌরনীতি ব্যবহার করে না। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজা-রানীর জীবনী প্রভৃতির খুঁটিনাটি বর্ণনাতে পৌরনীতি শাস্ত্র আগ্রহান্বিত নয়। ইতিহাস হইতে খুঁটিয়া-বাছিয়া তথ্য আহরণ করিয়া পৌরনীতি নিজের তত্ত্ব ও বক্তব্যগুলি সপ্রমাণ করে।

পৌরনীতি ও অর্থনীতি (Civics and Economics) : পৌরনীতি ও অর্থনীতি উভয়ে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সম্পদের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। পৌরনীতির আলোচ্য হইল নাগরিক জীবনের নানা দিক, তাহার অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্রের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার সম্পর্ক। এই শাস্ত্রের লক্ষ্য সুখী সামাজিক জীবন, আর উহার ভিত্তি হইল পার্থিব দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য। উপরন্তু, কার্ল মার্ক্সের মতে নাগরিকের সামাজিক ও নৈতিক জীবন তাহার অর্থনৈতিক পবিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। যেমন, সমাজের অর্থনৈতিক দেহে অতিবিক্ত সম্পদ্-বৈষম্য থাকিলে দেশে সুনাগরিক গড়িয়া উঠে না। আবার নাগরিকদের অনেক অধিকাব, যেমন সম্পত্তি অর্জন, রক্ষণ, ক্রয়বিক্রয় ও ব্যবহার প্রভৃতি, দেশেব অর্থনৈতিক কাজকর্মেব উপর প্রভাব বিস্তার করে। নানারূপ প্রতিষ্ঠান গঠনেব অধিকার অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে, যেমন মালিকসঙ্ঘ, শ্রমিকসঙ্ঘ প্রভৃতি। নাগবিকেব কর্তব্যবোধ প্রখর হইলে খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের কালোবাজারী হয় না, তাহার কর্তব্যবোধ দুর্বল হইলে মনাফাখোরি মজুতদারি দেখা দেয়। এইরূপে উভয়ই পরস্পরকে প্রভাবিত কবে।

পৌরনীতি ও সমাজতত্ত্ব (Civics and Sociology) : সমাজে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিব সহিত অন্য ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানেব কতরূপ সম্পর্ক থাকিতে পারে, সমাজে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি মিলিয়া কত বিচিত্র ধরনের দল উপদল ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, ব্যক্তিব মনের নানা ঝোঁক ও আবেগ তাহাব চতুষ্পার্শ্বের ব্যক্তি, দল, উপদল ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে কতভাবে প্রভাবিত কবে—এই ধরনের বিষয়বস্তু লইয়া সমাজতত্ত্ব গঠিত। সমাজ বা ব্যক্তিজীবনের সকল দিকেব গভীর আলোচনা সমাজতত্ত্বের কাজ কিন্তু পৌরনীতি একমাত্র নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির আচরণকে পর্যালোচনা কবে।

পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্র (Civics and Ethics) : মানুষের মনের ন্যায়-অন্যায়বোধ নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। শুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত আচরণের নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করা ইহার বিষয়বস্তু। ব্যক্তির মনের উন্নতি, অন্তরের প্রসার, বিবেকের দৃঢ়তা —এই সকল নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য। মানুষের সামাজিক সুখের জন্য তাহার এই নৈতিক উন্নতি একান্ত অপরিহার্য। পৌরনীতি তাই নীতিশাস্ত্রের সহিত সম্পর্ক একেবারে বাদ দিতে পারে না। ব্যক্তির উন্নত জীবনযাপনের বাহিরের কয়েকটি দিক্ পৌরনীতির আলোচ্য, কিন্তু তাহার অন্তরের কয়েকটি দিক্ যেমন সততা সত্যবাদিতা, পরার্থপরতা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য। তবে মনের গুণগুলিই ব্যক্তির বাহিরের আচরণে প্রকাশ পায়, তাই ইহাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সুনাগরিককে অবশ্যই নানা সদ্গুণবিশিষ্ট সৎব্যক্তি হইতে হইবে।

পৌরনীতি ও মনস্তত্ত্ব (Civics and Psychology) : পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির আচরণ। মনস্তত্ত্বের বিষয়বস্তু হইল সামাজিক সম্পর্কযুক্ত মানুষের মনের গতিবিধি। পৌরনীতি ও মনস্তত্ত্ব তাই একেবারে পরস্পর সম্পর্কহীন নয়। পৌরজীবন মানুষের মনস্তত্ত্বের ফলস্বরূপ। বার্কার (Barker) বলেন যে আধুনিককালে মানুষের কাজকর্মের ধরন বিশ্লেষণ করিতে মনস্তত্ত্বের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। চিন্তাজগতে আমাদের পূর্বসূরী পণ্ডিতগণ জীবতত্ত্বের দৃষ্টিতে (biologically) সকল কিছু আলোচনা করিতেন, বর্তমানকালে তাঁহারা করেন মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে। উপরন্তু, দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে জনসাধারণের মানসিকতার উপর। পার্লামেণ্টারী সরকার ইংলণ্ডে সফল, কারণ, ইংরাজদের পরমত-সহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অধিকার ও কর্তব্যবোধ এবং এই সকল কিছুর জন্য সংগ্রামের ইচ্ছা ইত্যাদি মানসিক গুণাবলী আছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, মনস্তত্ত্ব মানুষের নীতি-বোধকে বাদ দিয়া আলোচনা করে, কিন্তু পৌরনীতি সামাজিক জীবনে সততা ও সভ্যচেতনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

Questions to be Discussed

1. Define Civics and discuss its subject-matter.

পৌরনীতি কাহাকে বলে ? উহার বিষয়-বস্তু আলোচনা কর।

2. Discuss the relation of civics with (a) Politics, (b) History, (c) Economics, (d) Sociology, (e) Ethics and (f) Psychology.

পৌরনীতির সহিত (ক) রাষ্ট্রনীতি, (খ) ইতিহাস, (গ) অর্থনীতি, (ঘ) সমাজনীতি, (ঙ) নীতিশাস্ত্র, (চ) মনোবিজ্ঞান-এর সম্পর্ক আলোচনা কর।

২

ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

The Individual, Society, the State & Associations

সমাজের উৎপত্তি ও প্রয়োজন (Origin & necessity of Society) : পরস্পর নির্ভরশীল লোকসমষ্টিকে সমাজ বলা হয়। মানুষ সামাজিক প্রাণী। সমাজ ছাড়া মানুষের পক্ষে বাস করা কঠিন। একা বসবাস করিলে সে কখনও সুখে, শান্তিতে, স্বস্তিতে বাস করিতে পারে না; কোনমতে একা বাস করিলেও সে সম্পূর্ণ মানুষ হইয়া উঠে না। তাহার মধ্যে মানসিক গুণ ও শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। আরও অনেক মানুষের সহিত একত্রে, প্রত্যেকে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ও সহযোগিতা করিয়া, একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মানুষ সমাজে বাস করে। তাহাদের সকলের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ও আনন্দের সঙ্গে নিজের জীবন, চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবাদর্শ মিলাইয়া মিশাইয়া প্রতিটি মানুষ নিজস্ব সমাজ-জীবন গড়িয়া তোলে। এইরূপে সে সমাজ গঠন করিয়া জীবনযাপন করে, একসূত্রে সহস্র জীবন গাঁথা থাকে।

সমাজ কাহাকে বলে

অতি প্রাচীনকালে মানুষ পর্বতের গুহায় বা বৃক্ষকোটরে বাস করিত। আদিম অধিবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য ও অন্যান্য সুবিধার জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করিত। দলবদ্ধ হইয়া থাকার প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা তাহারা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল। যে-কোন সময়ে অপর একটি দল আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে, অথবা হিংস্র প্রাণী প্রাণনাশ করিতে পারে। সুতরাং প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যেই, প্রথম দিকে তাহারা দলবদ্ধ হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে যূথবদ্ধ হইয়া থাকার আবেগ বা প্রবৃত্তি (gregarious instinct) আছে। সেই আবেগের তাগিদেও তাহারা সমাজ গঠন করিয়াছিল। দলবদ্ধভাবে বাস করার এইরূপ প্রবৃত্তি পশুপক্ষীর মধ্যেও দেখা যায়। অন্যের সঙ্গ কামনা করা মানুষের একপ্রকার সহজাত প্রবৃত্তি। আপন জনের স্নেহ, ভালবাসা এবং বন্ধু-বান্ধবের সহানুভূতি ও সাহায্য মানুষ সকল যুগেই কামনা করিয়া আসিয়াছে। মানুষের স্বভাব এমনভাবেই গড়া যে, পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাছাকাছি থাকিতে তাহারা ভালবাসে।

কেমন করিয়া ও কেন আদিম কালের সমাজ গঠিত হইয়াছিল

এইরূপে আদিমকালে এক ধরনের গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ গঠিত হয়। এই সমাজের মানুষেরা একসঙ্গে শিকারে যাইত অথবা পশুপালন করিত। শিকার করিয়া যাহা পাওয়া যাইত তাহা আদিম মানব-দল নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, নিজস্ব

গোষ্ঠী, পরিবার ও জাতি

সম্পত্তি ছিল না, নিজস্ব পরিবার, নিজস্ব সন্তান-সন্ততি বলিয়া কিছু ছিল না। সকল সন্তান ছিল গোষ্ঠীর সম্পত্তি। গোষ্ঠীর সকল পুরুষ ছিল পিতার সমান এবং সকল মহিলা ছিল মাতার তুল্য। গোষ্ঠীর স্বার্থ হইতে তাহার স্বার্থ ছিল অভিন্ন, গোষ্ঠীর নিয়মকানুন, জীবন, সম্পত্তি, ধর্ম, প্রথা ও রীতি রক্ষা করিয়া তাহার জীবনের পূর্ণতা দেখা দিত। ক্রমে এই আদিম মানবগোষ্ঠী কৃষিকাজ শিখিয়া ফেলিল, যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করিয়া নির্দিষ্ট এক জায়গায় বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। তখন হইতে আধুনিক সমাজের গোড়াপত্তন হইয়াছে বলা যায়। কৃষিকাজ ও পশুপালনের যুগ হইতে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিল। আমার মৃত্যুর পরে এই সম্পত্তির মালিক যাহাতে আমার নিকটতম রক্তের সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি হয়, এই কামনায় মানুষ পৃথক্ পৃথক্ পরিবার গঠন করিতে লাগিল। গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম মানুষ এইরূপে বিভিন্ন পরিবারে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে ক্রমে বিপদ-আপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ও নানাপ্রকার সুখ-সুবিধার জন্য বিভিন্ন পরিবার একস্থানে দলবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিল, এইরূপে গোত্রের (clan) সৃষ্টি হইল। কয়েকটি গোত্রের লোকেরা মিলিয়া নিজেদের এক একটি গোষ্ঠীর (tribe) লোক মনে করিতে লাগিল। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার সুবিধা বাড়িয়া গেল, বিভিন্ন গোষ্ঠী ক্রমে জাতির (nation) ভিত্তিতে বৃহত্তর সমাজ গঠন করিতে থাকিল।

আধুনিককালে কেবল প্রয়োজন ও স্বভাবের তাগিদে নয়, সচেতনভাবে চিন্তা করিয়া ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া মানুষ সমাজ-সংগঠন গড়িয়া তুলিতেছে, প্রয়োজনমত উহার সংস্কার করিয়া লইতেছে। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার সুবিধা ক্রমে বুঝিতে পারিয়া বিভিন্ন পরিবারের বিচ্ছিন্ন মানুষ সমাজগঠন দৃঢ়তর করিয়াছে। বর্তমান কালের সমাজ শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে গঠিত। একা একা নিজের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র আজকাল কেহ প্রস্তুত করিতে পারে না। কেহ ধান্য রোপণ করে, কেহ বা বস্ত্র বয়ন করে। একদল মানুষ হাঁড়ি কলসী তৈয়ারী করে, অপর দল হয়তো লাঙল, কোদাল, কাটারি ইত্যাদি প্রস্তুত করে। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে এবং তাহার পরে নিজের জিনিসের বদলে অন্যের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য পায়। এইরূপে সমাজে সর্বদা বিনিময় চলিতেছে। মানুষ সকল সময়ে সচেতন না থাকিলেও সে অবচেতন মনে অন্যের উপর এবং অন্যে তাহার উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে। নিজেদের ভালমন্দ বুঝিবার মত বিচারশক্তি আছে বলিয়াই তাহারা সমাজে বাস করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছে। এই চেতনাবোধই বর্তমান কালে সমাজ-জীবনকে গড়িয়া তুলিতেছে। ক্রমে সমাজের মধ্যে এক ব্যক্তির সহিত

মানুষের স্বভাব, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, আত্মরক্ষা ও সচেতনতা

অন্য ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামাজিক রীতি, নীতি, নিয়ম, প্রথা ও সংস্কার প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হইয়াছে, সমাজের মধ্যে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য বিবিধ আইনকানুনের সৃষ্টি হইয়াছে।

সমাজের কাঠামো ও গঠন (Structure of Society) : সমাজের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যক্তি, বিভিন্ন দল বা উপদল এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান লইয়া সমাজ গঠিত থাকে।

মানুষের স্বভাবের মধ্যে দুইটি বিপরীত ঝোঁক বা প্রবণতার ঘাত-প্রতিঘাতে সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠে। জার্মানীর বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্টের ভাষায় আমরা বলিতে পারি যে, মানুষের মধ্যে এক ধরনের "অসামাজিক সামাজিকতা" (unsocial sociableness) আছে। উহাই সমাজজীবনের ভিত্তি।

ব্যক্তির মন

মানুষের স্বভাবের একদিক হইল আত্মপ্রতিষ্ঠার ঝোঁক ও আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি; উহার অপর দিক হইল আত্মত্যাগ, নম্রতা ও সহানুভূতি। মানুষের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তির দরুন সে আলস্য ও দুর্বলতা জয় করে, অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে, অন্য লোকের উপর ক্ষমতাবিস্তার ও প্রভুত্ব লাভের স্পৃহা নিজের মধ্যে জাগাইয়া তোলে। তাহার স্বভাবের এই দিকটি সংযত থাকে অন্য লোকের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা, অন্য লোকের সঙ্গ লাভের কামনা ও স্বভাবের নম্রতার দরুন। অহংবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ উভয়ই তাহার প্রকৃতিজাত—উভয়ই স্বাভাবিক। ব্যক্তির মনের মধ্যে সমাজজীবনের উৎস খুঁজিতে গেলে আমরা উগ্রতা ও নম্রতা, ব্যক্তিবোধ ও সমাজবোধ, সংঘর্ষ ও সহযোগিতা—এই সকল বিষয়ের জটিল ও সূক্ষ্ম সম্মিলন দেখিতে পাই।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের কাঠামো আলোচনা করিলে আমরা আরও একটি বিষয় বুঝিতে পারি। সমাজে সকলে সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও একই সমাজের মধ্যে আবার বিভিন্ন দল উপদল আছে, বিভিন্ন স্তরে সমাজজীবন বিভক্ত। সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের কত বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক এক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে আমরা এক একরূপে পর্যবেক্ষণ করি। সমাজে কেহ মালিক, কেহ শ্রমিক, কেহ ক্রেতা, কেহ বিক্রেতা, কেহ বন্ধু, কেহ শত্রু, কেহ আত্মীয়, কেহ বা প্রতিবেশী। প্রত্যেকটি মানুষ বিভিন্ন মানুষকে এবং বিভিন্ন দ্রব্যকে কি চোখে দেখে সেই দৃষ্টিকোণ (attitudes to men and objects) অনুযায়ী মোটামুটি ভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্কের গভীরতা গড়িয়া উঠে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে

বিষয়টি বুঝা যাইবে। মনে করা যাউক, একদল লোক একই পাড়ায় থাকে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে ততটা মেলামেশা করে না, খুব ঘনিষ্ঠতা নাই। সেই পাড়ায় চুরি, ডাকাতি বা গুণ্ডামি সুরু হইল, লোকেরা ভয় পাইয়া গেল। ভয়ের দরুন তাহারা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা সুরু করিল। নিজেরা একত্র হইয়া ভয় দূর করার চেষ্টাতে তাহাদের মধ্যে পূর্বের তুলনায় সম্পর্ক নিকটতর হইয়া উঠিল। একই দ্রব্য যদি অনেক লোকে ভালবাসে, তবে তাহারা এইরূপ নিকটতর হইয়া উঠিতে পারে, যদি অবশ্য সেই দ্রব্যটি এমনই হয় যে, সকলে মিলিয়া মিশিয়া সমবেতভাবে উহাকে ব্যবহার করা চলে, যেমন পার্ক, রাস্তা, সরোবর ইত্যাদি। যদি সেই দ্রব্যটি এমন হয় যে উহা ব্যক্তিগত-ভাবে ভোগের বা ব্যবহারের জিনিস, তবে ঝগড়াঝাঁটি বাদবিসংবাদ সুরু হয়, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি দেখা দেয়; সামাজিক সম্পর্ক বিবাদের রূপ গ্রহণ করে। রামের একখানা কাপড়ের খুব দরকার, শ্যামের নিকট ঐ কাপড় আছে, শ্যাম উহাকে নিজের পক্ষে দরকারী মনে করিতেছে না। এইরূপ অবস্থায় সামাজিক কাজকর্ম ক্রয়-বিক্রয়ের রূপ গ্রহণ করিতে পারে; রাম ও শ্যামের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা—এইরূপ সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব হয়। অনেক সময় দ্রব্যটি এমন হয় যে একা উহাকে তৈয়ারি করা বা সংগ্রহ করা যায় না, সমবেত চেষ্টার দরকার। এই চেষ্টার সময়ে সকলের শ্রম একই ধরনের হইতে পারে, অথবা বিভিন্ন রকম শ্রমের দরকার হইতে পারে। যেমন—একদল লোক গাছ কাটে, আর একদল লোক তক্তা বানায়, আর একদল লোক নৌকাটি তৈয়ারি করে। তখন সমাজে শ্রমবিভাগ (division of labour) আসিয়া পড়ে, বা বৃত্তি-বিশেষায়ণ (occupational specialisation) দেখা দেয়। যাহারা গাছ কাটে, তাহারা নিজেদের কাজ একরকম বলিয়া সেই সহানুভূতির টানে নিকটতর হয়; যাহারা তক্তা বানায় তাহাদের তুলনায় নিজেদের একটু পৃথক্ বলিয়া মনে করে। আমরা নিজেরা এক, কিন্তু আমরা উহাদের হইতে পৃথক্—এইরূপ মনোভাব দেখা দেয়। একই সঙ্গে একত্র হইবার ও বিচ্ছিন্ন হইবার মনোবৃত্তি (centripetal and centrifugal forces) সমাজে এই রকমের বিভিন্ন দল ও উপদল সৃষ্টি করে।

ব্যক্তির মনে বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাবে দল ও উপদল গঠন

তৃতীয়ত, সমাজের গঠন লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সকল মানুষের জীবন সমাজের মধ্যেই কতকগুলি গ্রন্থির দ্বারা যুক্ত এবং কতকগুলি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত। কোন সমাজ বলিলে এই সকল গ্রন্থি ও প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়া আমরা চিন্তা করিতে পারি না। যেমন—বিবাহপ্রথা, পূজাপার্বণ, সামাজিক উৎসব-আনন্দ, সম্পত্তির আইন, উত্তরাধিকার আইন—ইহারা হইল কতকগুলি গ্রন্থি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই সকল মৌলিক গ্রন্থি না থাকিলে বিচ্ছিন্নতা

অবশ্যম্ভাবী—এই সকল খুঁটির জোরেই সমাজ দাঁড়াইয়া থাকে এবং সচল থাকে।

বিভিন্ন গ্রন্থি ও প্রতিষ্ঠান—ব্যক্তির সহিত তাহাদের জটিল সম্পর্কজাল

এই সকল গ্রন্থি ছাড়াও সমাজে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন পরিবার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও ধর্মচক্র, সাহিত্যসভা, ফুটবল ফেডারেশন, শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, ছাত্র সংঘ, শিক্ষকসমিতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি। মানুষের বহু বিভিন্ন রকমের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য (instincts, desires and purposes) পূরণের জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া মানুষ তাহার প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। মানুষের সমাজজীবন অথবা তাহার সামাজিক পরিবেশ, এই দুই প্রকার বিষয়ের (বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থি ও বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের.) সম্মিলিত যোগফল।

ব্যক্তি ও সমাজ (Individual and the Society): ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক, তাই, খুবই ঘনিষ্ঠ। বহু ব্যক্তি লইয়াই সমাজ গঠিত হয়; সমাজের বাহিরে কোন ব্যক্তিকে আমরা কল্পনা করিতে পারি না। প্রাচীনকালের

অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের তাগিদ

মুনিঋষিদের অবস্থায় এখনকার মানুষ বাঁচিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে তাহার বিভিন্ন দ্রব্যের অভাব মিটাইবার জন্য এখন সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অভাবের সংখ্যাবৃদ্ধি। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমাজের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ভাষায় বলিতে গেলে "Man is by nature and necessity a social animal."

কেবল অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই নয়, সমাজে বাস করা মানুষের স্বভাব। অন্যের সঙ্গে কামনা করা, অন্যের উপর নির্ভর করা, অনেক মানুষের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া

আবেগ বা স্বভাবের তাগিদ

থাকা, ইহারা ক্ষুধাতৃষ্ণার ন্যায় মানুষের প্রাচীনতম প্রবৃত্তির অংশ, তাহার আদিম আবেগ (instinct)। অ্যারিস্টটলের ভাষায় "Man is a social and political animal and a person who does not live in society is either above humanity or below it," হয় সে দেবতা নতুবা সে পশু।

শুধু তাহাই নহে। সমাজে বাস না করিলে তাহার মানসিক গুণ ও বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশলাভ সম্ভব হয় না, মনের অভাব মিটান চলে না। আমাদের শাস্ত্রে

মনের বা সংস্কৃতির তাগিদ

বলে, নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারাই সুখ এবং সমাজে বাস না করিলে সেই সুখ মানুষ পাইতে পারে না। সমাজ হইল দর্পণের ন্যায়; কোনো ব্যক্তি সমাজের মধ্যে নিজের গুরুত্ব ও স্থান অপরের

সহিত তুলনা করিয়াই বুঝিতে পারে। সমাজের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং প্রত্যেকটি সম্পর্কই তাহাকে নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা ও সমাজসত্তা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। সকলের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইতে হয় বলিয়া তাহাকে অন্যের সহিত অবিরাম সহযোগিতা ও সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয়, ইহাতে তাহার ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও গুণাবলীর স্ফুরণ দেখা যায়। ব্যক্তি, তাই, সমাজেই সম্পূর্ণ।

যদি কেবল ব্যক্তিকে সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো একক হিসাবে দেখিতে যাই, তবে তাহার সমগ্র রূপটি কিছুতেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় না। মহাকাশের দিকে তাকাইয়া আমরা চাঁদকে যতটুকু দেখি, বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও উহার বেশি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার, ব্যক্তিকে বাদ দিয়া কেবল সমষ্টিগতভাবে সমাজের প্রতি তাকাইলেও আমাদের চোখে মানুষ সম্পর্কে সঠিক চিত্র পরিস্ফুট হয় না। যেমন, সামগ্রিক দৃষ্টিতে মহাকাশের দিকে তাকাইয়া শুধু ছায়াপথই (Milky way) একমাত্র সত্য বলিয়া মনে হয়। তাই একমাত্র ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, মানুষের সহিত মানুষের যে-সম্পর্ক উহা বুঝিতে পারিলেই ব্যক্তি ও সমাজের সঠিক রূপরেখা, উহাদের সুস্পষ্ট ছবি আমাদের চোখে ধরা পড়ে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহুবিচিত্ররূপ সম্পর্ক লইয়াই সমাজ।

সমাজের কাজে ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করে কি ভাবে? এই বিস্তীর্ণ জনসমুদ্রে সে কি ভাবে নিজের ঠাঁই খুঁজিয়া পায়? তাহার মনের মধ্যে সমগ্র সমাজকে সে অনুভব করে কি করিয়া? তাহার সামাজিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় কি রূপে?

সমাজ বলিলে কবির কল্পনাপ্রসূত কোন অবাস্তব কিছু আমরা বুঝি না। যাহা ধরা যায় না, ছোয়া যায় না, আকারহীন বা রূপহীন কোন বস্তু ইহা নয়। সমাজের বিভিন্ন গ্রন্থি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যক্তি যে জীবনযাপন করে, সেই বাস্তব সামাজিক সম্পর্কগুলি লইয়াই সমাজ গঠিত। সকল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণ, যোগ্যতা বা ঝোঁক সমান নয়। তাই একই ব্যক্তি সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের সমান অংশীদার হয় না। কাহারও রাজনীতিতে ঝোঁক, সে রাজনৈতিক দল বা উপদলে যোগ দেয়। কেহ বা অন্যের সেবা করিতে খুব ইচ্ছুক, সে সেবাসমিতি গঠন করে। এইরূপে কোন ব্যক্তি নিজের ঝোঁক অনুযায়ী সামাজিক পরিবেশের এক বিশেষ অংশ নিজেই খুঁজিয়া বাহির করে, নিজের প্রবণতা ও সাধ্য অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তাহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, নিজের উন্নতি করিতে গিয়া সে প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করিয়া তোলে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এইরূপে পরস্পরকে প্রভাবিত করে, ব্যক্তির জীবনের মান ও সমাজসংগঠন একত্রে উন্নত হয়। মনে রাখা দরকার, ব্যক্তি এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই নিজের ব্যক্তিত্বকে বাস্তবে রূপ দেয়।

অবশ্য এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থির ও অপরিবর্তনীয় নহে। যখন কোন প্রতিষ্ঠান স্থির ও অপরিবর্তনীয় নহে। যখন কোন প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটাইতে পারে না, মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে নিজেকে বদলাইয়া লইতে চাহে না, তখন উহার পরিবর্তন করা দরকার হয়, এমন কি সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করাও দরকার হইতে পারে।

সামজিক পরিবেশের একাংশ ব্যক্তি-মনের উপর প্রভাব ফেলে

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক আলোচনা করার সময়ে আমাদের আর একটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, প্রত্যেকটিই কোন ব্যক্তিকে নিজের দিকে টানিতেছে। শুধু তাহাই নহে। এমন অনেক সময় আসিয়া পড়িতে পারে যখন ব্যক্তি সমস্যার মধ্যে পড়ে, কাহাকে তাহার মানিয়া চলা উচিত। পরিবারের স্বার্থ দেখিলে ক্লাবের স্বার্থ দেখা হয় না; সাহিত্য-সমিতি তাহাকে সাহিত্য রচনা কারতে বলে, কিন্তু সেবা-সমিতি তাহাকে সেবা করিতে বলে। কোন প্রতিষ্ঠানের কথা সে মানিয়া লইবে? পরিবারকে মানিবে, অথবা ক্লাবকে মানিবে? মানবতার আহ্বানে সাড়া দিবে অথবা রাষ্ট্র তাহাকে যাহা করিতে বলে তাহা করিবে? বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাহাকে টানে, সে কাহাকে খুশি করিবে? প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এইরূপ সমস্যা বহুবার দেখা দেয়। পৌরনীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেই এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। প্রথমে কাহাকে মানিব, তাহার পরে কাহাকে, উহার পরে কোন্ প্রতিষ্ঠানকে—ব্যক্তি নিজের মনে সর্বদা এইরূপ স্তরবিভাগ করিয়া রাখে না। সুনাগরিক হওয়ার প্রকৃত সমস্যা হইল এইখানে। সুনাগরিক হইতে হইলে তাহাকে সর্বদা বৃহত্তর মানব সমাজের স্বার্থ চিন্তা করিতে হয়; সংকীর্ণ শ্রেণীগত, দলগত বা উপদলগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহত্তম স্বার্থকে মানিয়া চলিতে হয়। ইহা মানিতে শিখায় বলিয়াই সমাজ-জীবনযাপনে ব্যক্তির মানসিক ও চারিত্রিক উন্নতি দেখা দেয়। আমাদের শাস্ত্রেও তাই লেখা আছে যে, পরিবারের স্বার্থে ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবে; সম্প্রদায়ের স্বার্থে পরিবারকে ত্যাগ করিবে; দেশের স্বার্থে সম্প্রদায়কে ত্যাগ করিবে এবং আত্মার স্বার্থে সমগ্র পৃথিবীকে ত্যাগ করিবে।*

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দাবি মানিয়া লওয়ায় বিরোধ দেখা দিতে পারে

* ত্যজেদেকম্ কুলস্বার্থে, গ্রামস্বার্থে কুলং ত্যজেৎ,
গ্রামং জনপদস্বার্থে, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।

সমাজে রাষ্ট্রের স্থান (The Place of State within Society): আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, সমাজে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্রের স্থান সর্বোচ্চে। সামাজিক জীবন ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই সর্বাপেক্ষা বেশি। সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, সকলে উহার আদেশ বা আজ্ঞা মানিয়া লয়—সমাজে এরূপ কোন ক্ষমতা না থাকিলে সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব হইত না, দেশে গণ্ডগোল ও বিশৃংখলা দেখা দিত।

সমাজে রাষ্ট্রের স্থান

প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে বা আমাদের দেশেও ছোট ছোট নগরীতে এক-একটি ছোট ছোট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কয়েক হাজার অধিবাসী লইয়া এক-একটি রাষ্ট্র গঠিত হইত এবং তাহারা নিজেরাই এইরূপ নগর-রাষ্ট্রের কাজকর্ম দেখাশোনা করিত। নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনের চরম লক্ষ্যও ছিল রাষ্ট্রের কাজকর্ম করা, সুনাগরিক হওয়া। ব্যক্তির জীবনের সকল কাজ, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রিত করিত। সমাজ ও রাষ্ট্র একাকার হইয়া গিয়াছিল; ইহাদের কোন পার্থক্য গ্রীক পণ্ডিতগণ (বিশেষত, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল্) স্বীকার করিতেন না।

প্রাচীনকালে গ্রীসে সমাজ ও রাষ্ট্র একই ছিল

আধুনিক কালে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আমরা কিছুটা পৃথক্ বলিয়া মনে করি। প্রথমত, সময়ের দিক হইতে বিচার করিলে সমাজ অনেক আগে, রাষ্ট্র অনেক পরে। মানবসভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ কোন-না-কোন সমাজে বসবাস করিত, তখনও রাষ্ট্র সংগঠিত হয় নাই। প্রাচীন আমলের শিকারী, পশুপালক ও ফলমূল আহরকদের রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। দ্বিতীয়ত, সমাজের কাজকর্ম অনেক বেশি ব্যাপক। রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজ অনেক বেশি বিস্তৃত। বহুরকম প্রতিষ্ঠান লইয়া সমাজ গঠিত, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই মানুষের কত বিভিন্ন প্রকার রুচি, ঝোঁক, আবেগ, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সাধনের কাজ করিতেছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্তি তাহার প্রয়োজন ও লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হইল সীমাবদ্ধ, কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ। তাই কেবল রাষ্ট্রকে মানিয়া চলিলেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে না; তাহাকে কেবলমাত্র সুনাগরিক হইলেই চলে না, মানুষ হইতে হইবে। তৃতীয়ত, সমাজের কাঠামো অনেকটা নমনীয়, রাষ্ট্রের কাঠামো ও গঠন-প্রকৃতি কঠিন ও যান্ত্রিক ধরনের। সমাজ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহার বিভিন্ন প্রথা, রীতিনীতি, আচার-বিচার ও সামাজিক নিয়মকানুনের মধ্য দিয়া। রাষ্ট্র কিন্তু মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের

রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজ অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত

আদেশ অর্থাৎ আইন-কানুন না মানিলে সে আমাদের জেলে পাঠাইতে পারে, এমন কি ফাঁসিও দিতে পারে। সর্বোপরি, সমাজের সকল কিছুর সঙ্গে আমরা নিজেদের জীবনকে খাপ খাওয়াইয়া মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করি; কিন্তু রাষ্ট্রকে আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য হই।

সমাজ ও রাষ্ট্র কিছুটা পৃথক্ হইলেও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন একেবারে পৃথক্ বিষয় বলিয়া ইহাদের মনে করা যায় না। সমাজের মধ্য হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজ যেন তরল ধরনের, ইহার মধ্য হইতে ক্রমশঃ যে ঘনীভূত শক্তির কেন্দ্র গড়িয়া উঠে, সেই পুঞ্জীভূত শক্তিকেই রাষ্ট্র বলে। সমাজের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া এই শক্তির কেন্দ্রটি সমাজকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে। সমাজকে চলমান অবস্থায় রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল, উপদল ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখাই রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ। ব্যক্তির অসামাজিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমাজকে সচল রাখা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়কে একেবারে পৃথক্ করা চলে না। উভয়েরই উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির পূর্ণোন্নতি।

সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়া সমাজকেই নিয়ন্ত্রণ করে

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র (Individual, Society and the State) : সমাজে বাস করিয়া এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া ব্যক্তির পূর্ণোন্নতি কেমন করিয়া হইতে পারে এই সম্পর্কে পণ্ডিতগণ নানারকম কথা বলিয়াছেন, নানাপ্রকার তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজে ব্যক্তিরা নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া সমাজ চালাইতে পারে, রাষ্ট্রের কোন দরকার নাই, অনেক পণ্ডিত এইরকম মত দিয়াছেন। রাষ্ট্র থাকিলেই ব্যক্তির নিজের ইচ্ছামত কাজ করা সম্ভব নয়, ব্যক্তির স্বাধীনতা কমিয়া যায়। ব্যক্তিরা নিজেরাই পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া সমাজ চালাইতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, সমাজে উহার কোন প্রয়োজন নাই; এইরূপ মত অনেকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের নৈরাজ্যবাদী (Anarchists) বলে এবং এইরূপ মতবাদকে নৈরাজ্যবাদ (Anarchism) বলা হয়।

শুধু সমাজ থাকিলেই চলিবে, রাষ্ট্রের দরকার নাই, ব্যক্তির মুক্তি চাই

সাম্যবাদীরা (Communists) বলেন যে, যখন হইতে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি হইল, তখনই সমাজ নিজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গেল।* এই বিরোধ যাহাতে সমাজকে একেবারে ভাঙিয়া না দেয় তাহা দেখার জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি

* একদল লোক সম্পত্তির মালিক, অপর একদল লোকের কোন সম্পত্তি নাই, তাহারা নিজের দেহশক্তি বা শ্রমশক্তি বিক্রয় করিয়া সমাজে বাস করিতে বাধ্য হয়। উৎপাদনের যন্ত্রপাতির কেহ মালিক, কেহ বা ব্যবহারকারী শ্রমিক। এই মালিকানার ভিত্তিতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী দেখা দেয়।

হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে মালিক-শ্রেণীর স্বার্থ যাহাতে কোনমতে ক্ষুণ্ণ হইতে না পারে, তাহাদের স্বার্থে যাহাতে কোন আঘাত না লাগে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে। সমাজের মালিক ব্যক্তিরাই রাষ্ট্র চালায়; অন্যান্য সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সমাজে শ্রেণীর রূপ বদলাইয়া গেলে রাষ্ট্রের রূপও বদলাইয়া যায়, সমাজের নূতন কাঠামোতে নূতন কৌশলে রাষ্ট্র নূতন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে। তাই সাম্যবাদীরা বলেন যে, যখন শ্রেণীহীন সমাজে কোন বিশেষ শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করিবে না, ব্যক্তিরা যখন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকিবে না, তখন রাষ্ট্রকেও দরকার হইবে না (wither away)। সহযোগিতা ও সংঘর্ষ উভয়ে মিলিয়া বর্তমানের সমাজ চলিতেছে ঠিকই, কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজে সংঘর্ষের স্থান নাই, প্রধানত সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমাজ চলিতে থাকিবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করিবে, সমাজই প্রাধান্য লাভ করিবে। রাষ্ট্র নামে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে না, কারণ স্বার্থসংঘাত অবলুপ্ত হইবে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সমাজে শ্রেণী-বিভেদ দূর হইলে রাষ্ট্র লোপ পাইবে

আর এক ধরনের মতবাদ পৃথিবীতে আছে, উহার নাম ফ্যাসিবাদ (Fascism)। এই মতবাদের ভিত্তি হইল রাষ্ট্র সম্পর্কে ভাববাদীতত্ত্ব (Idealist theory of State)। এই মতে বলা হয় যে সমাজে রাষ্ট্রই হইল সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান, মানুষ ইহা ছাড়া আর কাহাকেও মানিতে পারে না। ব্যক্তির সামাজিক জীবন একমাত্র রাষ্ট্রের কাজ কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সকল ব্যাপারেই চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী জীবন ধারণ ও পরিচালনা করিবে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা (Will) পূরণের মধ্য দিয়াই ব্যক্তির ইচ্ছা পূরণ হয়। রাষ্ট্রকে মানিয়াই ব্যক্তি নিজের আত্মোপলব্ধি করিতে পারে। ব্যক্তির নিজস্ব কোন কিছু করার স্বাধীনতা এই মতবাদে স্বীকার করা হয় না।

রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তির মুক্তি ও সম্পূর্ণতা

সাধারণত, আমাদের দেশে বা পৃথিবীর কয়েকটি দেশে আর এক ধরনের মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সমাজকে ও রাষ্ট্রকে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন। নিজেদের মতকে তাঁহারা উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal democracy) নামে আখ্যা দেন। তাঁহারা বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভয়ানক কোন বিরোধ নাই; কিন্তু উহারা একেবারে একও নহে। তাঁহাদের মতে সাম্যবাদীরা ও ফ্যাসিবাদীরা ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রাধান্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিপন্ন বলিয়া তাঁহারা মনে

ব্যক্তির বিকাশ সমাজে এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে

করেন। এই সকল পণ্ডিতগণ রাষ্ট্রের অবলোপ চাহেন না, আবার একমাত্র রাষ্ট্রেই ব্যক্তির পরিপূর্ণতা তাহাও স্বীকার করেন না। সমাজ থাকিবে, রাষ্ট্রও থাকিবে, ব্যক্তির অসামাজিক কাজকর্মে রাষ্ট্র বাধা দিবে, কিন্তু উহা ব্যক্তির সকল প্রতিভা ও প্রবণতা বিকাশের পথে সকল বাধা দূর করার চেষ্টা করিবে; ইহাই তাঁহাদের অভিমত। সমাজে ব্যক্তি, বিভিন্ন দল বা উপদল, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে, ব্যক্তির স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া সমাজের শৃংখলা রক্ষা করিবে—ইহাই তাঁহারা বলিতে চাহেন।

রাষ্ট্র কাহাকে বলে ? (What is state ?) **:** ইটালীর বিখ্যাত কূট রাজনীতিবিদ্ ও লেখক ম্যাকিয়াভেলি সর্বপ্রথমে 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে রাষ্ট্র ছিল খুবই ছোট। দশ বা বারো হাজার অধিবাসীর একটি নগরীকেই রাষ্ট্র বলা হইত। যেমন, গ্রীস দেশের বিখ্যাত নগরী এথেন্স একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল। গ্রীক ও রোমকগণ এইরূপ ছোট ছোট নগররাষ্ট্রে বাস করিত। রাষ্ট্রের আয়তন এক-একটি নগরের আয়তনের সমান ছিল। পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রের আয়তন বড় হইতে আরম্ভ করিল। আজকাল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত বিরাট দেশ এক-একটি রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন বলেন যে, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী আইন দ্বারা সংঘবদ্ধ একদল লোক একটি রাষ্ট্র গঠন করে ("a people organised for law within a definite territory")। আন্তর্জাতিক আইনের বিখ্যাত অধ্যাপক হল বলেন, "রাষ্ট্র হইল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত বহিঃশক্তির শাসন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ।" পণ্ডিত ব্লুণ্টশ্লি বলেন, "কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজ হইল রাষ্ট্র।"

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের একটি উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি কতকগুলি লোকের সমষ্টি স্থায়িভাবে নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে বাস করিয়া, বিদেশী কোন রাষ্ট্রের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া একটি সরকার স্থাপন করে ও ঐ সরকারের নির্দেশ সকলে মানিয়া চলে, তবেই রাষ্ট্র স্থাপিত হয়।

সমাজের একটি বিশেষ সংগঠনের নাম রাষ্ট্র। সমাজের প্রতিটি সংগঠনই বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করে। প্রতিটি সংগঠনের মধ্য দিয়াই সমাজের ঐক্যসাধন ঘটে। সমাজে যখন শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয়, তখন সংহতি রক্ষার জন্য সমাজের মধ্য হইতেই একটি শক্তির কেন্দ্র গড়িয়া ওঠে। সমাজে কেন্দ্রীভূত শক্তির আধার এই রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের তাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হইল প্রথমত, সামাজিক ঐক্য, এবং দ্বিতীয়ত,

বিরোধের মধ্যে শান্তি। সমাজের এই ঐক্য ও শান্তি রাষ্ট্র নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতিতে রক্ষা করে, সেই কারণে অন্যান্য সংগঠনের সহিত রাষ্ট্রের এত পার্থক্য। এই বিশেষ পদ্ধতি হইল বল প্রয়োগ—ইহার দ্বারাই রাষ্ট্র যে কোনরূপ বিরোধ ও বিশৃংখলা মীমাংসা করে। তাহার বলপ্রয়োগ ক্ষমতার বাহরূপ তাহার সামরিক বাহিনী ও আরক্ষা বাহিনী। রাষ্ট্রের সকল আইনের পিছনেও মূল শক্তি এই বলপ্রয়োগের ক্ষমতা। সুতরাং বলপ্রয়োগকারী শক্তির যে সংগঠন সমাজের ঐক্য ও শান্তি রক্ষা করে, উহাই রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রের উপাদান (Elements of State) : অধ্যাপক গার্নারের এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের চারিটি উপাদান আছেঃ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, নির্দিষ্ট লোকসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌম শক্তি। এই উপাদান কয়টি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

(ক) **ভূখণ্ড**—যাহারা রাষ্ট্রে বাস করিবে তাহাদের স্থায়িভাবে পৃথিবীর বুকে কোন একটি অঞ্চলে বসবাস করিতে হয়। যাযাবরেব ন্যায় সর্বদা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যদি সেই লোকসমষ্টি ঘোরাফেরা করে, তবে তাহাদের কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্র থাকে না। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। ব্লুণ্টশ্লির ভাষায় বলা চলে "রাষ্ট্রের যেমন শাবীরিক ভিত্তি আছে জনসমষ্টিতে, তেমন বাস্তব ভিত্তি আছে জমিতে।" এই ভূখণ্ড বলিতে শুধু জমির উপরিভাগ বুঝায় না। এই উপরিভাগ ছাড়াও মাটির তলায় খনিজ পদার্থ, উপরে আকাশ, ভূভাগের নদ-নদী, গিরি, বন, সমুদ্র ও উপকূল এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। এই ভূখণ্ডেব আয়তন বড়ও হইতে পারে, আবার ছোটও হইতে পারে।

ভূখণ্ড ও ভৌগোলিক সীমা

অ্যারিস্টটলের যুগে রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র আয়তনের। তিনি খুব বড় রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আজকাল ছোট বড় নানা আকারের রাষ্ট্রই আছে। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। ইহাদের আয়তন আমাদের দেশের এক একটি জেলার সমান। আবার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র একটি বিরাট আয়তনের রাষ্ট্র। তাহা ভারত হইতেও বহুগুণে বড়।

(খ) **জনসংখ্যা**—লোক ছাড়া কখনও রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। জনহীন মরুভূমি অথবা মহাসাগরকে কেহ রাষ্ট্র বলিবে না। রাষ্ট্রের গঠনে একদল লোকের প্রয়োজন, কারণ, ব্যক্তি লইয়া গঠিত সমাজ না থাকিলে এই প্রতিষ্ঠানেরও কোন দরকার নাই। কিন্তু কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমকগণ ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বাস করিত। সেই জন্য প্লেটো, অ্যারিস্টটল্ প্রভৃতি মনীষীরা

জনসমষ্টি বা সমাজ

রাষ্ট্রবাসীর সংখ্যা অল্প হওয়া উচিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাদের মতে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা খুব বেশি হইবে না, কারণ, তাহা হইলে শাসন-কার্যে অসুবিধা দেখা দিবে, আবার খুব কমও হইবে না, কারণ, তাহাতে রাষ্ট্রটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। কিন্তু আজকাল রাষ্ট্রের আকারও বড়, লোকসংখ্যাও অনেক বেশি। তবে সকল রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা সমান নয়। দক্ষিণ আমেরিকার পানামা রাষ্ট্রটির জনসংখ্যা মাত্র পাঁচ লক্ষ। কিন্তু ভারত যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা 44 কোটির উপরে, আর চীন গণতন্ত্রের লোকসংখ্যা 70 কোটির উপর।*

রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মানসিক ঐক্য ও সংহতির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূল প্রশ্ন হইল, রাষ্ট্রের জনসংখ্যাকে কি একজাতীয় বা সমভাবাপন্ন (homogeneous) হইতে হইবে ? এক ভাষা, এক ধর্ম প্রভৃতি থাকিলে এই সমভাব (homogeneity) আসিতে পারে। আমরা যখন একটি "জাতীয় রাষ্ট্র" কল্পনা করি তখন আমরা সেই রাষ্ট্রের এইরূপ সমভাবাপন্ন জনসমষ্টি ধরিয়া লই।

শাসনের সুবিধার জন্য, রাষ্ট্রের লক্ষ্য সুষ্ঠুভাবে পূরণের জন্য এই সমভাব থাকা দরকার। আজকাল অবশ্য রাজনৈতিক দলের শাসন থাকায় এই সমভাব দরকার নাই, কারণ প্রতিটি দলই বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের লোকজন লইয়া গঠিত হয়। ইহারাই জনসমষ্টির মধ্যে একপ্রকার ভাবগত ঐক্যের পরিমণ্ডল গড়িয়া তোলে।

(গ) শাসনযন্ত্র ও সরকার—একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করিলেই এক দল লোক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। এই জনসংখ্যাকে সংঘবদ্ধ করিয়া শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এইজন্য একটি শাসনযন্ত্রের দরকার। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রকেই সরকার বলা হয়। অধ্যাপক গার্নারের ভাষায় "Government is the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interests promoted." এই সরকারের শাসন জনসমষ্টির অধিকাংশ লোক মানিয়া চলিবে। এই সরকারের সাহায্যেই আইন প্রণয়ন করিয়া ও তাহা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রে আইন ও শৃংখলা রক্ষা করা হয়। একটি রেলগাড়ির ইঞ্জিন চালাইতে হইলে যেমন ড্রাইভার, গার্ড প্রভৃতির দরকার, সেইরূপ রাষ্ট্রের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সচল রাখিতে হইলে সরকারের দরকার।

সরকার ও শাসনযন্ত্র

* রাষ্ট্রের মধ্যে দুই ধরনের জনসমষ্টি থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, যাহারা নাগরিক হিসাবে অর্থাৎ রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে বিভিন্ন সুবিধা পায়, এবং দ্বিতীয়তঃ, যাহারা প্রজা হিসাবে নাগরিকদের অপেক্ষা কিছু কম সুবিধা পায়। রুশো (Rousseau) এই রাষ্ট্রীয় জনসমাজকে দুই ভাবে দেখিয়াছেন: 'সক্রিয় সভ্য হিসাবে' যাহারা "সাধারণের ইচ্ছায়" অংশ গ্রহণ করে, আবার 'প্রজা হিসাবে' যাহারা রাষ্ট্রের আইনের অধীন।

(ঘ) **সার্বভৌম ক্ষমতা**—রাষ্ট্র গঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌম ক্ষমতা। ইহাকে চরম ক্ষমতা বলা যায়। সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের প্রাণ। দেহে যেমন প্রাণ না থাকিলে একটি লোককে মানুষ না বলিয়া হাড়মাংসের সমষ্টি বলা হয়, সেইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের চরম ক্ষমতা না থাকিলে তাহাকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা যায়, কিন্তু রাষ্ট্র বলা হয় না। এই সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

সার্বভৌম ক্ষমতা বা আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃরাষ্ট্র স্বাধীনতা

রাষ্ট্রের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা অবাধভাবে পরিচালিত হইতে পারিবে। সরকারের আইন ও শাসনব্যবস্থা দেশের অধিকাংশ লোক মানিয়া চলিবে। রাষ্ট্রশাসনকে অমান্য করিতে পারে, এমন কোন শক্তি রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিতে পারে না। অধিকন্তু, রাষ্ট্রের উপর কোন বৈদেশিক শক্তির কোন নিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকিতে পারিবে না। সে নিজে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে পারিবে, নিজেই সন্ধির সর্ত ঘোষণা করিতে পারিবে, নিজের নামে সন্ধি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। অন্য একটি রাষ্ট্র যদি আমাদের দেশের উপরে প্রভুত্ব করে তবে আমাদের সার্বভৌমিকতা নাই ধরা হইবে ও আমাদেরই সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্র বলা চলিবে না। যেমন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বা আসাম রাজ্য রাষ্ট্র নহে। যদিও এই সব রাজ্যের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, লোকসংখ্যা ও সরকার আছে। কিন্তু ইহাদের নিজস্ব সার্বভৌম শক্তি নাই। অনেক কিছু ব্যাপারেই ইহাদের ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমত চলিতে হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের চারিটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সার্বভৌমিকতা বা চরম শক্তির বৈশিষ্ট্যই প্রধান।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government): অনেক দার্শনিক (যেমন, হব্‌স্ প্রভৃতি) রাষ্ট্র ও সরকারকে একই বলিয়া মনে করেন। সরকারের শাসন-যন্ত্রের কার্যাবলীর মধ্যে রাষ্ট্রের প্রকাশ হয় বলিয়া সাধারণভাবে মনে হয় যে, রাষ্ট্র ও সরকার সমার্থক। অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও ইহাদের একই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় "the State is for the purposes of practical administration, the government." ঠিক এইরূপ অধ্যাপক কোল (G. D. H. Cole) বলেন, "A State is nothing more or less than the political machinery of government in a community." কিন্তু সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই বক্তব্য মানেন না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বের দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য করা ভাল। রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত-ধারণা মাত্র (abstract idea); সরকার উহার বাস্তব প্রতিনিধি। তাই পৌরবিজ্ঞানে এই দুইটি শব্দকে সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থে ব্যবহার করা হয়।

যে-চারিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত, তাহার মধ্যে সরকার একটি মাত্র উপাদান। সরকার হইল যন্ত্র, ইহার মাধ্যমে রাষ্ট্র কাজকর্ম চালায়, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করে: "the machinery through which its purposes are formulated and executed.' কিন্তু সরকারকেই রাষ্ট্র বলিলে ভুল হইবে। মনে কর, মানুষ যাহা করিতে চায়, হাতের সাহায্যে সে তাহা করে। কিন্তু মানুষ বলিলে শুধু হাতটিকে বুঝায় না। মোটর গাড়ির ইঞ্জিন সমগ্র গাড়িটা চালায়, কিন্তু সেই ইঞ্জিনটিকে কেহ সমগ্র গাড়ি বলিতে পারে না। সেইরূপ সরকার রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা করিলেও তাহাকে রাষ্ট্র বলা চলে না। অধ্যাপক গার্নার তাই যথার্থই বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র যেন একটি যৌথব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। সরকার তাহার পরিচালকমণ্ডলী মাত্র। পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশে যেমন প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়, তেমনি সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

সরকার রাষ্ট্রের কাজ চালায় কিন্তু উহা নিজেই রাষ্ট্র নহে

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র দেশের লোকসংখ্যা লইয়া রাষ্ট্র গঠিত। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক লোক লইয়া সরকার গঠিত হয়। ভারতে 45 কোটির উপর লোক আছে। তাহাদের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার লোক আইন, শাসন ও বিচারকার্যে নিযুক্ত আছে। ইহাদের লইয়া সরকার গঠিত। আমরা সকলে ভারতীয়, ভারত রাষ্ট্রের সভ্য, কিন্তু আমাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন মাত্র সরকারের সদস্য।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র বলিলে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বুঝায়; সিংহল বলিতে একটি ডিম্বাকৃতি দ্বীপের কথা মনে আসে। কিন্তু সরকারের কাঠামোর সহিত কোন ভূখণ্ডের সম্পর্ক নাই, বা উহার কোন ভৌগোলিক সীমা নাই।

চতুর্থত, রাষ্ট্র একটি চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান, "a permanent and stable entity," সমাজের নিয়ন্ত্রণকারী এরূপ কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠান বহুদিন হইতেই আছে এবং ভবিষ্যতেও বহুদিন থাকিবে। সরকারের পরিবর্তন হইতে পারে, এক সরকারের পতন হইলে অন্য সরকার আসিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন হয় না। তবে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার পরিবর্তন হইতে পারে। আজ ভারতে কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে, ভবিষ্যতে অন্য দলীয় সরকার স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ভারত রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না।

পঞ্চমত, সকল রাষ্ট্রের রূপই এক। রাষ্ট্র হিসাবে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু উহাদের সরকার ভিন্ন জাতীয়। ভারতে মন্ত্রিসংসদশাসিত সরকার, আর আমেরিকাতে রাষ্ট্রপতিচালিত সরকার।

ষষ্ঠত, সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অনেক অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকার থাকিতে পারে না। ব্যক্তির সকল অধিকারের উৎস হইল রাষ্ট্র, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকারের দাবি করিবার অধিকার কাহারও নাই।

সর্বোপরি, সরকার একটি বাস্তব জিনিস, কিন্তু রাষ্ট্র হইল ভাবাত্মক কল্পনা (idea or concept)। অনেকে তাই উপমা দিয়া বলিয়াছেন, সরকার দেহ এবং রাষ্ট্র তাহার আত্মা। সরকার পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী, অপর পক্ষে রাষ্ট্র আত্মার ন্যায় অবিনশ্বর।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (State and other Associations) : একটি সমাজে নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান আছে। এই সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সমাজ মানুষের নানা প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। বিভিন্ন মানুষের মনে বহু বিভিন্ন প্রকার আবেগ ও ঝোঁক থাকে। কেহ খেলাধূলার বিষয়ে দক্ষ হইতে চায়, কেহ সাহিত্য-চর্চা পছন্দ করে, কেহ চিত্রশিল্পে নৈপুণ্যের আরাধনা করে, কেহ বা মাহিনা-বৃদ্ধির আন্দোলনে পারদর্শিতা লাভ করিতে চায়। শুধু তাহাই নহে। একই মানুষের মনের মধ্যে এই সকল বহু ইচ্ছা একই সঙ্গে দেখা যায়। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় ব্যক্তি হইল "a bundle of interests." এই সকল ইচ্ছা মিটাইবার জন্য সমাজের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া এক-একটি বিষয়ে এক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। এক একটি প্রতিষ্ঠান হইল "a group organised for the pursuit of an interest or a group of interests in common." রাষ্ট্রও সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ। ইহা সমাজের ঐক্য ও শান্তিরক্ষার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। এই কারণে লোকেরা রাষ্ট্রের সভ্য হন। অনেকে তাই রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রকার সংঘের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পান না। আজকাল একদল পণ্ডিত এইরূপ বহুত্ববাদী মত (Pluralism) প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রই পাইবে এই কথা ঠিক নয়। ক্রীড়া সংঘ, শ্রমিক সংঘ, লেখক সংঘ, সেবা সংঘ, এই সকল প্রতিষ্ঠানের মত দেশে একটি রাজনৈতিক সংঘ অর্থাৎ রাষ্ট্র থাকিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও মর্যাদা এই সকল সংঘগুলির সমান ; উহাদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া চলে না, রাষ্ট্র তাহা দাবিও করিতে পারে না।

কিন্তু ইহারা রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যগুলি মনে রাখেন না। প্রথমত, রাষ্ট্রের কাজকর্ম একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের কোন সীমাবদ্ধ স্থান নাই ; যেমন, রেডক্রস্ ও বয়স্কাউট সোসাইটি। ইহারা এক-একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ইহারা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়ানো আছে। রাষ্ট্রের ন্যায় ইহাদের কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা নাই।

দ্বিতীয়ত, কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ একটি উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়। কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধর্মের প্রচার করে, যেমন—ব্যাপটিস্ট মিশন, কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় আর্তের সেবার জন্য, যেমন—ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং রেডক্রস্। কোন প্রতিষ্ঠান খেলা-ধুলার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন, কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু রাষ্ট্রের কোন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নাই। রাষ্ট্র সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থাকে।

রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিগত পার্থক্য

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সংঘ, কিন্তু সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থায়ী না ও হইতে পারে। সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ ও আভ্যন্তরীণ সংঘাতে-বিভেদে প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া যায়। কিন্তু সরকারের অস্থায়িত্ব বা রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্র নাড়াচাড়া খাইলেও কখনও একেবারে ভাঙিয়া পড়ে না।

চতুর্থত, মানুষ ইচ্ছামত একাধিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারে। একজন লোক কলেজের বিতর্কসভার সভ্য হইতে পারে, আবার ফুটবল ক্লাবের এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যও হইতে পারে। কিন্তু একই ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের নাগারিক হইতে পারে না।

পঞ্চমত, কোন-না-কোন একটি রাষ্ট্রের সভ্য ব্যক্তিকে হইতেই হইবে—রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক। কিন্তু কোন সংঘের সভ্য হওয়া ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। ইচ্ছা করিলে ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের সদস্যপদ ত্যাগ করা কেবল ব্যক্তির ইচ্ছা হইলেই সম্ভব হয় না।

ষষ্ঠত, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক পার্থক্যের বিষয় হইল যে, রাষ্ট্রের হাতে চরম ক্ষমতা আছে, উহার নাম সার্বভৌম ক্ষমতা, অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বা সংঘের এই ক্ষমতা থাকিতে পারে না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি তাহার সভ্যদের সতর্ক করিয়া দিতে পারে, বহিষ্কার করিয়া দিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ঘোষণা করিতে পারে। ব্যক্তির জীবনে তাই রাষ্ট্রের স্থান অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পৃথক্। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়া থাকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর, কিন্তু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের খেয়ালের উপর নির্ভর করে না।

সমাজের এই সংঘ বা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মে ও তাহাদের নিজস্ব ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতায় কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। সমাজের ঐক্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বরং রাষ্ট্রই উদ্যোগী হইয়া ইহাদের কাজকর্মে সামঞ্জস্য আনিয়া ইহাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। এই কাজ করিতে গিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের পরিধিতে কিছুটা হস্তক্ষেপ করিতে সে বাধ্য হয়। অধ্যাপক

বার্কারের ভাষায় "The State, as a general and embracing scheme of life, must necessarily adjust the relations of associations to itself, to other associations and to their own members." রাষ্ট্রের এই কাজের উদ্দেশ্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আরও ভালভাবে নিজের কাজ করিতে দেওয়া, তাহার বিলোপ করা নয়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Origin of the State): রাষ্ট্রের উৎপত্তি বলিলে বোঝা যায় না যে, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট কারণের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা কেবল এইটুকু জানি যে, রাষ্ট্র হইল সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; সমাজের মধ্য হইতে ইহার উদ্ভব। ইতিহাসের কোন-না-কোন স্তরে, কোন বিশেষ সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ও বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশে সকল অঞ্চলে ঠিক একই সময়ে মনুষ্যসমাজ গঠিত হয় নাই, এবং সকল মনুষ্যসমাজে ঠিক একই সময়ে একই কারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার শক্তির ফলে বিভিন্ন মনুষ্যসমাজে রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে—আমরা মাত্র ইহাই বলিতে পারি। তাই পণ্ডিতগণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে একমত নহেন। এই বিষয় লইয়া বহু মতবাদ প্রচলিত আছে—প্রায় সকল মতবাদই অনুমান ও কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বার্কের (Burke) ভাষায় বলা চলে যে, সরকারের আদি রূপের উপর যেন একটা পর্দা টাঙানো আছে এবং সেই পর্দা এখনও সরানো যায় নাই। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না থাকায় এইরূপ কল্পনার সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদগুলি প্রথমে আলোচনা করিয়া সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তাহা বিচার করিব।

কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই; তাই নানা মুনির নানা মত

(ক) **বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ** (The Theory of Divine Origin): রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে এই মতবাদটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া সকলে মনে করেন। এই মতবাদে বলা হয়, স্বয়ং ভগবান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মানুষকে রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধভাবে থাকিবার জন্য প্রেরণা দিয়াছেন। রাজা বিধাতার প্রতিনিধি মাত্র। রাজার মাধ্যমেই ভগবানের ইচ্ছা লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং রাজার আজ্ঞা পালন করার অর্থ ভগবানের আদেশ পালন করা। রাজার আদেশ অমান্য করিলে পাপ হয়। ঈশ্বর যেমন নিজের সৃষ্ট কোন জীবের নিকট দায়িত্বশীল নন, তেমনি কোন রাজা বা রাণী প্রজাদের নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তাঁহারা আইনের ঊর্ধ্বে, তাঁহারা নিজেদের কাজের জবাবদিহি করিবেন

রাষ্ট্র ভগবানের সৃষ্টি—রাজা ভগবানের প্রতিনিধি

ঈশ্বরের নিকট, প্রজাদের নিকট নয়। আমরা হিন্দু শাস্ত্রে ভগবানের অংশরূপে রাজাকে প্রচার করার অনেক উদাহরণ পাই। রামচন্দ্র ছিলেন স্বয়ং ভগবান। যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপুত্র। কোন রাজবংশের উৎপত্তি সূর্য হইতে, আবার কোন বংশের উৎপত্তি চন্দ্র হইতে। মহাভারতের শান্তিপর্বে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাৎস্যন্যায়ের ফলে জনসাধারণ ঈশ্বরের নিকট শান্তি ও শৃংখলা প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর উহা পূর্ণ করার জন্য মনুকে শাসক হিসাবে পাঠাইয়া দেন। এমন কি, মুসলমান রাজত্বেও 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করা হইত। প্রাচীন মিশর দেশে, চীন দেশে, এমন কি, আধুনিক যুগেও জাপানে রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা হইত।*

এই মতবাদ এশিয়া ও ইউরোপে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পর হইতে এই মতবাদের উপরে লোকে বিশ্বাস হারায়। এই মতবাদের বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো যাইতে পারে। প্রথমত, রাষ্ট্র মানুষেরই প্রতিষ্ঠান। মানুষ নিজ ইচ্ছায় ও নিজ সুবিধার জন্য ইহা সৃষ্টি করিয়াছে। ভগবান এই রাষ্ট্র নির্মাণে হস্তক্ষেপ করেন নাই। দ্বিতীয়ত, মতবাদ শুধু রাজতন্ত্রকে সমর্থন করে। গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে এই মতবাদ নীরব। আজকাল রাজতন্ত্রের যুগ চলিয়া গিয়াছে। রাজার প্রাধান্য আর নাই। সুতরাং রাজাকে বড় করিবার জন্য যে মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল আজকাল সেই মতবাদ লোপ পাইয়াছে। তৃতীয়ত, এই তত্ত্ব রাজাকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছিল। নিজেকে ভগবানের প্রেরিত দূত মনে করিয়া, রাজা প্রজাদের উপরে নানা প্রকার জুলুম করিত। এই জন্যই রাজার প্রাধান্য কমিবার সঙ্গে সঙ্গে, এই মতবাদটিও জনসাধারণের নিকট ক্রমশ অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

এই মতের অসম্পূর্ণতা

কিন্তু এই তত্ত্বের ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। বর্বর বন্যজাতির লোকজনের মনে ভয় জন্মাইয়া দিয়া তাহাদের আনুগত্য আদায় করা এই তত্ত্বের একটি অন্যতম প্রধান ফল। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রকে মানিয়া লওয়া ব্যক্তির কল্যাণ ও নীতিবোধসম্মত—এই চিন্তাও এই তত্ত্বের ভাবগত ফল।

(২) **পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ** (The Patriarchal and Matriarchal Theory): এই মত অনুসারে পরিবারই বিস্তার লাভ করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। কতকগুলি পরিবারকে লইয়া গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া একটি উপজাতি বা সম্প্রদায় গঠিত হয় এবং এইরূপ কয়েকটি সম্প্রদায় মিলিয়া জাতি গড়িয়া তোলে। কালক্রমে এই জাতি হইতেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

* "Let every soul be subject unto the higher powers; for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God." (Romans 10. 1. 2.)

বিখ্যাত লেখক স্যার হেন্‌রি মেইনের মতে আদিম মানব-পারবার পিতৃতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত ছিল। পরিবারের কর্তা ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির উপরে তাঁহার অবাধ কর্তৃত্ব ছিল। তাহার নির্দেশেই সমগ্র পরিবার পরিচালিত হইত। এই পরিবারের বিস্তার হইয়া যখন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইল তখন গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হইলেন গোষ্ঠীপতি (Patriarch)। এইরূপ কতকগুলি গোষ্ঠী মিলিত হইয়া যখন রাষ্ট্র গঠিত হইল, তখন পিতৃপুরুষদের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ, তিনিই হইলেন রাষ্ট্রনায়ক। অ্যারিস্টটলও তাঁহার 'পলিটিক্‌স' পুস্তকে বলিয়াছেন যে, পরিবার হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু আজকাল পরিবার বিস্তার লাভ করিয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে বলিয়া লোকে মনে করে না। ইতিহাসেও এইরূপ কোন নিদর্শন নাই।

পরিবারের বিস্তার ও প্রসার

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে আদিম পরিবারগুলি বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোককে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছিল। পুরুষের পরিবর্তে নারীই ছিল পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী। প্রাচীনকালে মানবসমাজে মাতাই ছিল সন্তানসন্ততিদের অভিভাবিকা। মাতার পরিচয়ে সন্তানসন্ততিদের পরিচয় দেওয়া হইত। এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠনের নির্দেশ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক ও জার্মান সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ মাতার সম্পর্ক ধরিয়া জাতি নির্ণয় করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই ধরনের পরিবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এই মতবাদেরও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। পারিবারিক বন্ধন হইতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা পৃথক্ ধরনের ও দৃঢ়তর। এই সার্বভৌম ক্ষমতা ছাড়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।

(গ) **বলপ্রয়োগ মতবাদ** (The Theory of Force): এই মতবাদ অনুযায়ী শক্তিশালী লোক বা শক্তিশালী জাতি দুর্বল লোক বা দুর্বল জাতিকে দৈহিক শক্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া, নিজ কর্তৃত্বের অধীনে আনিয়া, রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে চিরকালই আছে। সংঘবদ্ধ সমাজে বাস করিয়াও ক্ষমতালাভের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুর্বলের উপরে মানুষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। প্রাচীন মানবসমাজের এক গোষ্ঠী বা উপজাতির নেতা নিজের অনুচরদের সহযোগিতার বলে, অন্য দলকে পরাস্ত করিয়া বিজিত দলের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিত। এইরূপে একজন দলপতি একটি অঞ্চলে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাসনকার্য আরম্ভ করে এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। সুতরাং বাহুবল প্রয়োগেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। এইজন্যই আমরা বলি—"জোর যার মুল্লুক তার।" রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় বলপ্রয়োগে; রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখা হয় বলপ্রয়োগে। বিরাট

বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি—বলের উপর রাষ্ট্রের নির্ভর

শক্তির অধিকারী বলিয়াই লোকে ভয় ও ভক্তিতে রাষ্ট্রের শাসন মানিয়া চলে। শাসনের মূল হইতেছে শক্তি। রাজ্যের ভিতরে শান্তি শৃংখলা রক্ষা করিতে হইলে এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইলে পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং, এই মত অনুসারে রাষ্ট্রের সৃষ্টি, ভিত্তি ও অস্তিত্ব পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(এই মতের অন্যতম প্রধান দার্শনিক হইলেন হব্‌স্ (Hobbes)। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের পূর্বে মানুষে মানুষে হানাহানি ছিল স্বাভাবিক, উহাই ছিল নিয়ম। প্রতিটি মানুষ স্বার্থপর, নিজের ভাল ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না, এবং এই স্বার্থপরতার ফলে সমাজে শৃংখলা ও নিরাপত্তা থাকিতে পারে না। এই স্বার্থপর ব্যক্তিরা শক্তির দণ্ড বা বল-প্রয়োগের কাছেই মাথা নত করে। ব্যক্তিরা সকল ক্ষমতা রাজার হাতে ছাড়িয়া দিলে রাজা হইলেন সকল শক্তির আধার। সেই শক্তিই রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতেছে, "covenants without the sword are but words and have no strength to secure a man at all.'

এই মতের প্রাচীন দার্শনিক—হব্‌স্

আধুনিক যুগে বলপ্রয়োগ মতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হইলেন মার্কস্ ও তাঁহার অনুগামী পণ্ডিতেরা। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের জন্ম শক্তি হইতে। সমাজের প্রথম যুগের মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, পরিবার ছিল না। এক প্রকার আদিম সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে একত্র আহার সংগ্রহ ও বণ্টন করিয়া মানুষ কাল কাটাইত। কিন্তু শিকারের স্তর পার হইয়া গো-পালন ও কৃষির স্তর চলিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ব্যক্তিগত শ্রমের পদ্ধতি দেখা দিল, ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হইল। ইহারই ফলে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও রক্ষণাবেক্ষণের চাপে আধুনিক 'পরিবার' দেখা দিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের সূত্রপাত হইয়াছে। অর্থ নৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী সম্পত্তিবান্ শ্রেণী, সম্পত্তিহীন দুর্বল অথচ উৎপাদক শ্রেণীকে দমন করিতে চায়। এই শ্রেণীবিরোধ যাহাতে সমগ্র সমাজকে একেবারে গ্রাস করিয়া না ফেলে সেই জন্য সমাজের মধ্য হইতেই এইরূপ এক শক্তির আধার বা রাষ্ট্র দেখা দেয়।*)

আধুনিক কালে এই মতের প্রধান দার্শনিক —মার্কস্

যদিও রাষ্ট্রগঠনে পশুবলের দরকার, তথাপি, একমাত্র শারীরিক শক্তির দ্বারাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, একথা বলা যায় না। ফরাসী দেশের রাষ্ট্রতত্ত্বের বিখ্যাত লেখক

* ফ্রিড্‌রিশ এঙ্গেলস্ লিখিয়াছেন যে, "But in order that these antagonisms, classes with conflicting economic interests might not consume themselves and society in sterile struggle, a power apparently standing above society became necessary for the purpose of moderating the conflict and keeping it within the bounds of 'order'; and this power, arising out of society, but placing it above it and increasingly itself alienating from it, is the state."

রুশো বলিয়া গিয়াছেন, যে-অধিকার পশুবলের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের অবসান ঘটে। ইতিহাসে উদাহরণ আছে, বলপ্রয়োগে রাষ্ট্র জয় করিয়া তাহা দীর্ঘকাল রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পশুবলের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে না। আধুনিক কালের কল্যাণরাষ্ট্র জনমত ও সহযোগিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। কিন্তু পশুবল এই মন্ত্রের বিপক্ষে। এইজন্যই অধ্যাপক গ্রীন বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রের ভিত্তি গণ-ইচ্ছার উপর স্থাপিত, বলপ্রয়োগের উপর নহে (Will, and not force, is the basis of the State)।"

বল ও শক্তি সত্যই রাষ্ট্রগঠনে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু ইহাই একমাত্র বিষয় নহে

(ঘ) **সামাজিক চুক্তি মতবাদ** (The Social Contract Theory): রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতবাদটি একসময়ে ইয়োরোপে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র একটি চুক্তির ফলে গঠিত হইয়াছে। এই তত্ত্বের সারমর্ম হইল, (ক) এমন এক দিন ছিল যখন সমাজ বা রাষ্ট্র বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না। কোন রীতিনীতি বা আইন ছিল না। মানুষ নিজের খুশিমত তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। আদিম মানুষের জীবনের এই অবস্থাটিকে বলা হয় 'প্রকৃতির রাজত্ব' (state of nature)। (খ) কিন্তু এই অবস্থায় মানুষ সুখী ছিল না। নানা প্রকার অসুবিধা দেখা দিয়াছিল। ফলে মানুষেরা 'প্রকৃতির রাজত্ব' হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিজেদের সৃষ্ট আইনকানুনের সাহায্যে রচিত সমাজ-গঠনে আগ্রহী ছিল। (গ) এই উদ্দেশ্যে মানুষেরা সংঘবদ্ধ ও সুসংযত জীবন যাপনের জন্য একটা চুক্তি করিল। কিন্তু (ক) প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের অবস্থা কেমন ছিল, (খ) কেন তাহারা বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল, এবং (গ) কাহার সহিত ও কি ধরনের চুক্তি হইল সে বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রকৃতির রাজ্য, চুক্তি ও রাষ্ট্রগঠন

এই চুক্তি দ্বারাই মানুষের রাষ্ট্র গঠিত হইল। এই মতবাদটি বহু প্রাচীন। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতির বিখ্যাত লেখক কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্র পুস্তকে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলিয়া গিয়াছেন। তিনজন বিখ্যাত লেখক এই সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম হব্‌স্, লক্ এবং রুশো। হব্‌স ও লক্ ছিলেন ইংরেজ, এবং রুশো ছিলেন ফরাসী। হব্‌স্ (Hobbes) বলেন যে, রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে, প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের অনন্ত দুঃখ ও

কষ্ট ছিল। এই দুঃখের কারণ মানুষের স্বভাবের মধ্যে নিহিত। মানুষ একা ও নিঃসঙ্গ। প্রতিটি মানুষ নিঃসঙ্গ বলিয়া নিজের স্বার্থ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। ফলে প্রাক্-রাষ্ট্রীয় আমলে স্বার্থ, হিংসা, লোভ প্রভৃতি পাশব প্রবৃত্তির দ্বারা লোকে পরিচালিত হইত। মানুষেব জীবন, ধন ও মানের কোন নিরাপত্তা ছিল না। মাবামারি, কাটাকাটি, জোরজুলুমেব অন্ত ছিল না। এই অবাধ স্বাধীনতায় অশান্তি দেখিয়া, মানুষেরা প্রকৃতির রাজত্ব ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে আগ্রহী হইয়া উঠে। তখন মানুষেরা নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করে। এই চুক্তি অনেকটা এই ভাষায় প্রকাশ করা যায়ঃ "নিজেরা ইচ্ছামত না চলিয়া আমরা আমাদের অধিকার ও ক্ষমতা বিনা শর্তে এই রাজাব হাতে সমর্পণ করিলাম।" প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক অর্পি এই ক্ষমতারাশি যাঁহার হাতে পৌছিল তিনিই সার্বভৌম শক্তি বা রাজা, "He that carrieth this person is called sovereign and hath sovereign powers; and every one besides his subjects." এইরূপে রাজা ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। রাজা কিন্তু কোন চুক্তি করেন নাই। সুতরাং তাঁহার কাজের জন্য প্রজাদের নিকট কৈফিয়ত দিতে তিনি বাধ্য নহেন। নিজের খুশিমত প্রজাদের শাসন করিবেন। প্রজারা তাঁহার শাসন ও দণ্ডাদেশ মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য। রাজার ইচ্ছাই আইন এবং উহা ন্যায়সঙ্গত। এই ভাবে হব্‌স্ রাজশক্তিকে প্রাধান্য দিলেন।

হবস্

ইহার পরে আসিলেন জন্ লক্ (John Locke)। তিনি বলেন যে, প্রকৃতির রাজত্বটা খুব খারাপ ছিল না। মানুষ স্বাধীন ছিল। মানুষের ন্যায় ও অন্যায় বোধ ছিল, এবং প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা মানুষের কার্য নিয়ন্ত্রিত হইত। প্রকৃতির দেওয়া কিছু অধিকারও সে ভোগ করিত। লকের ভাষায় বলিতে গেলে "The State of Nature has a Law of Nature to govern it." কিন্তু এইরূপ প্রাকৃতিক রাজত্বেও মানুষ থাকিতে চাহিল না। কোন্‌টি প্রকৃতির নিয়ম ইহা লইয়া বিবাদ দেখা দিল, কোন সর্ববাদিসম্মত আইন বা বিচারক ছিল না, এবং এই সকল প্রাকৃতিক আইন যাহাতে সকলে মানিয়া লয় এইরূপ কোন কর্তৃত্বশালী শক্তি-কেন্দ্রও ছিল না। সুতরাং তাহারা নিজেদের মধ্যে প্রথমে একটি চুক্তি করিয়া সমাজ গঠন করিল, ও উহার পরে দ্বিতীয় চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা করিল। প্রথম চুক্তির ভাষা এইরূপ, "নিজেরা যথেচ্ছ না চলিয়া আমরা একটি সংঘবদ্ধ সমাজের উপর আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কিছু অংশ ছাড়িয়া দিলাম।" এইরূপে প্রকৃতির আইন ব্যাখ্যা করা এবং সেই আইন প্রয়োগ করার অধিকার মানুষ প্রথমে ছাড়িয়া দিল। অপর সকল কিছু অধিকার সে নিজের হাতেই রাখিয়া দিল। দ্বিতীয় চুক্তির ভাষা এই ভাবে লেখা যায়, "আমাদের অধিকার রাজার হাতে সঁপিয়া

লক

দিলাম, এবং তাহার অনুশাসন মানিয়া চলিব। কিন্তু শর্ত এই যে, তিনি আইন প্রণয়ন করিয়া লোকের জীবন ধন মানের নিরাপত্তা বজায় রাখিবেন।" সুতরাং, রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইল। যতদিন তিনি চুক্তির শর্ত মানিয়া চলিবেন, ততদিন তিনি জনগণের সমর্থন পাইবেন। অন্যায়কারী রাজাকে প্রজারা ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারিবে। দেশে রাজা থাকিবেন ঠিকই, তবে এই রাজার শাসনের ক্ষমতার মূল উৎস গণসম্মতি। জনসাধারণের সম্মতির ভিত্তিতেই সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের হাতেই থাকে। সুতরাং লক্ এই মতবাদের সাহায্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় করেন। হব্‌স্ গণশক্তিকে অবহেলা করিয়া রাজশক্তিকে বড় করিয়াছিলেন, আর লক্ রাজশক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া গণশক্তিকেই কিছুটা প্রাধান্য দিলেন।

রুশো

বিখ্যাত ফরাসী লেখক রুশো (Rousseau) 1762 খৃষ্টাব্দে তাঁহার "সামাজিক চুক্তি" বা Social Contract নামক বই লিখিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত বিদ্রোহী লেখক ও ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত। তিনি বলেন যে, প্রকৃতির রাজত্ব ছিল শান্তি ও সুখের আধার। আকাশের পাখির মত মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুক্ত জীবন যাপন করিত। সেই জীবন ছিল গৌরবের জীবন। কিন্তু লোকবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়ায় নানা সমস্যা দেখা দিল। মানুষের সরলতা ও সাম্যবোধ কমিয়া গেল। ক্রমে সে আপন ও পর বিচার করিতে শিখিল। নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান জন্মিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিল। ফলে তাহারা আরও স্বার্থপর হইয়া উঠিল। এইজন্যই লোকেরা নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল। চুক্তি এইরূপ—"আমরা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ না করিয়া, আমাদের সমষ্টিগত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইব।"

এই সমষ্টিগত ইচ্ছাকে রুশো বলিয়াছেন সাধারণের ইচ্ছা বা General will.* চুক্তি দ্বারা লোকেরা নিজেদের সমস্ত ক্ষমতা 'সাধারণ ইচ্ছার' হাতে সমর্পণ করিয়া কেহই পরাধীন হইল না। নিজেদের মিলিত ইচ্ছার নিকটেই তাহারা অধীনতা স্বীকার করিল। সমষ্টিগত ইচ্ছার উপরই রুশো সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ করিয়াছেন। রুশোর কল্পিত চুক্তিতে রাজার কোন স্থান নাই। জনসাধারণের প্রতিনিধির হাতেই জনসাধারণের কর্তৃত্ব থাকিবে। তাঁহার মতে, এই চুক্তির ফলে কোন রাজার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং, সমাজে রাজার কোন স্থান নাই।

কিন্তু এই চুক্তিবাদের কয়েকটি ত্রুটি আছে। প্রথমত, ইতিহাসে রাষ্ট্রগঠনে আমরা এমন কোন চুক্তির নিদর্শন পাই নাই। চুক্তির সাহায্যে ব্যবসায় চালানো

* "There is often a great deal of difference between the *will of all* and the *general will* the latter takes account only of the common interest, while the former takes private interest into account and is no more than a sum of particular will."

যায়, কিন্তু রাষ্ট্র গঠন করা চলে না। দ্বিতীয়ত, এই মতবাদের পিছনে কোন যুক্তি নাই। রাজনৈতিক চেতনা না আসিলে কেহ রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিবে না। সেই চেতনা যখনই আসিল, তখনই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল, বাহিরের কোন চুক্তির অপেক্ষায় রহিল না। তাই চুক্তির পূর্বেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, পরে নহে। তৃতীয়ত, চুক্তি বলবৎ করিতে গেলে আইনের প্রয়োজন। কিন্তু আইনের সৃষ্টি হইল চুক্তির পরে, পূর্বে নহে। সুতরাং, যে চুক্তির পিছনে তাহা রক্ষা করিবার মত আইন নাই, সেই চুক্তির কোন মূল্য থাকিতে পারে না। এই মতবাদে জনসাধারণের মতের উপর বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বিপদ আছে। জনমত ভ্রান্ত হইতে পারে, সাময়িক উত্তেজনায় পরিচালিত হইতে পারে। তাহাতে কথায় কথায় বিপ্লব, বিদ্রোহ ও রক্তপাতের আশঙ্কা থাকে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব জনমতের খামখেয়ালের উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্র সামান্য অংশীদারী কারবার নহে, এই কথাটাই প্রসিদ্ধ ইংরেজ বক্তা বার্ক (Burke) বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে চুক্তিবাদ কোন পণ্ডিত গ্রহণ করেন না।

চুক্তিবাদের অসম্পূর্ণতা : অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক, অসম্ভব, বিপদ্জনক

তবে এই মতবাদটির যথেষ্ট মূল্য আছে। জনসাধারণের সম্মতি ও সহযোগিতার উপরেই রাষ্ট্র গঠিত, এই বাণী প্রচার করিয়া চুক্তিবাদিগণ বর্তমান গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। এই মতবাদ হইতেই স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী রচিত হইল। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারের দাবীর সৃষ্টি রুশোর লেখনী হইতে আরম্ভ হইল। এই মতবাদ হইতে দুইটি মূল্যবান নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে : স্বাধীনতার মূল্য এবং ন্যায়ের মূল্য।*

তবুও ইহার কিছু মূল্য আছে

(ঙ) **ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ** (Historical or Evolutionary Theory) : সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্রেরও উৎপত্তি হইয়াছে সুদূর অতীতে মানুষের স্মরণকালের পূর্বেকার কোন যুগে। রাষ্ট্র একদিনে বা কোন এক কারণে গঠিত হয় নাই। কখন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল, তাহা কেহ জানে না। কি ভাবে এবং কাহার দ্বারা রাষ্ট্রের সৃষ্টি তাহাও সঠিক বলা যায় না। নানা উপাদান ও নানা কারণ একত্রিত হইয়া রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা করিয়াছে। এই বিষয়ে অধ্যাপক গার্নারের মন্তব্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন নাই, একমাত্র পশুবলে অথবা চুক্তির সাহায্যে অথবা পরিবার বিস্তার লাভ করিয়াও রাষ্ট্র

* এই মতবাদটি হইল, "a way of expressing two fundamental ideas or values to which human mind will always cling—the value of *liberty* or the idea that will, not force, is the basis of government, and the value of *justice*, or the right, not might is the basis of all political society and of every system of political order." (*Barker*)

গঠিত হয় নাই।" মানবসমাজ বহু যুগ ধরিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। মানবসমাজের শৈশব হইতেই একটা বিবর্তন চলিতেছে। এই বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। অতি সাধারণভাবে রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়, তাহার পরে ক্রমে ক্রমে ইহা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রতিটি সমাজের সুরু হইতেই নিশ্চয় উহাকে পরিচালনার উপযুক্ত কোন ক্ষমতা নিজের মধ্যেই তৈয়ারী হইয়াছে। সচেতনভাবে না হইলেও নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ কোন একটি শক্তিকে মানিয়া লইয়াছে। আহার্য সন্ধানে সুপটু কোন দলপতি, দলপতির পুত্র, পূর্বপুরুষদের স্মৃতিবহনকারী বৃদ্ধদের কোন সভা, নিজেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বীর কোন যোদ্ধা, প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে অর্ধ-সচেতন কোন দার্শনিক, বা ক্ষমতাপ্রিয় কোন যাদুকর—এইরূপ কোন-না-কোন শক্তি সমাজকে সর্বদা পরিচালনা করিয়াছে। ঐ অবস্থা হইতে সমাজের রূপও বদল হইয়াছে, উহার পরিচালনা-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রেরও নানারূপ বিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের পথে কত বিভিন্নরূপ শক্তি সমাজের সংহতি ও ঐক্য বাড়াইয়াছে, পরিচালনার কর্তৃপক্ষকে সাহস ও ক্ষমতা যোগাইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মানুষ সামাজিক জীব। তাহাদের যূথবদ্ধতার প্রবৃত্তি (gregarious instinct) ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তাহারা দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতে চায়। মানুষের স্থায়িভাবে একসঙ্গে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। পরিবার ও গোষ্ঠীর বিস্তার হইয়াই জাতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং রক্তের সম্পর্ক জাতি গঠনে সহায়তা করিয়াছে। অধ্যাপক ম্যাকাইভারের ভাষায় বলা চলে: 'Kinship creates society and society at length creates the state.' রক্তের বন্ধন ছাড়া ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্রগঠনে সাহায্য করিয়াছে। ধর্ম মানুষের মনে ভয়, শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া রাষ্ট্রের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছে। আদিম যুগের মানুষ প্রকৃতির অন্ধ শক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করিতে পারিত না। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, বজ্রপাত, ঝড়ঝঞ্ঝা—সকল কিছুর মধ্যেই তাহারা অপ্রাকৃত জীবন্তভাব আরোপ করিয়া উহাদের প্রাণময় বলিয়া মনে করিত। প্রকৃতির প্রাণময়তা (animism) হইতে প্রকৃতির পূজা দেখা দিয়াছে। পূর্বপুরুষদের পূজা সকল আদিম মানবসমাজের একটি স্বভাবজাত আবেগ। পুরোহিত ও যাদুকরদের ক্ষমতা ছিল প্রবল। ইহারা সমাজকে পরিচালনা করিয়াছে, রাজশক্তিকে সাহায্য করিয়া রাষ্ট্রের বিবর্তনে গতিসঞ্চার করিয়াছে। বল-প্রয়োগও রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা করিয়াছে। গোষ্ঠীর বন্ধন যত শিথিল হইয়াছে, শক্তির প্রয়োজন তত বাড়িয়াছে। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর শক্তির লড়াই এবং বাহিরের সমাজের সহিত ভূখণ্ড ও খাদ্যস্থান লইয়া যুদ্ধ—উভয়ই শক্তির প্রকাশ। এই সকল

নানা বিষয়ের প্রভাবে

লড়াই-এর প্রয়োজনে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে, নিজেদের আত্মকর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া কোন নেতার নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে নেতা, আবার নেতৃত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ—এইরূপে শক্তি বা বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রকে সুগঠিত করিয়া তুলিয়াছে। সর্বোপরি, রাজনৈতিক চেতনা এবং জনসাধারণের সম্মতিও রাষ্ট্রগঠনে সহায়ক হইয়াছিল।

সুতরাং মানুষের মনে রাষ্ট্রের ধারণা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে চিন্তা জন্মিতে দীর্ঘকাল প্রয়োজন হইয়াছে। সর্বপ্রথমে হয়তো পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া সেই গঠনের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল। তাহার পরে সমাজের চিন্তাশীল নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা আসিল। ক্রমে ক্রমে সেই চেতনা জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। এই সংগঠনের আকাঙ্ক্ষাই রাষ্ট্রগঠনে সহায়তা করিল। রাষ্ট্রগঠনের

নানা স্তরের মধ্য দিয়া

বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতা দেখা গিয়াছে। ধর্মের বন্ধন, রক্তের বন্ধন, বলপ্রয়োগের শক্তি, জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি রাষ্ট্রগঠনের উপাদানগুলি কোন একযুগে একসঙ্গে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে।

Questions to be discussed

1. Write what you know about the origin and evolution ot human society.
মনুষ্যসমাজের সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

2. Discuss what you mean by Society.
সমাজ বলিতে কি বুঝায় লিখ।

3. Discuss the relation between the Individual and Society.
ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক আলোচনা কর।

4, Define State and discuss the characteristics of the State.
রাষ্ট্র কাহাকে বলে? রাষ্ট্রের উপাদানগুলি কি কি?

5. Distinguish between (a) State and Government, and (b) State and Associations.
(ক) রাষ্ট্র ও সরকার (খ) রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর

6. Discuss the theory of force and critically examine it.
বলপ্রয়োগ তত্ত্ব আলোচনা কর। ইহার সমালোচনাগুলি লিখ।

7. Write short essay on the Social Contract Theory of the origin of the State.
রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

8. Distinguish between the theories of Hobbes, Locke and Rousseau.
হবস্, লক্ ও রুশোর তত্ত্বগুলির পার্থক্য আলোচনা কর।

9. Discuss the Historical or Evolutionary theory of the origin of the State. Explain the stages through which the State has evolved and the forces which have helped its formation.

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদটি আলোচনা কর। রাষ্ট্রের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি এবং যে শক্তিগুলি এই বিবর্তনে সহায়তা করিয়াছে উহাদের লইয়া আলোচনা কর।

৩

রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কার্যাবলী

Ends and Functions of the State

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য (The purpose of the State) : রাষ্ট্র মানুষের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি ? এই প্রতিষ্ঠান তাহার সদস্যদের অর্থাৎ নাগরিকদের কোন্ উদ্দেশ্যের পথে লইয়া যায় ?*

রাষ্ট্রের লক্ষ্য কি এই সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রচলিত আছে। পূর্বে অনেকে মনে করিতেন যে, রাজা বা শাসকবৃন্দ ভগবানেরই প্রতিনিধি বা অংশ, তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণ করাই রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য। যেমন, ভারতবর্ষে এখনও অনেকে মনে করেন, দেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা বা মানুষের সমাজে ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ইঁহারা বলেন যে, ভগবান যেমন সকলকে স্নেহ করেন, পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করেন, রাষ্ট্রও সেইরূপ করিবে। ভগবান হইল সকল ন্যায়পরায়ণতা, সততা, বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতার প্রতীক। সুতরাং রাষ্ট্রও ন্যায়, সততা ও পবিত্রতার দ্বারা সকল মানুষের জীবনে পূর্ণতা আনিয়া দিবে, অর্থাৎ ভগবানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে ; ইহাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা

উনবিংশ শতাব্দীতে একদল চিন্তানায়ক নিজেদের হিতবাদী (utilitarian) বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের মতবাদ হিতবাদ (utilitarianism) বলিয়া পরিচিত। এই মতে বলা হয় যে, সমাজে ব্যক্তির কল্যাণ করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়, সুতরাং কাহার কল্যাণ সাধন রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইবে ? একের মঙ্গল অপরের অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে, একের ব্যক্তিগত কল্যাণ অপরের ব্যক্তিগত অকল্যাণ ঘটাইতে পারে। যেমন, রেলপথ স্থাপন করিলে যাত্রীদের কল্যাণ হইল, কিন্তু

* আমরা জানি সকল মানুষেরই নিজের জীবনের কোন-না-কোন লক্ষ্য আছে, অন্তত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বা কোন্-না-কোন উদ্দেশ্য লাভের কথা মনে রাখিয়া সারা জীবন কাজকর্ম করে। এই ভাবে সে তাহার লক্ষ্যে পৌছিবার চেষ্টা করে বা উদ্দেশ্য সাধন করে। দেশে রাষ্ট্র ছাড়া আরও যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন থাকে তাহাদেরও প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য তাহারা দৈনন্দিন কাজকর্ম স্থির করে। যেমন, তোমাদের পাড়ায় খেলাধুলার ক্লাব আছে। উহার লক্ষ্য হইল পাড়ার ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার নৈপুণ্য বৃদ্ধি করা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করা। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ক্লাব রোজ খেলাধুলার ব্যবস্থা করে, সভ্যদের জন্য বিভিন্ন নিয়ম কানুন তৈয়ারি করে। কোন সভ্য সেই নিয়ম না মানিলে তাহার প্রতিবিধান করে। এই সকল হইল ক্লাবের কার্যাবলী, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইবার উপায় বা পথ। ঠিক সেই রকম রাষ্ট্রের লক্ষ্য সাধনের জন্য সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজকর্ম করা হয়।

নদী খাল ইত্যাদি নষ্ট হওয়ায় চাষীদের অকল্যাণ ঘটিল। চাষীদের অকল্যাণ না করাটাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। উভয় শ্রেণীর ব্যক্তির কল্যাণে অনেক সময় বিরোধ দেখা দিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, রেলপথের দ্বারা শস্য সামগ্রী দূরে বিক্রয় করিতে পারায় তাঁহাদের কিরূপ কল্যাণ হইল এবং রেলপথ স্থাপনে তাঁহাদের চাষের কিরূপ ক্ষতি হইল। সেই ক্ষতিপূরণ করিয়াও মোট কল্যাণের পরিমাণ একটু বেশি রহিল কি না। এই সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্র বা সরকার তাহার কাজকর্ম চালাইবে। উহার লক্ষ্য থাকিবে সমাজে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কল্যাণ সাধন (greatest good of the greatest number)।

সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক পরিমাণে মঙ্গলসাধন

আজকালকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথমত, ব্যক্তির উন্নতি সাধন। দেশে এইরূপ অবস্থা আনিতে হইবে যাহাতে সমাজের সকল মানুষ তাহাদের নিজ নিজ শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতিভা অনুযায়ী বিকাশলাভের সম্পূর্ণ সুযোগ পায়, ব্যক্তির উন্নতির পক্ষে সকল বাধা দূরীভূত হয়। দেশে শান্তিরক্ষা, অপরাধীদের শাস্তিদান, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি কার্যের দ্বারা সমাজে এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, ব্যক্তিকে সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে, তাহাকে বিভিন্নপ্রকার পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার দিতে হইবে। ব্যক্তির উন্নতি সাধনই রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য (primary end)। দ্বিতীয়ত, সমাজের ও জাতির উন্নতি সাধন। শুধু ব্যক্তির কল্যাণই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, সকল ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত সমাজের বা জাতির কল্যাণ সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পুরাতন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও চিন্তাধারা জাতিগত প্রতিভা অনুযায়ী সমগ্র জাতির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে; সম্পদে ও শিক্ষায়, আচরণে ও মননশীলতায় তাহাদের উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। সকল রাষ্ট্রের তুলনায় নিজের রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মধ্যে গরীয়ান্ করিয়া তুলিতে হইবে। তাই জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও জাতীয় কল্যাণই রাষ্ট্রের মাধ্যমিক লক্ষ্য (secondary end)। তৃতীয়ত, পৃথিবীর সকল মানুষের কল্যাণ ও মানব সভ্যতার অগ্রগতি। কেবল ব্যক্তির বা নিজের দেশের কল্যাণই রাষ্ট্রের লক্ষ্য নহে। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বিভিন্ন জাতির ও সমাজের মানুষের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি দূর করা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই পৃথিবীতে কোন দেশের অধিবাসীদের কোন কিছুর অকল্যাণ অপর দেশের অধিবাসীদের অমঙ্গল ডাকিয়া আনে। বৃহত্তর মানব-সমাজের কোন অংশ অনুন্নত থাকিলে সমগ্র

1. ব্যক্তির উন্নতি

2. সমাজের উন্নতি

3. মানবজাতির উন্নতি

মানবজাতি উন্নত হইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইবে মানব সমাজের কল্যাণ সাধন। ইহাই রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য (ultimate end)।

রাষ্ট্রের বা সরকারের কার্যাবলী (Functions of the State or the Government) ঃ রাষ্ট্রের কার্য সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। প্রত্যেক রাষ্ট্রের কতকগুলি কর্তব্য আছে। রাষ্ট্র নিজে কোন কাজ করিতে পারে না। সরকার তাহার কাজ করিবার যন্ত্র। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তাহার কর্তব্য পালন করে। যখন আমরা বলি যে ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সহিত চুক্তি করিয়াছে তখন সেই কথার অর্থ যে, ভারতবর্ষে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সরকার পাকিস্তানের সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সহিত চুক্তি করিয়াছেন। সুতরাং রাষ্ট্রের কাজ করা হয় সরকারের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের কি কি কার্যকলাপ হইবে তাহা সেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের কাজগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতকগুলি কাজ অবশ্য-করণীয়। সেই কাজ না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকিবে না। কতকগুলি কাজ ইচ্ছামূলক। এই শ্রেণীর কাজ না করিলে রাষ্ট্র লোপ পাইবে না। কিন্তু সাধারণত বর্তমান জগতে সকল রাষ্ট্রই ইচ্ছা করিয়া বহুপ্রকার কাজ করিয়া থাকে। জনকল্যাণের জন্য কতকগুলি কাজ আজকাল রাষ্ট্র ক্রমশ নিজের হাতে গ্রহণ করিতেছে। কোন কোন কাজ এখনও জনসাধারণের হাতেই রাখিয়াছে। তবে ক্রমশই ইচ্ছামূলক কাজগুলি রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলিয়া লইতেছে।

আবশ্যকীয় কাজ ও ইচ্ছামূলক কাজ

(ক) রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা অবশ্য করণীয় কর্তব্য—দেশের ভিতরে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা ও বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই প্রাথমিক বা অবশ্য-কর্তব্য। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই এই কর্তব্য পালন করিতে হয়। নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলিকে অবশ্য-কর্তব্য বলা যায় ঃ

(১) শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা। আজকাল সারা বিশ্বে অশান্তি চলিতেছে। যে-কোন মুহূর্তে যুদ্ধ-বিগ্রহের আশংকা আছে। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য সর্বদাই প্রত্যেক রাষ্ট্রের কতকগুলি ব্যবস্থা রাখিতে হয়। সৈন্য, নৌ-বাহিনী, বিমান-বাহিনী ও সমরসজ্জার ব্যবস্থা রাখা কর্তব্য। নাগরিকদের এই উদ্দেশ্যে সামরিক শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে।

(২) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া নিজস্ব অস্তিত্বকে নিরাপদ রাখাও বর্তমান রাষ্ট্রের কর্তব্য। দেশের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে জাতির দাবি পেশ করিতে হইবে। যেমন, ভারতবর্ষ বর্তমানে কাশ্মীরে তাহার অধিকার রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দফ্তরে জাতীয়

দাবি জানাইয়াছে ও পাকিস্তানের হাত হইতে কাশ্মীর উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বদরবারে আবেদন জানাইয়াছে।

(৩) পারিবারিক সম্পর্ক স্থির করিয়া অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা-সন্তানের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া পারিবারিক জীবন সুগঠিত করা রাষ্ট্রের একটি বড় কর্তব্য

(৪) আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃংখলা রক্ষা করা—দেশবাসীদের জীবন ও ধন সম্পত্তি নিরাপদে রাখা রাষ্ট্রের অবশ্য-কর্তব্য। আইন ও শৃংখলা রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র বিচার ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। চুরি-ডাকাতি, খুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণ করিবার জন্য পুলিস বাহিনীর দরকার। শাস্তি দিবার জন্য জেল বিভাগ রক্ষা করিবার দরকার। শান্তি রক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে সৈন্য বাহিনীও দরকার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা লইয়া বিবাদ হইলে তাহার মীমাংসাও বিচার বিভাগ করিয়া থাকে। সমাজদ্রোহী বা দেশদ্রোহীদের দমন রাখাও রাষ্ট্রের একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ।

(খ) **রাষ্ট্রের পরোক্ষ কর্তব্য**—কতকগুলি কাজ আছে যাহা না করিলে রাষ্ট্র লোপ পাইবে না। কিন্তু আবশ্যকমত রাষ্ট্র তাহা করিলে ভাল হয়। এইগুলিকে ইচ্ছাধীন কার্য অথবা পরোক্ষ কর্তব্য বলে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই কর্তব্য করিয়া থাকে। আজকাল জনকল্যাণরাষ্ট্র সাধারণের মঙ্গলের জন্য এই কাজগুলি করে। নিম্নলিখিত কাজগুলিকে ইচ্ছাধীন কাজ বলা হয়ঃ

(১) **জনহিতকর কাজ**—সাধারণের মঙ্গলের জন্য আজকাল ডাক-বিভাগ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি কতকগুলি কাজ রাষ্ট্র নিজেই করিয়া থাকে।

(২) **শিক্ষা**—নাগরিকদিগের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের কাজ। লোকেরা সাধারণ শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ না করিলে দেশের উন্নতি হইবে না। পূর্বে শিক্ষার ব্যবস্থা জনসাধারণের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কিন্তু নাগরিক জীবনের উন্নতির জন্য আজকাল রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকারের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি প্রভৃতি স্থাপন করে।

(৩) **স্বাস্থ্যের উন্নতি**—জনসাধারণের স্বাস্থ্য ভাল রাখা রাষ্ট্রের একটি উদ্দেশ্য। লোকের দেহ রোগমুক্ত রাখিয়া তাহাদের ধনোৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের একটি কর্তব্য। চিকিৎসার জন্য বিদ্যালয়, কলেজ, গবেষণাগার, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি দেশের নানা অঞ্চলে স্থাপিত করা হয়। সরকারী ডাক্তার, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ইত্যাদি থাকে। কোন সংক্রামক ব্যাধি আরম্ভ হইলে তাহা বন্ধ করাও রাষ্ট্রের কাজ।

(৪) **শিল্প ও বাণিজ্য**—মুদ্রা ও কাগজী নোট প্রস্তুত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সরকার নানা প্রকার আইন করিয়া থাকে। সুচারুভাবে ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি চালনার জন্য নানা প্রকার নিয়ম-কানুন করা হয়। আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন অথবা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয়া শিল্পের প্রসারে সাহায্য করে। বিদেশী প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দেশী ব্যবসায়ের পথ সুগম করিয়া দেয়।

(৫) **শ্রমিকের স্বার্থ**—ব্যবসায়ের মালিকের শোষণ হইতে শ্রমিকেরা যাহাতে রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিয়া থাকে। দিনে কত ঘণ্টা কাজ করিবে, বেতনের হার কত, কতদিন ছুটি, অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসা, কারখানার ব্যবস্থা ইত্যাদি রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া ধরা হয়। বেকার ও অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য করার ব্যবস্থাও থাকে। শ্রমিকদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির নানা-প্রকার ব্যবস্থা করা হয়।

(৬) **অসহায় ও বৃদ্ধের সাহায্য**—অনেক রাষ্ট্র আজকাল দরিদ্র, অসহায়, বৃদ্ধ, পঙ্গু ও নিঃস্বদের প্রতিপালনের জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করে। পেন্‌শন্ ও ভাতা দিয়া ইহাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

আজকাল রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় ও ইচ্ছাধীন কার্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। প্রায় অধিকাংশ রাষ্ট্রই ইচ্ছাধীন কাজগুলি ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া না দিয়া নিজের হাতে তুলিয়া নিয়াছে।

মনে রাখা দরকার যে, সরকারের কাজকর্মের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ কখনই নিখুঁত হইতে পারে না। আজ যাহা পরোক্ষ কাজ, কাল তাহা প্রত্যক্ষ বা অবশ্যকরণীয় কার্যে পরিণত হইতে পারে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে, সরকারের কাজকর্ম সম্বন্ধে লোকের ধারণা পৃথক্ থাকে, তাই উহার সর্বজনগ্রাহ্য কোন শ্রেণীবিভাগ করা চলে না। রাষ্ট্রের বা সরকারের কাজকর্ম এত বেশি ও বিস্তৃত যে, সকল কাজ তালিকাবদ্ধ করাও সম্ভব নয়, শ্রেণীবদ্ধ করাও যায় না। সমাজের প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী এইরূপ শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তন আসিবে। যেমন, শিক্ষার প্রসার। পূর্বে ইহাকে রাষ্ট্রের পরোক্ষ কাজ বলিয়া মনে করা হইত। বর্তমানে ইহা সকল সভ্য দেশের সরকারের অবশ্য-করণীয় কাজের মধ্যেই গৃহীত হইতেছে।

এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং অপরিবর্তনীয় নয়

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র (The sphere of Individual and the State): ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র কি হইবে এই বিষয়ে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সীমা নির্দেশ করা কঠিন। আজকাল প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্র ক্রমেই তাহাদের কার্যের সীমানা বাড়াইতেছে।

শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, সমাজোন্নয়ন প্রভৃতি নানা কাজে আজকাল রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতেছে। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই ধীরে ধীরে জাতীয়করণের দ্বারা নানা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র নিজের তত্ত্বাবধানে আনিতেছে। বর্তমান কালে রাষ্ট্র সম্বন্ধে লোকের ধারণা অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। আগের দিনে রাষ্ট্রকে মানুষ কেবলমাত্র ক্ষমতার কেন্দ্র বলিয়া মনে করিত। তখনকার দিনে ধারণা ছিল যে, জনসাধারণের মঙ্গলের কাজ জনসাধারণই করিবে। রাষ্ট্র শুধু আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবে ও বাহিরের শত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষা করিবে। শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও সামাজিক ব্যাপারগুলি সবই নাগরিকদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের দরকার নাই। কিন্তু আজকাল গণতন্ত্রের যুগ আসিয়াছে। গণতন্ত্রের আদর্শ জনকল্যাণ। তাই দেশের সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র আত্মনিয়োগ করিতেছে। অতীতের পুলিসী রাষ্ট্র আজকাল কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। আজকাল, তাই, মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এমন কি নৈতিক উন্নতির জন্য যাহা-কিছু করা দরকার সবই রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া মনে করা হয়।

পুলিসীরাষ্ট্র হইতে কল্যাণরাষ্ট্র

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বাড়িলে ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র কমিয়া আসে। এইজন্য, যাঁহারা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষপাতী, তাঁহারা রাষ্ট্রের ব্যাপক কার্যাবলীর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তবে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব হয়, তাঁহার ব্যক্তিত্ব হ্রাস পায় ও কর্মতৎপরতা কমিয়া যায়। সুতরাং রাষ্ট্র বেশি ব্যাপারে মাথা না গলাইয়া, মাত্র আবশ্যকীয় কার্যগুলি করিলেই ভাল হয়। অপর পক্ষে, একদল লোক বলেন যে, গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রকে পরিচালিত করে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ। জনমঙ্গলই জন-সাধারণের প্রতিনিধিদের আদর্শ হইবে। কতিপয় লোকের সুখের জন্য দেশের বেশির ভাগ লোক কষ্ট পাইবে, তাহা আজকাল কেহই সমর্থন করে না। দেশের উন্নতির জন্য ও বেশির ভাগ ব্যক্তির কল্যাণের জন্য যদি কিছু ব্যক্তির স্বাধীন কর্মক্ষেত্রের কিছুটা সংকোচন হয়, তবে তাহাও ভাল। দেশের মঙ্গলেই দশের মঙ্গল। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বড় করিলে ভবিষ্যতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism): রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি লইয়া দুইটি মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে—একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অপরটি সমাজতন্ত্রবাদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন যে, রাষ্ট্রের কার্যাবলী খুবই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। বেশির ভাগ কার্যই জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া দরকার। এই মতবাদের সমর্থনে তাঁহারা অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন।

প্রথমত, মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। নিজের ভালমন্দ সে নিজেই ভাল বুঝিতে পারে। সুতরাং, নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিবার সুযোগ পাইলে তাহারা স্বাধীনতা ও সুখের অধিকারী হইবে। রাষ্ট্র বেশি কর্তৃত্ব করিলে মানুষের আত্মবিশ্বাস ও কার্যশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। সে তখন ছাঁচেঢালা প্রাণহীন পুতুলে পরিণত হইবে। স্পেনসার বলিয়াছিলেন, অত্যধিক আইন থাকিলে সে দেশে "সকলেই সকলের মত।" দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি নিজের লক্ষ্য নিজে স্থির করে, নিজের সাধ্যমত স্বাধীনভাবে সে লক্ষ্যে পৌঁছায়। তাহার নিজের প্রেরণা, চেষ্টা ও কাজের উৎসাহ ছাড়িয়া দিয়া সে যদি রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে, তবে ইহার ফল ভাল হইবে না। সব কাজে রাষ্ট্রের উপর নির্ভব করিলে ব্যক্তির উৎসাহ, কর্মশক্তি ও কল্পনা প্রকাশ পাইবে না। তৃতীয়ত, সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকা ভাল। তাহাতে যাহারা যোগ্যতম ব্যক্তি তাহাবা বাঁচিয়া থাকিবে (survival of the fittest) ও যাহারা অক্ষম তাহারা লোপ পাইবে (elimination of the unfit)। অযোগ্য ব্যক্তিকে দূর করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে উন্নতির সুযোগ দিলে উহা সমাজের পক্ষে ভাল (natural selection)। চতুর্থত, এই মতবাদীরা আরও বলেন যে, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা থাকা ভাল (Laissez faire)। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, শিল্পের প্রসার হয় এবং জিনিসের দাম কমে। সুলভে জিনিস পাইলে লোকের আর্থিক সচ্ছলতা আসে। পঞ্চমত, সরকারের ভুল-ত্রুটি হয়। অনেক ক্ষেত্রেই সরকার অনেক কাজ সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে না বলিয়া, সবকারী কাজ ভালভাবে করিবার আগ্রহ কাহারও থাকে না। সরকারী কার্যে মিতব্যয়িতা থাকে না। সর্বোপরি, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা করে মুষ্টিমেয় শক্তিশালী লোক, রাষ্ট্রের দোহাই দিয়া তাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথই খোঁজে। জনসাধারণের মঙ্গল বেশি হয় বলিয়া মনে হয় না। ব্যক্তির নিজের উপর দায়িত্ব চাপিলেই তাহার কর্মশক্তি বাড়ে। সুতরাং সরকারের উচিত সকল দায়িত্ব নিজে না লইয়া লোকেব হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কাহাকে বলে ও ইহার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের এই সকল যুক্তি সর্বদা সঠিক বলা চলে না। সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ সর্বদা ও নিশ্চয় খারাপ, এমন কথা মানা চলে না। নিয়ন্ত্রণ বলিলেই স্বাধীনতার হানি হইল, একথাও সব সময়ে গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিহাসে আমরা দেখিয়াছি, রাষ্ট্রের সুনিয়ন্ত্রণ বা সুশাসনে ব্যক্তির জীবনে মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু আসে নাই। আজকাল রাষ্ট্র নিজে আগাইয়া গিয়া মানুষের কল্যাণ করিতেছে। গার্নারের ভাষায় আজকাল রাষ্ট্রের কাজ **"protecting, encouraging and fostering the common welfare."**

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটি কোথায়

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করেন সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের লীলাক্ষেত্র। একের সঙ্গে যেন অপরের কোন যোগ নাই। প্রত্যেকটি ব্যক্তি যেন সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কেবল নিজেকে লইয়া ব্যস্ত। প্রত্যেকেই যেন আত্মকেন্দ্রিক। কেহ কাহারও ধার ধারে না, নিজস্ব কক্ষে নিজ নিজ প্রেরণায় আপন মনে স্বার্থচিন্তায় মগ্ন। নিজের সুখ বাড়ানো এবং দুঃখ কমানোই একমাত্র তপস্যা। প্রত্যেকেই যেন এক একজন রবিনসন ক্রুসো। অথবা প্রত্যেকে যেন এক একটি দ্বীপ, চারিদিকে বিচ্ছিন্নতার সীমাহীন সমুদ্র। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী আমরা মানিয়া লইতে পারি না। সমাজের কোন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থ নৈতিক দিক হইতে সকলে পরস্পর নির্ভরশীল। পূর্বপুরুষের জ্ঞান ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়া সকলে অপরের নিকট-আত্মীয়। ব্যক্তির সুখ-দুঃখ সম্পর্কিত চিন্তাও সামাজিক। অধ্যাপক রীচি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন, "Apart from his surroundings and relationship the individual is a mere abstraction, a logical ghost, a metaphysical spectre, a mere negation."

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism): সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন যে, আর্থিক ব্যাপারে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ও উদাসীন থাকিলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এই ব্যবস্থায় কৃষক ও মজুরশ্রেণীর স্বার্থ কখনও বজায় থাকে না। মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণী ক্রমশই ধনশালী হয় এবং শ্রমজীবীদের দারিদ্র্যের মাত্রা ক্রমশই বাড়িয়া যায়। দরিদ্র এবং শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের দরকার। বিশেষত প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থায় অনেক ক্ষতি ও অপচয় ঘটে। সুতরাং প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার দরকার। তাহাতে অতিরিক্ত উৎপাদন, রেষারেষি ও বিজ্ঞাপনের খরচ দূর করা যায়। সমাজতন্ত্রবাদিগণ বলেন, জমি, জায়গা, খনি প্রভৃতি প্রকৃতির সম্পদগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতে না থাকিয়া রাষ্ট্রের হাতে থাকিলে তাহা জনগণের মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হইবে। এই জন্যই এইসব সম্পত্তির জাতীয়করণ আবশ্যক। তাঁহাদের মতে সমাজের সকলের স্বার্থহানি করিয়া কখনও স্থায়িভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ করা যায় না। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদের সমষ্টিগত স্বার্থপূরণের দ্বারাই প্রত্যেক ব্যক্তি লাভবান হইবে। কেবল রাজনৈতিক সমতার দ্বারাই গণতন্ত্র সফল হইবে না। অর্থ নৈতিক সমতা গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। দেশের নাগরিকগণ অভাবমুক্ত না হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদই মানুষকে অভাবমুক্ত করিতে পারে। তাহাদের মধ্যে সমাজচেতনা জাগাইয়া দেয়। সকলের সহযোগিতায় ও সমবেত প্রচেষ্টাতেই রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব। ইহাই

সমাজতন্ত্রবাদ কাহাকে বলে ও উহার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ

সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি। অর্থের সমবণ্টন করিয়া ধনী ও নির্ধনের বিরাট ব্যবধান লোপ করিতে হইবে। উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের ব্যবস্থা রাষ্ট্রই করিবে।

সমাজতন্ত্রে ব্যক্তির তুলনায় সমাজের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাজতান্ত্রিকরা বলেন যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিচ্ছিন্নতা থাকিলে সমগ্র সমাজের ভারসাম্য বিচ্যুত হয়। সমাজতন্ত্র ইহাদের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী ফিরাইয়া আনিতে চায়। সমাজের উৎপাদনী যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলি রাষ্ট্রের মালিকানায় পরিচালিত হইলে এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণী শোষিত হয় না। ফলে ব্যক্তি ও শ্রেণীর বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা দূর হয়। প্রত্যেকে সহজেই অপরের হৃদয়ের নিকটে উপস্থিত হয়। প্রত্যেকে মনে করে আমি এক বৃহৎ সংস্থার অংশ। প্রত্যেকে জানে তাহাদের শ্রমের ফল সকলেই ভোগ করিবে, বিশেষ কোন ব্যক্তি নয়, কোন মালিক বা ধনিকগোষ্ঠী নয়। প্রতিটি ব্যক্তির মন সামাজিক কল্যাণ চিন্তার রসাধারায় পুষ্ট ও সজীব হইয়া উঠে।

কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধীরা এই মতবাদের দোষ-ত্রুটি দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্রের তেমন যোগ্যতা নাই। রাষ্ট্রে মানুষেরই সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। মানুষ মাত্রেরই যেমন ভুল হওয়া স্বাভাবিক, রাষ্ট্রেরও সর্বদা ভুল-ত্রুটি হয়। সুতরাং সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে দিলে তাহার ভুলের জন্য জনসাধারণের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইতে পারে। সকল সম্পত্তিরই মালিক যদি রাষ্ট্র হয় তবে ব্যক্তিদের কর্মপ্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণা থাকিবে না। মানুষ যদি নিজের শ্রমলব্ধ ফল ভোগ না করিতে পারে তাহার শ্রম করিবার আগ্রহ কমিয়া যাইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার অতি পবিত্র। অ্যারিস্টটলের ভাষায় বলা চলে, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়াইলে তবেই লোকের মনে দান, ধ্যান প্রভৃতি পুণ্য কর্মের প্রেরণা আসিবে। সম্পত্তি না থাকিলে সকলেই মজুর, দান ধ্যানের ক্ষমতা নাই, তাই মনের কোন প্রসারতা নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইল দর্পণ বা আয়নার মত। মানুষ এই আয়নাতে নিজের রূপ ও গুরুত্ব পর্যবেক্ষণ করে। ইহাতেই তাহার তৃপ্তি। কেবল কাজে কোন সুখ নাই, অপরের তুলনায় নিজেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করাতেই তাহার আনন্দ। সর্বোপরি, প্রত্যেক কাজেই যদি মানুষ রাষ্ট্রের নির্দেশে চলে তবে মানুষের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করিতে পারা যায় না। ব্যক্তির জীবন যান্ত্রিক ও রসহীন হইয়া পড়ে। স্বার্থ ও আত্মবোধ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া কায়মনোবাক্যে রাষ্ট্রের সেবা করার মনোবৃত্তি সাধারণ লোকের মধ্যে আশা করা যায় না। আদর্শটি উচ্চ-সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা কার্যকরী করা কঠিন।

সমাজতন্ত্রবাদের অসুবিধা

সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (Different forms of Socialism): বিভিন্ন সমাজতন্ত্রবাদীরা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করিতে বলেন। তাহার মধ্যে চার শ্রেণীর সমাজতন্ত্রের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) **মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ** (Marxian Socialism)—বিখ্যাত লেখক কার্ল মার্কস উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সমাজতন্ত্রবাদের একটি নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, জিনিস উৎপাদনের সকল উপাদানের মধ্যে শ্রমের অংশই প্রধান। শ্রমের পরিমাণ দিয়াই সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করা উচিত। কিন্তু শ্রমিকেরা যে মজুরি পায় তাহা তাহাদের শ্রমের তুলনায় অনেক কম। শ্রমিকেরা যে মূল্য উৎপাদন করে তাহার তুলনায় উৎপাদনকারী শ্রমিকেরা কম মজুরি পায়। এই বাড়্তি মূল্য অন্যায়ভাবে মালিকগণ শ্রমিকদের প্রাপ্য হইতে কাড়িয়া নেয়। শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যের সামান্য একটি অংশ মালিকগণ শ্রমিকদের হিসাবে দিয়া বাকী অংশ মুনাফা হিসাবে আত্মসাৎ করে। ইহা মালিকশ্রেণীর শোষণনীতি। ধনতান্ত্রিক সমাজে মুষ্টিমেয় ধনী মালিক অর্থের জোরে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে আধিপত্য করিতেছে। সুতরাং, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব আসিবে এবং ধনিক শ্রেণীকে বিতাড়িত করিয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন এক নূতন শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে এবং উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়-ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক সকলের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত হইবে। লোকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিবে ও প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে। একথা ঠিক যে, মালিকগণ পূর্বে শ্রমিকদের খুবই শোষণ করিত এবং শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হওয়ায় মালিকের জুলুম বর্তমানে অনেকটা কমিয়াছে।

(খ) **রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ** (State Socialism)—এই মতবাদ অনুযায়ী শ্রমিকেরা দুর্বল ; তাহারা নিজেদের স্বার্থরক্ষায় অক্ষম। সুতরাং রাষ্ট্রেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিবে। এইজন্যই রাষ্ট্রের অধিকারে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে ভাতা, শ্রমিক-জীবনবীমা, কারখানা-সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি করিয়া শ্রমিকদের কল্যাণসাধন করা রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য।

(গ) **সমিতিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ** (Guild Socialism)—এই মতবাদ অনুযায়ী যদিও রাষ্ট্র থাকিবে, তথাপি রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতা কম বলিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে না থাকিয়া শ্রমিক, পরিচালক ও কারিগর লইয়া গঠিত সমিতিগুলির হাতে থাকিবে। অর্থনৈতিক সমিতিগুলি এবং সামাজিক অন্যান্য সমিতিগুলির সহযোগিতায় মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন হইবে। রাষ্ট্রের হাতে সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিচালনার ক্ষমতা রাখিলে বিশৃংখলা, দুর্নীতি ও অযোগ্যতা

বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ক্ষমতাগুলি এই সমিতির হাতে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। রাষ্ট্র শুধু এই সমিতিগুলির কার্যের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে।

(ঘ) **সাম্যবাদ** (Communism)—উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজ-বিজ্ঞানী কার্ল মার্কস (Karl Marx) সমাজ গঠন ও সমাজের গতিবিধি লইয়া বিপুল গবেষণা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের স্রষ্টা।

তাঁহার মতে আদিমকালে ধনোৎপাদন ও জনোৎপাদনের প্রচেষ্টা হইতেই সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি হওয়ায় সমাজ উহার সুবিধাভোগী এবং মালিক-শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপে সমাজ নিজের মধ্যে শ্রেণী-বিভক্ত হইয়াছে, শক্তিশালী শ্রেণীর নিজের স্বার্থে রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। উৎপাদনের প্রধান যন্ত্রপাতিতে (instruments of production) গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসিলে সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতিতে (mode of production) মৌলিক পরিবর্তন আসে। ফলে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কেও (relations of production) মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়। সমাজের রূপ তখন বদলাইয়া যায়। আদিমকাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মোটামুটি পাঁচ রকম সমাজের রূপ দেখা গিয়াছে—আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সমাজে এইরূপ পরিবর্তন কোন অপ্রাকৃত শক্তির ফলে আসে না, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষই সমাজের গতি ও পরিবর্তনের সূচনা করে।

সমাজে কেন পরিবর্তন হয়

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণী নিজের স্বার্থে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করিতে থাকিবে, উৎপাদন বৃদ্ধির পথে সকল বাধা দূর করিয়া উৎপাদন বাড়াইবে। সকলে তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করিবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে। কিছুকাল পরে যখন সমাজের উৎপাদনশক্তি খুবই বৃদ্ধি পাইবে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ দূর হইয়া যাইবে, বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়া সমাজে সকল মানুষের স্থান সমান হইয়া পড়িবে, তখন সমাজ সাম্যবাদী স্তরে পৌঁছিবে। এইরূপ সমাজে সকল সম্পদ্ উৎপাদনের উপকরণ ও যন্ত্রপাতির উপর সামাজিক মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সম্পদ্ উৎপাদনের পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। সকলে তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ পাইবে। শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীশাসন বজায় রাখার যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন থাকিবে না; প্রয়োজনহীন হইয়া পড়ায় ক্রমে তাহা অবলুপ্ত হইবে। সকলের মধ্যে সহযোগিতার

সমাজতন্ত্রের পরবর্তী উন্নততর স্তরের সমাজ সংগঠন

ভিত্তিতে মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক উন্নততর সামাজিক কাঠামো গড়িয়া উঠিবে। এইরূপ মতবাদকেই সাম্যবাদ বলা হয়।

Questions to be discussed

1. What are the ends and purposes of the functions of the State ?
রাষ্ট্রের কার্যাবলীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ?

2. Write a short essay on the functions of the State.
রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।

3. Distinguish between and discuss the compulsory and voluntary activities of the State.
রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক কার্যাবলী আলোচনা কর। ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় কর।

4 What do you mean by welfare State ? Is India a welfare State ?
কল্যাণ রাষ্ট্র বলিতে কি বুঝায় ? ভারতবর্ষ কি একটি কল্যাণ রাষ্ট্র ?

5. Which should expand- the individual sphere or the State sphere ?
ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র না রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র, কোন্‌টিকে সম্প্রসারিত হইতে দেওয়া উচিত ?

6. Discuss arguments for and against Individualism.
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি সমূহ দেখাও।

7. Discuss the merits and demerits of Socialism
সমাজতন্ত্রবাদের দোষ ও গুণগুলি আলোচনা কর।

8. Analyse the different forms of Socialism
সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপগুলি আলোচনা কর।

9. What is Communism ?
সাম্যবাদ বলিতে কি বুঝায় ?

৪
নাগরিক
The Citizen

নাগরিক কে ? (Who is a Citizen ?) : ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যাহারা নগরে বাস করে তাহাদিগকে নাগরিক বলে। প্রাচীন গ্রীসদেশে বহু নগর-রাষ্ট্র ছিল; এক একটি নগরী লইয়া এক একটি ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠিত হইত। এই 'নগর' শব্দ হইতেই নাগরিক কথাটি আসিয়াছে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে যাহারা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অথবা বিচারালয়ে অংশ গ্রহণ করে কেবলমাত্র তাহাদিগকেই নাগরিক বলিয়া গণ্য করা উচিত,

নাগরিক কাহাকে বলে

"He who has the power to take part in the deliberative or judicial administration is said by us to be a citizen of that state". ইতিহাসের বিবর্তনপথে এই নগর-রাষ্ট্রগুলি আজিকার বৃহদায়তন জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক কালের রাষ্ট্রগুলি আয়তনে যেমন বিরাট, তেমনি উহারা রাজনৈতিক অধিকারও সর্বজনীন করিয়া তুলিয়াছে।

তাই আজকাল পৌরনীতিতে 'নাগরিক' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের যে-কোন সদস্যকেই নাগরিক বলা হয়। যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে ও রাষ্ট্রের সকল অধিকার ভোগ করে, তাহাদিগকেই রাষ্ট্রের সদস্য বলিয়া মনে করা হয়। অ্যারিস্টটলের যুগে ক্রীতদাস, মজুর শ্রেণী ও স্ত্রীলোকদিগকে নাগরিক আখ্যা দেওয়া হইত না। কারণ, তাহারা ছিল পরনির্ভরশীল ও সেই যুগে রাষ্ট্রের কাজে তাহারা কোন অংশই গ্রহণ করিতে পারিত না। কিন্তু আজকাল রাষ্ট্রের যে-কোন অধিবাসী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিলেই নাগরিক বলিয়া গণ্য হয়। আনুগত্য কাহাকে বলে ? যখন কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের প্রতি মোটামুটি শ্রদ্ধাশীল এবং বিপদের সময় রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত—তখন সে অনুগত। কোন নাগরিক রাষ্ট্র হইতে সামাজিক ও রাজনৈতিক কতকগুলি অধিকার লাভ করে, আবার রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলি কর্তব্যও পালন করে। এই সকল কাজ ভাল ভাবে করিতে হইলে নাগরিকের মানসিক ও নৈতিক গুণাবলী প্রসারিত করিতে হইবে। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় নাগরিকত্ব হইল "the contribution of one's instructed judgment to the public good." তাই ব্যাপক অর্থে, নাগরিক হইল যে রাষ্ট্রে বসবাস তাহার অনুগত, পৌর ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ অধিকারী, এবং সমাজের সম্পদ্ বৃদ্ধিতে সে বুদ্ধিদীপ্ত সাহায্য করিয়া থাকে।

সাধারণত, একটি দেশের অধিবাসীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যথা, নাগরিক ও বিদেশী (citizens and aliens)। বিদেশীরা ভিন্ন দেশের স্থায়ী

অধিবাসী ও সেই ভিন্ন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। ভারতে বহু ইংরাজ, জার্মান, জাপানী প্রভৃতি বিদেশী বাস করে। যদিও তাহারা ভারতীয় আইন মানিয়া চলে ও ভারত সরকারকে কর দেয় তথাপি তাহাদের ভারতীয় নাগরিক বলা চলে না।

নাগরিক ও বিদেশী

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নাগরিকেরা ভারতীয় পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার উভয়ই ভোগ করিতে পারে। কিন্তু বিদেশীরা পৌর অধিকার কিছু ভোগ করিলেও এদেশের কোন রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না। তাহারা ভোট দিতে পারে না, সরকারী চাকুরির দাবি করিতে পারে না, এ-দেশে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার অধিকার পায় না।

নাগরিক ও দেশবাসীর (citizens and nationals) মধ্যে পার্থক্য আছে, তাহাও জানা দরকার। যেমন, ভারতীয় নাগরিক ও ভারতবাসী। যে ভারতীয় ব্যক্তির ভোটাধিকার আছে, সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার ও অনুরূপ রাজনৈতিক অধিকার আছে সে ভারতের নাগরিক। কিন্তু ভারতে শিশু, যুবা বহু ভারতবাসী আছে যাহারা দেশে বসবাস করে, পৌর অধিকারগুলি ভোগ করে, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না। ইহাদের দেশবাসী বলে, ইহারা নাগরিক হইতে পৃথক্।

নাগরিক ও দেশবাসী

নাগরিক ও প্রজার (citizens and subjects) মধ্যেও পার্থক্য আছে। ব্রিটেনের যে সকল উপনিবেশ আছে সেই সকল স্থানের অধিবাসীরা ব্রিটিশ প্রজা। কিন্তু যাহারা ব্রিটিশ সরকারের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিয়া থাকে তাহারা ব্রিটেনের নাগরিক। যেমন, অষ্ট্রেলিয়ার নাগরিক একজন ব্রিটিশ প্রজা।

নাগরিক ও প্রজা

নাগরিকত্ব লাভের উপায় (Modes of acquiring citizenship) : দুইটি উপায়ে নাগরিক অধিকার লাভ করা যায়—জন্মগত (by birth), ও স্বেচ্ছাকৃত (by naturalisation)। জন্মগত নাগরিক অধিকার পাওয়ার দুইটি নিয়ম আছে : একটি রক্তগত অধিকার (*Jus sanguinis* or by virtue of blood), অপরটি জন্মভূমিগত অধিকার (*Jus soli* or by virtue of birth-place)। জন্মগত অধিকার অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা-মাতা যে-দেশের নাগরিক ছিল সে সেই দেশের নাগরিক হইবে। এই নীতি অনুযায়ী ব্যক্তির জন্মস্থান বিচার করা হইবে না। যেমন, ভারতীয় নাগরিকের সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন ভারতীয় নাগরিক বলিয়াই গণ্য হইবে। জন্মভূমির অধিকার অনুযায়ী যদি কোন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে আমেরিকার

রক্তগত অধিকার ও জন্মগত অধিকার

নাগরিক অধিকার পাইবে। অর্থাৎ জন্মস্থান অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভ হইবে। কোন কোন রাষ্ট্রে প্রথম নিয়মটি, কোন রাষ্ট্রে দ্বিতীয় নিয়মটি আর কোন রাষ্ট্রে উভয় নিয়মই গ্রহণ করা হয়। ভারতের নূতন শাসন-ব্যবস্থায় আমরা দুইটি নীতিই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ যদি ভারতের মাটিতে কোন বিদেশীর সন্তান হয়, তবে সে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করে। আর কোন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান বিদেশে জন্মলাভ করিলে সে-ও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হয়।

এই দুইটি নীতির মধ্যে রক্তগত অধিকারকে অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়, কারণ কোন্ স্থানে জন্ম ঘটিবে তাহা অনেকাংশে অনিশ্চিত এবং আকস্মিক বিষয়। বিদেশে পঠনকালে ভারতীয় মাতার শিশু জন্মগ্রহণ করিলে গ্রেট ব্রিটেন তাহাকে দাবি করিলেও ভারতের অধিকারই তাহার উপর বেশি হওয়া উচিত। জন্মভূমিগত আইন-কানুন আছে বলিয়া নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। ভারতীয় নাগরিকের সন্তান আমেরিকার মাটিতে জন্মলাভ করিলে সে ভারতীয় আইন অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিক, আর আমেরিকার নিয়মে সেই দেশের নাগরিক। ইহাকে বলে দ্বি-নাগরিকত্বের সমস্যা (double nationality)। কিন্তু এক ব্যক্তি তো একই সময়ে দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে নিয়ম হইল যে, সেই ব্যক্তি সাবালক হইয়া এক দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া অপর দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিবে। যে-দেশের নাগরিকই হউক না কেন, বিবাহের পরে স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্বামীর নাগরিকত্ব পায়।

স্বেচ্ছাকৃত নাগরিক হইতে হইলে, কতকগুলি শর্ত পূরণ করিয়া তাহা অর্জন করিতে হয়। ইহাকে অর্জিত নাগরিকত্ব বলে। সকল রাষ্ট্রেই বিদেশীয়দের নাগরিকত্ব অর্জন করিবার ব্যবস্থা আছে। নিম্নলিখিত শর্তগুলি বিভিন্ন দেশে আরোপিত হইয়াছে।

স্বেচ্ছাকৃত উপায়

যে বিদেশী নাগরিক হইতে ইচ্ছা করে সে (ক) ঐ দেশে একাদিক্রমে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর বাস করিবে, অথবা, (খ) রাষ্ট্রের অধীনে চাকরি করিবে, অথবা, (গ) সম্পত্তি ক্রয় করিবে, অথবা (ঘ) সেনাবিভাগে যোগদান করিবে, অথবা, (ঙ) সেই দেশের ভাষা অভ্যাস করিবে, ইত্যাদি। সকল দেশের শর্ত এক নহে। কোন কোন দেশে উহার দুই একটি শর্ত মানিলেই হয়, আবার, কোন কোন দেশে কতকগুলি শর্ত একত্রে মানিতে হয়। এই শর্তগুলি পূরণ হইলে রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছামত কোন বিদেশীকে নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারে। ইচ্ছামত এইরূপ নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং অনুসন্ধান করিয়া সন্তুষ্ট হইলে কর্তৃপক্ষ নাগরিকত্ব দান করিবে।

নাগরিকত্ব অর্জন পূর্ণ বা আংশিক (complete or partial) হইতে পারে। কোন বিদেশী যখন নাগরিকত্ব অর্জন দ্বারা সেই রাষ্ট্রের দেওয়া সকল অধিকার ও

সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ অংশীদার হয়, তখন তাহার অর্জিত নাগরিকত্ব সম্পূর্ণ। ইংলণ্ডে অর্জিত নাগরিকদের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে, (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কোন অর্জিত নাগরিক স্বাভাবিক নাগরিকের তুলনায় কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা কম পায়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অর্জিত নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট হইতে হইলে যতটা দেশপ্রেম এবং একাগ্রচিত্ত হইতে হয়, তাহা একমাত্র জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মার্কিন নাগরিকের ক্ষেত্রেই সম্ভব, এইরূপ মনে করা হয়। ইহাকে আংশিক নাগরিকত্ব অর্জন বলে।

পূর্ণ বা আংশিক নাগরিকত্ব অর্জন

নাগরিকত্ব হারাইবার কারণ (Causes of the loss of citizenship): নানা কারণে কোন ব্যক্তি তাহার নাগরিক অধিকার হারাইতে পারে। যেমন, (i) অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে নিজের রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লোপ পাইবে। কারণ, একসঙ্গে একই ব্যক্তি দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিক থাকিতে পারে না। (ii) বিদেশীর সহিত বিবাহ হইলে স্ত্রীলোক স্বামীর নাগরিকত্ব লাভ করে ও নিজের নাগরিকত্ব হারায়। (iii) অন্য রাষ্ট্রের অধীনে সরকারী কাজ গ্রহণ করিলে কোন কোন রাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। (iv) কোন কোন রাষ্ট্রে এমন নিয়মও আছে যে, অন্য রাষ্ট্র হইতে উপাধি বা সম্মান গ্রহণ করিলে তাহাকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। বর্তমানে কোন ভারতীয় নাগরিক ইংলণ্ডের রানীর প্রদত্ত কোন উপাধি গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য এভারেস্ট বিজয়ী বীর তেনজিঙকে ইংলণ্ডের রানী ইচ্ছা থাকিলেও কোন উপাধি দিতে পারেন নাই। (v) যুদ্ধের সময় কোন সৈনিক নিজের সৈন্যদল ছাড়িয়া বিপক্ষ দলে পলায়ন করিলে তাহার নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়। (vi) কোন কোন দেশে নিয়ম আছে যে, বিচারালয়ে গুরুতর অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাহার নাগরিক অধিকার লোপ করিয়া দেওয়া হয়। (vii) রাষ্ট্র হইতে একটানা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিলে নাগরিক তাহার নাগরিকত্ব হারাইতে পারে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকার কারণ

ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল স্বেচ্ছাকৃত ভাবে পদত্যাগ এবং নূতন নাগরিকত্ব বরণ করা। এ বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানা রকম বিধি দেখা যায়। কতকগুলি রাষ্ট্র শর্তসাপেক্ষে এই অধিকার দেয়। অতীতে বেশির ভাগ রাষ্ট্রই পদত্যাগের অধিকার দিত না। এখন অবশ্য গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসারের ফলে রাষ্ট্র নাগরিকের পদত্যাগের উপর বিধিনিষেধ অনেকখানি তুলিয়া দিয়াছে।

সু-নাগরিকের গুণাবলী (Qualities of a good citizen) : বহুকাল পূর্বে ভল্‌টেয়ার (Voltaire) বলিয়া গিয়াছিলেন, "জাতি নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকার পায়" (a people will get the kind of government it deserves)। নাগরিকত্বের ধারণা রাষ্ট্রের ধারণা হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। সু-নাগরিক ও সু-রাষ্ট্র একই ধারণার দুইটি দিক। সু-নাগরিকের ভাল গুণগুলিই রাষ্ট্রকে উন্নত করিয়া তোলে। আবার রাষ্ট্রের ভাল নিয়মকানুন ও পরিচালনার ফলেই সু-নাগরিক সম্ভব হয়। বর্তমান যুগে আমরা গণতন্ত্রকে আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলিয়া মনে করি। এই কারণে সু-নাগরিক হইল সেই ব্যক্তি যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য কার্যগুলি করিতে প্রস্তুত। গণতন্ত্রে সাধারণ নাগরিকেরা শাসনে অংশগ্রহণ করে। সাধারণ নাগরিকদের উন্নতির স্তরই তাই গণতন্ত্রের উন্নতির মাত্রা নির্ধারণ করে।

ভাল নাগরিক ভাল রাষ্ট্র

গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য হইতেই নাগরিকদের গুণাবলী গড়িয়া উঠে ; আবার এই গুণগুলিই গণতন্ত্রকে রক্ষা করিয়া উহাতে প্রাণসঞ্চার করে। বার্নসের ভাষায় বলিতে গেলে "two characteristics in the conduct and outlook of all men : first, a sturdy independence and secondly, an imaginative sympathy," গণতন্ত্রের সাফল্যের মূলকথা হইল : প্রতিটি নাগরিকের মনে, একদিকে স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ ও তীব্র আত্মসম্মান বোধ ; অপর দিকে দায়িত্ব বহনের, আলাপ-আলোচনার ও সহনশীলতার ইচ্ছা। সু-নাগরিকত্বের মূল কথা হইল "নিজের সুশিক্ষিত বিচার-বিবেচনাশক্তি জনকল্যাণে নিয়োগ করা" : "the contribution of one's instructed judgment to the public good." নাগরিকের মনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগিয়া উঠিলে ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা দেখা দিলে তবেই সে সু-নাগরিক হিসাবে গড়িয়া উঠিবে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আদর্শ যে বহন করে

বিখ্যাত রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ লর্ড ব্রাইস সু-নাগরিকের তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা, বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক : "Each member of a free community must be capable of citizenship. Capacity involves three qualities—intelligence, self-control and conscience." সু-নাগরিকের বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। কিভাবে দেশ শাসিত হইলে জনসাধারণের মঙ্গল হইবে তাহার সেই বিচার-বুদ্ধি থাকা দরকার। ভাল মন্দ বিচার করিবার মত বোধশক্তি থাকা আবশ্যক। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য প্রত্যেক

বুদ্ধি, সংযম ও বিবেক

নাগরিকের সু-শিক্ষার দরকার। সমগ্রতার আলোকে কোন একটি অংশকে বোঝা, স্থায়িত্বের আলোকে আজিকার সাময়িক বিষয়কে বোঝা সুনাগরিকত্বের প্রকৃত শিক্ষা।

সু-নাগরিকের আত্মসংযম থাকা দরকার। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিবার মত মনোভাব থাকা দরকার। নিজের সুখ-সুবিধা বর্জন করিয়াও দেশের মঙ্গল করিতে হইবে। নিজের মতামতের সহিত যদি দেশের অধিকাংশের মতামত পৃথক্ হয়, তথাপি আত্মসংযমের দ্বারা সকলের মত মানিয়া লইতে হইবে। সরকারী কোন আইন ব্যক্তির সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বিরুদ্ধে হইলেও তাহা মানিয়া লইতে হইবে। উন্মাদনা, আবেগ ও স্বার্থের প্রাবল্য সংযত না করিলে সে সু-নাগরিক হইতে পারে না।

পরিশেষে সু-নাগরিকের বিবেকসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সু-নাগরিক প্রত্যেকটি কাজ কর্তব্যনিষ্ঠা ও সাধুতার সহিত সম্পন্ন করিবে। সাধুভাবে ভোটাধিকার ব্যবহার করা, সরকারকে কর দেওয়া, আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দিতে সাহায্য করাও সু-নাগরিকের কর্তব্য। সু-নাগরিক আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিবে। নিজের স্বার্থ ভুলিয়া দেশের ও দশের সেবাই সু-নাগরিকের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু অর্থলোভ, অথবা ক্ষমতা লোভে যাহারা এই নীতি মানে না, অন্য অনেক গুণ থাকিলেও তাহারা সু-নাগরিক হইতে পারে না। বিবেকের প্রেরণা অনুযায়ী কর্তব্য করা সু-নাগরিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ।

সু-নাগরিকত্বের অন্তরায় (Hindrances to good citizenship) : নাগরিকদের উৎকর্ষ যেমন রাষ্ট্রের মান উন্নত করে, সেইরূপ নাগরিকদের অপকর্ষ বা গুণস্বল্পতা রাষ্ট্রের মান নামাইয়া দেয়। বাস্তব জগতে সুনাগরিকত্বের আদর্শ খুব কমই রূপায়িত হইতে দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নানা অবস্থার চাপে নাগরিকরা সু-নাগরিকের কর্তব্যগুলি করিয়া উঠিতে পারে না। দারিদ্র্য, অশিক্ষা প্রভৃতির দরুন সু-নাগরিক গড়িয়া উঠিতে পারে না।

এই সকল বাধা ছাড়া সু-নাগরিকত্বের অন্তরায় হিসাবে আমরা কতকগুলি দোষের কথা উল্লেখ করিতে পারি। নাগরিকের তিনটি দোষ থাকিলে সে সু-নাগরিক হইতে পারে না। লর্ড ব্রাইসের মতে এই তিনটি দোষ হইতেছে (1) উদ্যমহীনতা (Indelence), (2) স্বার্থপরায়ণতা (Self-interest) এবং (3) দলীয় মনোভাব (Party spirit)। যে-ব্যক্তি অলস, স্বার্থপর এবং দলাদলির পক্ষপাতী সে কখনও সু-নাগরিক হইতে পারে না।

(1) সর্বসাধারণের বিষয়ে যে নির্লিপ্ত থাকিতে চায় সে কখনও ভাল নাগরিক হইতে পারে না। সকলের সমবেত চেষ্টাতেই একটা কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে।

আমাদের দেশে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, জনসাধারণের কাজে কেহই মাথা ঘামায় না। ব্যক্তিগত স্বার্থ যখন নাই তখন এইরূপ কাজে অগ্রণী হওয়ার দরকার নাই,—এই মনোবৃত্তি সু-নাগরিক হওয়ার অন্তরায়। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। কিন্তু দেখা যায় যে, কার্যক্ষেত্রে অনেকে গা ঢাকা দেয়। সে ভাবে যে অন্যে ঐ কাজ করিবে। এইরূপে সর্বজনীন কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না। ভোট দেওয়ার সময়ে নাগরিক হয়তো ভাবিবে, কত ভোটদাতাই তো আছে, আমার একটা ভোট দেওয়ায় বা না দেওয়ায় এমন কি আসিয়া যায়? এইভাবে ক্রমে ক্রমে কর্মে এবং চিন্তায় অলসতা আসে। সকল লোকেই যদি এইরূপ রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে উদাসীন হইয়া পড়ে, তবে শাসনে শৈথিল্য আসে। সরকারী কর্মচারীরাও কার্যে শিথিল হয় এবং শাসন অবস্থার অবনতি ঘটে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে, অবিরাম সতর্ক থাকাই ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ (Eternal vigilance is the price of liberty)। দেশের রাজনৈতিক বা পৌর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে সর্বদা শাসন বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নচেৎ তাহা রক্ষা পাইবে না। নির্লিপ্ত ও উদাসীন নাগরিকই একনায়কতন্ত্রের জন্ম দেয়। এইজন্য রাজনৈতিক বিষয়ে যাহারা অবহেলা করে তাহারা সু-নাগরিক হওয়ার অনুপযুক্ত।

1. উদ্যমহীনতা

(2) ব্যক্তিগত স্বার্থ সু-নাগরিকত্বের অন্তরায়। সমাজ-জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি দিতে হইবে। অর্থের লোভে অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্বাচন, ভোট ক্রয়-বিক্রয়, নির্বাচনের পরে টাকা বা মন্ত্রিত্বের লোভে আইনসভার সদস্যদের সম্পূর্ণ নীতিহীন দলবদল, স্বার্থের জন্য আইনভঙ্গকারীকে বাঁচাইয়া চলা, অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মীয়তার খাতিরে সরকারী চাকরীতে বহাল করিবার জন্য তদ্বির ইত্যাদি সমাজবিরুদ্ধ কাজ। অর্থের লোভে, সম্মানের লোভে বা সুলভে সমাজে জনপ্রিয় হইবার জন্য এইরূপ অন্যায় কাজ করা নাগরিকের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। দেশের শিল্পপতিরা কেবলমাত্র অর্থলোভে চালিত হইতে পারে। সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিগ্রস্ত ও উৎকোচপ্রবণ হইতে পারে। সরকারে ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রশক্তিকে দলীয় স্বার্থে নিয়োগ করিতে পারে। এই অবস্থায় গণতন্ত্র বেশিদিন বাঁচিতে পারে না। এই শ্রেণীর লোক সু-নাগরিক হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

2. স্বার্থপরতা

(3) দলীয় মনোভাব সু-নাগরিকত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। বর্তমান-কালে গণতন্ত্রের যুগে রাজনৈতিক দল প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আছে। মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত রাষ্ট্রে এইরূপ রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই আদর্শ হইবে

দেশের সেবা। কিন্তু এই আদর্শ ভুলিয়া যদি প্রত্যেক দল নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেয়, তবে রাষ্ট্রের পক্ষে অমঙ্গলজনক।

3. উগ্র দলীয় মনোভাব

যদি কোন নাগরিক নিজের দলের স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিয়া সমাজের ও রাষ্ট্রের স্বার্থহানি করে তবে সে সু-নাগরিক হওয়ার অনুপযুক্ত। দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ ও যুক্তিহীন করে। বিভিন্ন দলভুক্ত লোকেরা একে অন্যের সহিত ঝগড়াবিবাদ করিয়া অনেক সময় দেশের অনিষ্ট ডাকিয়া আনে। দলের সভ্যদের মধ্যে মিথ্যাচরণ, নীতিহীনতা ও স্বার্থ-লোলুপতা দেখা দেয়। এই অবস্থায় দেশের রাজনীতির অবস্থা দাঁড়ায়, ম্যাকাইভারের ভাষায়, "the jockeying of organised groups for relative advantage." সু-নাগরিকত্বের পক্ষে এইরূপ পরিবেশ মোটেই সুফল-দায়ী নয়। নিজেদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক, প্রত্যেক দলের সভ্যদের একমাত্র আদর্শ হইবে সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া কায়মনোবাক্যে দেশের সেবা করা।

অন্যান্য প্রতিবন্ধক

সু-নাগরিকত্বের আরও অনেক প্রতিবন্ধক আছে। (1) দেশের নির্বাচনী প্রথার ত্রুটি-বিচ্যুতি, (2) জনসাধারণের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য, (3) জনমত প্রকাশের বাহনগুলির দুর্নীতিপরায়ণতা, এবং (4) দেশের বিপুল জনসংখ্যা ও আয়তন প্রভৃতি—ইহারা সু-নাগরিক গড়িয়া তুলিতে বাধা দেয়। সর্বোপরি, বর্তমানের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনীতি অপরিকল্পিত হওয়ায় কখনও কখনও বিপুল বেকারি দেখা দেয়। উৎপাদনে বিশৃঙ্খলা, বিরাট অর্থ নৈতিক অসাম্য,—সকল কিছুর সম্মুখে ব্যক্তি নিজেকে ক্ষমতাহীন ও একান্ত দুর্বল বলিয়া মনে করে। ব্যক্তি ক্রমশ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নতা (alienation) অনুভব করে, ফলে সমাজের সহিত নাগরিক একাত্মবোধ অনুভব করে না, ক্রমশ সে হতাশাগ্রস্ত ও নৈরাশ্যবাদী হইয়া উঠে।

সু-নাগরিকত্বের অন্তরায়গুলি দূর করার উপায় (Measures for the removal of the hindrances to good citizenship)

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নাগরিকদের উৎকর্ষ এবং চরিত্রের উপর। তাই সু-নাগরিকত্বের অন্তরায়গুলিকে দূর করা যায় কি উপায়ে সে বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানাভাবে চিন্তা করিয়াছেন। সকল দোষের মূল হইল জনসাধারণের নির্লিপ্ততা (public apathy)। সুতরাং সকল প্রতিকারের লক্ষ্যই হইল নাগরিককে জনকল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করা ও সমাজমুখী করিয়া তোলা।

এই দোষগুলি দূর করিতে হইলে লর্ড ব্রাইসের মত অনুযায়ী দুই ধরনের প্রতিকার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে—শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Administrative

remedies) ও নৈতিক ব্যবস্থা (moral remedies)। সরকারের কাঠামো, রাজনীতি ও কার্যপদ্ধতি উন্নত করাকে বলে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আর নৈতিক ব্যবস্থা হইল যাহা জনসাধারণের চরিত্র ও মনোবল উন্নত করিয়া তোলে

(ক) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারসমূহ—সুচিন্তিতভাবে ও সাবধানতার সহিত রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনিয়া সু-নাগরিকত্বের অন্তরায়গুলি দূর করা সম্ভব। (1) তাঁহার মতে দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে ভোটসংখ্যার অনুপাতে আসন দেওয়া উচিত (system of proportional representation)। ইহাতে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেরাই আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব পাইবে, সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হইবে। (2) ভোটদানের কাজ বাধ্যতামূলক করার কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভোটদান বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে যাহাতে রাষ্ট্রের কাজে লোকেরা উদাসীন না-হইয়া পড়ে। (3) গণমতসংগ্রহ (referendum), গণউদ্যোগ (initiative) ও প্রতিনিধি-প্রত্যাহার প্রথা (re-call) প্রভৃতির কথাও বলা হইয়াছে—এই সকল নিয়ম থাকিলে নাগরিকেরা রাষ্ট্রের কাজকর্ম সম্পর্কে সজাগ থাকে এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহী হয়। (4) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, যেমন পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, ইহাদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিতে হইবে। ইহারাই নাগরিককে গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ দেয়, এ বিষয়ে তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলে। (5) তাহা ছাড়া, দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি অসামাজিক কাজকর্ম রোধের জন্য উপযুক্ত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলে।

(খ) নৈতিক প্রতিকারসমূহ (moral remedies)—নির্বাচনী আইনের কড়াকড়ি, দুর্নীতির জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা নাগরিকদের দোষত্রুটি দূর করা যায়। কিন্তু আইনের দ্বারা বাধ্য করিলেই ভোটদাতার উদাসীনতা দূর করা যায় না। তাহার মনের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাইয়া উন্নত স্তরের দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করিতে হইবে। মনকে রঙীন না করিয়া গৈরিক রঙের বস্ত্র পরিধান করিলে যেমন প্রকৃত যোগী হওয়া যায় না ইহাও সেইরূপ। অন্তরের উন্নতিই বড় কথা, মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধিই ব্যক্তিকে সুনাগরিক করিয়া তোলে। তাহার মনে অদম্য উৎসাহ থাকা চাই, সমাজবোধ থাকা চাই, শিক্ষিত সুসংস্কৃত অনুভূতি থাকা চাই। এ বিষয়ে দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক জন স্টুয়ার্ট মিলের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "কোন জনসমষ্টি অন্যান্য ধরনের সরকার অপেক্ষা গণতন্ত্রকে অধিকতর পছন্দ করিতে পারে, কিন্তু যদি উৎসাহহীনতা, অসাবধানতা, কাপুরুষতা বা জনকল্যাণ-মূলক প্রেরণার অভাবের দরুন এই ধরনের সরকার রক্ষা করার মত পরিশ্রম করিতে

প্রস্তুত না হয় ; যদি এই ধরনের সরকার আক্রান্ত হইলে তাহারা ইহাকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করিতে প্রস্তুত না থাকে ; এই ধরনের সরকার হইতে তাহাদের ঠকাইয়া বাহির করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রলোভনের প্রভাবে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে ; যদি সাময়িক নিরুৎসাহ, বা ভয় বা কোন ব্যক্তির জন্য সাময়িক উৎসাহের আবেগে বিরাট কোন পুরুষের পদতলে লুটাইতে তাহারা উন্মাদ হইয়া উঠে, বা সেই ব্যক্তিকে অস্বাভাবিক বেশি ক্ষমতা দিয়া যদি নিজেদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিনষ্ট করিতে উদ্বুদ্ধ করে ; তবে এইরূপ অবস্থায় সেই জনসমষ্টি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে অনুপযুক্ত। তবুও কিছুকালের জন্য হইলেও, ইহাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভোগ করিতে দেওয়া ভাল, অবশ্য বেশিদিন তাহারা ইহা আস্বাদন করিতে পারিবে না ইহা নিশ্চিত।".

এইজন্য প্রকৃত উপায় হইল শিক্ষার প্রসার, এমন ধরনের শিক্ষাদান যাহাতে সাহস, সততা, সহনশীলতা এবং ত্যাগস্বীকার ও অপরের সহিত মানাইয়া চলার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। এইজন্যই গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্রে (Ideal State) ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। সুশিক্ষা ব্যক্তির মনে উদারতা আনে, দেশপ্রেম জাগায়, গভীর সমাজবোধ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। শিক্ষার প্রভাবই হিংসা, দ্বেষ, আঞ্চলিক, গোষ্ঠীগত বা দলগত সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলাইয়া দেশমাতৃকাকে সেবা করিবার মনোভাব জাগাইয়া তোলে। প্রকৃত শিক্ষা প্রতিটি নাগরিককেই সত্যনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ দেশসেবকে পরিণত করে। এইরূপ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইবে, কোন্ উৎস হইতে ও কি কৌশলে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি জাগ্রত হইতেছে সে-সম্পর্কে সদাসর্বদা তাহাদের সচেতন রাখিতে হইবে।

প্রতিকারের এই সকল ব্যবস্থা ছাড়াও দারিদ্র্য, অনাহার, আয়-বৈষম্য, ধন-সম্পদের কেন্দ্রিকতা প্রভৃতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে জনসমষ্টির মধ্যে স্বায়িত্ববোধ ও ন্যায়বোধ জাগিয়া উঠে। যদি দেশের প্রতিটি ক্ষেতখামার ও কলকারখানা হইতে আলাপ-আলোচনা ও হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে তলার দিক হইতে সুরু হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া ক্রমশ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হয়, তবে তাহা জনচিত্তে সাড়া জাগায়, দেশ সম্পর্কে লোককে আগ্রহী করিয়া তোলে। এইরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টির যে অভিন্নতাবোধ দেখা দেয় উহাই সু-নাগরিক সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে

ভারতীয় নাগরিকত্ব (Indian Citizenship): পৃথিবীর বৃহৎ দুইটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের (আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নে) প্রত্যেকটিতে ব্যক্তির

দুই প্রকারের নাগরিকত্ব আছে। ব্যক্তি যে-প্রদেশে বা রাজ্যে বাস করে উহার নাগরিকত্ব এবং সমগ্র দেশের অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নাগরিকত্ব বলিতে কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব বুঝায়; কোন প্রাদেশিক, আঞ্চলিক বা রাজ্যের নাগরিকত্ব বুঝায় না। সর্বভারতীয় নাগরিকত্ব ব্যতীত কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব (dual citizenship) এদেশের শাসনতন্ত্রে নাই। আমরা ভারতের নাগরিক, বাংলা ও বিহারের নাগরিক নই। ভারতের নাগরিকেরা বিভিন্ন রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী (domiciled) হইতে পাবেন, কিন্তু তাঁহাকে সেই রাজ্যের নাগরিক বলা চলিবে না।

যুক্তরাষ্ট্র হইলেও এক প্রকার নাগরিকত্ব

আমাদের শাসনতন্ত্রে নাগরিকত্ব প্রাপ্তি বা নাগরিকত্ব লোপ সম্বন্ধে কিছু বলা ছিল না। বলা হইয়াছিল যে এই বিষয়ে সংসদ আইন করিয়া নিয়মাবলী স্থির করিবে। 1955 সালে সংসদে এইরূপ আইন গৃহীত হইয়াছে। 1950 সালে গৃহীত সংবিধানে লিখিত ছিল যে, যাঁহারা নিম্নলিখিত গুণসমূহের মধ্যে যে-কোন একটি গুণের অধিকারী হইবেন তাঁহাদের ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে: (i) যিনি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত কোন স্থানে জন্মগ্রহণ; বা (ii) যাঁহার মাতাপিতা এই ইউনিয়নের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অথবা (iii) ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হইবার পূর্বে পাঁচ বৎসর বা তাহার অধিককাল ইউনিয়নের মধ্যে বাস করিয়াছেন; (iv) যিনি বা যাঁহার মাতাপিতা বা পিতামহ পিতামহী 1935 সালের ভারত শাসন আইনের অন্তর্গত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অথবা (v) 1948 সালের 19শে জুলাই তারিখের পূর্বে ভারতীয় ইউনিয়নে আসিয়া বসবাস করিতেছেন; অথবা (vi) উক্ত তারিখে বা তৎপরে ভারতীয় ইউনিয়নে আসিয়া বসবাস করিবার পর সরকারী কর্মচারী কর্তৃক নাগরিকরূপে নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া অবস্থান করিতেছেন।*

সংবিধানে লেখা ছিল কাহাদের তখন নাগরিক বলিয়া মনে করা হইবে

যিনি 1947 সালের 1লা মার্চের পর পাকিস্তান গমন করিয়া সেখানে বসবাস করিতেছেন তিনি নাগরিকত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। কিন্তু তিনি যদি পুনরায় পাকিস্তান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্থায়িভাবে বাস করিবার সনদ বা আইনানুসারে অধিকার পাইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি ভারতীয় ইউনিয়নের নাগরিকত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।

1955 সালে সংসদে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনানুসারে পাঁচটি পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করা যায়: (i) জন্ম (birth): 1950 সালে 26শে জানুয়ারীর পরে যাঁহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন

* সংবিধানের 5 হইতে 10 ধারায় কাহারা ভারতের নাগরিক, তাহা বলা হইয়াছিল।

(বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত বা ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক সন্তান ছাড়া)। (ii) বংশ (descent) : উত্তরাধিকার সূত্র অনুযায়ী ভারতে জন্মিয়াছেন এমন ব্যক্তির সন্তান ঐ তারিখে বা তাহার পরে বিদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও ভারতের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবেন। (iii) রেজেষ্ট্রী করা (registration) : যাঁহারা সাধারণত ভারতে বসবাস করেন তাঁহারা যদি রেজেষ্টারীভুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিবার ছয় মাস পূর্বে এখানে বাস করেন। (iv) অর্জন (naturalisation) : (ক) ভারতীয় নাগরিকদের সহিত বিবাহ হইয়াছে এমন বিদেশীয় নারীরাও দরখাস্ত করিয়া নাম রেজেষ্টারী করাইয়া ভারতীয় নাগরিক হইতে পারেন, (খ) বিদেশী ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে এবং ভারত সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ভারতীয় নাগরিকত্ব দিতে পারেন। (v) রাজ্যক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্তি (incorporation of territory) : যদি নূতন কোন অঞ্চল ভারতের অধিকারভুক্ত হয় তাহা হইলে উহার কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন তাহা ভারত সরকার স্থির করিবেন। পণ্ডীচেরী, চন্দননগর, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি রাজ্যের অধিবাসীরা এইভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করিয়াছেন।

1955 সালের আইন অনুসারে কাহারা নাগরিক

কোন বিদেশীকে ভারতের নাগরিকত্ব দিবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়; (ক) তিনি যে দেশের প্রজা বা নাগরিক সেই দেশে ভারতীয়রা নাগরিকত্ব লইবার সুযোগ পান কি না; (খ) তিনি পূর্বের বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিয়াছেন কি না; (গ) দরখাস্ত করিবার বারো মাস পূর্ব হইতে তিনি ভারতে একটানা বসবাস করিতেছেন কি না বা ভারত সরকারের অধীনে চাকুরি করিয়াছেন কি না; (ঘ) ঐ বারো মাসের পূর্বে সাত বৎসরের মধ্যে অন্তত চার বৎসর তিনি এদেশে বাস করিয়াছেন বা ভারত সরকারের অধীনে চাকুরি করিতেছেন কি না; (ঙ) তিনি সচ্চরিত্র এবং ভারতের 14টি প্রধান ভাষার একটিও জানেন কি না; (চ) ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করার কোন অভিপ্রায় আছে কি না।

বিদেশীয় ব্যক্তির নাগরিকত্ব লাভ

1955 সালের আইনে নাগরিকত্ব বিলোপ সাধনের বিধানও রাখা হইয়াছে। তিনভাবে নাগরিকত্ব লোপ পাইতে পারে। (i) ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগের দ্বারা। যদি কখনও দেখা যায় কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে ভারতের এবং অন্য কোন দেশের নাগরিক থাকিতেছে তবে তাহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটি দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা তাহার ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ পাইবে। (ii) স্বেচ্ছায় অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের দ্বারা। কোন ভারতীয়

নাগরিকত্বের বিলোপ

নাগরিক নিজ ইচ্ছায় অপর কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে স্বভাবতঃই তাহার ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ পাইবে। (iii) সরকারী নির্দেশ দ্বারা। যদি কখনও ভারত সরকার মনে করেন যে জাল বা মিথ্যা প্রমাণ দ্বারা ভারতের নাগরিক হইয়াছেন বা তিনি সংবিধানের প্রতি অনুরক্ত নন, তবে তাঁহার নাগরিকত্ব লুপ্ত হইয়া যাই বে।

অধিকার কাহাকে বলে? (What are Rights: the nature of Rights): মানুষেরা একত্র মিলিয়া সমাজ গঠন করিয়াছে। অ্যারিস্টটলের ভাষায় এই সমাজগঠনের উদ্দেশ্য হইল উন্নত জীবনযাপন করা (good life)। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশ করা প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলিতে আমরা বুঝি প্রত্যেকের নিজস্ব ঝোঁক এবং অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা অবাধে প্রকাশ করা। কাহারও ঝোঁক খেলাধুলায়, কাহারও ছবি আঁকায়, কাহারও লেখাপড়ায়, কাহারও বা গান-বাজনা ও নাটক অভিনয়ে। নিজ নিজ ঝোঁক ও দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইলে আমরা বলি তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইল। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশই উন্নত জীবনযাপন। নিজ নিজ ঝোঁক ও দক্ষতার বিকাশ সম্ভব হয় উপযুক্ত পরিবেশে। নিম্নতম কতকগুলি প্রয়োজন না মিটিলে এই পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। যেমন, কোন বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিলে তবেই নাগরিকের ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হইতে পারে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাইবার জন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার উহাদের যোগফল হইল অধিকার (Rights)। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় বলিতে গেলে "Rights, in fact, are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best."* কিন্তু এই অধিকারগুলি তখনই প্রকৃত অধিকার হইতে পারে যখন রাষ্ট্র উহাদের অধিকার বলিয়া স্বীকার করে এবং উহাদের রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। রাষ্ট্র না-মানিয়া লইলে ইহারা অধিকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

যাহারা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ঘটাইতে সাহায্য করে

এবং রাষ্ট্র যাহাদের রক্ষা করে

মানুষের সামাজিক প্রকৃতি বা সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের ইচ্ছার মধ্যেই অধিকার লুকানো আছে। সামাজিক জীবনযাপনের প্রয়োজনের মধ্য হইতেই এই সকল অধিকারের উদ্ভব। যেমন, কোন মানুষের অধিকার নাই অপরকে হত্যা করার।

* অধ্যাপক Barker আরও সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন: "The sum of rights is my whole capacity—my whole status and whole power of action—within the state and under its law: it is my general and total *persona*, or legal personality: it is my general position in the system of Rights (in so far as that system is recognised by the State), and the whole of my share in that system."

Barker, *Principles of Secial and Political Theory, p. 137.*

এই অধিকার মানিয়া লইলে সমাজ ভাঙিয়া যাইবে চূড়ান্ত বিশৃংখলা দেখা দিবে। সামাজিক বিশৃংখলার পরিবেশে সুন্দর ও উন্নত জীবনযাপনের আদর্শ বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক কল্যাণের মৌলিক নিয়মগুলি না মানিয়া চলিলে অধিকারগুলি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকটি নাগরিকেরই কতকগুলি নৈতিক দায়িত্ব আছে। নিজে যেমন অধিকার ভোগ করিবে, ঠিক সেইরূপ প্রতিটি নাগরিক অন্যদের অধিকারের কথা স্মরণ রাখিবে। অন্যদের অধিকার মানিয়া চলা সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব। আরও একটি কথা আছে। প্রত্যেকেরই উচিত এমনভাবে এই অধিকারগুলি প্রয়োগ করা যাহাতে সমাজের জ্ঞান ও সম্পদ্ ভাণ্ডার ভরিয়া উঠে। হব্‌হাউসের (Hobhouse) ভাষায় বলা চলে যে, প্রতিটি অধিকারই সামাজিক কল্যাণের শর্তস্বরূপ।

সামাজিক কল্যাণ বলিলে একেবারে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট কোন ধারণা বুঝায় না। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কে ধারণারও বদল হয়। পৃথিবীতে যখন শিল্পপ্রসার শুরু হইল, তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। লোকে যতখুশি সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিত, এবং যে-কোন ভাবে অর্জিত সম্পত্তি ব্যবহার ও ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর এত ত্রুটি দেখা গিয়াছে যে আজকাল সামাজিক কল্যাণের দিকে তাকাইয়া এইরূপ অধিকার সকলেই কমাইয়া দিতে চাহিতেছে। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের জনমতই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ অধিকার সঙ্কোচনের পক্ষে। অনেক দেশের রাষ্ট্রও তাই জনমত অনুযায়ী এই অধিকার খর্ব করিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সমাজজীবনের দ্রুত পরিবর্তনের জন্য এমন কোন অধিকারের তালিকা তৈয়ার করা যায় না যাহা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়।

অধিকার সম্পর্কে ধারণার বদল হয়

একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নাগরিকদের অধিকার দিতে পারে। কারণ, এইরূপ রাষ্ট্রে স্বাধীনতা ও সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা না থাকিলে কোন নাগরিক নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য দাবী করিতে পারে না। নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত অনুযায়ী সরকার গঠিত হইবে, এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই নাগরিককে অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেয়। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নাগরিকদের অধিকার রক্ষার সহায়ক। উপরন্তু, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য না-থাকিলে রাষ্ট্র বলবান্ শ্রেণীর লোকজনকে অধিকতর সুবিধা দেয়, সকলের অধিকার সমভাবে রক্ষিত হয় না; ইহার ফলে এইরূপ সমাজে কাগজে-পত্রে অধিকার থাকিলেও উহা মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

একমাত্র গণতন্ত্রেই অধিকার থাকে

যে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যত বেশিসংখ্যক অধিকার ভোগ করিতে পারে, সেই রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও গণতান্ত্রিক।

নাগরিকের বিভিন্ন অধিকার (Different Rights of Citizens) : সাধারণ ভাষায় লোকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন কাজ করিবার ক্ষমতাকে অধিকার বলা হয়। কিন্তু পৌরনীতিতে অধিকার শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অধ্যাপক লাস্কি বলিয়াছেন, সমাজ-জীবনে যে-সকল অবস্থা ছাড়া মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না, সেই সকল অবস্থা বা সুযোগ-সুবিধাকে অধিকার বলা হয়। নাগরিকগণ যাহাতে তাহাদের জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারে তাহার জন্য রাষ্ট্র তাহাদিগকে কতকগুলি অধিকার দিয়া থাকে। এই সুযোগ-সুবিধাগুলিকে রাষ্ট্র সকলের কল্যাণের জন্যই নাগরিকদের দান করে। যে-রাষ্ট্রে নাগরিকদের যত বেশি অধিকার দেওয়া হয় এবং রক্ষা করিবার জন্য যত ভাল ব্যবস্থা থাকে, সেই রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত।

অধিকার কাহাকে বলে

নাগরিকদের অধিকারগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—নৈতিক অধিকার ও আইনসঙ্গত অধিকার। নৈতিক অধিকার ন্যায়বুদ্ধি ও বিবেকের উপর নির্ভর করে। ইহাতে রাষ্ট্র কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। যেমন সন্তানের প্রতি পিতার কয়েকটি নৈতিক অধিকার আছে, শিক্ষকেরও ছাত্রের উপর কয়েকটি নৈতিক অধিকার আছে। কিন্তু এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে কোন প্রতিকার করিতে পারে না। সন্তান যদি বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার ভরণপোষণ না করে, অথবা ছাত্র যদি শিক্ষককে ভক্তিশ্রদ্ধা না করে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে সেইজন্য কোন শাস্তি দিতে পারে না। কেহ যদি নৈতিক অধিকার ভঙ্গ করে তবে সমাজের নিকট সে নিন্দনীয় হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র এ-বিষয়ে নীরব।

নৈতিক অধিকার ও আইনসঙ্গত অধিকার

যে-সকল অধিকার রাষ্ট্র আইনের দ্বারা রক্ষা করে তাহা আইনসঙ্গত বা আইনগত অধিকার। এই অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লয় এবং এই অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দেয়। আইনগত অধিকারকে দুইটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যথা—পৌর অধিকার (civic rights) এবং রাজনৈতিক অধিকার (political rights)। যে-সকল অধিকার ছাড়া মানুষ সুষ্ঠুভাবে সভ্য জীবন যাপন করিতে পারে না, যাহা সামাজিক জীবনে অত্যাবশ্যক, তাহাদের পৌর অধিকার বলে। মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিসমূহের পূর্ণ বিকাশের জন্য পৌর অধিকারের প্রয়োজন। আর যে-সকল অধিকারের বলে রাষ্ট্রের কার্য-পরিচালনায় নাগরিকেরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে রাজনৈতিক

পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার

অধিকার বলে। ভোট দেওয়ার অধিকার, আইন পরিষদের সদস্য হওয়ার অধিকার, রাষ্ট্রের কর্মচারী হইবার অধিকার প্রভৃতি হইল রাজনৈতিক অধিকার।

অনেক প্রকার **পৌর অধিকার** আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পৌর অধিকারগুলিই প্রধান : (1) **জীবন রক্ষার অধিকার**—প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান কর্তব্য নাগরিকদের জীবনরক্ষা করা এবং দেশের ভিতরের ও বাহিরের শত্রুর হাত হইতে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করা। সুতরাং, দেশের ভিতরের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। সকলের জীবন রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য; এইজন্য আত্মহত্যা করাও আইনের চোখে অপরাধ। (2) **স্বাধীন গতিবিধির অধিকার**—রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যে-কোন নাগরিক অবাধে চলাফেরা করিতে পারিবে। সরকারী নিষিদ্ধ স্থান ছাড়া অবাধ চলাফেরায় সরকার কোন বাধা দিতে পারিবে না। বিনা বিচারে সরকার কখনো কাহাকে আটক রাখিতে পারিবে না। কাহাকেও অন্যায়ভাবে আটক করিলে সে এই মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য উচ্চ আদালতে আবেদন করিতে পারে এবং তখন বিচারপতি বিচার করিয়া আটক রাখা অবৈধ বলিয়া মনে করিলে তৎক্ষণাৎ বন্দীকে মুক্তি দিতে পারেন। (3) **সম্পত্তির অধিকার**—প্রত্যেক নাগরিকই ব্যক্তিগত সম্পত্তি অবাধে ভোগ করিতে পারিবে। সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার না থাকিলে সমাজ-বন্ধনই শিথিল হইয়া যায়। ইহাই অ্যারিস্টটলের মত। যদিও বর্তমান সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকার করা হয় না, তথাপি সমাজের মঙ্গলের জন্য ও ব্যক্তির বিকাশের জন্য নিজের অর্জিত সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার থাকা কর্তব্য। (4) **চুক্তির অধিকার**—আইনের সীমানার মধ্যে থাকিয়া, যে-কোন নাগরিক অন্য নাগরিকের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবে। এই চুক্তি দুই পক্ষেরই পালনীয়। অবশ্য যদি চুক্তি আইন-বিরুদ্ধ অথবা রাষ্ট্র-স্বার্থের বিরুদ্ধ হয় তবে তাহা বাতিল হইবে। (5) **স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার**—সকল নাগরিকই সব সময়ে নির্ভীকভাবে তাহার মতামত প্রকাশ করিতে পারিবে। সরকারী নীতি সমালোচনা করিবার অধিকারও তাহাদের আছে। অপ্রীতিকর হইলেও বে-আইনী না হইলে, সরকারের সমালোচনা করিলে সমালোচককে শাস্তি দেওয়া হইবে না। মতামত দুইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—বক্তৃতার দ্বারা এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। পুস্তকে অথবা সংবাদপত্রে প্রত্যেকের মতামত খোলাখুলি প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। (6) **আইনের চক্ষে সমান বলিয়া গণ্য হইবার অধিকার**—ধনীদরিদ্র সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান। আইন কাহাকেও খাতির করে না। যে যত বড়ই হউক না কেন, অপরাধ করিলে শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে।

(7) **সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার**—মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চায়। নানাপ্রকার উদ্দেশ্যে লোকে সংঘ গঠন করে। এই সংঘ যদি বে-আইনী অথবা রাষ্ট্রবিরোধী না হয় তবে প্রত্যেক নাগরিক যে-কোন সংঘ গঠন করিতে পারিবে। (8) **সাধারণ সভায় যোগ দেওয়ার অধিকার**—সভা আহ্বান করিয়া যে-কোন বিষয়ে সমালোচনা করিবার অধিকার নাগরিকের আছে। যে-কোন বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিয়া সকলের মতামত জানাইবার অধিকার আছে।

ইহা ছাড়াও অনেক অধিকার আছে, যথা—ধর্মাচরণের অধিকার, সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার, কর্ম ও শিক্ষালাভের অধিকার, ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত অধিকারগুলিকে প্রধান বা মৌলিক **রাজনৈতিক অধিকার** বলিয়া গণ্য করা হয়।

(1) **ভোটাধিকার**—আধুনিক রাষ্ট্রে প্রায় প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার থাকা উচিত। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আজকাল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা আইনসভায় তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারে। তবে যাহারা দেউলিয়া, গুরুতর অপরাধে অপরাধী, পাগল, নাবালক—তাহারা কোথাও ভোট দেওয়ার অধিকারী হয় না।

(2) **সরকারী চাকরি পাওয়ার অধিকার**—যদি যোগ্যতা থাকে, তবে প্রত্যেক নাগরিক জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সরকারী চাকরি পাওয়ার অধিকারী হইবে। ইহাতে কোন আইনগত বাধা থাকিবে না।

(3) **আবেদন করিবার অধিকার**—সরকারের বিরুদ্ধে কোন অভাব-অভিযোগ থাকিলে প্রত্যেক নাগরিকের শাসন কর্তৃপক্ষের ও ব্যবস্থাপক সভার নিকট আবেদন করিবার অধিকার থাকে।

(4) **বসবাস করিবার অধিকার**—প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের যে-কোন স্থানে বসবাস করিবার অধিকার থাকে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ভঙ্গ না করিলে সকল নাগরিকেরই স্থায়িভাবে বসবাস করিবার অধিকার আছে।

(5) **বিদেশে থাকাকালীন নিরাপত্তার অধিকার**—যখন কোন নাগরিক বিদেশে থাকে, তখন সেই সরকারের কোন অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য ঐ দেশে নিযুক্ত স্বদেশীয় রাজদূতের মাধ্যমে সাহায্য পাইবে।

কিন্তু যুদ্ধের সময়ে অথবা জরুরী অবস্থায় দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন মনে করিলে কোন কোন পৌর অধিকারের ব্যবহার সরকার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারে।

নাগরিকের কর্তব্য (The Duties of Citizens) : রাষ্ট্রের নিকট হইতে নাগরিকেরা বিভিন্ন অধিকার পাইয়া থাকে। এই সকল অধিকারের সাহায্যে তাহারা যাহাতে নিজেদের উন্নত করিয়া তুলিতে পারে, সেইরূপ কাজ করা নাগরিকের কর্তব্য। যে-সকল কাজ তাহার করা উচিত, যাহা করা তাহার কর্তব্য, তাহাকে নাগরিকের কর্তব্য বলে। সুষ্ঠুভাবে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন না করিলে কেহ সু-নাগরিক হইতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, মানবজাতির প্রতি—এই চারি দিকেই নাগরিকের বহু কর্তব্য আছে।

(1) **রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য** (Duties of Citizens towards the State) : (ক) **রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য**—এই কর্তব্যই বিদেশী ও নাগরিকের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা বা রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকার করা। দেশ আক্রান্ত হইলে দেশ রক্ষা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়াও রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইবে। বিপদে-আপদে রাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা এবং সরকারী কর্মচারীদিগকে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(খ) **আইন মান্য করা**—প্রত্যেক নাগরিকই আইনের আদেশ মানিয়া চলিবে। সমাজের মঙ্গলের জন্য আইন করা হয়। সুতরাং যাহারা সমাজের মঙ্গল চাহিবে তাহারা নিশ্চয়ই আইনের বিরোধিতা করিবে না। শুধু নিজে আইন মানিলেই চলিবে না, অন্যে আইন ভঙ্গ করিলে তাহাকেও ধরাইয়া দিতে হইবে। তবে যদি আইন ন্যায় ও কল্যাণের বিরুদ্ধে হয়, তখন তাহা সংশোধনের জন্য আইনসম্মত ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাও প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের কর্তব্য।

(গ) **কর প্রদান**—রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ সম্পন্ন করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। নাগরিকেরা কর দিয়া এই অর্থের সংস্থান করিবে। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইল নিয়মিত ভাবে সরকার কর্তৃক ধার্য কর প্রদান করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতা করা।

(ঘ) **ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করা**—আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রত্যেক নাগরিক নির্বাচনের সময় বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী বিচার করিয়া তাহার ভোট ব্যবহার করিবে। সাধুভাবে ভোটাধিকার ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রকে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(ঙ) **নিষ্ঠার সহিত সরকারী কাজ সম্পাদন করা**—নাগরিক সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইলে, তাহা যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিবে। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও সরকারের সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। অনেক সময় দেখা

যায় যে, একজন হাইকোর্টের উকিল মাসে দশ হাজার টাকা রোজগার করেন, কিন্তু সরকারী আদেশে এই বিরাট আয়ের লোভ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকা মাসিক বেতনে হাইকোর্টের জজিয়তী গ্রহণ করিতে হয়।

(2) **পরিবারের প্রতি কর্তব্য** (Duty towards one's own family): প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন নাগরিকের নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্য আছে। যতদিন পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের সেবা করা ও সাধ্যমত সুখশান্তি দেওয়া প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য। নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন ও নিকট আত্মীয়কে ভরণপোষণ করা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, নানাপ্রকার আর্থিক ও দৈহিক সাহায্য সকলকে সুখী করার চেষ্টা করা নাগরিকের পারিবারিক কর্তব্য। ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে, দয়াদাক্ষিণ্যের অভ্যাসের সূত্রপাত নিজের বাড়িতেই হয় (Charity begins at home)। সেইরূপ রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের সূত্রপাত নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্যেই দেখা যায়।

সুখী ও উন্নত পারিবারিক জীবন গড়িয়া তোলা

যে-ব্যক্তি নিজের পরিবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, সে কখনই তাহার রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারিবে না। পারিবারিক কল্যাণের উপরেই রাষ্ট্রের কল্যাণ নির্ভর করে। সমাজের সমগ্র পরিবারের মধ্যে যদি অশান্তি থাকে, তবে রাষ্ট্রে শান্তি আসিতে পারে না। স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তিশ্রদ্ধা, সহানুভূতি প্রভৃতি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশ ও প্রয়োগ পরিবারের সম্পর্কেই গড়িয়া উঠে। পরিবারের সহিত প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ থাকাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিই রাষ্ট্রের ঐক্য ও সহযোগিতার মূল ভিত্তি। এইজন্য পারিবারিক কর্তব্যকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই কর্তব্যবোধ যাহার নাই সে নাগরিক হইবার অনুপযুক্ত। পারিবারিক কর্তব্য নাগরিক কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

(3) **সমাজের প্রতি কর্তব্য** (Duty towards the community): মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে দলবদ্ধ হইয়া বাস করাই মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। কিন্তু, সমাজে বাস করিতে হইলে প্রত্যেক নাগরিকের সমাজের প্রতি কয়েকটি কর্তব্য আছে। সমাজের উন্নতিতেই নাগরিকের উন্নতি সম্ভব। সমাজের উন্নতির জন্য প্রত্যেক নাগরিক তাহার সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করিবে। অর্থের দ্বারা, শ্রমের দ্বারা, বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা সমাজের সেবা করা প্রত্যেক নাগরিকের সুমহান্ কর্তব্য। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও সমাজের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আজকাল আমাদের দেশে সরকার সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, কুটির-শিল্পের উন্নয়ন

গৃহপালিত পশুর সেবাকেন্দ্র, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বনজঙ্গল পরিষ্কার ও জলনিকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু জনহিতকর কার্যে জনসাধারণের সহযোগিতার আবশ্যক। এই সকল সমাজোন্নয়নের কার্যে সরকারকে সাহায্য করাও প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সকলের মধ্যে নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি আনয়ন করাও নাগরিকের কর্তব্য। সমাজের কুসংস্কার ও কু-রীতিনীতি দূর করিয়া নানাপ্রকার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করা নাগরিকের কর্তব্য। অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও ঋণভারে জর্জরিত লোকেদের মধ্যে আশার বাণী বহন করিয়া, প্রত্যেক লোককে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়া, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম জাগাইয়া জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

সমগ্র সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন

(4) **বিশ্বমানবের প্রতি কর্তব্য** (Duty towards other Nations): বর্তমান যুগে মানুষকে শুধু নিজের পরিবার, নিজের সমাজ অথবা নিজের রাষ্ট্র লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলে না। বিশ্বমানবের প্রতি তাহার একটা কর্তব্য আছে। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সমগ্র জাতিই এক সূত্রে গ্রথিত। বিজ্ঞানের নানা প্রকার আবিষ্কার আজকাল সময় ও দূরত্ব অত্যন্ত সংক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছে। এখনকার এরোপ্লেন শব্দগতি অপেক্ষাও দ্রুত চলিতে পারে। তিন দিনে আজকাল সমগ্র বিশ্ব একবার পরিক্রমা করা চলে। এমন দিন হয়তো আসিবে যখন একদিনে এরোপ্লেনের সাহায্যে সমগ্র বিশ্ব প্রদক্ষিণ করা সম্ভব হইবে। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে দূরত্বের ব্যবধান ছিল আজকাল আর তাহা নাই। সুদূর আমেরিকাকেও এখন ভারতের নিকট-প্রতিবেশী বলা চলে। জলপথে দ্রুতগামী জাহাজ মহাসাগরের দুর্গম ব্যবধান দূর করিয়াছে। স্থলপথে দ্রুতগামী ট্রেন ও মোটরগাড়ি সকল জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করিতেছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভিশন, বেতারবার্তা প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বের মধ্যে অতি সহজে ও অল্পসময়ে ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক জাতির সুখ-দুঃখ, গৌরব-গ্লানি, সমৃদ্ধি-দুর্গতি প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া অন্যান্য জাতিতেও অনুভূত হইবে। কোন জাতিই আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও কৃষ্টির যোগাযোগ আছে। এজন্যই আজ সুদূর কোরিয়ায় অথবা প্যালেস্টাইনে কোন অশান্তির সৃষ্টি হইলে ভারত, আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া প্রভৃতি সকলের দুশ্চিন্তা আরম্ভ হইবে।

বিশ্বমানবতা-বোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া ও অপরকে উদ্বুদ্ধ করা

এই বিশ্বমানবতার আদর্শের প্রতীক—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংস্থা। ইহাই সকল জাতির মিলনক্ষেত্র। এই স্থানেই সকলের অভাব-অভিযোগ সমবেত চেষ্টায় দূরীকরণের

ব্যবস্থা হয়। সুতরাং বর্তমান কালে প্রত্যেক জাতিরই অপর জাতির উপর কতকগুলি কর্তব্য আছে। বড় রাষ্ট্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবে, অনুন্নত রাষ্ট্রকে উন্নত রাষ্ট্র নানাভাবে উন্নয়নের জন্য সাহায্য করিবে; এক রাষ্ট্রের সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, শিল্পকলা অন্য রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধিশালী করিবে। প্রত্যেক জাতির জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের বহুমুখী দানে বিশ্ববিজ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হইবে ও অপরাপর জাতি তাহার অংশ গ্রহণ করিবে।

সুতরাং, প্রত্যেক নাগরিক নিজের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রাখিয়াও ক্ষমতানুযায়ী বিশ্বমানবের প্রতি তাহার কর্তব্য সম্পন্ন করিবে। সকল জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিবার জন্য প্রত্যেক নাগরিক সচেষ্ট থাকিবে। সকল জাতির মধ্যে সৌহার্দ্র ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রচার করিবার জন্য সকলেরই কর্তব্য হইল কায়মনোবাক্যে রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ অনুসরণ করা। ঘৃণা, দ্বেষ, বর্ণবৈষম্য, ধর্মবৈষম্য, কৃষ্টিবৈষম্য প্রভৃতি বিভেদ ভুলিয়া বিশ্বপ্রেমের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের তাহার শিক্ষাদীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

• **নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক** (The relation between Rights and Duties of Citizens): রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি আছে: "Rights imply Duties." অধিকার বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যের কথা উঠিবে। কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বাস করিতে হইলে মানুষ একে অন্যের উপরে কতকগুলি দাবি করিবে। এই দাবীর এক দিক হইল অধিকার, অপর দিক কর্তব্য। এক ব্যক্তির অধিকার অন্য ব্যক্তির কর্তব্যবোধের উপর নির্ভর করে। নিজের উপার্জিত সম্পত্তির উপরে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে। কিন্তু এই অধিকার নির্ভর করে অন্যান্য নাগরিকের কর্তব্যবোধের উপরে। তাহারা কখনও অন্যের সম্পত্তি জোর করিয়া দখল করিবে না বা সেইরূপ কোন চেষ্টা করিবে না, ইহাও তাহাদের কর্তব্য। কিন্তু অন্যের যদি এই কর্তব্যবোধ না থাকে, অর্থাৎ সে যদি সর্বদাই পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সম্পত্তির উপরে উহার মালিকের অধিকার বজায় থাকিতে পারে না। অধ্যাপক হব্ হাউস (Hobhouse) অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন: "If I have the right to walk along the street without being pushed off the pavement, it is your duty to give me reasonable room."

উভয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

ইহা আইন-সম্মত অধিকারের উদাহরণ। সেইরূপ নৈতিক অধিকার ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। পিতার যেরূপ নৈতিক অধিকার আছে, তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে সন্তান তাঁহাকে ভরণপোষণ করিবে, পিতারও সেইরূপ যথাযথ পোষণ, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দ্বারা সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। রাজনৈতিক অধিকারের ও কর্তব্যেরও একই সম্পর্ক। নাগরিকের উপর রাষ্ট্রের কতকগুলি অধিকার আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকেও কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হয়। নাগরিকের আনুগত্য ও সহযোগিতা রাষ্ট্র দাবি করিতে পারে। অপর পক্ষে রাষ্ট্রও নাগরিকের নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৈষয়িক উন্নতি প্রভৃতির জন্য কর্তব্য পালন করিবে। নাগরিকের অনেক অধিকার আছে। সম্পত্তি ভোগ, স্বাধীন গতিবিধি, স্বাধীন মত প্রকাশ, চুক্তি, সংঘবদ্ধ হওয়া, পরিবার গঠন, ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদির অধিকার আছে।

নৈতিক অধিকার ও নৈতিক কর্তব্য

সেইরূপ নাগরিকেরও কতকগুলি কর্তব্য আছে। সময়মত ধার্য কর দেওয়া, আইন মানিয়া চলা, আনুগত্য স্বীকার, নিষ্ঠার সহিত সরকারী কার্য সম্পন্ন করা ইত্যাদি। নাগরিক যদি আইন মানিয়া না চলে, রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকার না করে, খরচ নির্বাহ করার জন্য কর না দেয়, তবে নাগরিকের অধিকার রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কখনও থাকিতে পারে না।

রাজনৈতিক অধিকার রাজনৈতিক কর্তব্য

সুতরাং সামাজিক কল্যাণের বিষয়ে নাগরিকের চেতনা ও রাজনৈতিক বোধের উপরেই অধিকার নির্ভর করে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য নাগরিক তাহার অধিকার ব্যবহার করিবে না। তাহার অধিকার যেন সামাজিক কল্যাণের বিরুদ্ধে না যায়, তাহাও তাহার লক্ষ্য হইবে। আমার অধিকার আছে যে, আমার বাড়ির সম্মুখে আমার জায়গায় নানা প্রকার আবর্জনা নিক্ষেপ করিব। কিন্তু সেই অধিকার ব্যবহার করিবার ফলে যদি আমার প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্যের হানি হয়, তবে তাহা সমাজকল্যাণ বিরোধী। এইরূপ অধিকার ব্যবহার করার ফলে সমাজের উপর আমার যে একটা কর্তব্য আছে তাহা লঙ্ঘন করা হইল। সুতরাং প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত সেই অধিকারের সাহায্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করিবার দায়িত্ব ও কর্তব্য যুক্ত আছে।

নাগরিক আদর্শ (**The Civic Ideals**)**:** প্রত্যেক সু-নাগরিকেরই কতকগুলি আদর্শ পালন করা কর্তব্য। নাগরিকের আদর্শ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক। স্বদেশপ্রেম প্রত্যেকটি নাগরিকের আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু শুধু নিজের দেশকে বড় করাই প্রকৃত জাতীয়তা নহে। জাতীয়তার অর্থ আন্তর্জাতিক প্রীতি ও স্বার্থ রক্ষা করিয়া নিজের দেশকে ভালবাসা।

নৈতিক দৃষ্টি হইতে নাগরিক আদর্শ হইবে সমাজের প্রতি গভীর ও অকৃত্রিম কর্তব্য-বোধ। সমাজের স্বার্থের নিকট নাগরিকের ব্যক্তিস্বার্থ বলি দিতে হইবে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে নাগরিক আদর্শ হইল জাতির সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিসাধন।

দেশপ্রেম ও বিশ্ব-মানবতা, সাংস্কৃতিক উন্নতি, নৈতিক মানোন্নয়ন

নাগরিকের দৃষ্টি হইবে প্রগতিশীল এবং উদার। অতীতের কুসংস্কার, আচার, বিধি-নিষেধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া সমাজের বৃহত্তর কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করা নাগরিকের আদর্শ হওয়া উচিত। দেশের এবং পৃথিবীর সর্বসাধারণের জীবনে শিক্ষার ও নীতির প্রচার করাও নাগরিকের অন্যতম আদর্শ। সে সমগ্র মানবজাতির কথা চিন্তা করিয়া তদনুযায়ী কাজ করে। সমস্ত পৃথিবীকে অখণ্ড হিসাবে দেখিয়া পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের সুখশান্তি ও সম্পদ্ বৃদ্ধির চেষ্টা করা আদর্শ নাগরিকের কর্তব্য। দেশের সমষ্টিগত কল্যাণ যেমন আদর্শ নাগরিকের লক্ষ্যবস্তু, সেইরূপ পৃথিবীর সকল জাতির কল্যাণও তাহার লক্ষ্যবস্তু হওয়া দরকার। ভ্রান্ত দেশপ্রেমিক মনে করে যে, অন্য দেশের যত ক্ষতিই হউক না কেন, তাহার নিজের দেশের মঙ্গল হইলেই চলিবে। কিন্তু খাঁটি দেশপ্রেমিক মনে ভাবিবে যে, তাহার দেশের মঙ্গল অন্য দেশের মঙ্গলের সহিত জড়িত। নিজের দেশের মঙ্গলের সহিত অন্যান্য দেশের কল্যাণও দেখিতে হইবে। এইরূপ উদার মনোভাবাপন্ন হইলেই সু-নাগরিক হওয়া সম্ভব।

Questions to be discussed

1. Define citizenship and distinguish between citizen, alien, national and subject.
নাগরিকের সংজ্ঞা দাও। নাগরিক, বিদেশী, দেশবাসী এবং প্রজার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

2. Discuss the various modes of acquiring citizenship.
নাগরিকত্ব লাভের বিভিন্ন উপায়গুলি লিখ।

3. Discuss how citizenship is lost.
নাগরিকত্ব হারাইবার কারণ কি ?

4. What are the qualities of good citizenship ? What are its hindrances ?
সু-নাগরিকের গুণাবলী কি কি ? ইহার অন্তরায় কি কি ?

5. Discuss the manner in which Indian citizenship can be acquired.
ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের উপায়সমূহ কি ?

6. Define Rights. What are the various types of rights a citizen enjoys ?
অধিকার কাহাকে বলে ? নাগরিকের বিভিন্ন অধিকারগুলি লিখ।

7. Define duties of a citizen. What are the various duties a citizen is expected to perform ?
নাগরিকের কর্তব্য কাহাকে বলে ? নাগরিকের বিভিন্ন কর্তব্যগুলি কি কি ?

8. Discuss the relation between Rights and Duties.
অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক আলোচনা কর।

9. "Rights imply Duties". Elucidate.
"অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর জড়িত"—ব্যাখ্যা কর।

৫

আইন ও স্বাধীনতা

Law and Liberty

নাগরিকদের অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপিত করে। কোন নাগরিক যাহাতে নিজে অপর কোন নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে, প্রত্যেক নাগরিকই যাহাতে অধিকারগুলি ভোগ করিয়া এবং কর্তব্যগুলি সাধন করিয়া সু-নাগরিক হিসাবে নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এই সকল বিধিনিষেধ সৃষ্টি করে এবং সকলে যাহাতে এইগুলি মানিয়া চলে তাহার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। এই সকল বিধি-নিষেধকে আইন (Law) বলে।

নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা এবং কর্তব্য পালনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য আইন দরকার

যখন সমাজে রাষ্ট্র ছিল না, তখন নাগরিকগণ কোন অধিকার ভোগ করিতেন না। জীবজন্তুর ন্যায় প্রাকৃতিক রাজ্যে তাঁহারা বসবাস করিতেন, কোন বিধিনিষেধ বা আইনকানুন ছিল না। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এই সকল আইনকানুন সৃষ্টি হইয়াছে ; ব্যক্তি যাহাতে অপর কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে, নিজে স্বাধীনভাবে নিজের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী উন্নত হইতে পারে, উহার জন্য এই সকল আইনকানুন দরকার। আইনই স্বাধীনতার রক্ষক, আইন না থাকিলে অপরের হস্তক্ষেপ হইতে ব্যক্তি কোন অধিকার রক্ষা করিতে পারে না, কোন স্বাধীনতাও ভোগ করিতে পারে না।

আইনই স্বাধীনতার রক্ষক

আইন কাহাকে বলে (What is Law) : সমাজের মধ্য হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং মানুষের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করাই উহার প্রধান কাজ। সমাজে বসবাস করিতে হইলে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির সহিত মেলামেশা, দ্রব্য-সামগ্রী ও চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান করিতে হয়। তাহার বহির্জীবন অন্যান্য ব্যক্তিদের বহির্জীবনের সহিত কত বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন রূপে সংযুক্ত। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক অর্থাৎ সমগ্র সমাজ-জীবন যাহাতে শৃংখলার সহিত পরিচালিত হয় সেইজন্য ব্যক্তির কাজকর্মের উপর রাষ্ট্র কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপিত করে। কেহ সেই বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিলে রাষ্ট্র শাস্তি দেয় ; উহার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ব্যক্তির অন্তর্জীবনের চিন্তাভাবনাকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, কারণ, উহা বাহিরে প্রকাশিত হয় না। মনে মনে কাহাকেও খুন করিলে কেহ জানিতে

পারে না, তাহাকে শাস্তি দেওয়াও চলে না। তাই রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিনিষেধগুলিকে আইন বলা যায়। তাহা ছাড়া রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান। উহা নিজে কিরূপে পরিচালিত হইবে, সে-সম্বন্ধে নিয়মকানুন থাকা দরকার। যেমন, একটি খেলাধুলার ক্লাব আছে, উহা একটি প্রতিষ্ঠান। ক্লাবের কাজকর্ম কিরূপে পরিচালিত হইবে সেই সম্পর্কে কতকগুলি নিয়মকানুন আছে। রাষ্ট্রের কাজকর্ম কিরূপে চলিবে সেই সম্বন্ধেও কতকগুলি নিয়মকানুন থাকে; উহাদিগকে আইন বলে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিয়মের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় আইনের পার্থক্য হইল যে, রাষ্ট্রীয় আইন মানিয়া চলা বাধ্যতামূলক, কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মানা ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন। সুতরাং ব্যক্তির বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধগুলি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিশেষ ধরনের নিয়মকানুনগুলিকে আইন বলা হয়।

অস্টিন্ নামে একজন আইনবিদ্ আইন সম্বন্ধে একটি সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সার্বভৌম শক্তি যে-নির্দেশ দেন বা আদেশ জারী করেন, তাহাই আইন। রাষ্ট্রের হাতে যে চরম ক্ষমতা থাকে, তাহাকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলে। এই ক্ষমতা থাকার দরুনই রাষ্ট্রের নির্দেশ কেহ অমান্য করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া চলে। সুতরাং সার্বভৌমের আদেশই হইল দেশের আইন।

অস্টিন: আইন হইল সার্বভৌমের আদেশ

কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, সমাজে প্রচলিত অনেক রীতিনীতি ও প্রথা চালু আছে এবং তাহারাও সাধারণভাবে আইনের মত মর্যাদা লাভ করিতেছে। অথবা অনেক সামাজিক রীতিনীতি রাষ্ট্র তৈয়ারী হইবার আগে হইতেই প্রচলিত আছে এবং রাষ্ট্র কোনদিন নির্দেশ বা আদেশ জারী করিয়া ঐ সকল আইন সৃষ্টি করে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে উহাদের সার্বভৌমের নির্দেশ বলা চলে না। তাই হেন্‌রী মেইন্ প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ অস্টিন্-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞা গ্রহণ করেন না।

হেন্‌রি মেইনের বিরুদ্ধ যুক্তি

আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এই দুই মতকে মিলাইয়া আইনের একটি নূতন সংজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা যাহা কালক্রমে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে উহারাই আইন।

উড্রো উইলসনের সমন্বয়

আইনের উৎস (Sources of Law): আইন শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমরা সমাজ-জীবনে যে-সকল বিধিনিষেধ মানিয়া চলি উহাদিগকে সামাজিক আইন বলা হয়। আমরা প্রতিদিন কতকগুলি নৈতিক রীতিনীতিও মানিয়া চলি। উহারা নৈতিক আইন। কিন্তু পৌরনীতিতে আইন কথাটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়।

নাগরিকদিগের কার্যকলাপ রাষ্ট্র কতকগুলি নিয়মকানুনের দ্বারা পরিচালিত করে। এই নিয়মকানুনগুলি সমাজও স্বীকার করিয়া লয় এবং দেশের শাসন কর্তৃপক্ষ বা সরকারের শাসনবিভাগ তাহার শক্তির দ্বারা বলবৎ করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মগুলিকেই পৌরনীতিতে আইন বলা হয়। কেহ এই আইন অমান্য করিলে তাহাকে বিচার করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়।

আইন কাহাকে বলে

একমাত্র আইন-পরিষদই আইনের স্রষ্টিকর্তা নহে। নানাপ্রকার সামাজিক শক্তি আইন গঠনে সহায়তা করে। নিম্নলিখিত সূত্র হইতে আইনের সৃষ্টি হইয়াছে :

প্রচলিত রীতি-নীতি—প্রত্যেক দেশেই কতকগুলি প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই প্রথা রাষ্ট্র রচনা করে না। ইহারা আপনা হইতেই প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়া উঠে। এই প্রথাগুলি মানুষের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কালক্রমে রাষ্ট্র এই নীতিগুলিকে গ্রাহ্য করে এবং প্রচলিত রাখিতে সহায়তা করে। তখনই এই প্রথা-গুলি আইন বলিয়া গণ্য হয়।

ধর্ম—প্রাচীনকালে ধর্ম ও তাহার অনুশাসন হইতেই অনেক আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্মের নিষেধ মানিয়া চলা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পরে এই ধর্মের নিয়মগুলি রাষ্ট্র সমর্থন করিলে আইন বলিয়া গৃহীত হয়। হিন্দু ও মুসলমানদের উত্তরাধিকার, বিবাহ ও সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে নানা প্রকার আইন হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বিচারকের ব্যাখ্যা—বিচারকেরাই ব্যাখ্যা করিয়া অনেক সময়ে আইনের সৃষ্টি করেন। আইনের অর্থ যদি সুস্পষ্ট না হয়, তবে বিচারকগণ তাহা বিশ্লেষণ করিয়া, আইনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নূতন সিদ্ধান্ত করেন। এই নূতন সিদ্ধান্তগুলি আইন বলিয়া গৃহীত হয় এবং অন্যান্য বিচারকগণ এই সিদ্ধান্তসমূহকে নজীর হিসাবে অনুসরণ করেন।

ন্যায়বোধ—আইনের অসম্পূর্ণতার জন্য অনেক সময়ে বিচারকেরা নিজেদের ন্যায় ও বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিচার কার্য পরিচালনা করেন। অনেক সময়ে দেখা যায়, আইনের বিশেষ কোন ধারা ন্যায়সঙ্গত নহে। তখন বিচারকেরা ন্যায়ের আলোচনা করিয়া আইনের গলদ দূর করেন। এইভাবে ন্যায়ধর্মের অনুসরণ করিয়াও আইনের সৃষ্টি হয়।

আইনজ্ঞ পণ্ডিতদের আলোচনা—আইনের বিখ্যাত পণ্ডিত ও সমালোচকগণ তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া অনেক সময়ে আইনের পরিবর্তনে সহায়তা করেন। এই পণ্ডিতগণের মতামত পরে রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া থাকে। আইনজ্ঞদের বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও টীকা আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝাইয়া দেয়। এইভাবে তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়া নূতন আইনের সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডের কোক্, ব্ল্যাকস্টোন, ভারতের

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, রঘুনন্দন প্রভৃতি টীকাকারগণ তাঁহাদের স্ব স্ব দেশের আইনের অনেক পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন।

আইন পরিষদ—বর্তমান যুগে আইন পরিষদই আইনের প্রধান উৎস। দেশের আইন পরিষদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে জনমত অনুযায়ী আইনের সৃষ্টি করিয়া থাকে। জনসাধারণের ইচ্ছা ও মতামত আইন পরিষদের মাধ্যমে আইনরূপে প্রকাশিত হয়।

আইন এবং নীতি (Law and Morality): আইন এবং নীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মানুষের আচার-ব্যবহার, কার্যকলাপ ও চিন্তা নীতিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়। আইনের উদ্দেশ্যও মানুষের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা। সুতরাং উভয়ের উদ্দেশ্যই প্রায় এক জাতীয়। অধিকাংশ সময়ে নীতি-শাস্ত্রের সূত্র হইতে আইনের সৃষ্টি হয়। যাহা নীতিবিরুদ্ধ, আইন তাহা সমর্থন করে না। অতীত কালের দার্শনিক পণ্ডিতেরা আইন ও নীতিবোধের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। রাষ্ট্র ও সমাজের উদ্দেশ্য সর্বজনীন কল্যাণ। সুতরাং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের আইন মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং আরিস্টটল নৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিতেন না। যেমন, প্লেটো বলিয়াছেন, "The best state is that which is nearest in virtue to the individual." বর্তমান কালেও উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অস্পৃশ্যতা নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং, ভারতের আইনে বর্তমানে অস্পৃশ্যতা বর্জনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখন অস্পৃশ্যতা স্বীকার দণ্ডনীয় হইবে। সুতরাং আইনের প্রধান ভিত্তি নীতিজ্ঞান। আইনের মাধ্যমেই দেশের নৈতিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়। তবে এই নীতিজ্ঞানও পরিবর্তিত হয়। ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা নীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া সাধারণ লোক একসময়ে মনে করিত। কিন্তু আজকাল এই নীতিজ্ঞানের পরিবর্তন হইয়াছে। সকলেই ইহা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে। আইনও তাই এই প্রথার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। তাই অধ্যাপক গেটেলের ভাষায় বলা চলে, "Law marks time to moral progress."

প্রচলিত নীতিজ্ঞানই আইনের ভিত্তি

কিন্তু যদিও আইন ও নীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে এই দুই-এর মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়: "Law is not ethics; and legality or obedience to law is not the same as morality." প্রথমত, মানুষের মনের গোপন চিন্তা ও বাহিরের ব্যবহার—এই উভয়ই নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। কিন্তু আইনের প্রধান আলোচ্য বিষয় মানুষের বাহ্য আচরণ। বাহিরের আচরণে প্রকাশ না পাইলে, একমাত্র মনের ইচ্ছাকেই আইন বিচার করে না। আমি যদি একটা লোকের মৃত্যু কামনা করি, তাহা নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এই মৃত্যু-কামনা বাহিরের কার্য

দ্বারা প্রকাশ না করিলে তাহা আইনবিরুদ্ধ হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, আইনভঙ্গ করিলে রাষ্ট্র অমান্যকারীকে শাস্তি দিয়া থাকে। কিন্তু নৈতিক নিয়মভঙ্গ করিলে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে না। যদি একটি মোটর চালক একটি পথ-চারীকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে মোটরচাপা দেয়, তবে তাহার গুরুতর দণ্ড হইবে। কিন্তু অসাবধানতায় তাহা করিলে শাস্তি লঘু হয়। মিথ্যা কথা বলা ন্যায়বিরুদ্ধ। কিন্তু যে-পর্যন্ত মিথ্যা কথায় কাহারও অনিষ্ট না হয়, সেই পর্যন্ত তাহা আইনবিরুদ্ধ নহে। এমন অনেক কাজ আছে, যাহা আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। যেমন, শহরে রাস্তার বামপার্শ্বে গাড়ি চালাইতে হইবে। তাহা না করিলে আইনবিরুদ্ধ হইবে, কিন্তু ন্যায়জ্ঞানের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। মদ্যপান করা দুর্নীতিমূলক, কিন্তু অনেক দেশেই বে-আইনী নহে। কিন্তু মদ্যপান করিয়া জনসাধারণের শান্তি ভঙ্গ করিলে, তাহা বে-আইনী বলিয়া শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, সকল ব্যক্তির নীতিবোধ একরকমের নয়। কিন্তু দেশের সকলের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ একই রকমের। আইনের চরিত্র সর্বজনীন, ইহা একের সহিত অন্যকে পৃথক্ করে না। কিন্তু নীতিবোধ ব্যক্তিবিশেষে পৃথক্ হয়। এই কারণে নৈতিক আইনকানুন, অস্পষ্ট এবং অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। কিন্তু রাষ্ট্রের আইন সুনির্দিষ্ট, সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য এবং নির্দিষ্ট। চতুর্থত, একই রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন লোকসমষ্টির ক্ষেত্রে নীতিবোধের মানও বিভিন্ন। এই নীতির মান অনেকাংশে সেই লোকসমষ্টির শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। কোন লোক-সমষ্টিতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বা জ্ঞাতির মধ্যে বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু অন্য লোকসমষ্টিতে হয়তো তাহা নীতিবোধের পরিপন্থী নহে। ভারতবর্ষের নাগা উপজাতি, সাঁওতাল বা পার্বত্য উপজাতিতে যেরূপ নীতিবোধ, সমতলভূমির অধিবাসীর নীতিবোধ উহা হইতে বহুলাংশে পৃথক্। তবুও সকলে একই রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু একটি পার্থক্য থাকিতে পারে

স্বাধীনতার অর্থ (The meaning of Liberty): স্বাধীনতার অর্থ নিজের স্বাধীনতা। সাধারণ ভাষায় স্বাধীনতা কথাটির অর্থ নিজের ইচ্ছামত চলিবার ও কাজ করিবার অধিকার। কিন্তু ইহা স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ নহে। যাহা খুশি তাহাই করাকে উচ্ছৃংখলতা বলা হয়। বিনা বাধায় ইচ্ছামত কাজ করিবার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলা চলে না। ইহাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলা চলে। যাহা খুশি তাহাই যদি মানুষ করিতে পারিত, তবে কেহই স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিত না। তাহা হইলে ধনী গরীবের উপর অত্যাচার করিত, শক্তিশালী দুর্বলের উপরে জুলুম করিত; দুষ্টলোক সাধুলোকের উপর স্বেচ্ছাচারিতা করিত। সুতরাং স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ আইনের গণ্ডীর মধ্যে

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথের বাধা অপসারণ

থাকিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিকাশ করিবার অধিকার ও সুযোগ ভোগ করা। দেশের আইন যখন নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, তখনই সে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ লাস্কি বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা বলিতে আমরা এমন একটা পরিবেশের কথা বুঝি, যে পরিবেশে মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ সত্তার উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইবে।

ব্যক্তির বা নাগরিকের স্বাধীনতার চরিত্র ও উৎস সম্পর্কে বহু পণ্ডিত দীর্ঘকাল যাবৎ তর্ক করিতেছেন। একদল পণ্ডিতের মতে সমাজ (বা রাষ্ট্র) সৃষ্টির পূর্বে মানুষের কোন স্বাধীনতা বা অধিকার ছিল না। রাষ্ট্র (বা সমাজ) তাহাদের এই স্বাধীনতা দিয়াছে। তাই রাষ্ট্র (বা সমাজ) ব্যক্তির উপরে তাহার শাসনের জাল বিস্তার করিতে পারে। অপর একদল পণ্ডিতের মতে মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বেই মানুষ অধিকার ও স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাহারা সমাজে প্রবেশ করিয়াছে সকল অধিকার লইয়া। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ (যেমন রুশো) এমনও বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র (বা সমাজ) ব্যক্তির স্বাধীনতা, তাহার প্রকৃতির দেওয়া জন্মগত অধিকারকে নিয়ন্ত্রণের শৃংখল পরাইয়া খর্ব করিয়াছে।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত কি না

স্বাধীনতার শ্রেণী বিভাগ (Classification of Liberty): নানা অর্থে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে স্বাধীনতা কথাটি ব্যবহৃত হয়। পাচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে স্বাধীনতা কথাটি ভাগ করা যায়—

(ক) **প্রাকৃতিক স্বাধীনতা**—যখন পৃথিবীতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই তখন প্রাকৃতিক অবস্থায় লোকেরা যে অবাধ কার্যকলাপের সুযোগ পাইত তাহাকে স্বাভাবিক স্বাধীনতা বলা যায়: সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন আইন ছিল না। সুতরাং, এইরূপ অবস্থায় ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতা থাকা অসম্ভব ছিল। তখন ছিল "জোর যার মুল্লুক তার"; তাহা স্বেচ্ছাচারিতার যুগ। সেই অবস্থায় কেহই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিত না। যাহা খুশি তাহাই করিবার সুযোগ পাওয়াকে স্বাধীনতা বলা চলে না।

(খ) **ব্যক্তিস্বাধীনতা**—সমাজে থাকিয়া, সমাজের আচার-নিয়ম মানিয়া যে স্বাধীনতা লোকে ভোগ করিতে পারে তাহাই ব্যক্তিস্বাধীনতা। বিনা বাধায় সামাজিক অধিকার ভোগ করাকেই ব্যক্তিস্বাধীনতা বলা হয়। অবাধে চলাফেরা করা, বক্তৃতা দেওয়া, সভা করা, লেখা, সমিতি গঠন ইত্যাদির সুযোগ থাকিলে ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে বলা যায়।

(গ) **রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা**—ইহার অর্থ রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার। যেখানে প্রত্যেক সাবালক নাগরিককেই প্রতিনিধি

নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হয়, সেখানেই রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। আইন প্রণয়ন ও শাসননীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলা যায়।

(ঘ) **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা**—বেকার সমস্যার সমাধান এবং অভাব ও অনটন হইতে মুক্তি পাওয়াই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। প্রত্যেক মানুষ তাহার জীবিকা নির্বাচনে স্বাধীনতা ও সুযোগ পাইবে, ইহাও একপ্রকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আটলান্টিক সনদে এই স্বাধীনতার কথার উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা প্রকৃতরূপে পাইতে হইলে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও আবশ্যক।

(ঙ) **জাতীয় স্বাধীনতা**—এই স্বাধীনতার অর্থ অপর কোন রাষ্ট্রের অধীন না থাকিয়া দেশের শাসনকার্য দেশবাসীর উপরেই থাকিবে। ভারতের অধিবাসীরা 1947 সালের আগস্ট মাসে জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পূর্বে আমাদের দেশ ইংরাজের অধীন ছিল। সুতরাং, জাতীয় স্বাধীনতা ছিল না। দীর্ঘকাল ধরিয়া জাতীয় আন্দোলনের ফলে আমরা এই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি।

আইনের সহিত স্বাধীনতার সম্পর্ক (The relation between Law and Liberty): সাধারণ লোকে মনে করে যে, আইন স্বাধীনতার বিরোধী। নানা প্রকার আইনের বন্ধন প্রতিপদে মানুষকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এইজন্য সে তাহার ইচ্ছামত যাহা খুশি তাহা করিতে পারে না। নানা প্রকার নিষেধ দ্বারা আইন মানুষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, সুতরাং তাহারা মনে করে, আইন থাকিলে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো তাঁহার "সামাজিক চুক্তি" নামক বিখ্যাত পুস্তকের প্রথমেই বলিয়াছেন যে, "সর্বত্রই মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহারা স্বাধীন, কিন্তু পরে তাহারা সর্বত্রই শৃংখলাবদ্ধ হইয়া পড়ে" ('All men are born free but everywhere they are found in chains'.)।

আইন বাড়িলে উহা ব্যক্তির কাজকর্মের পরিধি কমাইয়া দেয়

কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে প্রকৃত কোন বিরোধই নাই। নাগরিকের অধিকার দেওয়া ও সেই অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের একটি প্রধান কাজ। ইহার দ্বারা রাষ্ট্র এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যাহাতে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। এই অধিকার রক্ষা করিতেই আইনের প্রয়োজন। আইন না থাকিলে রাষ্ট্র নাগরিকের কোন অধিকারই রক্ষা করিতে পারিত না। স্বাধীনতা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইত। দেবত্ব ও পশুত্ব, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। যখন আইন থাকে না তখন পশুপ্রবৃত্তি জাগিয়া ওঠে ও অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতি, রক্তপাত ও বিশৃংখলায়

কিন্তু আইনই স্বাধীনতা রক্ষার শর্ত

সমাজ অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। মানুষের এই পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করিবার জন্য আইনের আবশ্যক। সকলের মঙ্গলের জন্য, সর্বাধিক স্বাধীনতা ভোগের জন্য আইনের দরকার। পৃথিবীর সকলেই যদি মহাত্মাজীর মত মহাপুরুষ হইত বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় পরমপুরুষ হইত, তবে হয়তো কোন আইনের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পৃথিবীতে দুষ্টলোকের অভাব নাই। সুযোগ পাইলেই তাহাদের কু-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে। তাহা হইলে সকলের স্বাধীনতা খর্ব হইবে। এই কু-প্রবৃত্তিকে দমন রাখিবার জন্যই আইনের আবশ্যক। সুতরাং, আইনের দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা হ্রাস পায় না। বরং আইনের দ্বারা স্বাধীনতার সৃষ্টি হয় এবং রক্ষা পায়। একটি উদাহরণ দিলে কথাটা বুঝা যাইবে। যদি একদিনের জন্য কলিকাতা মহানগরীতে সকলপ্রকার আইন তুলিয়া দেওয়া হয় তবে কি অবস্থা হইবে তাহা কল্পনা করা যায় না। অল্প সময়ের মধ্যেই অরাজকতার সৃষ্টি হইবে। লুটতরাজ, রাহাজানি, খুন, ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবে সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া যাইবে ও কাহারও কোন প্রকার স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে না। যাহাতে কোন ব্যক্তির লোভে অথবা স্বার্থে, সমষ্টির অধিকার ও স্বার্থ বিপন্ন না হয় সে জন্যই আইনের আবশ্যক। আইনের কার্য হইল সকলের কল্যাণের জন্য ব্যক্তির অধিকার ও আচরণ সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া। স্বাধীনতা কিছুটা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়াতেই স্বাধীনতা রক্ষা পায়। সুতরাং আইন ব্যতীত প্রকৃত স্বাধীনতা বাঁচিতে পারে না। ইংরাজীতে তাই বলা হয়, "Law is the condition of Liberty"

স্বাধীনতা রক্ষার উপায় (Safeguards of Liberty) : (স্বাধীনতা ব্যক্তির অমূল্য সম্পদ্। তাহার স্বাধীনতাই তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকল দেশেই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।) অনেক দেশে শাসনতন্ত্রে নানা মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা আছে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে অনেকগুলি মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই অধিকারগুলির কোনটিতে যদি শাসন-কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করে, তবে নাগরিকগণ তাহা রক্ষা করিবার জন্য উচ্চ বিচারালয়ে আবেদন করিতে পারে এবং উচ্চ আদালত সেই অধিকার রক্ষা করিবে। সুতরাং উচ্চ আদালত ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষা-কবচ হিসাবে কাজ করে। একনায়কমূলক শাসনতন্ত্রে সাধারণত ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না। একনায়ক মতামত প্রকাশ করার সুযোগ জনসাধারণকে দিতে পারেন না। নাৎসী যুগে জার্মানীতে কোন ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকে বলিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করিবার সুযোগ-সুবিধা সকলেরই থাকে।

মৌলিক অধিকারসমূহ

ইংলণ্ডে আইনের শাসন (Rule of Law) প্রচলিত আছে। তাহা দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা হয়। এই আইনের শাসন অনুযায়ী ধনী দরিদ্র, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল

লোকই আইনের দৃষ্টিতে সমান। সকল লোকই সমান অধিকার ভোগ করিবে। দ্বিতীয়ত, বিনা বিচারে ইংলণ্ডে কাহাকেও কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচারের জন্য আদালতে হাজির করিতে হইবে।

আইনের শাসন

ক্ষমতা বিভাগ করিয়া অনেকের মতে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা হয়। আইন প্রণয়ন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন পরিচালনা বিভাগ পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা-বিভাজন সম্ভব নহে। গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার বিশেষ কোন বিভাগ নাই, কিন্তু সেই দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা কোন অংশে অন্য দেশের তুলনায় কম নহে।

ক্ষমতা-বিভাজন

প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নাগরিকের স্বাধীনতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। বিচারকগণ যে-পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ও নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে পারিবেন সেই পর্যন্ত নাগরিকেরা কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার হাত হইতে রক্ষা পাইবে। বিচারক যদি নির্ভীক হন ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হন, তবেই তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবেন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

সর্বোপরি, স্বাধীনতা রক্ষার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হইল স্বাধীনতার স্পৃহা। যে জাতি নিজের অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকে, নিজের চোখের মণির মত তাহার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করে, সেই জাতির লোকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয় না। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকেরা নিজেদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ সহ্য করিতে পারে না। এই স্বাধীনতার আকাংক্ষাই ব্যক্তিস্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষা-কবচ।

স্বাধীনতার স্পৃহা

Questions to be discussed

1. Define Law and discuss the different sources of Law.
আইনের সংজ্ঞা দাও। আইনের বিভিন্ন উৎসগুলি কি ?
2. Discuss the relation between Law and Morality.
আইন ও নীতির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।
3. What is Liberty ? Discuss the different kinds of Liberty.
স্বাধীনতা কাহাকে বলে ? বিভিন্নরূপ স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা কর।
4. Discuss the relationship between Law and Liberty.
আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।
5. 'Law is the condition of Liberty'—Elucidate.
'আইন স্বাধীনতাকে রক্ষা করে'—ব্যাখ্যা কর।
6. What are the different safeguards of Liberty in a modern state ? Are those present. in India ?
বর্তমান রাষ্ট্রে স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ কি কি ? ভারতে এইগুলি কি বর্তমান ?

৬

সরকার

Government

সরকার কাহাকে বলে এবং উহার শ্রেণীবিভাগ কিরূপ (Meaning of the term Government and its classification) : সরকার শব্দটি সাধারণ ভাষায় নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকেও সরকার বলা হয়। কিন্তু পৌরনীতিতে সরকার শব্দটির অর্থ রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র। রাষ্ট্র হইল মানসিক ধারণা, আমরা উহাকে অনেকটা কল্পনা করিয়া লই। বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্দেশ বা আদেশ জানিতে পারা যায় সরকারের মাধ্যমে। সমাজে বহুপ্রকার প্রতিষ্ঠান আছে। রাষ্ট্র উহার মধ্যে একটি। এই রাষ্ট্র তাহার সভ্যদের উপর নিজের ইচ্ছা খাটায়। রাষ্ট্রের ইচ্ছা নাগরিকেরা কি করিয়া জানিতে পারে ? রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ পায় আইনের মধ্য দিয়া। আইনগুলি রাষ্ট্রের আদেশ বা নির্দেশ। আইনের পিছনে কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিয়াই আমরা রাষ্ট্রের ইচ্ছা বুঝিতে পারি। কেহ যদি আইন ভঙ্গ করে, তবে তাহার অর্থ হইল সে রাষ্ট্রের আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করিতেছে, রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতেছে না। সরকারই আইন করে, কেহ আইন ভঙ্গ করিলে, তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। সরকার হইল বাস্তব ধারণা। আইনসভা, মন্ত্রিসভা, রাজা বা রাষ্ট্রপতি, সৈন্য, পুলিশ, বিচারসভা এই সকল মিলিয়াই সরকার। ইহার কাজ হইল রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজকর্ম করা। ইহাকে **তাই** রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বলা হয়।

সমাজের যেমন পরিবর্তন ঘটে সেইরূপ যুগে যুগে রাষ্ট্র ও সরকারেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যেমন—সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে 'দাস-রাষ্ট্র', 'সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র' ও 'ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র' প্রভৃতি দেখা গিয়াছে ; বর্তমানে যেমন পৃথিবীর অনেক দেশে 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' স্থাপিত হইয়াছে।

এই পৃথক্ পৃথক্ ধরনের রাষ্ট্রের মধ্যে বহু বিভিন্ন রকম সরকার দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশের সরকারের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা সমপ্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশের সরকারেরই আইন করার, শাসন করার ও বিচার করার বিভিন্ন বিভাগ থাকে। সকল সরকারই বিভিন্নরূপ কাজকর্ম করার জন্য আইন করে, শাসন করে, বিচার করে, এই সকল বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে এবং উহাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের কাঠামোতে পার্থক্য আছে। তাই ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Government) : গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল 2000 বৎসর পূর্বে তাঁহার সুবিখ্যাত 'পলিটিকস্' নামক বইতে সরকারকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ

শ্রেণীবিভাগ করার সময়ে তিনি দুইটি মান ধরিয়া লইয়াছেন—সংখ্যা ও উদ্দেশ্য। সরকারের চরম ক্ষমতা কয়জন লোকের হাতে আছে ও কি উদ্দেশ্যে সেই ক্ষমতার ব্যবহার হইতেছে, এই দুইটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। সংখ্যার দিক হইতে তাঁহার বিচার্য বিষয় ছিল, কতজন লোক রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা বা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছেন। উদ্দেশ্যের দিক হইতে তাহার বিচার্য বিষয় ছিল, কাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সেই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইতেছে। যাঁহার হাতেই এই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকুক না কেন, তিনি যদি দেশের সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে থাকেন তবে উহা সেই সরকারের স্বাভাবিক রূপ (natural form)। আর যদি সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহৃত হইতে থাকে, তবে উহা সেই সরকারের বিকৃত রূপ (perverted form)। তিনি বলেন যে, দেশের ক্ষমতা একজনের হাতে থাকিলে তাহাকে রাজতন্ত্র (monarchy) বলা হয়। কিন্তু তিনি যদি নিজের স্বার্থ অনুযায়ী স্বেচ্ছাচারীর মত শাসন করেন তবে তাহাকে স্বৈরাচারতন্ত্র (tyranny) বলে। যদি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকে তবে তাহাকে বলা হইবে অভিজাততন্ত্র (aristocracy)। কিন্তু এই অভিজাততন্ত্র স্বার্থপরের নীতি গ্রহণ করিলে তাহাকে বলে ধনিকতন্ত্র (oligarchy)। যদি বহুসংখ্যক ব্যক্তি শাসনের অধিকারী হয় এবং সকলের স্বার্থে দেশ শাসন করে তবে তিনি তাহাকে পলিটি (polity) বা সু-গণতন্ত্র বলিয়াছেন। কিন্তু বিশৃঙ্খল জনতা যদি সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন না মানিয়া স্বেচ্ছাচারিতা (mob rule) চালাইতে থাকে তবে তাহাকে জনতাতন্ত্র বা কু-গণতন্ত্র আখ্যা দিয়াছেন।

অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ: (১) ক্ষমতা কয়জনের হাতে, (২) শাসন ভাল কি খারাপ

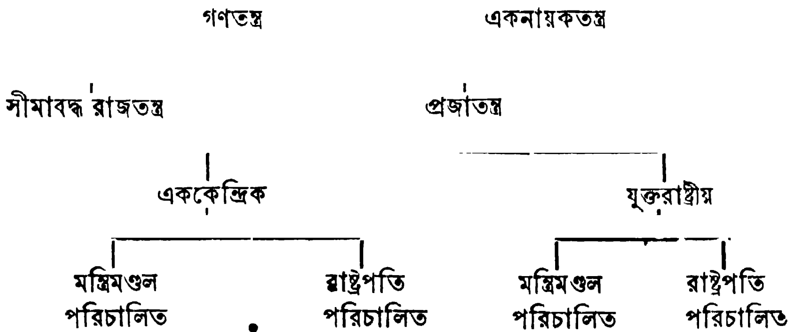
অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগটি নিম্নে দেওয়া হইল:

কাহার হাতে ক্ষমতা	স্বাভাবিক রূপ (সকলের হিতের জন্য)	বিকৃত রূপ (শাসকের স্বার্থের জন্য)
একজন	রাজতন্ত্র	স্বৈরাচারতন্ত্র
কয়েকজন	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুজন	পলিটি বা সু-গণতন্ত্র	জনতাতন্ত্র

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ (Modern classification): অ্যারিস্টটলের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সমগ্র মধ্যযুগে (mediaeval age) প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক কালের পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করেন। এই কারণে উহাকে বর্জন করা হইয়াছে। আধুনিককালে নিছক কাঠামো দেখিয়া কোন সরকারের রূপ বোঝা যায় না। যেমন, ইংলণ্ডে শাসন-বিভাগের শীর্ষে একজন রাজা বা রাণী থাকেন। তাই বলিয়া ইংলণ্ডকে পুরা রাজতন্ত্র বলা যায় না। অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ হইল কেবলমাত্র একটি সংখ্যাগত বিভাগ (quantitative); কোন সরকারের গুণগত রূপ বা ধরন (qualitative) ইহা হইতে প্রকাশিত হয় না। অ্যারিস্টটল যাহাকে 'পলিটি' বলিয়াছেন, উহাকে আজকাল গণতন্ত্র বা (Democracy) বলা হয়। তাঁহার জনতাতন্ত্র (Mob rule) হইল আধুনিক গণতন্ত্রের বিকৃত রূপ।

উপরের শ্রেণীবিভাগের ত্রুটিসমূহ

আধুনিক পণ্ডিতেরা (বিশেষত, Marriott ও Leacock) তাই ভিন্ন পদ্ধতিতে সরকারগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে দেওয়া হইল:



আধুনিক যুগের শাসনতন্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র। যে-শাসনব্যবস্থায় চরম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকে তাহাকে গণতন্ত্র বলা হয়। দেশের সমস্ত ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছাই গ্রহণযোগ্য হইবে এবং জনমত অনুযায়ী দেশের শাসন-কার্য পরিচালিত হইবে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, একটি দল শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করে এবং সেই দলের দলপতি সর্বাধিনায়ক হইয়া বসে।*

* দেশের শাসন-ব্যবস্থা যখন কয়েকজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলে। বর্তমান যুগে অভিজাততন্ত্রের স্থান নাই। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসে অনেক অভিজাততন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গ্রীকেরা প্রাচীনকালে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থাকেই সর্বাপেক্ষা ভাল মনে করিত।

গণতন্ত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করা চলে। সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র। যে শাসন-ব্যবস্থায় দেশের শাসন-ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে এক ব্যক্তি পাইয়া থাকে, সেই ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। রাজতন্ত্র দুই প্রকার হইতে পারে, যথা—অবাধ রাজতন্ত্র (absolute monarchy) ও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (limited monarchy)। আজকাল অবাধ রাজতন্ত্র পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। বর্তমানে গণ-জাগরণের দিনে একমাত্র রাজার ইচ্ছায় শাসনকার্য পরিচালিত হয়, এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা লোকেরা কল্পনা করিতে পারে না। সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রে সর্বোপরি শাসনকার্যে একজন রাজা থাকেন বটে, কিন্তু কার্যত তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। তিনি নিজে নামেই রাজা, কিন্তু তাঁহার নাম লইয়া মন্ত্রীরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই প্রকার রাজতন্ত্রে রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন মন্ত্রিমণ্ডলী। ইংলণ্ডের বর্তমান রাণী এলিজাবেথও এই শ্রেণীর রাজ্ঞী।

দুই রকমের গণতন্ত্র

যখন দেশের শাসনযন্ত্রের শীর্ষে কোন রাজা থাকে না, জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি থাকে, তখন সেইরূপ সরকারকে প্রজাতন্ত্র (republic) বলা হয়। প্রজাতান্ত্রিক সরকার, আবার, দুই ধরনের হইতে পারে ; এককেন্দ্রিক (unitary) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal)। যখন সমগ্র দেশে একটিমাত্র সরকার থাকে, এবং সেই কেন্দ্রীয় সরকারই দেশের সমগ্র অঞ্চলের জন্য সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভাবে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিয়া থাকে তখন উহাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। যখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক্ পৃথক্ আঞ্চলিক সরকার এবং সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার—উভয়ই চলিতে থাকে, তখন উহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। আঞ্চলিক সরকারগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে কোন কোন বিষয়ে আইন করে ও উহাদের প্রয়োগ করে ; কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দেশের সকল অঞ্চলের জন্য কোন বিষয়ে আইন করিয়া দেশের সর্বত্র উহাদের প্রয়োগ করিয়া থাকে। সরকার এককেন্দ্রিক হউক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় হউক—উহাদের আরও দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যদি দেশের শাসন-বিভাগের সকল ক্ষমতা একটি মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে থাকে তবে তাহাকে মন্ত্রিমণ্ডলী-পরিচালিত সরকার বলা হয়। অপরপক্ষে যদি শাসন-বিভাগের সকল ক্ষমতা একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে তবে তাহাকে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার বলে।

অনেক রকমের প্রজাতন্ত্র

আমরা এখন সরকারের এই সকল বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতির দোষগুণ বিচার করিয়া উহার পরে একনায়কতন্ত্র ও উহার দোষগুণ বিশ্লেষণ করিব। তাহার পরে এককেন্দ্রিক ও

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, এবং মন্ত্রিমণ্ডলী-পরিচালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার আলোচিত হইবে। কোন সরকারের গুণ বা দোষ আলোচনার সময়ে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের গুণ বা দোষ পরিমাপ করিতে হইলে সমান ধরনের কয়েকটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড চাই। সরকার ভাল কি মন্দ তাহা বিচারের জন্য দুইটি মাপকাঠি সর্বদা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, সেই ধরনের সরকার দেশের শাসনকার্য কিরূপ যোগ্যতার সহিত চালাইতে পারে, অর্থাৎ শাসন-ব্যবস্থা দক্ষ হয় কি না। দ্বিতীয়ত, এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হয় কি না।

সরকার ভাল কি মন্দ বিচারের দুইটি মাপকাঠি

রাজতন্ত্র (Monarchy): অনেক দেশে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ক্ষমতা বা সার্বভৌম শক্তি একজন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে। তিনি নিজেকে রাজা বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার নাম রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রে সাধারণত উত্তরাধিকারসূত্রে শাসনক্ষমতা লাভ হয়। প্রাচীন কালে ভারতে কোন কোন অঞ্চলে বা রোমে প্রজাসাধারণ কর্তৃক রাজা নির্বাচন প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজতন্ত্র দুই শ্রেণীর: (১) স্বেচ্ছাচারী বা অবাধ রাজতন্ত্র (absolute monarchy), এবং (২) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (constitutional monarchy)।

সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

পৃথিবীতে দুই-একটি দেশ ছাড়া আজকাল আর অবাধ রাজতন্ত্র দেখা যায় না। ফ্রান্সের বুর্বোঁ বংশ, রাশিয়ার রুমানফ্, অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বুর্গ, জার্মানীর হোহেন-জোলর্ন ও তুর্কির সুলতান আজ ইতিহাসের পাতা হইতে লুপ্ত। যে ফরাসী দেশের চতুর্দশ লুই একদিন দম্ভ করিয়া বলিয়াছেন, "আমিই রাষ্ট্র", সেই দেশে এখন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

অবাধ রাজতন্ত্রের যুগ শেষ হইয়াছে

শাসনকার্য চালাইবার দক্ষতার দিক হইতে বিচার করিলে অবাধ রাজতন্ত্রের কতকগুলি গুণের দিক অস্বীকার করা যায় না। ইহার গুণ হইল শক্তিমত্তা, উদ্যম, তৎপরতা, মন্ত্রগুপ্তি, সত্বর মীমাংসা এবং সাংগঠনিক সরলতা। একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন স্বেচ্ছাচারী রাজা প্রজার বহু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন। প্রাচীন কালে অবাধ রাজতন্ত্রের যুগে বহু মহানুভব রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, যেমন—অশোক, আকবর, শার্লামেন প্রভৃতি। এই কারণেই রামরাজ্যের আদর্শ এখনও ম্লান হয় নাই। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা যদি নিজের স্বার্থের জন্য রাজ্যশাসন করেন তাহা হইলে সাধারণের মঙ্গল সুদূর-পরাহত। বর্তমান যুগে রাজতন্ত্র মোটেই লোকপ্রিয় নয়। ইহার কারণ হইল: (ক) সাম্যের ধারণা

অবাধ রাজতন্ত্রের গুণ ও দোষ

আজ সুপ্রতিষ্ঠিত; (খ) ইহাতে সাধারণ নাগরিকদের কর্মোদ্যম নষ্ট হয়; এবং (গ) ব্যক্তি এমন অধিকার লাভ করিতে পারে না যাহাতে মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম বিকাশ হইতে পারে।

যখন রাজা নিজে শাসন-কার্য পরিচালনা করেন না, দেশের সংবিধানের শীর্ষে থাকিয়া শোভা পাইতে থাকেন (reigns but does not govern), তখন উহাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলে। প্রজারা যাহা ইচ্ছা করে রাজা তাহা সম্পাদন করেন মাত্র। এই প্রথায় যোগ্যতা-সম্পন্ন রাজার জনহিতকর কার্য করার সুযোগও যেমন কম, অপরদিকে অযোগ্য রাজা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর কাজ করার সুযোগও পান না। প্রজা বিদ্রোহের দ্বারা বা রাজার স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র উদ্ভব হয়। ইংলণ্ডের রাজা নিয়মতান্ত্রিক শাসক, তিনি রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কাহাকে বলে

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কিছু কিছু গুণ আছে। দেশের প্রধান কর্মকর্তা সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হইলে দেশে নির্বাচনের সময়ে অসম্ভব রকমের উত্তেজনা, রেষারেষি ও কলহের সূত্রপাত হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে রাজমুকুট পাইলে রাজকার্য পরিচালনার ধারায় অবিচ্ছিন্ন সংযোগ থাকে। রাজাও দলাদলির ঊর্ধ্বে থাকিতে পারেন। তবে এই প্রথার দোষও কম নয়। উত্তরাধিকারসূত্রে একের পর এক যোগ্য রাজা জন্মায় না। তাহা ছাড়া, নিয়মতান্ত্রিক হইলেও রাজার জন্য ব্যয় কম হয় না, দেশের সাধারণ নাগরিকেরা আজকাল তাহাদের সাম্যবোধ হইতে রাজার অস্তিত্ব অপছন্দ করিতেছেন।

ইহার গুণ ও দোষ

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy): যখন কয়েকজন ব্যক্তি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করিবার সুযোগ পান তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলে। উচ্চবংশসম্ভূত, অর্থশালী, জ্ঞানী, রাজনৈতিক প্রতিভা-সম্পন্ন ও সামরিক বিদ্যাবুদ্ধিবিশারদ্—যে কোন বিষয়ের ভিত্তিতে এই অভিজাতশ্রেণী গড়িয়া উঠে।*

অভিজাততন্ত্র কাহাকে বলে

প্রকৃত অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। সর্বযুগে ও সকল দেশে অবস্থার বিশেষ প্রয়োজনে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মনে প্রথমে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়া উঠে। ফলে তাঁহাদের শাসন বা অভিজাততন্ত্র গড়িয়া উঠে। পরে এই চেতনা সমগ্র জনসাধারণের মনে পরিব্যাপ্ত হয়, ইহা তখন গণতন্ত্রে পরিণত হয়। তবে সাধারণত দেশের যোগ্য শ্রেণীর হাতে শাসনক্ষমতা থাকে না, অর্থশালী এবং

* Aristos অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট এবং Kratas অর্থাৎ ক্ষমতাসম্পন্ন—এই দুইটি গ্রীক শব্দ হইতে Aristocracy শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

ধনীবংশোদ্ভব ব্যক্তিদের লইয়া শাসকশ্রেণী গঠিত হয়। ইহার মূলসূত্র হইল কতক-গুলি লোক অন্যান্য লোক অপেক্ষা শাসনকার্যে বেশি দক্ষ। আধুনিককালের গণতন্ত্রী মন (democratic mind) এইরূপ কোন বিশেষ শ্রেণীর হাতে শাসনভার ছাড়িয়া দিতে চাহে না।

উহার দোষ-গুণ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কাহাকে বলে (What is Democratic Government): আমরা কোন শব্দ ব্যবহার করি মনের বিশেষ কোন ভাব প্রকাশের জন্য। কিন্তু 'গণতন্ত্র' শব্দটি আজকাল বহু বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। আমেরিকা ও ব্রিটেন নিজেদের প্রধান গণতান্ত্রিক দেশ বলিয়া মনে করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ। ইন্দোনেশিয়ায় সোয়েকার্ণো 'পরিচালিত গণতন্ত্রের' (guided democracy) কথা বলিতেন। পাকিস্তানের আয়ুব নিজের দেশে 'মৌলিক গণতন্ত্র' (basic democracy) গড়িয়া তোলার কথা প্রচার করিতেন। ভারতও নিজেকে 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র' (socialist democracy) বলিয়া মনে করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বহু বিভিন্ন প্রকৃতির সরকার গণতন্ত্র নামে পরিচিত হইতে চাহিতেছে। গণতান্ত্রিক সরকার কাহাকে বলে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গত শতাব্দীর এক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের একটি সুন্দর সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে গণতন্ত্র হইল জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য পরিচালিত সরকার (Government of the people, by the people and for the people)। প্রথমত, জনগণের সরকার বলিলে বোঝা যায় যে, সেই দেশের সরকারের কাজকর্ম, চিন্তাধারা সকল কিছুই দেশের জনসাধারণের প্রথা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, চিন্তা ও সংস্কৃতির অনুরূপ হইবে। সরকার যেন জনজীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য কোন ভাবে চিন্তা না করেন, জনসাধারণ যেন সেই সরকারকে সর্বদা নিজেদের বলিয়া মনে করিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত সরকার হইবে। অর্থাৎ যাহারা শাসন করেন তাঁহারা জনসাধারণের দ্বারাই নির্বাচিত হইবেন, এবং যতদিন জনসাধারণ তাঁহাদের শাসনের কাজে রাখিতে চাহে ততদিন শাসনকার্য চালাইবেন। ইচ্ছা করিলে জনসাধারণ তাঁহাদের খুশিমত নূতন শাসক নির্বাচিত করিতে পারিবেন। জনগণের প্রতিনিধিদল আইনসভা গঠন করিবেন এবং সেই আইনসভা জনগণের হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। নিজের বিচার-বুদ্ধি, স্বাভাবিক সরল বিবেচনাশক্তি দ্বারা সরকারের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সমাজের সকল ব্যক্তি সাহায্য করিবেন, উহার সহিত নিজের চিন্তা, ধারণা ও আদর্শকে সংযুক্ত করিবেন। তৃতীয়ত, জনসাধারণের জন্য সরকার বলিলে বোঝা যায় যে, জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা,

গণতান্ত্রিক সরকার কাহাকে বলে

সমাজের সকল ব্যক্তির উন্নতি ও কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা করা গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ। কোন দল, উপদল বা শ্রেণীর নহে, দেশের আপামর সকলের স্বার্থরক্ষার জন্য এই সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবে। দেশের সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ করা যে সরকারের লক্ষ্য ও কাজ তাহাকেই গণতন্ত্র বলে।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মূল কথা প্রতিনিধি নির্বাচন, মত নির্বাচন, দল নির্বাচন, সকল বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা। কে শাসন করিবে, কোন্ নীতিতে শাসন চলিবে, এই সকল বিষয়ে ব্যক্তির মনে মুক্ত চিন্তা থাকা দরকার। বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন চিন্তা থাকিতে পারে, এই স্বীকৃতি সকলের মনে থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন ভাবাদর্শের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোকে সুদৃঢ় করিয়া তোলে। মত-পার্থক্যের স্বাধীনতা এবং অধিকার আমার আছে,—ইহাই গণতান্ত্রিক নীতি। সমাজের মধ্যে নানারূপ ভাবাদর্শ থাকিলে প্রতিটি দল এক একটি ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক হইয়া পড়ে। গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতে তাই বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দলের অবস্থান অপরিহার্য। সমাজের মধ্য হইতে বিভিন্ন চিন্তা ও আদর্শ সংগ্রহ করিয়া, উহাদের বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া সতর্কতার সহিত যাচাই করিয়া সরকারী নীতিতে রূপান্তরিত করিতে হয়। সেই নীতি অনুযায়ী আইন তৈয়ারী করিয়া রাষ্ট্রের পরিচালনা-কার্য চলিতে থাকে। এই দলগুলির মধ্য দিয়া বিভিন্ন ভাবাদর্শ 'flow from their social reservoir into the system of the democratic state and turn the wheels of the political machinery in that system." বিভিন্ন দল হইল সেতু, সেই সেতু পার হইয়া নানারূপ সামাজিক চিন্তা আইনের রূপে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামো এইরূপ নানা ভাবাদর্শের সুস্থ প্রতিযোগিতা ও রূপান্তরের উপযোগী পরিবেশ গড়িয়া তোলে।

গণতান্ত্রিক আদর্শ (Democratic Ideal): গণতন্ত্র বলিলে নিছক সরকারের একটি কাঠামো বা রূপ বুঝা যায় না—ইহার অর্থের আরও গভীরতর ও বিস্তৃততর এক ব্যঞ্জনা আছে। বিস্তৃততর অর্থে ইহা সমাজ সংগঠনের আদর্শ রূপ। ইহা সভ্য মানুষের নিয়মবোধ, শৃংখলাবোধ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত এক আদর্শ সমাজব্যবস্থা। সকল মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ ও সম্পদ্ এই আদর্শের ভিত্তি, সাধারণ মানুষের কল্যাণময় সমাজবোধের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক সরকারের আদর্শ হইল যে, রাষ্ট্র সমাজের সেবা করিবে, উহাকে গ্রাস করিবে না। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করিয়া তাহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশই হইবে ইহার লক্ষ্য। ব্যক্তি নিজের কল্যাণের পথ নিজেই স্থির করিবে। ভয়, কাপুরুষতা, বীরপূজা ও স্বার্থান্ধতার পরিবর্তে ন্যায়নিষ্ঠা

গণতান্ত্রিক আদর্শ কাহাকে বলে

ও সহজ বিচারবোধের সাহায্যে সাধারণ নাগরিক নিজেরা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করিবে। সাধারণ মানুষ নিজেরা শাসন করিবে, আর নিজেরাই শাসিত হইবে।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্সের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস (Pericles) উদাত্তকণ্ঠে এই মহান্ আদর্শের জয়গান করিয়াছিলেন: "আমাদের শাসনতন্ত্রের নাম গণতন্ত্র, কারণ, ইহা অনেকের দ্বারা পরিচালিত, কয়েকজনের দ্বারা নয়। কিন্তু আমাদের আইন সকলের জন্য সমান ন্যায় বিচার রক্ষা করে, আমাদের জনমত প্রত্যেকটি কীর্তির মহত্ত্বকে সম্মান দেয়, কোন শ্রেণীগত কারণে নয়, কেবলমাত্র উৎকর্ষের জন্য। আমাদের গণজীবনে আমরা যেমন প্রত্যেককে ইচ্ছামত নিজশক্তি প্রকাশের সুযোগ দিই, ঠিক সেইরূপ আমাদের দৈনন্দিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই ভাবাদর্শ আমাদের পরিচালনা করে···ব্যক্তিগত চলাফেরায় আমরা খোলাখুলি ও বন্ধুত্বপূর্ণ, সরকারী কাজকর্মেও আমরা নিখুঁতভাবে আইনের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলি। শ্রদ্ধা যে-সংযম আনে আমরা তাহা মানিয়া লই; পদে যে-ই অবস্থিত থাকুক না কেন, কর্তৃত্ব ও আইনের প্রতি আমরা অনুগত···আমরা সৌন্দর্যের প্রেমিক, কিন্তু আতিশয্যের নয়; জ্ঞানের প্রেমিক, কিন্তু অমানুষিকতার নয়। আমাদের নাগরিকগণ ব্যক্তিগত ও সরকারী কাজকর্ম উভয় ক্ষেত্রেই সমান উৎসাহী, নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে নিমগ্ন থাকিয়া তাহারা রাষ্ট্রের সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইতে বিরত থাকে না। অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে আমরা পৃথক্, সেখানে রাষ্ট্র সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিকে তাহারা 'শান্ত' বলে, আমরা এই ব্যক্তিকে 'অকেজো' বলিয়া মনে করি। সকল সরকারী নীতি সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত লই অথবা বিতর্ক করি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া, কারণ, আমরা মনে করি কথা বলা এবং কাজ করায় কোন বিরোধ নাই; বরং আলাপ-আলোচনা না করিয়া যে কাজ করা হয় তাহা বিফল হইতে বাধ্য।"

গণতন্ত্রের প্রধান কথা ব্যক্তি এবং ব্যক্তির আত্মনির্ভর স্বাধীনতা। ব্যক্তির স্বাধীনতার দুইটি শর্ত। প্রথমত, সে একজন পূর্ণ ব্যক্তি, তাহার জীবনের কল্পনা সম্পূর্ণভাবে তাহার নিজের বিচার ও বিবেচনার বিষয়। কাণ্টের ভাষায় বলা চলে, "ব্যক্তি কখনও কাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার নয়।" প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহার লক্ষ্য একান্তভাবে তাহারই নিজস্ব। দ্বিতীয়ত, এই পরিপূর্ণ লক্ষ্যশীল ব্যক্তির পূর্ণ পরিণতি নির্ভর করে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশের উপর। গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামো সেই স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশ রচনা করে। যে-সমাজের অধিকাংশ বংশমর্যাদা বা অর্থ-কৌলীন্যকে সম্মান দিতে অভ্যস্ত, সেই সমাজে কেবলমাত্র ভোটের অধিকার বা আইনের চক্ষে সমতা প্রকৃত গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে না। সি. ডি. বার্ন্স্ (C. D. Burns) তাই লিখিয়াছেন, "Democracy as an ideal is, therefore, a

society not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole."

গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Democracy) : গণতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিত। তখনকার দিনে এক একটি ক্ষুদ্র শহর লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইত। জনসংখ্যাও ছিল কম। এই জনসংখ্যার মধ্যে যাহারা স্বাধীন নাগরিক ছিল, তাহারা সকলে প্রকাশ্য জায়গায় সভায় মিলিত হইয়া ভোট দিয়া আইন প্রণয়ন করিত। এইভাবে প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিত। ইহাকেই বলা যায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (direct democracy)।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র

কিন্তু আজকাল আর সে দিন নাই। এখনকার রাষ্ট্রগুলি আয়তনে অনেক বড়। লোকসংখ্যাও অনেক বেশি। রাষ্ট্রের সমস্যাও আজকাল খুবই জটিল। লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে একটি সভায় মিলিত হইয়া, ভোট দিয়া আইন প্রণয়ন করা অসম্ভব। সুতরাং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দিন আর নাই। এইজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রের (indirect democracy) আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাকে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থাও (representative government) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ নিজেরা শাসনকার্য পরিচালনা করে না; তাহারা কয়েক বৎসরের জন্য তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরা আইনসভায় মিলিত হইয়া আইন প্রণয়ন করে এবং কর্মকর্তাদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। জনসাধারণ এইভাবে নিজেদের প্রতিনিধিবৃন্দের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দেশ শাসন করে। এইরূপ শাসনব্যবস্থার উপকারিতা হইল যে আইন প্রণয়ন ও শাসন-কার্যে অশিক্ষিত জনতা হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সাধারণ লোকদের শাসন-কার্যের এত খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ কম, যোগ্যতাও কম। তাই স্বল্পসংখ্যক প্রতিনিধির মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা তুলনা-মূলকভাবে ভাল ব্যবস্থা।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের উপকারিতা

যাহাতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কিছুটা সুযোগ-সুবিধা পাইয়া আজকালকার বড় বড় রাষ্ট্রের নাগরিকেরাও প্রকৃত গণতন্ত্রের আস্বাদ পাইতে পারেন সেই জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। যেমত—প্রথমত অনেক সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ আইন সম্পর্কে কেবল প্রতিনিধিদের মতামত লইয়াই আইন পাশ করা হয় না, দেশের অধিকাংশ লোকের মতামত জানিবার জন্য গণভোট (referendum) গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। বিলের পক্ষে বেশির ভাগ লোকের ভোট পাইলে তবে উহা আইনে পরিণত

পরোক্ষ গণতন্ত্রকে যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষ করার উপায়

হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভোটদাতাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অংশ যদি মনে করে কোন বিষয়ে একটি আইন হওয়া দরকার, তবে তাহারা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া কোন বিলের খসড়া আইনসভায় উপস্থিত করিতে পারে। ইহাকে বলে গণ-উদ্যোগ (initiative)। তৃতীয়ত, যদি কোন প্রতিনিধি তাঁহার ভোটদাতাদের মতের বিরুদ্ধে আইনসভায় ক্রমাগত ভোট দেন বা মতামত প্রকাশ করেন তবে কিছুসংখ্যক ভোটদাতা তাঁহাকে প্রতিনিধিত্বের আসন হইতে অপসারণের দাবী (recall) জানাইতে পারেন। পৃথিবীর দুই একটি দেশে ইহার দুই একটি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় না।

গণতন্ত্রের দোষ ও গুণ বিচার (Merits and Demerits of Democracy) : প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের যুগ হইতে সুরু করিয়া বহুবিধ কারণে গণতন্ত্রের উপর চরম আক্রমণ হইয়াছে। গণতন্ত্র সকলকেই সমান চক্ষে দেখিবার ফলে ব্যক্তির যোগ্যতা উপযুক্ত সমাদর লাভ করে না। ইহা সংখ্যাধিক্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। গুণের উপর জোর দেয় না। ফলে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠের শাসন নয় ; গড়ের শাসন (rule of the average)। গড় নাগরিকেরা সর্বদাই প্রাচীনের প্রতি আকৃষ্ট, নব নব চিন্তা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা গ্রহণে তাহারা অক্ষম। তাই অভ্যাস ও চিরাচরিত রীতিনীতির দাস, রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরোধী গড় নরনারীর ভাবাদর্শ এই শাসন-কাঠামোর ভিত্তি। এই কারণেই অ্যারিস্টটলের মতে জনতারাজ বা জনতাতন্ত্র অতি নিকৃষ্ট ধরনের সরকার। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ দেশের বেশির ভাগ লোকই অশিক্ষিত ও অক্ষম। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এই অক্ষম ও অশিক্ষিতরাই শাসনকার্য চালায়। এই জন্যই রাষ্ট্র-শাসন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। কার্লাইল উপহাস করিয়া ইহাকে 'নির্বোধের রাজত্ব' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কিন্তু উহার অনেক ত্রুটি আছে

তৃতীয়ত, গণতন্ত্র যদিও নামে জনসাধারণের শাসন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শাসনকার্য কয়েকটি চতুর ও ক্ষমতাপ্রিয় লোকের হাতেই থাকে। তাহারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই রাজনৈতিক দলগুলিকে করায়ত্ত করিয়া দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে। রাজনৈতিক দলগুলির সংগঠন "iron law of oligarchy" মানিয়া রচিত। সাধারণ কোন সভ্যের কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা নাই। সাধারণ নাগরিকের সারাজীবনের রাজনৈতিক তৎপরতা হইল অতি-আবেগ ভরে কোন-না-কোন নেতাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা। কয়েকজন নেতার সিদ্ধান্ত সকলে মানিতে বাধ্য হয়, নেতার জয়গানে সকলে মুখর হয়। এই অবস্থায় গণতন্ত্র উপহাসের মত শোনায়। চতুর্থত, মার্ক্সবাদীরা মনে করেন যে সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের ফলে সর্বজনীন গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করিতে পারে না। যে শ্রেণী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় আগ্রহান্বিত তাহারা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিয়া বেতার, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র প্রভৃতি

নানারূপ উপায়ে জনসাধারণকে ভুল চিন্তা ও তথ্য পরিবেশন করিয়া নির্বাচনে জয়লাভ করে। পঞ্চমত, একজন বা কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে না বলিয়া জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি দ্রুত লওয়া যায় না। আলাপ-আলোচনায় কাল অপহরণ হয়। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গণতন্ত্র সাহায্য করিতে পারে না। বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী ও উপদলের (pressure groups) চাপে সঠিক নীতি গ্রহণ করা যায় না। প্রধানমন্ত্রি বাল্ডউইনের ভাষায় বলা চলে, "Democracy is always two years behind than Dictatorship." (ষষ্ঠত, অধ্যাপক ব্রাইস্ (Bryce) বলেন যে, আধুনিক গণতন্ত্রের রূপ বিকৃত। কারণ, অর্থের লোভে ভোটদাতা, আইন-সভার প্রতিনিধি এবং সরকারী কর্মচারীরা সহজে ধনিকদের শিকারে পরিণত হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র বা সরকার আর নিরপেক্ষ থাকে না। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বিতরণে রাষ্ট্রের কাজকর্ম তাই গণতন্ত্রকে বিকৃত করিয়া তোলে।) সপ্তমত, অনেকের মতে, গণতন্ত্র একেবারেই অবৈজ্ঞানিক ও গোঁড়ামির উপর প্রতিষ্ঠিত। মনস্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব উভয়দিক হইতেই গণতন্ত্র ভুল। মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে দেখা যায় যে জনতার যূথ-মনোবৃত্তি (mass-psychology) কখনই সুচিন্তিত কোন বৈজ্ঞানিক মনের প্রকাশ নয়।* যূথবদ্ধ মানুষ চিন্তার ধার ধারে না, সে চমক ও শ্লোগানে বিশ্বাসী। জীবতত্ত্বের দিক হইতে বলা হয় যে, মানুষে-মানুষে চিন্তাশক্তিতে পার্থক্য থাকিবেই। এই পার্থক্য বংশ ও জন্ম দ্বারা স্থিরীকৃত, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। ম্যাকডুগালের (McDougall) ভাষায় বলা চলে যে, "Capacity for intellectual growth is inborn that is hereditary, and also that it is correlated with social status." সর্বোপরি, আঞ্চলিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি পাঠান একেবারেই অবৈজ্ঞানিক, কারণ, সেই অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধি অগণিত ভোটদাতার বহুপ্রকার ঝোঁক ও আবেগের রক্ষাকর্তা হইতে পারে না। তাই অধ্যাপক কোলের (Cole) মতে সফল গণতন্ত্রের ভিত্তি হওয়া উচিত সমাজের বিভিন্ন জীবিকা অনুযায়ী নির্বাচন ব্যবস্থা (Functional representation)।

উপরের যুক্তিসমূহ কেন গ্রহণযোগ্য নয়

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যত সমালোচনা করা হইয়াছে উহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি। কিন্তু যতই শিক্ষার প্রসার হইবে এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাইবে, ততই নাগরিকের উপর যূথ বা গণমনস্তত্ত্বের প্রভাব কমিতে থাকিবে। জীবতাত্ত্বিক যুক্তিটিও খুব দুর্বল। মানুষের জন্মগত গুণাবলী এবং পরিবেশজাত প্রভাব এমনভাবে মিশ্রিত আছে যে ইহাদের পৃথক্ করা চলে না। তৃতীয়ত, মার্ক্সবাদী যুক্তিও বর্তমানে কিছুটা দুর্বল

*"Politics is only in a slight degree the product of conscious reason ; it is largely a matter of sub-conscious processes of habit and instinct, suggestion and imitation.
—Graham Wallas.

হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল কোন দলের মধ্যে বা সরকারের মধ্যে বিশেষ কোন শ্রেণীর নিরঙ্কুশ প্রভাব আর পূর্বভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। সরকারের নীতি-নির্ধারণ বা আইন প্রণয়নের সময়ে ধনিকশ্রেণী, মজুরশ্রেণী এবং আমলাতন্ত্র (bureaucracy) —এই তিন দিক হইতে চাপ আসিতে থাকে। সরকারের আইনকানুন এইরূপ নানাপ্রকার টানাপোড়েনের ফল (a parallelogram of forces)। সুতরাং গণতন্ত্রকে আজকাল আর ধনিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বলা চলে না।

গণতন্ত্রের গুণ বা যুক্তিসমূহ

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলির ত্রুটি তো আছেই, ইহার প্রত্যক্ষ গুণও কম নাই। প্রথমত, ইহা একমাত্র শাসনব্যবস্থা যাহা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে-প্রধান যুক্তি ইহার ভিত্তি তাহা হইল কোন মানুষ নির্ভুল নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন-না-কোন বিষয়ে কখনও-না-কখনও ভুল করিতে পারে। এই কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আলোচনা ও সমালোচনার পদ্ধতিতে কাজ চালায়। সকল ব্যক্তিকে সে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে ডাকে। ইহার মূল কথা 'কেহ নিজেই নিজের সঠিক বিচারক হইতে পারে না।'* গণতন্ত্রে এইরূপ আলাপ-আলোচনা শক্তির অপব্যবহার বা ভুল প্রয়োগ দূর করে। অনেকের বিচার-ক্ষমতা একত্রে হইয়া সামাজিক চিন্তার মান উন্নত করিয়া তোলে।

দ্বিতীয়ত, ম্যাকাইভার বলেন যে গণতন্ত্র ভাল, কারণ, ইহা শক্তির মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। গণতান্ত্রিক সংবিধানে রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হইতে পারে না, শাসকশ্রেণী শক্তিমদমত্ত হইয়া উঠিতে পারে না। ইহার কারণ, বিভিন্ন রকম আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি বজায় থাকে বলিয়া একে অপরের শক্তিবৃদ্ধিকে বাধা দেয় (interlocking system operating through multiple checks)। তৃতীয়ত, গণতন্ত্র দক্ষ এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠন করে। স্বল্পকাল পরে নির্বাচনে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে, এই চিন্তায় সরকার দক্ষ ও দায়িত্বশীল হয়। চতুর্থত, জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্রকে অভিনন্দিত করিয়াছেন, কারণ, এই ব্যবস্থায় যে-কোন ব্যক্তি নিজের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করার অধিকার পায়।

সর্বোপরি, গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা, কারণ, ইহা মানুষের চরিত্রকে মহৎ করিয়া তোলে। চরিত্রগঠনের প্রধান পরিবেশ গণতান্ত্রিক শাসন ও সমাজব্যবস্থা। ব্যক্তির মনুষ্যত্ব সম্মানিত হয় তাহার ভোটের অধিকারে। সে এক নূতন কর্তব্যবোধে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া তাহার সমগ্র চরিত্র বিকশিত হয়, তাহার

*"the rational attitude is bound up with the idea that everybody is liable to make mistakes which may be found out by himself with the assistance of the criticism of others. It therefore suggests the idea that nobody should be his own judge."

মনে দায়িত্বশীলতা ও আত্মসম্মানবোধ সঞ্চারিত হয়। গণতন্ত্র "elicits and enlists for its operation the minds and wills of its members and thus aids the development of their capacities as persons." আরও অনেক নাগরিকের সহিত একযোগে কাজ করিতে গিয়া ব্যক্তি তাহার স্বার্থ-বুদ্ধির গণ্ডী ভাঙিয়া বাহির হইতে পারে, তাহার মনের দিগন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপে চরিত্রগঠনে সহায়তা করিয়া গণতন্ত্র মানুষের পূর্ণবিকাশ ঘটায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যে চরিত্রগঠন করে তাহার ফল হইল ব্যক্তির মনে গণতান্ত্রিক আদর্শের উদ্বোধন। প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের অমরবাণী এই গণতান্ত্রিক মনের সুন্দরতম প্রকাশ, "আমি কাহারও দাস হইতে চাহি না, তাই আমি কাহারও প্রভুও হইব না।"

গণতন্ত্র সফল হওয়ার শর্তসমূহ (Conditions for the success of Democracy): গণতান্ত্রিক সরকারের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাকে সফল করিয়া তুলিতে পারিলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আদর্শ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাই, কি অবস্থায় গণতন্ত্র সফল হইতে পারে তাহা আলোচনা করা দরকার। ইংরাজ পণ্ডিত জেমস্ স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, তিনটি অবস্থা বজায় থাকিলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে। ইহারা গণতন্ত্রের সাফল্যলাভের প্রয়োজনীয় তিনটি শর্ত। প্রথমত, সেই দেশের অধিবাসীদের গণতান্ত্রিক সরকার গ্রহণ করার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োজন; সকল জাতির মনে এইরূপ ইচ্ছা দেখা যায় না। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করা দরকার, উহা আমাদের প্রয়োজন, এইরূপ বোধ তাহাদের মনে জাগরিত থাকিবে। এইরূপ সরকার গ্রহণ করার মত মানসিক ক্ষমতাও তাঁহাদের থাকা দরকার। গণতন্ত্রে সকল ব্যক্তির মূল্য সমান। অন্যের উপর নিজের মতামত জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা বর্জন করিতে হইবে, অপর কেহ তাহার মত চাপাইয়া কোন নাগরিকের নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিকে দাবাইয়া রাখিলে চলিবে না। এইরূপ মানসিক উন্নত স্তরে যে জনসমষ্টি উঠিতে পারে নাই, সেখানে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইলে বা গণতান্ত্রিক সরকার আক্রান্ত হইলে উহার রক্ষার জন্য সেই দেশের অধিবাসীরা ইচ্ছুক থাকিবে। ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং সকল প্রকার অধিকার নিশ্চয় রক্ষা করিতে হইবে; সেইজন্য কেবল সদিচ্ছা পোষণ করিলেই চলিবে না, প্রত্যেক নাগরিককে প্রয়োজনমত সচেষ্ট হইয়া উঠিতে হইবে। 'যাহা ইচ্ছা ঘটুক, আমার তাহাতে কিছু যায় আসে না'—এইরূপ মনে হইলে চলিবে না। গণতন্ত্র তাহাতে রক্ষা পাইতে পারে না। দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মনে অবহেলা, ঔদাসীন্য, সংগ্রাম-বিমুখতা থাকিলে

1. গণতন্ত্র গ্রহণ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা

2. উহা রক্ষার জন্য ইচ্ছা ও ক্ষমতা

অসংখ্যক কুচক্রী লোক নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারে। তাই জনচিত্তের বৃহত্তর অংশে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও সরকার রক্ষা করার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা নিশ্চয় থাকা দরকার। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রকে সচল রাখিতে হইলে যে কাজকর্মগুলি প্রত্যেকটি নাগরিকের করা দরকার সেই কাজে তাহাদের বিমুখ হইলে চলিবে না। গণতন্ত্রকে কার্যকরী রাখার জন্য যে সকল কাজ করা দরকার, সেইগুলি করিতে অলস হইলে চলে না। যেমন, সর্বোত্তম ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো দরকার, ভোট দেওয়ার সময়ে এই কথা সকলের মনে রাখা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের কর ফাঁকি দেওয়া উচিত নয়, ভোট বিক্রয় করা উচিত নয়। নাগরিকদের মনে এইরূপ মনোভাব গড়িয়া উঠিলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে।)

3. কাজগুলি নিয়মিত করার ইচ্ছা

এই সকল শর্ত ছাড়াও মিল কতকগুলি দুর্বলতা ও বিপদের (infirmities and dangers) কথা উল্লেখ করিয়াছেন যেগুলি দূর না হইলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। যেমন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের মতামত বা প্রয়োজনের কথা মনে না করিয়া দেশ শাসন করে তবে উহা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হওয়ার বিপদ আছে। তাই গণতান্ত্রিক সরকারে সংখ্যালঘিষ্ঠের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। আবার, যদি গণতান্ত্রিক কোন দেশ অপর কোন দেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে, তবে মাতৃভূমির গণতান্ত্রিক আদর্শ ধুলিসাৎ হইয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না।

দুর্বলতা ও বিপদ

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সুস্থ, সবল, সততাপূর্ণ ও উন্নত 'জনমত' (public opinion) থাকা দরকার। এই জনমত গঠন করিতে হইলে উচ্চ রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। অ্যারিস্টটল এইজন্যই বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত করিয়া তোলা রাষ্ট্রের কর্তব্য। এই শিক্ষার অভাবে গণতন্ত্রের প্রতি নাগরিকদের অকুণ্ঠ নিষ্ঠা স্থায়ী হইতে পারে না। নিষ্ঠার অভাব ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক।

জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থা

গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের অর্থনৈতিক ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করা দরকার। বুভুক্ষু নাগরিকের নিকট স্বাধীনতা মূল্যহীন। কেবল সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইলেই গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। দেশে অর্থনৈতিক অসাম্য থাকিলে অধিবাসীদের মধ্যে শ্রেণীবিবাদ ও শ্রেণীসংঘর্ষ সৃষ্টি হইতে থাকে। সমাজে কলকারখানা ও জমির মালিক মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাও তাহাদের হাতেই থাকে। এইরূপ দেশ নিজেই নিজের মধ্যে বিভক্ত থাকে। তাই অনেক পণ্ডিত

সমাজতান্ত্রিক দেশেই প্রকৃত গণতন্ত্র থাকিতে পারে কেন ?

বলিয়া থাকেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা দূর করিয়া দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলা দরকার। উহা না হইলে প্রকৃত গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) : একনায়কতন্ত্রের উদাহরণ প্রাচীনকালেও দেখা গিয়াছে। আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি ব্যক্তি বিখ্যাত এক-নায়ক ছিলেন। আধুনিক কালে জার্মানীতে হিটলার ও ইতালীতে মুসোলিনী একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। স্পেনের নেতা সেনাপতি ফ্রাঙ্কো বর্তমান যুগে একনায়কতন্ত্রের নিদর্শন। একনায়কতন্ত্রের মূলনীতি হইল,—এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক নায়ক। একনায়কতন্ত্রে সকলেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য থাকে। এই শাসনতন্ত্রে বিরোধী দলের স্থান নাই; মুসোলিনীর ভাষায় বলিতে গেলে "Everything for the State, nothing outside the State." রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক দেশের সকল বিষয়ব্যবস্থা ও শাসন-কার্যের পরিচায়ক। তিনি আইন প্রণয়নকারী এবং বিচার ও আইন প্রয়োগের ক্ষমতার সর্বোচ্চ আধার। গণতন্ত্রের আদর্শ হইল যে, রাষ্ট্রই চরম কাম্য নহে, মানব-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র একটি উপায় মাত্র, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়। একনায়কতন্ত্র বলে যে, ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের অধীন হইতে হইবে। দলের নেতাকে মানিতে হইবে ও দলের মতামত বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা লোকের থাকিবে না।

ব্যক্তির ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রের একটি পৃথক সত্তা আছে, তাহার বেদীমূলে ব্যক্তির বলিদান

একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক চিন্তার প্রকাশ হয় না। সকল নাগরিককে এক ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ার করার চেষ্টা চলিতে থাকে। সর্বোপরি, একনায়কতন্ত্র ক্রমাগত প্রচার চালাইয়া লোকের মনে এক ধরনের কল্পনার জগৎ তৈয়ার করিয়া তোলে, ইহাদের myth বলে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, প্রচার-প্রতিষ্ঠান এবং সৈন্য ও গুপ্তচরবাহিনী করায়ত্ত করিয়া অবিরাম প্রচার ও ভয়ের মাধ্যমে দেশের মধ্যে একনায়ক সম্পর্কে এইরূপ নির্বোধ আকর্ষণ গড়িয়া তোলা হয়। ক্রমে ক্রমে লোকের মনে অন্ধভাবে ভক্তি ও অনুসরণের অভ্যাস গড়িয়া তোলা হয়। মুসোলিনী নিজেই বলিতেছেন "We have created our myth. The myth is a faith, it is a passion. Our myth is the nation . . ." এইরূপে একনায়কতন্ত্র যুক্তি, বিচারশক্তি ও মানবিকতার পরিবর্তে অন্ধ আনুগত্য, জাতি বা বর্ণবিদ্বেষ এবং সামরিক শক্তির দম্ভের উপর দাঁড়াইয়া থাকে।

পৃথিবীতে দুই প্রকার একনায়কত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমী দেশগুলিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় রাখিয়া শ্রমিক ও কৃষককে শোষণের ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া দলপতি একনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে। জার্মানীর

একনায়কতন্ত্রের নাম ছিল নাৎসীবাদ (Nazism) ; ইতালীতে ইহার নাম ছিল ফ্যাসিবাদ (Fascism)। বর্তমানে স্পেনে, পাকিস্তানে এইরূপ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তাহা ইহাদের তুলনায় অনেক পৃথক্। উহার নাম সর্বহারার একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat)। শ্রমিক ও কৃষকেরা নিজেরা দলগঠন করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া একদলীয় শাসন প্রবর্তন করে। যতদিন পর্যন্ত শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে দেশের অধিবাসীরা উন্নত হইয়া না উঠে, ততদিন এই একদলীয় শাসন চলিতে থাকে। এই দুইপ্রকার একনায়কতন্ত্রে পার্থক্য আছে। প্রথম ধরনের একনায়কত্ব মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে, সাম্রাজ্যবাদী ও উগ্র সামরিক মত (Imperialistic or Militarist Doctrine) প্রচার করে। দ্বিতীয় প্রকার একনায়কতন্ত্র মূলত একদলীয় শাসন; ইহা অধিকাংশ জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে, দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করে।

দুই ধরনের একনায়কত্ব

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর অনেক দেশে গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্র দেখা দিয়াছিল, তাহার কারণ আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের হাতে এত বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল যে গণতান্ত্রিক সরকার ও ব্যক্তির অধিকার অনেকাংশে কমিয়া আসিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, রণক্লান্ত বুভুক্ষু জনতা দেখিল যে, যুদ্ধের মধ্যে দেশের একদল লোক আরও ধনী হইয়া উঠিল অথচ দরিদ্র জনসাধারণ দরিদ্রতর হইল। কি ভাবে সমাজতন্ত্র গঠন করা যায় সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই তাহারা যে-কোনরূপ পরিবর্তনের সমর্থক হইয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয়ত, জনসাধারণ ভাবিয়াছিল যে, দেশের আইনসভাগুলি হইল বাগাড়ম্বরের স্থান, ইহাতে অর্থের অপচয় হয়, সময় নষ্ট হয়, কর্মকুশলতা পঙ্গু হয়। অথচ একনায়কত্বে অল্প সময়ে অধিক মঙ্গল সাধিত হয়। চতুর্থত, প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে যে-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল তাহাতে পরাজিত রাষ্ট্রগুলিকে অত্যন্ত অবমাননাকর শর্তে রাজি হইতে হইয়াছিল। ফলে জনমত ছিল খুবই বিক্ষুব্ধ। জাতির ত্রাণকর্তা একনায়ক এইরূপ ক্ষুব্ধ জনমতকে নিজের ক্ষমতা বিস্তারের কাজে ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। পঞ্চমত, অনেক দেশে শ্রমিক ও কৃষকেরা ভোটের জোরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে পারে এই আশঙ্কায় ধনিকেরা গণতান্ত্রিক প্রথা বিসর্জন দিয়া নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তি একনায়কের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে গণতন্ত্রের বিপদের কারণ

একনায়কত্বের উৎপত্তির কতকগুলি পরোক্ষ (indirect) কারণও আছে। (i) বেতার, বিমান, টেলিফোন, রেলগাড়ী, সংবাদপত্র প্রভৃতির ফলে শাসনব্যবস্থা

কেন্দ্রীভূত (centralised) হইয়া উঠিতেছে (ii) সাধারণ মানুষ আজ আর নিজের মনের অভিভাবক নয়। বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যুবমনকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে না শিখাইয়া সে 'কি চিন্তা করিবে' তাহা শিখানো হইতেছে। আধুনিক শিল্পপ্রধান যুগে মানুষের জীবন অনেকখানি যান্ত্রিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে, আত্মিক জীবন নষ্ট হইয়া মানুষ প্রাণহীন যন্ত্রজীবে পরিণত হইতেছে। সর্বদা রুটির চিন্তায় আচ্ছন্ন মানুষ তাই অতিমানুষের চমকপ্রদ কথার অনুসরণে আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছে।

পরোক্ষ কারণসমূহ

একনায়কতন্ত্রের প্রধান গুণ—সময় সংক্ষেপ। গণতান্ত্রিক শাসনে কোন কাজ করিতে গেলে বহু সময় ও আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে সরকারী কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়। সর্বাধিনায়ককে কাহারও সহিত কোন বিষয় আলোচনা করিতে হয় না। তিনি যে কোন বিষয়ে নিজে নিজে অল্পসময়েই যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। বিশেষত, এই শাসন-ব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে দলগত বিরোধের স্থান নাই। বার্নার্ড শ' তাই বলিয়াছেন "জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র অভাবনীয় অসম্ভবতা"। সাধারণ নাগরিক "শ্লোগানে" বিশ্বাসী, তাই সে অধিনায়ক-ভক্ত। একনায়কতন্ত্রের অধীনে অতি অল্পকালের মধ্যেই কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষায় রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নতি সম্ভব। একনায়কতন্ত্রের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন দেশ এত দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু নানা কারণে একনায়কতন্ত্র বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে না, সাধারণত এইরূপ সরকার পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা দেশের সাধারণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। জনমত প্রকাশ করিবার পথগুলি রুদ্ধ হইয়া যায়। সর্বাধিনায়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টায় বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করে ও যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তোলে। এইজন্যই পৃথিবীতে এই শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হয় নাই।

গণতন্ত্র বনাম একনায়কত্ব (Democracy Vs. Dictatorship): গণতন্ত্রের অনেকগুলি দুর্বলতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা (i) অসাধারণ-রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না, (ii) দলগত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করে, (iii) অধিকাংশ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া অনেক সময় ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, (iv) আইনসভায় কেবল কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা ঘটে; দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ বা কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা সম্ভব হয় না, (v) উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন আইনবেত্তার অভাব অনুভূত হইয়া থাকে, (vi) বিভিন্ন দল পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে, ফলে জাতীয়

গণতন্ত্রের দুর্বলতা

ঐক্য নষ্ট হয়; সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়। এই সকল কারণেই একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই সকল দোষ সংশোধনযোগ্য। গণতান্ত্রিক আদর্শ বা সরকার অপেক্ষা উন্নততর আদর্শ বা সরকার এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। যদি দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য দূর করা হয় অর্থাৎ সমাজতন্ত্র গড়িয়া তোলা হয় তবে জাতির মধ্যে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী শ্রেণী লোপ পাইবে, গণতন্ত্র সফল হইয়া উঠিবে। সাময়িক কারণে বা কিছুকালের জন্য একনায়কতন্ত্র সমর্থনযোগ্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু চিরকালের জন্য গণতন্ত্র সর্বোত্তম ব্যবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কারণ, ইহাতে ব্যক্তির অধিকতর মর্যাদা দেওয়া হয়। একনায়কতন্ত্রের নাগরিকদের উপর যে-বাধ্যতামূলক আদেশ-নির্দেশ থাকে গণতন্ত্রে ব্যক্তির উপর সেই নিপীড়ন নাই। বর্তমানে তথাকথিত পশ্চিমী দেশগুলিতে যে-গণতন্ত্র দেখা যায় তাহাতে অবশ্যই ধনীশ্রেণীর একাধিপত্য বজায় থাকে। ইহাও এক ধরনের শ্রেণীগত একাধিপত্য। কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শ এখনও সর্বদেশে সর্বকালের সর্বাপেক্ষা উন্নত আদর্শ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু আদর্শ হিসাবে ইহা সর্বোত্তম

● এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (Unitary and Federal Government): গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—এককেন্দ্রীয় বা এককেন্দ্রিক শাসন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন। যখন দেশের শাসন-ক্ষমতা একটি সরকারের হাতে থাকে, তখন তাহাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। ইহাতে শাসন-ক্ষমতা দেশের একটি সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারী ক্ষমতাসমূহ বিভক্ত হইয়া একাধিক সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশে একটি সরকারই প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং তাহাই সমগ্র দেশের শাসন পরিচালনা করে। দেশটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত থাকিতে পারে এবং তাহাদের আঞ্চলিক শাসনপরিষদ থাকিতে পারে। কিন্তু এই আঞ্চলিক বা অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ মূল সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তাহার নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় শাসন পরিচালনা করে। এই সকল আঞ্চলিক শাসন-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন স্বাধীন ক্ষমতা থাকে না। মূল সরকার আপনার ক্ষমতার কিছু অংশ ইহাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। অধ্যাপক ডাইসীর মতে, "The essence of a Unitary state is that the power of central government is unrestricted, for the constitution does not admit any other lawmaking body than the

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য

central one." ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা আছে। কিন্তু আজকাল পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর সরকার থাকে, যথা—কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার। এই ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা একটি মূল সরকারে কেন্দ্রীভূত না থাকিয়া একটি কেন্দ্রীয় ও কতকগুলি আঞ্চলিক সরকারে বিভক্ত থাকে। সুতরাং রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতাও কার্যক্ষেত্রে দুইভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যে সকল বিষয় সমগ্র দেশে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে; আর যে-সব বিষয় প্রধানত আঞ্চলিক স্বার্থের সহিত জড়িত, তাহা থাকে আঞ্চলিক সরকারগুলির হাতে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে গঠিত।

যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা (definition) আলোচনা করিলে এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি (characteristics) বোঝা যাইবে। মন্টেস্কু তাঁহার 'স্পিরিট অব্ ল' (Spirit of law) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র হইল "a convention by which similar States agree to become members of a larger one." অর্থাৎ এক রকমের কয়েকটি রাষ্ট্র যখন মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন করে তখন তাহাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। কিন্তু, কথা হইল, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মিলিত হয় কেন? তাহার কারণ, পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যসরকার তাহাদের স্বতন্ত্রতা ও অধিকার রক্ষা করিতে চায়, আবার একই সঙ্গে একটি বৃহৎ-রাষ্ট্র গঠন করিয়া জাতীয়তার অনুভূতি আস্বাদন করিতে চায়। অধ্যাপক ডাইসীর ভাষায় বলা চলে, "A Federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity with the maintenance of State rights."

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য: ইহা গঠিত হয় কেন

আবার অনেক অধ্যাপক বলেন যে, কেবলমাত্র জাতীয়তার আস্বাদন-ই এই ঐক্যের কারণ নয়। যেমন, অধ্যাপক হুইয়ার (Wheare) বলেন যে, আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষার স্পৃহা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি কারণ ছোট ছোট জনগোষ্ঠীকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে ঠেলিয়া দেয়। অধ্যাপক হুইয়ারের মতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার ক্ষমতা বণ্টন রীতি। তিনি লিখিয়াছেন, 'By the Federal principle, I mean the method of dividing powers so that general and regional governments are each within its sphere co-ordinate and independent."

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা উপাদান আছে। প্রথমত, যেহেতু বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাদের সার্বভৌমত্বের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করে সেইজন্য সর্ববাদিসম্মত লিখিত দলিল (document)

সরকার হয়। এই দলিলের নাম সংবিধান (constitution)। যুক্তরাষ্ট্রে এই সংবিধান সকল ক্ষমতার আধার, ইহা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সকল ক্ষমতার প্রধান উৎস। দ্বিতীয়ত, এই দলিলে লিখিত থাকে কেন্দ্রের অংশ কতটুকু, রাজ্যের অংশ কতটুকু, উভয়ের যুগ্ম অংশ কতটুকু। দলিল-নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে প্রতিটি সরকার আইনত স্বাধীন এবং একটি অপরের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিলে উহা বে-আইনী বা সংবিধান-বিরোধী বলিয়া গণ্য হয়। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রের বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি উপাদান

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ইহার স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা (independent judiciary)। কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুই প্রকার সরকার থাকে বলিয়া সর্বদাই ইহাদের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন লইয়া বিবাদ থাকিতে পারে, ফলে সংবিধানের ব্যাখ্যাকারী উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। সম্ভাব্য বিবাদ মিটাইবার জন্য বা উভয় প্রকার সরকারের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে সংবিধান-সম্মত শক্তির ভারসাম্য (balance of power) এই বিচারবিভাগই রক্ষা করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়া এবং উহা সফল হওয়ার অনুকূল কারণগুলি (conditions for the growth and success of a federation) আলোচনা করা প্রয়োজন। এই কারণগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্তস্বরূপ। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী রাজ্যগুলি ভৌগোলিক দিক হইতে পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়া চাই (geographical contiguity)। ভৌগোলিক দূরত্বের ফলে জাতীয় চেতনা গড়িয়া উঠে না, যুক্তরাষ্ট্রও সহজে সফল হয় না। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে এক হাজার মাইলের (১৬০০ কিলোমিটার) ভৌগোলিক ব্যবধান ছিল, তাই সেখানে যুক্তরাষ্ট্র সফল না-হওয়ার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত, ঐ সকল অঙ্গ-রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষা, স্বার্থ ও সংস্কৃতির সমতা থাকা চাই। জাতীয়তা গঠনে যে যে প্রভাব কার্যকরী হয়, উহারা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-কাঠামো সফল হইতে পারে না। 'আমাদের ঐক্য বহু প্রাচীন,' অথবা 'বর্তমানে এই ঐক্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন'—এইরূপ কোন চিন্তা হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন লোকের মনে দানা বাঁধে। তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একই সঙ্গে কেন্দ্রাভিমুখিতা এবং কেন্দ্র-বিচ্ছিন্নতা (centripetal and centrifugal)—উভয় শক্তিই কাজ করিতে থাকে। এই উভয় শক্তির বিশেষ ভারসাম্যই যুক্তরাষ্ট্রকে সফল করে। কেন্দ্রাভিমুখিতা বেশি হইলে এককেন্দ্রিকতার ঝোঁক বাড়ে, কেন্দ্র-বিচ্ছিন্নতা বেশি হইলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়ে। এই দুই বিরোধী প্রভাবের মিলন এবং উপযুক্ত পরিমাণে

অবস্থানই যুক্তরাষ্ট্রকে সফল করিতে পারে। চতুর্থত, অঙ্গরাজ্য সরকারগুলির মনে এইরূপ চেতনা থাকা দরকার যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমাদের প্রতিটি রাজ্যের গুরুত্ব সমান, কাহারও কম নয় বা কাহারও বেশি নয়। কোনো রাজ্যসরকার অপর কোনো রাজ্যসরকার অপেক্ষা বেশি অধিকার পাইতে থাকিলে বা এইরূপ দাবি করিতে থাকিলে যুক্তরাষ্ট্র সফল হইতে পারে না। সর্বোপরি, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সফল হইতে হইলে রাজনৈতিক শিক্ষা দরকার। নিজ নিজ গণ্ডীতে অধিকার প্রয়োগ করা এবং অপরের গণ্ডীতে হস্তক্ষেপ না করা—এই চিন্তা রাজনৈতিক দিক হইতে শিক্ষিত মনেরই পরিচয়। দায়িত্বশীলতা, অপরের প্রতি কর্তব্য, এবং নিজ নিজ অধিকারের গণ্ডীতে বসবাস করা—এই সকল বিষয়ে শিক্ষা তাই যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যের পূর্বশর্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্ত কি কি

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়—এই উভয় প্রকার শাসন-ব্যবস্থারই দোষগুণ আছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান গুণ এই যে (i) ইহাতে শাসনব্যয় কম পড়ে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অনেকগুলি সরকারের ব্যবস্থা থাকায় ইহার খরচ বেশি পড়ে। (ii) এক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাতে সারা দেশে সমান ধরনের আইন ও শাসন-ব্যবস্থা থাকায় শাসনকার্য পক্ষপাতশূন্য হয় ও এই ব্যাপারে কোন জটিলতা দেখা দিতে পারে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন আইন থাকে। সুতরাং, শাসন-ব্যবস্থার তারতম্য হয় ও জটিলতা দেখা দেয়। (iii) এককেন্দ্রিক শাসনে সকল প্রকার দায়িত্ব কোন এক কেন্দ্রে নিহিত থাকে, সুতরাং, উহা সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে, অনেক সময় একের দায়িত্ব অন্যের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখা দেয়। (iv) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি সরকারই সকল শক্তির কেন্দ্র হয়। সুতরাং, দেশের বাহিরের ও ভিতরের শাসনব্যাপারে সরকার সবল নীতি অনুসরণ করিতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেকটি অঙ্গ-সরকারের ক্ষমতাই সীমাবদ্ধ, সুতরাং প্রত্যেকেই দুর্বল। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা ভাগাভাগি হওয়ায় কেহই সর্বময় প্রভুত্ব করিতে পারে না। বৈদেশিক নীতি ও দেশীয় নীতির প্রয়োগের বেলায় এই দুর্বলতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। (v) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশ অচ্ছেদ্য বন্ধনে কেন্দ্রের সহিত আবদ্ধ থাকে ও সকল বিষয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে যে-কোন সময়ে আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করিয়া যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিতে চাহিতে পারে। তখন যুক্তরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু শত দোষ থাকিলেও (i) যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ ও দোষ

সুযোগ দেয়। (ii) এই ব্যবস্থা দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার এবং বিচ্ছিন্ন দেশকে বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করাইবার একমাত্র প্রধান উপায়। ইহাতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, অঞ্চলসমূহের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লোপ পায় না; কিন্তু এক বৃহত্তর জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে। (iii) অধ্যাপক গেটেলের মতে দেশের ভৌগোলিক সীমানা বড় হইলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো একান্ত প্রয়োজন। কারণ, দূরবর্তী অঞ্চলগুলিকে রাজধানী হইতে ভালভাবে শাসন করা যায় না। তাই আঞ্চলিক সরকারগুলির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। (iv) লর্ড ব্রাইসের মতে যুক্তরাষ্ট্র থাকিলে শাসন বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে শাসনমূলক নূতন নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে এবং উহার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর।

পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Parliamentary or Cabinet System versus Presidential System): পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগের সকল ক্ষমতা থাকে একটি মন্ত্রিসভার হাতে এবং সেই মন্ত্রিসভাই শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু একজন ক্ষমতাহীন রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থার সকলের উপরে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি নামসর্বস্ব শাসক কিন্তু প্রকৃত শাসক নন, তিনি জাতির প্রতীক কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না, "the symbol of nation but does not rule the nation." তিনি রাষ্ট্রপ্রধান, কিন্তু সরকারের প্রধান নয়। তাঁহার পদের মর্যাদা আছে, কিন্তু কর্তৃত্ব নাই, সুতরাং দায়িত্বও নাই। এইরূপ শাসনে "the King can do no wrong." তাঁহার নামে মন্ত্রিসংসদ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই মন্ত্রিসংসদ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভা বা পার্লামেণ্ট যে আইন পাশ করে সেই আইন অনুযায়ী মন্ত্রিসংসদকে দেশ শাসন করিতে হয়। তাই আইনসভার নিকট মন্ত্রিসভাকে দায়ী থাকিতে হয়। এইজন্য ইহাকে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা বলে। মন্ত্রিসভার কার্য যদি আইনসভা অনুমোদন না করে তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইংলণ্ড, ভারত, রুশ, জাপান, চীন প্রভৃতি অধিকাংশ দেশেই এই প্রকার শাসনপদ্ধতি বিদ্যমান। মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকটে সর্বদা দায়ী থাকে বলিয়া ইহাকে দায়িত্বশীল সরকারও বলা হয় (Responsible Government).

উহাদের ব্যাখ্যা

অপরপক্ষে, রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের শাসনক্ষমতা নির্দিষ্টকালের জন্য একজন রাষ্ট্রনায়কের হাতে থাকে। তাঁহাকেই বলা হয় রাষ্ট্রপতি। তিনি একাধারে রাষ্ট্রের পতি ও শাসন বিভাগের কর্তা। তিনি নামেও শাসক, কাজেও শাসক। দেশে

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ আছে, আইনসভা আইন করেন, তিনি শাসন করেন। আইনসভার নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই, তিনি দায়ী জনসাধারণের নিকট।

কিন্তু দেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকিলেই তাহা রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার না-ও হইতে পারে। দেখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রপতি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী কি না। যেমন, ভারতে যদিও একজন রাষ্ট্রপতি আছেন, তথাপি ইহাঁকে মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থা বলা হয়। কারণ, রাষ্ট্রপতির নিজস্ব প্রকৃত ক্ষমতা খুবই অল্প। মন্ত্রিপরিষদ ছাড়া তিনি অচল। তিনি মন্ত্রিপরিষদের কথায় কাজকর্ম করেন। মন্ত্রিপরিষদ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক, প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিসভার। রাষ্ট্রপতি শুধু শাসনতান্ত্রিক প্রধান বা আনুষ্ঠানিক প্রধান (Constitutional Head or Titular Head)। কিন্তু আমেরিকাতে রাষ্ট্রপতি আছেন এবং এই দেশের সরকারকে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার বলা হয়। কারণ, তিনি তাঁহার কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী নহেন এবং তাঁহার নিজের হাতে শাসন চালাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি চার বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করা খুবই কঠিন। মন্ত্রীরা তাঁহার আজ্ঞাবহ কর্মচারী এবং তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী। রাষ্ট্রপতিই মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন এবং দরকার হইলে তিনি তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করেন।

উহাদের গুণ ও দোষ

মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। একের যাহা গুণ, তাহাই অপরটির ত্রুটি।

মন্ত্রিপরিষদ, অর্থাৎ পার্লামেন্টীয় শাসনব্যবস্থার গুণ হইল (i) আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে সহযোগিতা থাকে। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলিতে গেলে "It secures an essential co-ordination between bodies whose creative interplay is the condition of effective government." (ii) সঙ্কটের সময়ে বা প্রয়োজন মত মন্ত্রিসভা বদল করিয়া সময়ের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখা চলে। অধ্যাপক বেজহট, ডাইসী প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এইরূপ নমনীয়তা ও প্রসারশীলতা (Flexibility and elasticity) এই শাসনব্যবস্থার বিশেষ গুণ। (iii) আইনসভার প্রতিনিধিগণ সর্বদা জনমতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করেন, ফলে দেশে জনমতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহাতে শাসনবিভাগ দায়িত্বশীল (responsible) হয়। তাহারা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে, ফলে পরোক্ষে জনসাধারণের নিকট দায়িত্ববোধও তাহাদের মনে সঞ্চারিত হয়। অধ্যাপক ব্রাইসের ভাষায় "Being in constant contact with members of the opposition party, as well as in still closer contact with those of their

own, they have opportunities of feeling the pulse of the assembly and through it the pulse of public opinion." (iv) নির্বাচন ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দেশ শাসিত হয় বলিয়া সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। (v) কোন কোন দেশে রাজা বা বিরাট কোন দেশনেতাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া দরকার, অথচ গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করা প্রয়োজন। তখন এইরূপ শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। ইহার ত্রুটি হইল (i) অনেকে ইহাকে দায়িত্বহীন শাসনব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন। কারণ, মন্ত্রিমণ্ডলী ও আইনসভার সদস্যগণ একে অন্যের উপর দায়িত্ব অপসারণ করিতে থাকেন। (ii) আইনসভায় আলাপ-আলোচনায় মন্ত্রিদের সময় নষ্ট হয়, ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে। (iii) সরকারের সহজ-পরিবর্তনশীলতা ভাল নয়, কারণ, দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন নীতি অনুসরণ করা ইহাতে সম্ভব নয়। (iv) মন্ত্রিগণ বাক্‌সবস্ব জনপ্রিয় ও গণমনোহরণে দক্ষ হইতে পারেন, কিন্তু শাসনকার্যে দক্ষতা ভিন্ন গুণ। নির্বাচকদের লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া সাধারণত তাঁহারা শাসনে অপটু হন। (v) মন্ত্রিপরিষদীয় শাসন আসলে বহুশাসকের মিলন, নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে শাসন ভাল চলে না। (vi) পার্লামেণ্টারী শাসন আসলে দলীয় স্বৈরাচার। আইনসভায় দলের একাধিপত্য থাকিলে ইহা মন্ত্রিসভার একনায়কত্বে (Cabinet Dictatorship) পরিণত হয়।

পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধা

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রধান গুণ হইল (i) ইহার স্থায়িত্ব। নীতি ও তাহার প্রয়োগ পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চালান যায়। তাহাতে দেশে ও বিদেশে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বাড়ে। (ii) শাসকগণ নির্বাচনী প্রচারকার্য অপেক্ষা শাসনের কাজে অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে পারেন। (iii) ইহাতে শাসন বিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কম থাকে, কারণ, প্রত্যেকের কার্যক্ষেত্র পৃথক্। (vi) জরুরী অবস্থায় ইহা খুবই কার্যকর। রাষ্ট্রপতির কোন সমান মর্যাদাসম্পন্ন সহকর্মী নাই, কোন মন্ত্রিসভা থাকিলেও মন্ত্রিরা বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তিনি কাহারও সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য নন। ফলে অতি দ্রুতভাবে ক্ষিপ্রতার সহিত তিনি কোন সিদ্ধান্ত লইতে পারেন, প্রয়োগও করিতে পারেন। (v) যে-দেশে অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক দল থাকে, সেখানে ঘনঘন মন্ত্রিসভা বদল হয়। এইরূপ দেশে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন খুবই উপযোগী। (vi) অধ্যাপক ব্রাইস বলেন যে, "legislatures are less dominated by party spirit under the Presidential system than under the Cabinet system." অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করা প্রয়োজন। উহার দুর্বলতাও কম নয়। (i) আইন-

রাষ্ট্রপতি-চালিত ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধা

বিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনার ফলে কুশাসনের আশংকা থাকে। (ii) ইহাতে স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা বর্তমান। (iii) আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কাহার তাহা বোঝা যায় না। (iv) জনমত উপেক্ষা করিলে গণতন্ত্রের প্রাণ থাকে না। (v) আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা কাহার কত সর্বদা এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়া কালক্রমে বিচার-বিভাগের প্রাধান্য গড়িয়া উঠে। (vi) ইহার মধ্যে নমনীয়তা ও প্রসারশীলতা খুবই কম। প্রয়োজনমত উপযুক্ত ব্যক্তিকে সরকারের (মন্ত্রিসভায়) লইয়া আসিয়া শাসনব্যবস্থা সবল করা চলে না। অধ্যাপক বেজ্‌হটের ভাষায় "There is no elastic element, everything is rigid, specified,, stated."

উপসংহারে বলা যায় যে আজিকার দিনের জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার অপেক্ষা পার্লামেণ্টারী শাসনই জনসাধারণ অধিক মাত্রায় পছন্দ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। দলীয় প্রথার প্রসার, জনমতের প্রাধান্য, স্বৈরাচারের প্রতি বিমুখতা, আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতা দ্বারা শাসন পরিচালিত হউক এইরূপ ধারণা থাকা—এই সকল কারণেই পৃথিবীতে পার্লামেণ্টারী প্রথা তুলনামূলকভাবে ভাল বলিয়া মনে হইতেছে। এমনকি অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশেও পার্লামেণ্টের প্রাধান্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ক্রমে ক্রমে মন্ত্রিপরিষদ গুরুত্ব লাভ করিতে— অবশেষে রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসকে পরিণত হইবেন, এইরূপ ঝোঁক দেখা যাইতেছে

Questions to be discussed

1 Analyse the factors that have helped the growth of human society.
যে শক্তিগুলি মনুষ্যসমাজের বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের পর্যালোচনা কর।

2. What is Society ? How it is constructed ?
সমাজ কাহাকে বলে ? ইহার গড়ন কিরূপ ?

3. Discuss the relation between Individual and Society.
ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

4. "Man is by nature and necessity a social animal."—Elucidate.
"স্বভাব ও প্রয়োজনের দিক্ হইতে মানুষ একটি সামাজিক জীব।"—ব্যাখ্যা কর।

5. What is family ? What are its characteristics ?
পরিবার কাহাকে বলে ? ইহার বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি ?

6. What are the different types of families ?
পরিবারের বিভিন্নরূপ কি কি ? অথবা, কত প্রকার পরিবার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আলোচনা কর।

7. Distinguish between Patriarchal and Matriarchal families.
পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

8. Analyse the functions and utility of the family.
পরিবারের কাজকর্ম ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ কর।

9. Discuss the role of family in individual life.
ব্যক্তির জীবনে পরিবারের ভূমিকা আলোচনা কর।

10. "Family is the eternal school of social life."—Elucidate.
"পরিবার হইল সামাজিক জীবনের শাশ্বত বিদ্যালয়।"—ব্যাখ্যা কর।

৭

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

Various departments of Government

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও বিভাগীয় কাজ (Different departments of Government and their functions) : পৌরবিজ্ঞানীরা সরকারের কাজ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন ; যথা—আইন প্রণয়ন বিভাগ, আইনের প্রয়োগ বা শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা দরকার। এই আইন প্রণয়নের জন্য দেশে থাকে আইন পরিষদ। এই বিভাগকে ব্যবস্থাপক বিভাগও বলা হয়। আইনসভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক ভোটে বিল পাশ করিয়া আইন প্রণয়ন করা এই বিভাগের কর্তব্য। শাসন-বিভাগের কাজ এই সকল আইন প্রয়োগ করা ও আইন অনুসারে শাসন কার্য চালানো। কেহ আইন ভঙ্গ করিলে তাহা বিচারের জন্য শাসন-বিভাগ আসামীকে বিচার বিভাগের নিকট প্রেরণ করে। বিচার বিভাগের কাজ হইল আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া। স্বপক্ষের ও বিপক্ষের সমস্ত যুক্তি শুনিয়া কোন একটি আসামী অপরাধী কি না বিচার বিভাগ তাহা স্থির করে এবং সে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইলে দেশের আইন অনুযায়ী তাহাকে সাজা দেয়।

তিনটি বিভাগ ও উহাদের কাজকর্ম

একটি উদাহরণের সাহায্যে তিনটি বিভাগের কাজ বুঝাইয়া দেওয়া যায়। আইন-সভা নিরাপত্তার জন্য আইন করিল যে, কেহ অন্যের জিনিস চুরি করিলে তাহার ছয়মাস কারাদণ্ড হইবে। এই আইন করিবার উদ্দেশ্য দেশে চুরি নিবারণ করা। ইহা আইন বিভাগের কাজ। মনে করা যাউক যে, একটি চোর চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়িল। তখন পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইবে। এই পুলিশ ও থানা শাসন বিভাগের অংশ। এই বিভাগের কর্তব্য হইল আইন অনুযায়ী শাসন করা এবং আইনভঙ্গকারীর দোষ প্রমাণিত হইলে তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করা। থানার হাজত হইতে চোরকে বিচারালয়ে বিচারের জন্য হাজির করানো হইবে। বিচারালয়ে নানা শ্রেণীর হাকিম বা বিচারক ও অন্যান্য কর্মচারী আছেন। তাঁহাদের কর্তব্য হইল আইনভঙ্গকারীকে সাজা দেওয়া। আদালতে চোরটির বিচার হইবে। সাক্ষীসাবুদ লওয়া হইবে। আসামীর বক্তব্য শোনা হইবে। তাহার পরে বিচারক সাব্যস্ত করিবেন যে, আসামী দোষী কি না। যদি দোষী বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে চোরকে আইন অনুযায়ী হাকিম হয়তো ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। আর নির্দোষ হইলে খালাস করিয়া দিলেন।

উদাহরণ

সুতরাং এই চুরি এবং শাস্তির মধ্যেই আমরা আইন, শাসন এবং বিচার বিভাগের কার্যকলাপ দেখিতে পাই।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি (The Theory of Separation of Powers): প্রাচীনকালে রাজাদের ক্ষমতার কোন শেষ ছিল না। দেশে নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না। রাজা নিজেই ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করিতেন। সেই আইন ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া কাহারও কোন কিছু বলার অধিকার ছিল না। তিনি নিজেই সৈন্যসামন্ত ও লোকজন লইয়া সেই আইন প্রয়োগ করিতেন; সুতরাং আইন প্রয়োগের ব্যাপারেও তিনি সর্বেসর্বা ছিলেন। শুধু তাহাই নহে। তিনি যাহাকে আইনভঙ্গকারী বলিয়া আটক করিতেন, নিজেই তাহার বিচার করিতেন। নিজের খুশিমত আইন করিয়া, লোককে আটক করিয়া, নিজের মত অনুযায়ী আইনের ব্যাখ্যা করিয়া রাজা সকল ক্ষমতা নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

এই অবস্থার প্রতিবাদেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের তত্ত্ব প্রচারিত হয়। অ্যারিস্টটল্ও বহু পূর্বে এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী লেখক মন্টেস্কু (Montesquieu) ও ইংরেজ লেখক ব্ল্যাকস্টোন (Blackstone) এই মতবাদটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মতে সরকারের তিনটি বিভাগ (আইন, শাসন ও বিচার), তিনটি বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে থাকা উচিত। প্রত্যেকটি বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করিবে। তাহা হইলে ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন হানি হইবে না। যদি একই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের হাতে এই তিনটি ক্ষমতাই দেওয়া থাকে, তাহা হইলে নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়া পড়ে। মনে কর, দেশের শাসনকর্তা নিজেই যদি আইন করেন, নিজেই যদি সেই আইনের প্রয়োগ করেন ও আইন ভঙ্গ করিলে নিজেই উহার বিচার করেন, তবে তিনি যাহা খুশি তাহাই করিতে পারেন এবং নিজের শত্রুদের ইচ্ছামত শাস্তি দিতে পারেন। সুতরাং, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। কেহ কাহারও অধীন থাকিবে না। প্রত্যেকের কার্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইবে, কিন্তু প্রত্যেক বিভাগ অপর বিভাগের অনাচার প্রতিরোধ করিবে। এইভাবেই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা পাইবে: "from the very nature of things power should be a check to power." মনে কর, আজ যদি বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী হাইকোর্টকে আদেশ দেন যে, একটা লোককে শাস্তি দেওয়া হউক, আর হাইকোর্টও যদি মাথা পাতিয়া সেই আদেশ পালন করে, তবে দেশে অবিচার শুরু হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। অথবা

সরকারী ক্ষমতা তিনটি ভাগে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া দাও

প্রধানমন্ত্রী যদি আইনসভাকে হুকুম দেন যে, এই আইনটি পাশ করিয়া দেওয়া হউক আর আইনসভাও যদি সেই আদেশ পালন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আইনটি গ্রহণ করে, তবে গণতন্ত্র কিরূপে রক্ষিত হইবে? সুতরাং সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এইরূপ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণকে মণ্টেস্কু ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে, "The three powers then must be separated, exercised by different individuals in such a way as to act as checks and balances upon one another."

যদিও এই মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে, তথাপি কার্যক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা দুরূহ এবং প্রয়োগ করিলেও রক্ষা করা কঠিন। ক্ষমতা ও কার্যের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবও নহে এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে। বর্তমান শাসনব্যবস্থা এত জটিল যে, কোন বিভাগই অন্য বিভাগের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে না। এক বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া অন্য বিভাগের কার্য পরিচালনা করা অসম্ভব। সরকারকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করা যায়। শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ ইহার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বিভিন্ন অঙ্গের সহযোগিতা ছাড়া যেমন দেহ বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ এই তিনটি বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া সরকার অচল হইয়া পড়ে। লাস্কি (Laski) বলিতেছেন, "আইনসভাসমূহ অনেক সময় শাসন বিষয়ে কোন কোন কাজ করে···তাহারা বিচার বিষয়ক কর্তব্যও করে···শাসনবিভাগ, বিশেষত আজকাল, এমন ধরনের কাজ করে যাহাদের আইন বিষয়ক কাজ হইতে পৃথক্ করা যায় না···বিচারবিভাগ প্রায়ই শাসনবিভাগের ন্যায় কাজ করিতেছে··· তাহারা আইনসভার ন্যায়ও কাজ চালায়···।" মণ্টেস্কু একই ক্ষমতার তিনটি বিভাগকে "তিন ধরনের ক্ষমতা" (three kinds of power) বলিয়া ভুল করিয়াছেন। এই বিভাগগুলি "পৃথক্ নয়, পরস্পরসংলগ্ন—কেন্দ্রীয় শক্তির আধার হইতে বিদ্যুৎ যেমন বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়, এখানেও তেমনি, আইন ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের রূপ ধরিয়া সকল বিভাগের মধ্য দিয়া বহিয়া চলে।"*

সরকারের তিনটি বিভাগই পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবে। শাসন বিভাগকে অনেক সময় আইন প্রণয়ন করিতে হয়। আইনসভার অধিবেশন সারা বৎসর চলে না। একটি অধিবেশনের পর হয়তো সভার কাজ একমাস বন্ধ থাকিল এবং পুনরায় দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইল। এই দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তীকালে

* "insulated rather than isolated—the current from the central power-house taking the form of law and the political process, runs equally through all of them."

জরুরী প্রয়োজন হইলে শাসনবিভাগই সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। বিচারবিভাগও নূতন আইনের সৃষ্টি করিতে পারে। বিচারকগণ আবশ্যক বোধ করিলে ন্যায় বিচারের জন্য আইনের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া নূতন আইনের সৃষ্টি করিতে পারেন। সেইরূপ আইনসভাও অনেক সময়ে বিচারবিভাগের কাজ করে। রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপাল প্রভৃতির কর্তব্যের ত্রুটি হইলে আইনসভায় তাহার বিচার হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মন্ত্রিপরিষদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগের ও শাসন বিভাগের মধ্যে সংযোগ এত বেশি যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি নাই বলিলেই চলে। মন্ত্রীরা শাসন বিভাগের কর্তা কিন্তু আইনসভার সভ্য ও আইনসভার নিকট দায়ী। ভারতেও রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের কর্তা হইয়া জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট একাধারে শাসনকর্তা ও বিচারপতি। তিনি জেলার শাসন-বিভাগের কর্তা এবং ফৌজদারী মামলার তিনি বিচার করেন। আমেরিকায় যদিও স্বতন্ত্রীকরণের নীতি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তবুও কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই দেশেও এই তিনটি বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট সংযোগ আছে। সুতরাং মণ্টেস্কু যে-প্রকার সম্পূর্ণ ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণের নীতি সমর্থন করিয়াছেন তাহা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে অতিরিক্ত বিভাজনের ফলে বিরোধের সৃষ্টি হইয়া শাসনকার্য অচল হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। অধ্যাপক ফাইনারের ভাষায় বলিতে গেলে, এই তত্ত্ব কার্যে পরিণত হইলে, "the governments will be put into alternative conditions of coma and convulsion."

বাস্তব জগতে, ইংলণ্ডে, ভারতে ও আমেরিকায়

আইন প্রণয়ন বিভাগ (The Legislature): কোন গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভা সেখানকার জনসাধারণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, বিশ্বাস ও আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। জনসাধারণের প্রকৃত ইচ্ছা বা জাতির সঙ্কল্প প্রকাশ পায় তাহাদের আইনসভায়। জাতির সম্মুখে প্রতিদিন যে নানাপ্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য উপস্থিত হয়, বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর মনে এই সকল সমস্যা যে আলোড়নের ঢেউ তোলে তাহা রূপ পায় আইনসভায়। অধিকাংশ আইনসভার দুইটি কক্ষ অথবা পরিষদ আছে, যথা—উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদ। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আইনসভার নাম পার্লামেণ্ট বা সংসদ। পার্লামেণ্টের উচ্চ-পরিষদের নাম রাজ্যসভা এবং নিম্ন পরিষদের নাম লোকসভা। উচ্চ-পরিষদের ক্ষমতা কম। বিশেষত, অর্থ-সম্পর্কীয় আইন প্রণয়নে ইহা হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। উচ্চ-পরিষদের সভ্যগণ নির্বাচিত হইতে পারে, মনোনীতও হইতে পারে। কিন্তু নিম্ন পরিষদের

আইনসভার গঠন

সভ্যরা সাধারণ নির্বাচক-মণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হয়। সাধারণত, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ও মন্ত্রীদের কার্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের ক্ষমতাই বেশি। যে-আইনসভায় একটি মাত্র পরিষদ আছে, তাহাকে (Unicameralism) বলে। যে-আইনসভায় দুইটি পরিষদ থাকে তাহাকে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা (Bicameralism) বলে।

আইনসভার প্রধান কাজ (i) দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য আইন প্রণয়ন করা। আইনসভার গৃহীত আইন অনুসারে শাসনবিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং বিচারবিভাগ সেই আইন অনুসারে বিচারকার্য সমাধা করে। সুতরাং আইনসভা সরকারের প্রধান অঙ্গ। অনুপযোগী পুরাতন আইনগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া অথবা সংশোধন করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন আইন করা আইনসভার প্রধান কাজ।

আইন প্রণয়ন করা আইন পরিষদের প্রধান কাজ হইলেও ইহার অন্যান্য কাজও আছে। (ii) সরকারী আয়-ব্যয়ের আলোচনা ও মঞ্জুর করা আইনসভার আর একটি প্রধান কার্য। সরকারের আয় কি পরিমাণে হইবে, কি কি কর ধার্য করা হইবে, কি ভাবে কর আদায় করা হইবে, কি ভাবে বাৎসরিক আয় বিভিন্ন বিভাগের জন্য ব্যয় করা হইবে, এই সকল বিষয় আইন পরিষদ আলোচনা করিয়া মঞ্জুর করে। (iii) যে দেশে মন্ত্রিসংসদের শাসন প্রচলিত, সেই দেশে শাসনবিভাগ তাহাদের শাসন নীতির জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা মন্ত্রীদের কার্যকলাপের সর্বদা সমালোচনা করে ও দরকার হইলে অনাস্থাজ্ঞাপন করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদচ্যুত করিতে পারে। (iv) অনেক সময় আইনসভার কিছু কিছু শাসন করিবার ক্ষমতাও থাকে। আমেরিকায় বড় বড় সরকারী চাকুরিতে রাষ্ট্রপতি যে লোক নিয়োগ করেন, তাহাতে আইনসভার উচ্চ পরিষদের অনুমোদন লইতে হয়। (v) অনেক দেশে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারকগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হন। যেমন, ভারতে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভার ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচিত সভ্যদের মিলিত ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও ভারতীয় পার্লামেন্টের আছে।

আইনসভার কার্যাবলী

(vi) আইনসভা বহুক্ষেত্রে বিচারসংক্রান্ত কাজও করে। নির্বাচনসংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা, রাষ্ট্রপতির বিচার প্রভৃতি কাজ আইনসভার বিচারমূলক কাজ। রাষ্ট্রপতি অথবা অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাজে দোষ-ত্রুটি থাকিলে আইনসভায় তাহার বিচার হয়। ইংলণ্ডের লর্ড সভা সমস্ত মামলা বিচারের সর্বোচ্চ আদালত। (vii) সর্বশেষে, সংবিধান পরিবর্তনের ভারও আইনসভার হাতে। যেমন, ভারতের

আইনসভা সমগ্রভাবে বা আংশিক ভাবে সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা।

নীতি নির্দেশ করিবে, কিন্তু আইন রচনা করিবে না

জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, আইনসভার সকল সদস্য দেশের প্রতিটি সমস্যার খুঁটিনাটি নানাদিক সম্পর্কে খোঁজ রাখিতে পারেন না। তাঁহাদের হাতে আইন রচনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন যে, আইনরচনার ভার বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত বিভিন্ন কমিটির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আইনসভা কেবলমাত্র সাধারণ নীতির নির্দেশ দিয়া দক্ষ ব্যক্তিদের হাতে আইন রচনার ভার ছাড়িয়া দিবেন। আধুনিক জগতে এই নীতি সকল আইনসভাই গ্রহণ করিয়াছে।

বিভিন্ন দেশের আইনসভা বিভিন্ন নীতিতে গঠিত। পৃথিবীর অনেক দেশে একটি কক্ষ লইয়া আইনসভা গঠিত, যেমন—ফিনল্যাণ্ড, পর্তুগাল, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি। তবে বেশির ভাগ দেশেই আইনসভাতে দুইটি কক্ষ দেখা যায়। আইন-সভায় কয়টি কক্ষ থাকা উচিত তাহা লইয়া রাষ্ট্রনীতির পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক সময় তুমুল বিতর্ক চলিত। আজও এই বিতর্কের কোনরূপ চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। আমরা দ্বি-পরিষদীয় আইনসভার স্বপক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি আলোচনা করিব। দ্বি-পরিষদের স্বপক্ষে দুই ধরনের যুক্তি দেখা যায়, প্রথমত, এক-কক্ষের ত্রুটিগুলি ও দ্বিতীয়ত, দ্বি-কক্ষের সুবিধাগুলি। (i) এক-পরিষদীয় ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি জন্ স্টুয়ার্ট মিল বিশদভাবে নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। পূর্ণ-ক্ষমতা লাভ করিয়া আইনসভার একমাত্র কক্ষটি অসীম ক্ষমতাশালী, দুর্নীতিপ্রবণ ও স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। এক-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভার স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিবার জন্যই দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন। Bryce বলেন যে "The necessity ot two chambers is based on the belief that the innate tendency of an assembly to become hateful, tyrannical and corrupt needs to be checked by the co-existence of another house of equal authorities." (ii) আইনসভায় দুইটি পরিষদ থাকিলে, প্রত্যেকটি আইন উপযুক্তভাবে বিবেচিত হইতে পারে। প্রথম-কক্ষ তাড়াতাড়ি একটি আইন পাশ করিলে দ্বিতীয় কক্ষে তাহার ভুল-ত্রুটি সংশোধন হয় এবং দুইবারে পাশ হইতে যথেষ্ট সময় লাগে বলিয়া সাময়িক উত্তেজনায় অথবা তাড়াতাড়িতে আইন করার জন্য যে গলদ থাকে তাহা দূর করা সম্ভব হয়। অধ্যাপক লীককের (Leacock) মতে এক পরিষদীয় আইন দ্রুত ও অসঙ্গতভাবে পাশ হয়। আবেগ ও ভাবের প্রাবল্যে ভাসিয়া গিয়া সদস্যরা অবাঞ্ছিত আইন রচনা করিতে পারে। দ্বি-পরিষদীয়

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার দোষগুণ

আইন ব্যবস্থায় আবেগের পরিবর্তে আসে স্থিরতা এবং ভাবের পরিবর্তে আসে বিবেচনা ও সম্যক্ বিচার-বুদ্ধি। (iii) একটি কক্ষের উপর আইন-রচনার প্রচণ্ড চাপ থাকে, দ্বিতীয় কক্ষ থাকলে তাহা প্রথমটির কাজ অনেকটা হাল্কা করিয়া তুলিতে পারে। (iv) দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব। সমাজের নানা স্তরের প্রতিনিধি, নানা স্বার্থের রক্ষকদের লইয়া দ্বিতীয় কক্ষটি গঠিত হইতে পারে। অনেক যোগ্য ব্যক্তি বা প্রয়োজনীয় প্রতিনিধি হয়ত নির্বাচনে প্রবেশ করিতে চাহেন না, অথচ আইনসভায় তাহাদের থাকা প্রয়োজন, "It affords opportunities for the representation of sectional or minority interests and of the aristocratic or intellectual element in a society." (v) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে দুইটি পরিষদের একান্ত আবশ্যক। উচ্চ পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং তাহারা নিজেদের আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও স্বার্থ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। অধ্যাপক ফাইনারের ভাষায়, "Legislature are bicameral for two broad and different reasons : as part of federalism, and as the result of a desire to check the popular principle in the constitution."

দ্বি-পরিষদীয় আইনসভার বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হইল (i) ঊর্ধ্বকক্ষের কোন প্রয়োজন নাই। জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত নিম্নকক্ষ সঠিকভাবে জনগণের ইচ্ছা (Popular will) প্রকাশ করে। সেই গণ-ইচ্ছা অনুযায়ীই আইন প্রণীত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় আর একটি কক্ষ গঠন করার অর্থই হইল বিভাজন, বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি আহ্বান করা। একজন ফরাসী লেখক সমস্যাটিকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "ঊর্ধ্বকক্ষ কি প্রয়োজনে আসিবে? যদি তাহা নিম্নকক্ষের সহিত একমত হয় তবে ইহা অনাবশ্যক, আর যদি তাহা ভিন্নমত হয় তবে তাহা বিপজ্জনক।" (ii) দ্বিতীয়ত, দ্বি-পরিষদীয় আইনসভার পক্ষে একটি যুক্তি হইল উচ্চকক্ষের প্রতিরোধক্ষমতা—এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত নিম্নকক্ষের বিরুদ্ধে উচ্চকক্ষের বক্তব্য, যুক্তি বা অভিযোগ জনগণ গ্রহণে প্রস্তুত নয়। আর উচ্চকক্ষ আইন-প্রণয়নে বিলম্ব ঘটাইতে পারে বলিয়া যে যুক্তির অবতারণা করা হয়, অধ্যাপক লাস্কির মতে উহার কোনই সারবত্তা নাই, আধুনিক কালে সকল আইনের উপরেই দীর্ঘকাল ধরিয়া বিতর্ক ও আলোচনা করা হয়। লাস্কির মতে, "উচ্চকক্ষের আলোচনার অধিকাংশই হইল নিম্নকক্ষের আলোচনার পুনরাবৃত্তি। সুতরাং অযথা বিতর্কে সময়ের অপব্যয়ই ঘটান হয়।" অর্থের অপব্যয়ও বিশেষ কম হয় না। প্রতিটি বিভাগের উচ্চশিক্ষিত স্থায়ী সরকারী

কর্মচারিগণ অনেক চিন্তা করিয়া আইনের যে-খসড়া মন্ত্রিসভার হাতে তুলিয়া দেন, উহাই মন্ত্রিরা আইনসভায় পেশ করিয়া পাশ করান। ইহার মধ্যে আবার উচ্চকক্ষের প্রয়োজন কোথায়? (iii) তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রেও উচ্চকক্ষ গঠনের কোন প্রয়োজন নাই। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই নির্বাচিত অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিরা সেনেট বা উচ্চসভায় নিজস্ব দলের নির্দেশে ভোট দেন, অঙ্গরাজ্যের স্বার্থের ভিত্তিতে নহে। দলীয় প্রথার চাপে এই সকল প্রতিনিধির রাজ্য-স্বার্থ রক্ষার কথা মনে থাকে না। তাই যুক্তরাষ্ট্রেও আর উচ্চকক্ষের দরকার নাই। (iv) চতুর্থত, দ্বি-পরিষদীয় আইনসভায় দুইটি কক্ষের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, ফলে একে অন্যের প্রতিযোগী হইয়া উঠে। একটি গাড়ির দুই দিকে দুইটি বলদ বিপরীত দিকে গাড়িটিকে টানিতে থাকিলে উহা স্বভাবতই চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িবে। একে অন্যের উপর ক্রমাগত দোষারোপ করিতে থাকিবে। অপর কক্ষের সদস্যরা নিশ্চয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিবে এই ধারণায় দুইটি কক্ষের সদস্যরাই দায়িত্বহীন হইয়া উঠিবে। (v) পঞ্চমত, মানুষের সকল বিদ্যাবুদ্ধিবিবেচনা দ্বারা আজ পর্যন্ত একটি আদর্শ উচ্চকক্ষ গঠন করা সম্ভবপর হয় নাই। আদর্শ আইনসভা হিসাবে উচ্চকক্ষটি এমন হইবে যাহা গভীরভাবে আইনের বিষয় আলোচনা করিবে অথচ নিম্নকক্ষের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করিবে না, বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বাঁধ হিসাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে অথচ উন্নতি ও প্রগতির অন্তরায় হইবে না, জনমত প্রতিফলিত করিবে কিন্তু তাহার ক্ষণস্থায়ী প্রভাবের দ্বারা নিজে প্রভাবিত হইবে না। বাস্তবে এইরূপ কক্ষ কখনও দেখা যায় নাই, কোনদিন দেখা যাইবে কি না সন্দেহ।

উপসংহারে আমরা তাই লাস্কির কথা স্মরণ করিতে পারি "এক-পরিষদীয় আইনসভা আধুনিক রাষ্ট্রের সকল প্রয়োজন মিটাইতে পারে।" ইহার দ্বারা সরকারের গঠন ও পরিচালনা অনেক সরল হইয়া যায় এবং প্রশাসনের ব্যয়ভার কমিয়া যায়। তাই কতকগুলি দেশে সম্প্রতি দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের সরকারও লর্ডসভা তুলিয়া দেওয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ইউরোপে গ্রীস, বুলগেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং তুরস্কে এক-পরিষদীয় আইনসভা প্রচলিত হইয়াছে।

শাসন বিভাগ (The Executive): আইনসভা যে সকল আইন পাশ করে উহাদের কার্যকরী করিয়া তোলার দায়িত্ব যে বিভাগের উপর, তাহাকে শাসন বিভাগ বলে। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য সরকারের শাসন বিভাগ নিযুক্ত থাকে। নানাপ্রকারে শাসন বিভাগ গঠিত হয়। কোন কোন দেশে শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানে একজন রাজা এবং কোন কোন দেশে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় এই রাজা বা রাষ্ট্রপতির হাতে কোন

প্রকৃত শাসন ক্ষমতা থাকে না। আসল-ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতেই থাকে। মন্ত্রীরা যতকাল আইনসভার অধিকাংশ সভ্যদের সমর্থন পাইবে ততকাল পর্যন্ত শাসন-ক্ষমতা চালাইতে পারিবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনে রাষ্ট্রপতিই প্রধান শাসনকর্তা।

কত বিভিন্নভাবে শাসন বিভাগ গঠিত হইতে পারে

তিনি জনসাধারণের অথবা তাহাদের প্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি চার বৎসর ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সাত বৎসরের জন্য নিবাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভারত অথবা ফ্রান্সের শাসনকে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থা বলা হয় না। ইহারা মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থা। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত ক্ষমতাধারী শাসনকর্তা। তিনি নিজেকে সাহায্য করিবার জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু মন্ত্রীদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকে না। রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্টের আদেশ অনুযায়ী তাহাদের কার্য করিতে হয়। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের মন্ত্রীদের অধীনে অসংখ্য কর্মচারী থাকে। প্রত্যেক মন্ত্রী এক এক বিভাগের কর্মকর্তা হইয়া থাকেন। প্রতিযোগিতামূলক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস পরীক্ষার দ্বারা উচ্চপদস্থ স্থায়ী সরকারী কর্মচারিগণ নিযুক্ত হয়। তাহারা এবং অন্যান্য অধীনস্থ সরকারী কর্মচারী শাসনকার্য চালায়।

গার্নারের শ্রেণী বিভাগ

অধ্যাপক গার্নার শাসনবিভাগের কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন: (1) কূটনৈতিক (Diplomatic), (2) প্রশাসনিক (Administrative), (3) সামরিক (Military), (4) বিচারসংক্রান্ত (Judicial) এবং (5) আইনবিষয়ক (Legislative)।

(1) কূটনৈতিক

কূটনৈতিক ক্ষমতাবলীকে তিনটি বিষয়ে ভাগ করা যাইতে পারে: (ক) বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজ-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা; (খ) কূটনৈতিক প্রতিনিধিবর্গ ও কর্মচারিগণকে নিয়োগ ও গ্রহণ করা, এবং (গ) সন্ধি বা চুক্তি করিবার ক্ষমতা। সকল রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা বিদেশে নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। তিনিই প্রতিনিধিগণকে ও রাষ্ট্রীয় দূতসমূহকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং বিদেশীয় প্রতিনিধি বা দূতদের গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি নামসর্বস্ব শাসক হন তিনি প্রকৃত শাসকের (ক্যাবিনেট) পরামর্শে ঐ সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতির নিয়োগসমূহ সিনেটের দ্বারা অনুমোদন করাইতে হয়। ব্রিটেন ও ভারতে তাহার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু চুক্তির ক্ষেত্রে সকল দেশেই আইনসভার অনুমোদন আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক কর্তব্যকে শাসনবিভাগের প্রধান কার্যরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। দেশে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা হইল শাসনবিভাগের প্রাথমিক কর্তব্য। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা শাসনবিভাগের একান্ত কর্তব্য। এইজন্য শাসনবিভাগের অধীনে জেলবিভাগ ও পুলিশবাহিনী নিযুক্ত থাকে। এই বিভাগের নাম স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Department or the Interiors)।

(2) প্রশাসনিক

তৃতীয়ত, সকল রাষ্ট্রেই সামরিক ক্ষমতা শাসনবিভাগের হস্তে ন্যস্ত থাকে। দেশরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি নিয়োগ করা এবং যুদ্ধ পরিচালনা করার ভার থাকে শাসনবিভাগের উপর। ব্রিটেনে শাসনবিভাগের উপর যুদ্ধ ঘোষণা করার ভারও অর্পণ করা আছে। শাসন-বিভাগের অধীনে সেনাবাহিনী (পদাতিক), নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী নিযুক্ত থাকে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধের সময় প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই শাসনবিভাগ নাগরিকগণের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ বিবেচনা সাপেক্ষে সাময়িকভাবে বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

(3) সামরিক

(4) বিচার সংক্রান্ত

চতুর্থত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে স্বল্প পরিমাণে বিচারের অধিকারও প্রদান করা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ক্ষমা করিবার অধিকার, দণ্ড হ্রাস করিবার অথবা মকুব করিবার অধিকার।

পঞ্চমত, দেশের প্রধান শাসক কিছু পরিমাণে আইনবিষয়ক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আইন-কানুন বিধি ও বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশের খসড়া প্রণয়নের ভার শাসনবিভাগের উপর থাকে বলিয়া তাঁহারা কার্যত এই ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠেন। পার্লামেন্টীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগই আইনের খসড়াসমূহ উত্থাপন করেন এবং আইসভায় উহাদের অনুমোদন করাইয়া লন। অর্ডিন্যান্স এবং অন্যান্য অর্পিত আইনব্যবস্থার (delegated legislation) বিবিধ সূচী কার্যকরী করিবার অধিকার শাসন-ব্যবস্থাকে প্রদান করা আছে। আবার আইনসভার অনুমোদিত কোন আইনের খসড়াকে শাসনবিভাগ নাকচ করিয়া দিতে পারে যদি তাহার উপর 'ভিটো' (Veto) প্রদান করা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের ক্রমপ্রসারমান রাজ্যশাসনব্যবস্থার সহিত শাসনবিভাগের প্রভাবও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে।

(5) আইন বিষয়ক

বিচার বিভাগ (Judiciary)**:** বিভিন্ন উচ্চ এবং নিম্ন আদালতের বিচারকদের লইয়া বিচার বিভাগ গঠিত হয়। যেমন, ভারতের সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট প্রভৃতি

লইয়া ভারতের বিচার বিভাগ গঠিত আছে। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার করা এই বিভাগের কাজ। কেহ আইন ভঙ্গ করিলে আইনভঙ্গকারীকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে হাজির করে, অথবা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ করে। বিচারক বাদী ও বিবাদীর কথা শুনিয়া এবং সাক্ষীদের কথা শুনিয়া আইন ভঙ্গ হইয়াছে কিনা তাহার বিচার করেন ও আইন অনুযায়ী রায় দেন। দ্বিতীয়ত, বিচারকগণ সুবিচারের খাতিরে আইনের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া নূতন আইনেরও সৃষ্টি করেন। তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে শাসনতন্ত্রের ভাষার এবং আইনের ব্যাখ্যা হয়। যদি শাসনতন্ত্র লইয়া কেন্দ্র ও প্রদেশ অথবা বিভিন্ন প্রদেশের পরস্পরের সঙ্গে সংবিধানগত কোন ব্যাপারে বিরোধ ঘটে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয় এই বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়া এই বিরোধের মীমাংসা করে। এইরূপে ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক। চতুর্থত, অনেক সময়ে কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক কাজও বিচারকদের করিতে হয়। পঞ্চমত, অনেক সময় শাসন-বিভাগ ও আইন-সভাকে পরামর্শ দিতে হয়।

বিচার বিভাগের কাজকর্ম

বিচারকগণ যাহাতে নিরপেক্ষভাবে আইন-অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন, সেইজন্য তাহাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়া একান্ত দরকার। শাসনবিভাগের কর্তাদের বে-আইনী কার্যকলাপ হইতে নাগরিকদের অধিকারগুলি রক্ষা করা বিচারকগণের একটি গুরুদায়িত্ব। এইজন্য তাহাদের নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। কিরূপে এই স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব? প্রথমত, নির্ভীক বিচারের জন্য এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, বিবেক অনুযায়ী স্বাধীন বিচারের জন্য বিচারকগণকে কেহ পদচ্যুত করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত, কতকালের জন্য নিযুক্ত হইবেন তাহার উপরও নিরপেক্ষ বিচার নির্ভর করে। বিশেষ কোন অন্যায় ও বে-আইনী কাজ না করিলে তাহাদের নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত চাকুরি করা চলিবে বলিয়া ব্যবস্থা থাকিলে তাহারা নিশ্চিন্ত মনে বিচার করিতে পারিবে। তৃতীয়ত, তাহারা যেন অর্থের প্রলোভনে অবিচার না করে এই উদ্দেশ্যে তাহাদের উপযুক্ত পরিমাণ বেতন দেওয়া উচিত। চতুর্থত, নিয়োগ পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যে তিনি চাকরির জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইয়াছেন, এরূপ না হয়। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে শাসন কর্তৃপক্ষ বিচারপতিগণকে মনোনীত করিয়া থাকেন। সুইজারল্যাণ্ডে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

বিচার বিভাগের গঠন, মনোনয়ন বা নির্বাচন

Questions to be discussed

1. Discuss the different departments of a government and their respective functions.

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ আলোচনা কর এবং তাহাদের প্রত্যেকের কাজকর্ম বর্ণনা কর।

2. Analyse the theory of Separation of Powers, Is this theory applicable in practice ?

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতিটি বিশ্লেষণ কর। এই তত্ত্বটি কি কার্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?

3. Discuss the Composition and functions of the Legislature.

আইনসভার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

4. Discuss the arguments for and against Bicameralism. Do you support the existence of a Second chamber ?

দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর। তুমি কি দ্বিতীয় কক্ষের অবস্থান সমর্থন কর ?

5. What are the functions of the Executive department of a government ?

সরকারের শাসন বিভাগের কার্যাবলী কি কি ?

6. Discuss the functions of the Judiciary. What measures are adopted to maintain the impartiality and independence of the Judiciary ?

বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। বিচার বিভাগের অপক্ষপাতিত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ?

৮

প্রতিনিধিত্ব, নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার

Representation, Electorate and Suffrage

প্রতিনিধিত্ব কাহাকে বলে (What is Representation ?)

গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি বাস্তবে কার্যকর করিবার প্রধান পথ নির্বাচকমণ্ডলী স্থির করা ও আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠানো। একনায়কতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন ও নির্বাচন বা প্রতিনিধি প্রেরণের কোন সমস্যা নাই, দেশে গণতান্ত্রিক সরকার থাকিলেই এই সমস্যার উদ্ভব হয়। গণতন্ত্রে সার্বভৌমশক্তির মালিক হইল জনসাধারণ। এই জনসাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভায় প্রতিনিধিদের পাঠাইয়া সেই সার্বভৌমশক্তি তাহাদের হাতে অর্পণ করে। নির্বাচনের অর্থ ভোটদান ও প্রতিনিধি প্রেরণ, এই কাজের মধ্য দিয়াই জনসার্বভৌমত্ব নিজেকে প্রকাশ করে। এই কারণেই গণতন্ত্রের অগ্রগতির বাস্তব পথ হইল ভোটের অধিকার প্রসার। আজকাল প্রায় সকলেই ইহা মানিয়া লইয়াছেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সকল নাগরিককেই ভোটাধিকার দেওয়া হইবে।

সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা যত বাড়িয়াছে ততই ধারণা হইয়াছে যে সরকারের আইনকানুন জনস্বার্থের পরিপন্থী হওয়া উচিত নয়। প্রাচীন কালের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকেরা প্রত্যেকে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ও সরকারী কাজকর্ম পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। পরবর্তী কালের বৃহদাকার রাষ্ট্রগুলিতে সরকারী কাজে সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ অসম্ভব হইয়া উঠিল ; ফলে নিয়মিত সময় অন্তর অন্তর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নাগরিকদের প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। এই সকল প্রতিনিধি প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের বিশ্বাস, চিন্তা ও ধারণাগুলি আইনসভায় পৌঁছাইয়া দেওয়ার বাহন। জনসাধারণ সচেতনভাবে ইহাদের আইনসভায় পাঠায়, তাই নিজেরাই ইহাদের কাজকর্ম মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়া পড়ে। ইহাকেই গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব (Representation) বলে।*

প্রতিনিধিত্বের মূল কথা হইল ইহাতে সরকারের কাজে দায়িত্বশীলতা আসে। এই কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের (Representative Government) অপর

*Representation is the process through which the influence which the entire citizenry or a part of them have upon governmental action is, with their express approval, exercised on their behalf by a smaller number among them with binding effect upon those represented. *Friedrich, Constitutional Government and Democracy*, P. 266

নাম দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government)। প্রতিনিধি-প্রেরণের উদ্দেশ্যই হইল সরকারের উপর দায়িত্ব আনয়ন। কোন প্রতিনিধি তাহার কাজের জন্য তাহার নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী, এইরূপে সমগ্র সরকার দেশের জনসাধারণের নিকট দায়ী। অপরদিকে নিজেদের প্রতিনিধিরা যে আইন করিয়াছে উহা মানিয়া লওয়াও জনসাধারণের দায়িত্ব।*

ভোটদানের অধিকার-সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ (Theories of the Nature of the Suffrage)

যাঁহারা ভোট দিয়া আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠান তাঁহাদের বলে নির্বাচকমণ্ডলী (Electorate)। ভোট দিবার ক্ষমতা নাগরিকদের প্রধান রাজনৈতিক অধিকার, এই অধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্ব আছে।

(ক) প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্ব (The Natural Rights Theory): এই তত্ত্ব অনুযায়ী নাগরিকের ভোট দানের অধিকার প্রকৃতিদত্ত ও অবিচ্ছেদ্য। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদই এই ধারণার ভিত্তি। চুক্তিতত্ত্বের মূল কথা হইল মানুষের রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পূর্বে সে প্রকৃতির রাজত্বে স্বাধীন ও মুক্তভাবে বসবাস করিত, প্রকৃতির আইনের দ্বারা তাহার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হইত। নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া যখন তাহারা রাষ্ট্র গঠন করে, তখন স্বভাবতই সেই রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে অংশ-গ্রহণ করা তাহার প্রাকৃতিক অধিকার, ইহা প্রকৃতিদত্ত প্রাচীন প্রাকৃতিক আইনেরই অংশ বিশেষ। আজকালকার পণ্ডিতেরা অবশ্য ইহা মানেন না। তাঁহাদের মতে ইহা প্রকৃতির দান নয়, রাষ্ট্রের সৃষ্টি, রাষ্ট্রই ভোটদানের অধিকার নাগরিকদের অর্পণ করিয়াছে।†

(খ) আইনী তত্ত্ব (Legal theory): এই তত্ত্ব অনুসারে ভোটের অধিকার কোন প্রাকৃতিক অধিকার নয়। ইহা এক প্রকার রাজনৈতিক অধিকার, রাষ্ট্র আইন করিয়া নাগরিককে এই অধিকার দিয়াছে। নির্বাচকমণ্ডলী দেশের শাসন পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গস্বরূপ, ভোটদান হইল দেশের ও দশের কাজ, সরকার পরিচালনায় সাহায্য করার কাজ। এই কারণে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন এবং ক্ষমতা

*"Delegation involves the choice of men, but representation involves also the choice of measures. Delegation in its completest form...assigns no limitation of tenure, and no conditions of the exercise of power. Representation implies both direction and control. Delegation requires the consent of the governed, whereas representation requires the fulfilment of their will." McIver, *The Modern State*, P. 203.

†"The fallacy in this theory results from confusing the ethical and the legal concept of law and rights. Only those possess the right to vote, in the legal sense, upon whom the State has conferred such right by law." Gettel, *Political Science*, P. 264.

আইনের দ্বারা নির্ধারিত। কে ভোট দিবে, কিরূপে দিবে, ইহা কোন নৈতিক অধিকারের বিষয় নয়, ইহা রাজনৈতিক প্রয়োজন, সুবিধা, সম্ভাব্যতা এই সকল বিষয় দ্বারা পরিচালিত।

(গ) নৈতিক তত্ত্ব (The Ethical Theory): এই তত্ত্ব অনুযায়ী ভোটের অধিকার হইল ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপায়, রাজনৈতিক বিষয়ে তাহার মতামত প্রকাশ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ। সরকারের সহিত সহযোগিতা দ্বারা নাগরিক নিজের ব্যক্তিত্ব উন্নত করে, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙিয়া সাধারণের কাজে নিজেকে বিস্তৃত করে।

(ঘ) উপজাতীয় তত্ত্ব (The Tribal Theory): প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও জার্মানীর ছোট ছোট উপজাতিদের মধ্যে প্রথমদিকে কেবলমাত্র নিজস্ব উপজাতির মধ্যে নাগরিকত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। সেই উপজাতির বাহিরের লোকদের নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্র গণ্য করিত না। এই ক্ষুদ্র উপজাতির গণ্ডীর মধ্যেই প্রথমে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। ভোটদান ছিল এই উপজাতীয় সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রার অংশ বিশেষ। উপজাতির লোক হওয়ার অর্থ হইল, রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া ও ভোটের অধিকার পাওয়া। একমাত্র নাগরিকেরাই ভোট দিতে পারিবে, ইহা এই উপজাতীয় তত্ত্বের ভগ্নাবশেষ।

(ঙ) সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্ব (The Feudal Theory): ইউরোপের মধ্যযুগের শেষভাগে এইরূপ তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল যে ভোটদানের অধিকার নির্ভর করে নির্দিষ্ট সামাজিক পদমর্যাদার উপর (social status), অতীতে সাধারণভাবে জমির মালিকানা থাকিলে এই অধিকার দেওয়া হইত। কোন কোন রাষ্ট্রে এখনও সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়—ইহা সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্বের অবশেষ।

এই সকল তত্ত্বের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্ব এবং আইনী তত্ত্ব কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া ভোটের অধিকার সঙ্কোচন করিতে চায়। কিন্তু বর্তমান কালে সকল দেশেই অধিকাংশ নাগরিককে ভোটের অধিকার দিবার ঝোঁক দেখা দিতেছে। গার্নার বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বেশির ভাগ পণ্ডিতই ইহাকে প্রাকৃতিক অধিকার মনে করেন না, রাষ্ট্র-প্রদত্ত রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া গণ্য করেন।*

"The view which practically all writers on political science adopt today in regard to the nature of the suffrage is that it is an office or function which is conferred by the state upon only such persons as are believed to be most capable of exercising it for the public good, and not a natural right which belongs without distinction to all citizens of the State." Garner, *Political Science and Government*, P. 498-499.

ভোট দেওয়া কি নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য অথবা আইনগত বাধ্যবাধকতা —এই লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা একমত নন। অনেকে বলেন যে নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছা পূর্ণরূপে জানার উদ্দেশ্যে ভোটদান বাধ্যতামূলক করা দরকার। বিপরীতপক্ষে, ভোটদানের ক্ষমতাকে যদি নাগরিকের অধিকার বলিয়া মনে করা হয়, তবে মানিতে হয় যে, সে ইচ্ছামত এই অধিকার প্রয়োগ করিবে বা করিবে না। বাস্তবে বাধ্যতামূলক ভোটদান মাত্র অল্প কয়েকটি রাষ্ট্রে দেখা যায়, যেমন, বেলজিয়াম, রুমানিয়া, আর্জেন্টিনা, সুইজারল্যাণ্ডের কোন কোন ক্যান্টন প্রভৃতিতে। অনেকে মনে করেন যে, বাধ্যতামূলক ভোটদান নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনের মান নামাইয়া দেয়, দুর্নীতিগ্রস্ত ও সরকারবিরোধী করিয়া তোলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এক পণ্ডিত বলেন যে, After all, a man has a right not to use a right, and is not obliged to be interested in political issues ; he may be short-sighted and foolish, and cannot complain if things don't go according to his whishes, but voting is his own business—that is of the essence of democratic freedom."†]

সর্বজনীন ভোটাধিকার (The Universal adult Suffrage): ভোটের অধিকার পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বিপ্লব ও রক্তপাত ঘটিয়াছে। অতীতে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক ব্যক্তি, জনসংখ্যার নির্দিষ্ট একটি অংশ ভোট দিতে পারিত, ক্রমশ ভোটের অধিকার দেশের অধিকতর নাগরিকদের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে। এইরূপেই বর্তমান যুগে, ভিক্টর হুগোর ভাষায় সর্বজনীন ভোটাধিকার সাধারণ ব্যক্তির মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া তাহাকে নাগরিক করিয়া দিয়াছে (Adult suffrage has crowned man as the citizen)। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমশ বেশি সংখ্যক ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভোটাধিকার প্রসারের এই ধারা দ্রুততর হইয়াছে। অধ্যাপক গার্নারের ভাষায় বলিতে গেলে :

"Perhaps the most remarkable phenomenon in the history of democracy in the past century has been the steady evolution of the suffrage from a narrow, frequently unequal, and indirect system to one which is now virtually universal, direct and equal. One restriction after another, religious, economic, racial and sexual have disappeared before the rolling tide of democracy until today few barriers remain."

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে একদল পণ্ডিত সর্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন করেন এবং আর একদল পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে নানাবিধ যুক্তি দেখান। যাঁহারা সমর্থন করেন তাঁহাদের চিন্তা বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি যুক্তি পাওয়া যায়। প্রথমত,

† Soltan. *An Introduction to Politics*, P. 885

গণতন্ত্র বলিলে বোঝা যায় জনগণের সার্বভৌমত্ব, তাই জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ভোটের অধিকার পাইবে। রুশো (Rousseau) বলিয়াছেন "সার্বভৌম শক্তি জনসাধারণের মধ্যে নিহিত; অতএব প্রত্যেক নাগরিকের সেই সার্বভৌম শক্তি পরিচালনা করার অধিকার আছে। ভোট দিবার জন্মগত অধিকার উহারই অপরিহার্য পরিণতি।" দ্বিতীয়ত, সরকারের আইনকানুন সকলকে প্রভাবিত করে, তাই প্রত্যেকেরই ভোটের অধিকার থাকা দরকার। এই অধিকারের মাধ্যমেই সে সরকারী আইনকানুন প্রণয়নকে প্রভাবিত করিতে পারে; "what touches all must be decided by all." তৃতীয়ত, ভোটের অধিকার যদি নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে কার্যত দেশ সেই শ্রেণীর সুবিধা অনুযায়ী শাসিত হইবে। সীমাবদ্ধ নির্বাচকমণ্ডলী সর্বসাধারণের কল্যাণে দেশ শাসন করিবে না। ভোটের অধিকার না পাইলে সরকারের সুবিধাগুলি হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইবে। অধ্যাপক লাস্কির (Laski) ভাষায় "Exclusion from power means exclusion from the benfits of power." ইতিহাসে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যায় যে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার না-থাকিলে আইনকানুন তাহাদের স্বার্থে রচিত হয় না। চতুর্থত, নাগরিকের যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্ফুরণ সম্ভব সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে। মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ প্রসার লাভ করে যদি সে সামাজিক বিষয়ে যোগদান করার সুযোগ পায়। নাগরিক ভোটের অধিকার পাইয়া সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করিলে সে রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিবে। সর্বজনীন ভোটাধিকারই দেশে সামগ্রিক রাজনৈতিক সচেতনতা আনিতে পারে।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতেরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমত, অভিজাত যুক্তি (Aristocratic argument)। মেকলে, লেকী ও স্যার হেনরি মেইন (Macaulay, Lecky and Sir Henry Maine) প্রভৃতি লেখকগণ মনে করিতেন যে অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভোটের অধিকার দেওয়া অবিবেচিত এবং বিপদজনক। মেকলের মতে ইংলণ্ডে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করিলে "a few half-naked fishermen would divide with the owls and foxes the ruins of the greatest of Furopean cities." লেকী তাহার *Democracy and Liberty* গ্রন্থে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অশিক্ষিত জনসাধারণের শাসনে দেশের প্রগতি কোনমতেই সম্ভব নয়। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে "ultimate source of power should belong to the poorest, the most ignorant, the most incapable, who are necessarily the most

numerous is a theory which assuredly reverses all the past experiences of mankind." স্যার হেন্‌রি মেইনের মতে সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবে। তাঁহার মতে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রচলনের পূর্বেই বিজ্ঞানের প্রধান আবিষ্কারগুলি হইয়া গিয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্য-জনক। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে, "universal suffrage, which today excludes free trade from the United States, would certainly prohibited the spinning jenny and the power loom."

এই সকল যুক্তি অতিশয়োক্তি করিয়াছে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে এমন প্রমাণ বিশেষ পাওয়া যায় না যে সর্বজনীন ভোটাধিকার কোন দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়াছে। তবুও এই সকল সমালোচনা একটি বিশেষ সত্য প্রকাশ করে : জনসাধারণের হাতে শাসনভার অর্পণ করার পূর্বে তাহাদের শিক্ষিত ও যোগ্য করিয়া তোলা দরকার। জন স্টুয়ার্ট মিলের বক্তব্য একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না যে, "universal education must precede universal enfranchisement."

দ্বিতীয়ত, অনেকেই মনে করেন যে ভোটদানের অধিকার তাহাদেরই থাকা উচিত যাহাদের কিছু সম্পত্তি আছে এবং যাহারা রাষ্ট্রকে কর দেয়। এই যুক্তির দুইটি কারণ : (ক) সম্পত্তি থাকিলে ধরা যায় যে তাহারা শিক্ষা-দীক্ষায় মোটামুটি ভোটদানের উপযুক্ত ; (খ) সম্পত্তি নাই এরূপ ব্যক্তিদের ভোটের অধিকার দিলে শীঘ্রই দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ পাইবে। করদানগত যোগ্যতা সম্বন্ধে মিল বলেন, যাহারা কর দেয় না তাহারা অপরের দেওয়া কর-ভাণ্ডার লইয়া শাসন চালাইলে অপব্যয়ী হইবে [illegible]ই ব্যয়সঙ্কোচের চেষ্টা করিবে না। তাঁহার ভাষায় "Those who pay no taxes, disposing by their votes of other people's money, have every motive to be lavish and none to economise... The voting of taxes by those who do not themselves contribute is a violation of the fundamental principle of free government ; representation should be coextensive [illegible]ation."

সাধারণভাবে বলা যায় যে উপরের এই যুক্তিটি খুবই প্রতিক্রিয়াশীল।* সমাজে কঠোর শ্রেণী-পার্থক্য থাকিলে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তির দারিদ্র্য তাহার রাজনৈতিক যোগ্যতার পরিমাপ হইতে পারে না। করদানের যোগ্যতা থাকা উচিত এই যুক্তি অনেকাংশে সঠিক। রাষ্ট্র স্বভাবতই কর পাইতে পারে, কর না পাইলে সরকারের ব্যয় মিটানোও সম্ভব নয়। কিন্তু

* "Laski বলিয়াছেন "the legal order is a mark behind which a dominant economic interest secures the benefit of political authority."

রাষ্ট্রেরই দেখা উচিত প্রতিটি নাগরিক কর দিবার উপযুক্ত আয় যেন করিতে পারে। সেই বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া উহাদের ভোটাধিকার সঙ্কোচন করা উচিত কি?

তৃতীয়ত, অনেক লেখকই শিক্ষাকে ভোটদানের অধিকারের ভিত্তি করিতে চাহিয়াছেন। ইহার স্বপক্ষে বিখ্যাত প্রবক্তা ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল: "I regard it as wholly inadmissible that any person should participate in the suffrage without being able to read and write, and I will add, perform the common operations of arithmetic...." এই যুক্তির বিপক্ষে বলা হয় যে, রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি নিছক স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের উপর নির্ভর করে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ নির্ধারিত হয়, গ্রাহাম ওয়ালেসের (Graham Wallas) ভাষায়, আন্দাজ, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা (intuitions, passions and desires)। শিক্ষাদীক্ষা অপেক্ষা অভাবের চেতনাই ভোটদাতার দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলে। শিক্ষার অভাবের দরুন নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকারচ্যুত করা তাই উচিত নয়।

চতুর্থত, অনেকে বলিতেন যে স্ত্রীলোকদের ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত নয়। তাঁহারা যোগ্যতায় নিকৃষ্ট, রাজনীতি বিষয়ে উদাসীন, পুরুষদের দ্বারা সহজে প্রভাবিত, সেনাবাহিনীতে যোগদানের অনুপযুক্ত—এই সকল যুক্তিতে অনেকে এখনও স্ত্রী-ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। স্ত্রীভোটাধিকারের সর্বাধিক সমর্থক ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি এই সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা যোগ্যতাহীন নহে, ভোটের অধিকার পাইলেই তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়িবে, অনেক পুরুষও স্ত্রীলোকের মতামতদ্বারা প্রভাবিত, সৈনিক না হই[illegible] স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে রাষ্ট্রকে অনেক সাহায্য করি[illegible]

সর্বজনীন ভোটাধিকার সর্ববাদিসম্মত [illegible] আজকাল [illegible] কোন কোন শ্রেণীর লোককে সম্পূর্ণ বা শর্তসাপেক্ষে ভোট[illegible] দেয় না; "certain exclusions required by positive reason[illegible] do not conflict with this principle." যেমন নাবালক, উন[illegible] দেউলিয়া, ভবঘুরে, কতকগুলি বিশেষ পদাধিকারী, যুদ্ধক্ষেত্রে নিযু[illegible] ব্যক্তি। সর্বজনীন ভোটাধিকার থাকিলেও সাধারণত ইহাদের ভোটাধি[illegible] দেওয়া হয় না।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার (Women suffage) : দেশের স্ত্রী-জনসাধারণকে ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে একদা তীব্র বাদানুবাদ হইয়াছিল। আধুনিক কালের সকল গণতান্ত্রিক সংবিধানেই (সুইজারল্যাণ্ড ব্যতীত) দেশের স্ত্রী-নাগরিকদের পুরুষের ন্যায় সমান ভোটাধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদের ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত নয় এই বক্তব্যের পিছনে যুক্তিগুলি আলোচনা করা যাউক। প্রথমত, অনেকে বলেন যে শ্রেণী হিসাবে স্ত্রী জাতি পুরুষ জাতি অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতায় নিকৃষ্ট এবং ফলে তাঁহারা দেশের রাজনৈতিক জীবনে, উহার ঘটনাবর্তে, বিশেষ কোনরূপ প্রভাব আনিতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের ন্যায় রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামায় না, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁহারা সাধারণভাবে উদাসীন। তাঁহাদের ভোটের অধিকার দিলেও তাঁহারা উহা ব্যবহার করিবেন না। তৃতীয়ত, যদি বা তাঁহারা ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেনও, তবুও উহা তাঁহাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবে না ; কারণ—স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের নিকট হইতেই রাজনৈতিক খবরাদি জানিয়া মতামত স্থির করিবেন। তাই স্ত্রীলোকদের ভোটের অধিকার দেওয়া এবং বাড়ির পুরুষদের দুইটি করিয়া ভোটাধিকার দেওয়া একই কথা। চতুর্থত, ইহাও বলা হয় যে, ভোটের অধিকার তাঁহারাই পাইতে পারেন, যাঁহারা রাষ্ট্রের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। রাষ্ট্রের রক্ষায় স্ত্রীলোকের শক্তি কম, তাই রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বা অধিকার কিছুই নাই।

বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

স্ত্রী-ভোটাধিকারের স্বপক্ষেও বহু যুক্তি দেখান হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু বিদুষী রমণী এই ভোটাধিকারের জন্য দীর্ঘকাল আন্দোলন করিয়াছেন। [illegible]খ্যাত ইংরাজ মনীষী জন্ স্টুয়ার্ট মিল স্ত্রী-ভোটাধিকারের স্বপক্ষে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কোন ব্যক্তি স্ত্রীলোক বা পুরুষ ইহা একান্ত গৌণ, ব্যক্তির উচ্চতা, চুলের রঙ প্রভৃতি বাহ্য চিহ্ন দ্বারা তাহার নৈতিক ও [illegible]শক্তির উৎকর্ষ সম্পর্কে কিছু বোঝা যায় না। দ্বিতীয়ত, সরকারের নী[illegible] ও [illegible]কর্ম দেশের [illegible] ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও সমানভাবে প্রভাবিত করে, তাই যে প্রতিনিধিরা আইন [illegible] করিবেন তাঁহাদের নির্বাচনে স্ত্রীলোকদেরও সমান অধিকার থাকা দরকার। মিলে[illegible] ভাষা[illegible] বলিতে গেলে "Men, as well as women need political rig[illegible] [illegible]der that they may govern, but in order that they ma[illegible] [illegible]-governed." তৃতীয়ত, বিদ্যা, বুদ্ধি ও মননশীলতায় স্ত্রীলোকেরা কো[illegible] হইতেই পুরুষ অপেক্ষা হীন নহেন। তাঁহারা সম্পত্তি রক্ষা করেন, কর দেন, ব্যবসায় পরিচালনা করেন এবং সকল বিষয়েই পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় নামেন। সুতরাং ভোটের অধিকার তাঁহারা সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না, এই কথা মানিয়া লওয়া চলে না। চতুর্থত, স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের মতামতে প্রভাবিত হন ঠিকই, কিন্তু অনেক পুরুষও তাঁহার স্ত্রী-বন্ধু বা স্ত্রী-আত্মীয়দের মত অনুসারে ভোট দেন। পঞ্চমত, স্ত্রীলোকেরা ভোটের বিষয়ে নিস্পৃহ,

কিন্তু অনেক পুরুষও ভোটদানকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বা ঝঞ্ঝাট বলিয়া মনে করেন। প্রথম দিকে স্ত্রীজাতি ভোটের বিষয়ে উৎসাহ না দেখাইলেও ক্রমশ তাঁহারা রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিবেন ; "it is a benefit to human beings to take off their fetters even if they do not desire to walk." সর্বশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক না হইয়াও স্ত্রীলোকেরা রাষ্ট্রকে বহু প্রকারে সাহায্য করিতে পারে। মিলের মতে, পুরুষের 'স্বার্থপরতা এবং দুরারোগ্য সংস্কার'-এর (selfishness or inveterate prejudice') দরুনই তাঁহারা স্ত্রী-ভোটাধিকারের বিরোধিতা করিতেছেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, "before the lapse of another generation, the accident of sex, no more than the accident of skin, will not be deemed a sufficient justification for depriving its possessor of the equal protection and just privileges of a citizen."

ভোট দেওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য (The importance and implications of the Right to Vote) : ভোট দেওয়া একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দান করা নাগরিকের একটি অবশ্য কর্তব্য। ভোটদাতার এই অধি[illegible]ার অর্জন করিবার ও যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। যাহাদের এই ক্ষমতা নাই, তাহাদের ভোটদানের ক্ষমতা দেওয়া অনুচিত। এইজন্যই প্রত্যেক সভ্যদেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত ও বিদেশীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। গণমতের উপরেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভি[illegible] গণমত কার্যে পরিণত করিবার একমাত্র উপায় সর্বজনীন ভোটদ[illegible]। ইহার সাধ্য[illegible] জনসাধারণ শাসনক[illegible] সক্রিয় অংশ[illegible]রিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্য[illegible]ণের সম্মিলিত সম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সম্মতি তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। স্তরাং জনসাধার[illegible]ার না থাকিলে গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়া পড়ে। শাসনকর্তারা যাহ[illegible] না উঠে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিতে না পারে সেইজন্য জনগ[illegible]কার একান্ত আবশ্যক। ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া জনগণ দায়িত্ববোধহীন ও অকর্মণ্য সরকারকে অপসারিত করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে। কাহাকে ভোট দিলে সকল নাগরিকের স্বার্থ রক্ষা হইবে তাহা বিচার করিয়া তবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হইবে। হুজুগের বশে, ভয়ে অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থে ভোট দেওয়া গুরুতর অপরাধ। এইরূপ গর্হিত কার্য যে করে সে নাগরিক হওয়ার অনুপযুক্ত। ইহাতে আইনের চক্ষে অপরাধী না হইলেও ভোটদাতা তাহার বিবেকের নিকট অপরাধী এবং রাজনৈতিক কর্তব্যহীন বলিয়া ঘৃণ্য

ভোটাধিকার গণতন্ত্রের স্বরূপ

হয়। ভোটপ্রার্থীদের দোষ ও ক্ষমতা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া যে প্রতিনিধি হইবার পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত তাহাকে ভোট দেওয়াই প্রত্যেক দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে ন্যায্যভাবে ও সুবিবেচনার সহিত ভোটাধিকার ব্যবহার করার উপর।

অনেকেই মনে করেন যে ভোট দেওয়া সামান্য কাজ। খুশিমত কাহাকেও ভোট দিলেই কর্তব্য শেষ হইয়া গেল। কিন্তু এইরূপ মনে করা ভুল। ভোটাধিকারের মধ্যে একটা গভীর অর্থ আছে। একজন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করার মধ্যেই বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি স্থাপিত। গণতন্ত্রকে বলা হয় "জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণ কর্তৃক, জনসাধারণের শাসন"। এই কথাটার সত্যতা নির্ভর করে প্রতিনিধি নির্বাচন প্রথার উপর। বর্তমান যুগের বড় বড় রাষ্ট্রে প্রাচীন কালের গ্রীসীয় নগররাষ্ট্রের মত সকল নাগরিক মিলিত হইয়া প্রকাশ্য সভায় ভোট দিয়া আইন পাশ করিতে পারে না। এইজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্র ব্যবস্থায় জনসাধারণ তাহাদের মুখপাত্র হিসাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

গণমতের সক্রিয় প্রকাশ

এই প্রতিনিধি নির্বাচনকেন্দ্রের সকল ভোটদাতার পক্ষ হইয়া তাহাদের ইচ্ছা এবং মতামত আইন পরিষদে প্রকাশ করিবার এবং সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য বিতর্কে যোগ দিয়া ও যুক্তি দেখাইয়া অন্যান্য সভ্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিবে। সুতরাং ভোট দেওয়ার মধ্যে জনসাধারণের হাতে শাসননীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিহিত আছে। দেশের শাসন [illegible]া কাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে, কি কি আইন পাশ হইলে, অথবা বাতিল হইলে [illegible]ধিত [illegible] জনসাধারণের কল্যাণ হইবে, কি কি জনহিতকর কার্যে সরকার মনোযোগ দিবে [illegible] নৈতিক ও [illegible] উন্নতির জন্য কি কি নীতি অবলম্বন করা উচিত হইবে, প্রভৃতি সকল [illegible] টদাতা ভোটাধিকারের মাধ্যমে তাহার মতামত প্রকাশ করিতে পারে। বর্তমান যুগে সকলেই স্বীকার করেন যে রাষ্ট্রের নাগরিকের সমষ্টিই সার্বভৌম [illegible] অধিকারী। সুতরাং নাগরিকেরা ব্যক্তিগতভাবে এই ভোটদানে [illegible] ই সার্বভৌম শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়া থাকে। ফরাসী দার্শনিক রু[illegible] ইচ্ছা বা গণতন্ত্রকে (general will) রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভোট দানের মাধ্যমেই সেই শক্তির বাস্তব প্রকাশ ঘটে।

ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার (Universal Suffrage in India) **:** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন আইনসভার সদস্যদের উপর মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিবার ও শাসনকার্য

চালাইবার ভার দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণকে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ভোটদাতা হইতে হইলে (১) ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে, (২) ২১ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে, (৩) বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুর্নীতি বা নির্বাচন সংক্রান্ত অন্য অপরাধের জন্য ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া চলিবে না; এবং (৪) সে যে-অঞ্চলের ভোটদাতাদের তালিকাভুক্ত হইতেছে সাধারণভাবে তাহাকে সেই অঞ্চলের বাসিন্দা হইতে হইবে।

সংসদ বা রাজ্যের বিধানসভার কোন পরিষদে প্রার্থী (candidate) হিসাবে দাঁড়াইবার যোগ্যতাও এই ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার। লোকসভা ও বিধানসভায় নির্বাচন প্রার্থীদের বয়স কমপক্ষে ২৫ বৎসর হওয়া চাই। রাজ্যপরিষদ ও বিধান পরিষদে নির্বাচন প্রার্থীদের বয়স অন্যূন ৩০ বৎসর হইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি হইতে হইলে কমপক্ষে ৩৫ বৎসর বয়স হওয়া দরকার।

দেশের সকল ভোটদাতা কর্তৃক, পাঁচ বৎসর অন্তর, নূতন করিয়া কেন্দ্রের ও রাজ্যের আইনসভাগুলির সকল সদস্যদের একযোগে নির্বাচনকে 'সাধারণ নির্বাচন' (general election) বলে। একটি বা দুইটি সভ্যপদ শূন্য হইলে ইহা পূরণ করিবার জন্য যে-নির্বাচন হয় তাহাকে 'উপ-নির্বাচন' (by-election) বলে। যিনি ভোট দেন তাঁহাকে বলা হয় 'ভোটদাতা' (voter)। সকল ভোটদাতাকে একত্রে নির্বাচকমণ্ডলী (electorate) বলা হয়। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সমগ দেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এক একটি অঞ্চলের ভোটদাতাগণ ... ও রাজ্যে নির্দিষ্ট-সংখ্যক প্রতিনিধি ... entative) ... ন। এইরূপে এক একটি অঞ্চলকে 'নির্বাচন... নী এলাকা' (...stituency) বলা হয়।

দশ বৎসর অন্তর যে আদম-... কগণনা বা census) হয় তাহার ভিত্তিতে জনসংখ্যা হিসাবে নির্ব... রা হয়। লোকসভার নির্বাচনে ৭ লক্ষ ২০ হাজার অধিবাসীর জন্য ..., আবার রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ৭৫ হাজার অধিবাসীর জন্য একজন সদস্য; মোটামুটি এই হিসাবে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারিত করা হয়। তপশীলী উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষিত আছে, এই আসনে তপশীলী জাতি বা উপজাতির (Scheduled Castes or Tribes) লোক ব্যতীত অপর কেহ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারিবে না। সংবিধান সুরু হওয়ার দশ বৎসর পর হইতে সংরক্ষিত আসনের (reservation of seats) ব্যবস্থা থাকিবে না। অবশ্য বর্তমানে এইরূপ আসন-সংরক্ষণ রাখা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের ব্যক্তিদের (Anglo-Indians) উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নাই, তাহা হইলে তিনি দুইজন ইঙ্গ-ভারতীয়কে সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতে পারেন।

প্রত্যেক 'নির্বাচনী এলাকা'তে (constituency) যত ভোটদাতা (voter) আছেন তাঁহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহাকে 'নির্বাচক-তালিকা' (voter list) বলে। এই নির্বাচক-তালিকায় নাম না থাকিলে কেহ ভোট দিতে পারে না। একই ভোটদাতা লোকসভা ও বিধানসভা উভয় সভাতেই প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারী। সেই সঙ্গে সেই ব্যক্তি, নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকিলে, বিধান পরিষদের স্নাতক নির্বাচনক্ষেত্র, শিক্ষক নির্বাচনক্ষেত্র ও স্বায়ত্তশাসন নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটদাতা হইতে পারেন। এই সম্পর্কে বলা দরকার যে, একই ধরনের নির্বাচন-ক্ষেত্রে সেই ভোটদাতার নাম কোনক্রমেই একটির বেশি নির্বাচক-তালিকায় থাকিতে পারে না। যেমন উদাহরণস্বরূপ কলিকাতার কোন অঞ্চলের নির্বাচনী এলাকায় তালিকাভুক্ত ভোটদাতা বীরভূম বা এইরূপ অপর কোন অঞ্চলের নির্বাচন এলাকায় তালিকাভুক্ত হইতে পারিবেন না।

নামের তালিকা প্রস্তুতের পর নির্বাচিত হইতে ইচ্ছুক ভোটদাতাগণ মনো[illegible]য়ন-পত্র (nomination paper) দাখিল করেন এবং নির্দিষ্ট দিনে রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) সকল মনোনয়ন-পত্র গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা বিচার (scrutiny) [illegible]। তাহার পর ভোট গ্রহণের তারিখ ও ভোটকেন্দ্রগুলি (polling centre) [illegible]তাদের জানাইয়া দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কোন প্রার্থী মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহার [illegible]তে পারেন। [illegible]র্বাচনী এলাকা হইতে যতজন সদস্য নির্বাচিত হই[illegible] প্রত্যেক ভোটা[illegible] ভোট থাকিবে। কোন ভোটদাতা একজন প্রার্থীকে একটির বেশি ভোট [illegible]তে পারিবেন না।

ভোটদাতাগণ নিজ নিজ ভোট[illegible] হইয়া পোলিং অফিসারের নিকট হইতে ভোটপত্র বা ব্যালট পেপা[illegible] গ্রহণ করিয়া যে প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে চাহেন সেই প্রার্থীর [illegible] চিহ্ন দিয়া ভোট দিয়া আসিবেন নির্বাচনের পরে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সকল প্রার্থীকে হিসাব দাখিল করিতে হইবে ভোটগ্রহণ কালে কোন দুর্নীতি আদালতে প্রমাণিত হইলে অথবা কোন বে-আইনী ব্যয় প্রমাণিত হইলে তাঁহার নির্বাচন বাতিল হইয়া যাইবে; অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর সেই ব্যক্তি আর নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবে না।

নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটদাতাদের তালিকা প্রণয়ন, ভোট গ্রহণের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য শাসনতন্ত্রে একটি নির্বাচন-পরিষদ (Election Commission

স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। কোন নির্বাচন সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইলে, উহা মীমাংসার জন্য 'নির্বাচনী আদালত' স্থাপন ক্ষমতা এই নির্বাচন-পরিষদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি এই নির্বাচন-পরিষদের সদস্যসংখ্যা স্থির করিয়া দেন এবং একজন মুখ্য নির্বাচনকর্তাও নিয়োগ করিয়া থাকেন।

Questions to be discussed

1. What is meant by Representation ?

প্রতিনিধিত্ব বলিতে কি বোঝায় ?

2. Discuss why a citizen should have the right to vote.

নাগরিকের ভোটাধিকার থাকা উচিত কেন ?

3. Discuss the arguments for and against Universal Adult Suffrage.

সর্বজনীন ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ দেখাও।

4. Explain the arguments for and against women suffrage.

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি দেখাও।

৯

জনমত ও রাজনৈতিক দল

Public Opinion and Political Parties

জনমত কাহাকে বলে (What is Public Opinion) : সচেতন জনমতের সৃষ্টি করিয়াই গণতন্ত্রকে সফল করা যায়। তাই গণতন্ত্র প্রসারের পর হইতে জনমত সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। সরকারপক্ষ চেষ্টা করেন জনমত জানিতে। আর বিভিন্ন দল চেষ্টা করে জনমত গঠন করিতে। শাসকশ্রেণীর কাজকর্ম জনমতের দর্পণে প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে জনমতের পরিবর্তন হইলে সেই অনুযায়ী শাসকদলও নিজস্ব নীতি পরিবর্তন করেন। ইহাতেই গণতন্ত্রের গতি অব্যাহত থাকে। ম্যাকাইভারের ভাষায় বলিতে গেলে "This incessant activity of popular opinion is the dynamics of democracy," সাধারণ ভাষায় আমরা সকল নাগরিকের মতকেই জনমত বলি। কিন্তু কোন বিষয়েই সকলে একমত পোষণ করে না। যে-কোন একটি বিষয়ে দেশের বিভিন্ন দলের লোকের, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে। প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই যে, একটি বিষয় লইয়া দুইটি মতের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সুতরাং, সকলের একমত হইলে তবে জনমত গঠিত হইবে, এইরূপ মনে করা ভুল। যে-কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যাপারে সকলে যদি একমত হয় তবে তাহা খুবই ভাল। কিন্তু কার্যত পৃথিবীতে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি [illegible] বলিয়া শত ভাল প্রস্তাবেও সকলে একমত হয় না। কোন বিষয়ে সকলে একমত না হ[illegible] গঠন সম্ভব। [illegible]কেই মনে করেন যে, অধিকাংশের মতই জনমত। [illegible] গণতান্ত্রি[illegible]র মতের দ্বারাই দেশ শাসিত হয়। কিন্তু দেশের জন[illegible]ণের অধিকাংশের মতেই যে জনমত গঠিত হইবে, তাহাও [illegible] না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যদি নিজেদের সুখ-সুবিধার জ[illegible]লের স্বার্থ বিসর্জন করে, তবে তাহাকে জনমত বলা যায় না। জন[illegible]ন্তা করিয়া এমন কি সংখ্যালঘু দলের স্বার্থ বজায় রাখিয়া কোন একটি বিষয় সম্পর্কে সুগঠিত যে-মত দেশের বেশির ভাগ লোক পোষণ করে, তাহাই জনমত। দেশের নেতাগণ নিজেদের সুচিন্তিত মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া, তাহাদিগকেও সেই মতভুক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করে। এইভাবেই জনমত গঠিত হয়। সকলে যে মতটিকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবে, তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু মতটির সারাংশ গ্রহণ করিলেই জনমত গঠিত হইতে পারে।

জনসাধারণ কাহাকে বলে

মত কাহাকে বলে

জনমত সম্বন্ধে এই ধারণা চারিটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, জনসাধারণ সরকার সম্পর্কে আগ্রহী; দ্বিতীয়ত, জনসাধারণ জানে সে কি চায়; তৃতীয়ত, জনসাধারণ যাহা চায় তাহা প্রকাশের ক্ষমতা উহার আছে; এবং চতুর্থত, জনসাধারণের ইচ্ছা আইনে পরিণত হইবে। অর্থাৎ জনসাধারণ মত গঠন করিতে ও প্রকাশ করিত সক্ষম, এবং জনমত নিজেকে সরকারী নীতিতে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম।

এই সকল বিষয় ধরিয়া লইলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায়: ঠিক কাহাকে জনমত বলে? সাধারণভাবে জনমত বলিলে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটিকে বুঝায়; (ক) কোন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা; (খ) কোন একটি বিষয়ে জনসাধারণের বিশ্বাস, এবং (গ) ইচ্ছা। উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইবে।

জনমত কাহাকে বলে

(ক) কোন একটি ঘটনার উল্লেখ মাত্র: 'সোভিয়েট রুশিয়া চাঁদে মানুষ পাঠাইয়াছে'। (খ) 'বিশ্বাস' হইতে হইলে কেবল ঘটনার উল্লেখ করিলে চলিবে না, সেই বিষয়ে তাহার যে-কোন প্রকার মতামতও দেখা দিবে: 'আমেরিকা শীঘ্রই কিউবা আক্রমণ করিবে না'। (গ) 'ইচ্ছা' বলিলে কেবলমাত্র ঘটনার উল্লেখ বা বিশ্বাস বুঝায় না, কোন কিছু করা দরকার ইহাও প্রকাশ পায়: পর্তুগাল সরকারের অধীনতা হইতে গোয়ার মুক্তির জন্য ভারতের যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত—হাঁ কি না'?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনমত বলিলে প্রধানত তৃতীয় ধরনের বিষয়কে (ইচ্ছাকে) বুঝায়, কারণ, জনমতের উদ্দেশ্য সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করা। অধ্যাপক [illegible] ভাষায় বলিতে গেলে "Polit[illegible] st concern[illegible] public opinion as will - which typically [illegible] statute [illegible] administration."

গণতন্ত্র ও জনমত (Demo[illegible] and Public Opinion): সুশিক্ষিত ও সুগঠিত জনমতের সৃষ্টি না [illegible] সফল হইতে পারে না। এই কথাটা বিখ্যাত দার্শনিক রুশোও [illegible] প্রসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের মঙ্গলে[illegible] কর্তৃক জনসাধারণের শাসনই গণতন্ত্র।

সদাজাগ্রত জনমত গণতন্ত্র পরিচালনার অঙ্গস্বরূপ

জনমতই গণতন্ত্রের পরিচালক। আজকাল জনমতকে ভগবানের মত বলা হয় (The Voice of the People is the Voice of God)। এইজন্যই রুশো বলিয়াছেন যে, সার্বভৌম শক্তির উৎস সর্বসাধারণের ইচ্ছাশক্তিতেই নিহিত আছে। যে-রাষ্ট্রে সুগঠিত জনমত নাই, সেই রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন অচল। জনমতের বিরুদ্ধে যাইতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নাই। বিখ্যাত লেখক হেনরী মেইন্ বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ

সিংহ প্রবল পরাক্রান্ত শাসক বলিয়া গণ্য হওয়া সত্ত্বেও জনমতের বিরুদ্ধে যাইতে পারিতেন না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বা ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকেও জনমত মানিয়া চলিতে হয়। যখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনী ইডেন জনমতের বিরুদ্ধে মিশর দেশ আক্রমণ করিলেন, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। গণমতকে উপেক্ষা করিয়া শাসন চালাইলেই তাহা গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইবে। মুসোলিনী ফ্যাসিস্ত দলের সাহায্যে ইতালি দেশ এবং হিটলার নাজীদলের সাহায্যে জার্মানী দেশে কিছুকালের জন্য জনমত দাবাইয়া রাখার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই দেশে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক, শ্রেণীগত বা দলীয় স্বার্থের ষড়যন্ত্রে বা বিদেশী বাজার চক্রান্তে জনমত কিছুকালের জন্য দমিত থাকিতে পারে, কিন্তু চিরকালই এইরূপ থাকে না। গণতন্ত্র হইল প্রকৃত গণমতের দ্বারা দেশশাসন।

শক্তির কোন আধিক্য দেখা দেয় না

গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জনমত আরও দুইটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট মত প্রকাশের ব্যবস্থা থাকিলে কোন শক্তির আধিক্য বা শাসনের বিকৃতি দেখা দিতে পারে না। সরকার হইল শক্তির সংগঠন। অন্যান্য প্রকার সরকারে শক্তি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু গণতন্ত্রে নানা কেন্দ্রে এই শক্তি কিছু কিছু পরিমাণে ছড়ানো থাকে। যেমন আইন বিভাগে, দলের মধ্যে, শাসনবিভাগে, বিচারবিভাগে, দলের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠীতে, বিরোধী দলগুলির হাতে—প্রভৃতি নান[illegible]ন্দ্রে শক্তি ভাগ হইয়া থাকে। বিভিন্ন মত তাই গণতান্ত্রিক কাঠামোতে [illegible] বিরাজ করে ([illegible] hospitality t[illegible]rality of ideas)। সরকারের উপর কেহ অধিক [illegible] রে না, একটি [illegible] কন্দ্র অপর কেন্দ্রকে বাধা দিতে থাকে। কোন [illegible]র দ্বারা প্রচারি[illegible] গোষ্ঠীর মতকে খণ্ডন করিতে থাকে। ইহারই মধ্যে বিশেষ কোন মত [illegible]রকা[illegible]র নীতিনির্ধারণী কেন্দ্রে নিজের বক্তব্য পৌঁছাইতে সক্ষম হইলে উহা সার্থক হই[illegible]

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র হউক বা একন[illegible]তি শাস্ত্রের মূল সমস্যা হইল, আমরা রাষ্ট্রকে মানিয়া চলি কেন (the [illegible] or political obligation)? এই প্রশ্নের উত্তরই নাগরিকেরা চিরকাল খুঁজিয়া আসিয়াছে। যদি আমাদের চিন্তা ও ভাবনার কোন প্রভাব আইনের মধ্যে আমরা না দেখি তবে আমাদের

রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্নের সমাধান হয়

রাজনৈতিক বশ্যতার কোন কারণ আমরা পাই না। জনমত যদি আইন-গঠনে প্রভাব বিস্তার করে, তবেই নাগরিকদের মনে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে যে, এই আইনসমূহ আমাদেরই চিন্তার ফল। আমাদের নিজেদের মতামত আইনের মধ্যে প্রতিফলিত

হইতে দেখি। তখন আপনা আপনি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা দেখা যায়। জনমতের শাসন তাই বিপ্লবকে রোধ করে, গণতন্ত্রকে স্থায়িত্ব (stability) দেয়।

কথা হইল, জনমত কতকটা সার্থকভাবে সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করিতে পারিল। গণচিন্তাকে সরকারী আইনে রূপান্তরণ করার জন্য বিশেষ সচেতন থাকা দরকার। গণতন্ত্রের কাঠামো এমনভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন যে সকল গোষ্ঠীর মতামত যেন সরকারের কর্ণে সহজে পৌঁছাইতে পারে, আর সরকারও যেন সেই মতকে উপযুক্ত মূল্য দেন।

জনমত গঠনের উপাদান (The agencies for formation and expression of Public Opinion) : দেশের সাধারণ লোকেরা রাষ্ট্রের কাজকর্মের বিষয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উদাসীন। তাহাদের মনে কোন বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ জাগাইয়া তুলিতে পারিলে সেই বিষয়ে জনমত গঠিত হইতে পারে। যে সকল উপায়ে জনসাধারণের মনে ঔদাসীন্যের বেড়া ভাঙিয়া দেওয়া যায় বা উদ্দীপনা (experiment) সৃষ্টি করা যায়, তাহাদের আলোচনা করা দরকার। নানা উপায়ে জনমত গঠিত ও প্রভাবিত হইয়া থাকে। নানাপ্রকার বাহনের দ্বারা জনমত গঠিত ও ব্যক্ত হয়। নিম্নলিখিত উপাদানগুলিই প্রধান :

সংবাদপত্রের ভূমিকা

১। **সংবাদপত্র**—বর্তমান যুগে সংবাদপত্র জনমত গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং অল্পমূল্যে পাওয়া যায় বলিয়া সংবাদপত্রের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। একজন ইংরেজ লেখক সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের "তৃতীয় নয়ন" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। সংবাদপত্র শুধু সংবাদই পরিবেশ[illegible] ইহার স[illegible]রা নানা প্রক[illegible] করি। সম্পাদক ও দে[illegible] নেতারা [illegible] মাধ্যমে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন। তাঁহা[illegible] পড়িয়া পাঠকগণও নিজেদের মতামত গঠন করে। আধুনিক গণ[illegible] মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা আছে। সুতরাং সরকারের যে-কোন ভুল-[illegible] পত্রিকায় সমালোচনা করা সম্ভব। এইভাবে কর্তৃপক্ষ জনমতে[illegible]র ও সঙ্গে সঙ্গে জনমত অনুযায়ী নিজেদের কার্য সংশোধন করিয়া লইতে পা[illegible]।

জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা সর্বদা প্রশংসনীয় নয়। সংবাদপত্র একটি ব্যবসায় এবং মুনাফা পাওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। প্রতিটি সংবাদপত্র জানে তাহার ক্রেতাগোষ্ঠীর রুচি ও ইচ্ছা কি? সেই রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী প্রবন্ধ ও মতামত প্রকাশ করে। উহার বিরোধী মতামত প্রকাশ করিলে ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পাইবে এবং ব্যবসায়িক ক্ষতি হইবে। তাই সংবাদপত্র সেইদিকে মোটেই অগ্রসর হয় না।

কেবল তাহাই নহে। বিরাট শিল্পপতিদের নিকট হইতে বিজ্ঞাপন লইয়া সংবাদপত্রের মুনাফা হয়। সুতরাং সংবাদপত্রগুলি এমন ধরনের জনমত গঠনে অগ্রসর হয় যাহাতে বিজ্ঞাপন-দাতারা সন্তুষ্ট হয়। এইকারণে বর্তমানে সংবাদপত্র-গুলিকে আর জনমতের সঠিক দর্পণ মনে করা চলে না। অনেকে এই কারণে বলেন যে সংবাদপত্রগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসা উচিত। কিন্তু তাহা গণতন্ত্রের পক্ষে আরও বিপদজনক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কেন বিকৃত হইয়া গিয়াছে

২। **সভাসমিতি**—জনমত গঠনে জনসভার যথেষ্ট মূল্য আছে। দেশের নেতারা বা খ্যাতনামা বক্তারা যখন জনসভায় বক্তৃতা করেন, তখন তাঁহাদের বক্তৃতায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সকল লোকই প্রভাবিত হইয়া থাকে। বক্তৃতায় প্রত্যেকটি সমস্যার বিভিন্ন দিক সমালোচনা করা হয় এবং তাহাতে লোকের মতামত গঠনে সহায়তা করে। সভাসমিতিতে বক্তৃতা কোন বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া জনমত গঠনে সহায়তা করে। দার্শনিক ব্রুটাসের বক্তৃতা সাময়িক প্রশংসা পায়, কিন্তু সুচতুর বাগ্মী এণ্টনীর বক্তৃতা জনচিত্ত আলোড়িত করিয়া ইতিহাসের গতিপথ নির্ণয় করে।

৩। **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান**—স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষালয় জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। শৈশবে ও কৈশোরের ছাত্রজীবনে যে-শিক্ষা পাওয়া যায় মনের মধ্যে তাহা চিরস্থায়ী ছাপের সৃষ্টি করে। দেশের যাঁহারা নেতা ও বিভিন্ন মতবাদের স্রষ্টা তাঁহারা প্রায় সকলেই বাল্যের ও যৌবনের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। আজ [illegible] ছাত্রী, আগামী দিনে সে-ই দায়িত্বজ্ঞানশীল নাগরিক হইবে। হয়তো একদিন সে দেশে [illegible] লিয়া সম্মান [illegible] সুতরাং বিদ্যালয়ে পাঠকালে ছাত্র যে আদর্শে অ[illegible] হয়, তাঁহ[illegible]তিক আদর্শে পরিণত হয়। এই জন্য হিটলার ও মুসোলিনী তাঁহাদের [illegible] কত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য তাঁহাদের দেশের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া [illegible] প্রচার করিয়াছিল। স্কুল ও কলেজীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল ছাত্রদে[illegible]ব্ধক করা, তাহাদের মনে অনুসন্ধান, প্রশ্ন ও বিচার-ক্ষমতা জাগা[illegible] এই সকলের পরিবর্তে যদি নির্দিষ্ট কোন মত গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তাহাদের বহু অর্ধ-সত্য শেখানো হয় এবং যুক্তিনিষ্ঠ বিচারক্ষমতা লোপ পায়।

৪। **রাজনৈতিক দল**—গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন দল জনসাধারণের সম্মুখে বিভিন্ন কর্মপন্থা উত্থাপন করে। বক্তৃতার দ্বারা, প্রচারপত্র দ্বারা ও সংবাদপত্র দ্বারা তাহারা জনমত গঠনে সহায়তা করে। লোয়েলের (Lowell) ভাষায় বলিতে গেলে "parties are the brokers of ideas." রাজনৈতিক দলের

মারফত দেশের নানা সমস্যার কথা লোকেরা জানিতে পারে। এইসকল সমস্যা সম্বন্ধে মতামত গঠন করিতে পারে। বিভিন্ন দলের কর্মপন্থা লোকের রাজনৈতিক শিক্ষার ও চেতনার সহায়তা করে। এইভাবেই জনমত গঠিত হয়। জনমতের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক মত গড়িয়া উঠে।

৫। **বেতার ও চলচ্চিত্র**—বর্তমান জগতে বেতার ও চলচ্চিত্র জনমত গঠনের শ্রেষ্ঠ বাহন। কেবলমাত্র শিক্ষিত লোকেরাই সংবাদ পড়েন, বেতার ও চলচ্চিত্র সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট পৌছায়। তাহা ছাড়া বর্তমান জগতের সদাব্যস্ত জীবন-যাত্রায় সংবাদপত্র পাঠের সময়টুকুও মানুষের নাই। আজকাল বেতারবার্তা ও চলচ্চিত্র লোকের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বিখ্যাত অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ-সংস্কারক-গণ বেতার-বক্তৃতার দ্বারা লোকের মতামত গঠনের সহায়তা করেন। আজকাল অনেকে বলেন যে, বেতার ও টেলিভিসনের মাধ্যমে নেতাদের সহিত জনসাধারণের সংস্পর্শ অনেক ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, আমরা প্রায় পুরাতন যুগের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র দেখিতে পাইতেছি।

৬। **আইনসভা**—দেশের জনসাধারণের মতামত তাহাদের প্রতিনিধির মারফত আইনসভায় ব্যক্ত হয়। আইন পরিষদে দেশের সকল দলেরই প্রতিনিধি থাকেন। তাহাদের নানারূপ আলোচনা হইতে লোকেরা দেশের বিভিন্ন সমস্যা বুঝিতে পারে ও মতামত গঠন করিতে পারে। আইনসভায় তর্ক-বিতর্কের ধারা অনুধাবন করিয়া লোকে নিজস্ব ধারণা গঠন করে ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখে। আইনসভার দলের প্রতিনিধিরা বক্তৃতার সময়ে কেবলমাত্র আইনসভার প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যেই বলেন না। তাঁহারা সারা দেশের নাগরিকদের উদ্দেশ্যেই কথা বলেন। টেলিভিসনের মাধ্যমে তাঁহার [illegible]য় থাকিয়াও [illegible] কাছাকাছি আছেন বলিয়া অনুভব করিতে পারে।

ইহা ছাড়া নানাপ্রকার পুস্তিকা ও [illegible]ত্রের মাধ্যমেও জনমত গঠনের সহায়তা হয়।

জনমত গঠনের এই সকল [illegible]দানের মাধ্যমে লোকের মনে মতামত গঠিত হয় কি উপায়ে? [illegible]শ হইতে নিজের মনে সঠিক ধারণা কিরূপে [illegible] মানুষ তাঁহার আশেপাশের নানা সূত্র

পরিবেশ হইতে মানুষের মন; মত গঠনের প্রক্রিয়া

হইতে খোঁজখবর পায়, সেই খোঁজখবরের ভিত্তিতে তাহার রাজনৈতিক মত গঠিত হয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন কাজ করিলে বা নিজে উপস্থিত থাকিলে প্রত্যক্ষ খবর পাইতে পারে। কিন্তু মানুষ তো সকল ঘটনার সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে পারে না। তাহাকে তাই দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরের সংবাদ সরবরাহের উৎসের উপর ভরসা করিতে হয়, যেমন—রেডিও সংবাদপত্র প্রভৃতি। কিন্তু প্রতিস্তরের সংবাদদাতারাই নিজ নিজ ইচ্ছা বা প্রবণতা

অনুযায়ী প্রকৃত সংবাদটিকে অল্প একটু অদল-বদল করিতে থাকে। সংবাদের রিপোর্টাররা মালিকদের ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুযায়ী রিপোর্ট তৈয়ারী করে। রেডিওতে কোন তথ্য পরিবেশিত হইবার পূর্বে বাছাই করা হয়। স্মৃতিশক্তি, কল্পনা, সংস্কার, আবেগ ও ইচ্ছাকৃত বিকৃতি—এই সকল কিছু মিলিয়া নাগরিকদের নিকট যাহা পরিবেশিত হয়, তাহাকে দিয়া বাস্তব কোন মতামত তৈয়ারী করা সম্ভব হয় না। নাগরিকগণ অসম্পূর্ণ তথ্যের বিকৃত জগতে বাস করিতে থাকে। ফলে তাহার বিচার কোনমতে যুক্তিনিষ্ঠ হয় না, তাহার মতামত যুক্তির দ্বারা গঠিত নয়, উহা "the pictures in his head". আশেপাশের প্রতিবেশীদের বা কর্মস্থলের সহকর্মীদের মতামতই তাহার মত হইয়া দাঁড়ায়। সে জোরের সঙ্গে প্রচার করে উহাই তাহার নিজস্ব মত। তাহার পরিবেষ্টনীকে সে-ও প্রভাবিত করে, আবার সে নিজেও প্রভাবিত হয়। এক-ছাঁচে ঢালা গড় মানুষের মতামতকেই সে নিজের স্বাধীন মত বলিয়া মনে করিতে থাকে। অচল চিন্তার কতকগুলি ছাঁচ (stereotype) বস্তুজগতের প্রকৃত চিত্র বিকৃত করে, ফলে মানুষ প্রকৃত বিচার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা (Definition of a Political Party): যদি কয়েকজন ব্যক্তি কোন কোন বিষয়ে একই মত পোষণ করে এবং সেই মতের সমর্থনে সম্মিলিত হয়, তবে তাহাকে দল বলা যায়। বিভিন্ন বিষয়ে বহু লোক একমত হইতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়েই বহু নাগরিকেরা সম[illegible]চিন্তা করিতে পারে। এই মতৈক্যের মাধ্যমেই তাহারা একে অন্যের সহিত [illegible] যাহারা প্রধান প্রধান বিষয়ে মোটা[illegible] একমত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট কার্যতালিকা সমর্থন [illegible] কার্যে পরিণ[illegible] সচেষ্ট হয়, তাহারা একটি [illegible]জনৈতিক দল [illegible] রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইল তাহাদের [illegible] ও কার্যতালিকা অনুযায়ী রাষ্ট্রশাসন পরিচালনা করা এবং [illegible] ক[illegible]কর্ম নিয়ন্ত্রণ করা। প্রচারের মাধ্যমে তাহারা জনসাধারণের সমর্থন [illegible]তাদের উদ্দেশ্য হইল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের মত প্রচার করা [illegible] উপায়ে ক্ষমতা লাভ করিয়া নিজেদের কর্মসূচী কার্যকরী করা। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয় সম্পর্কে কর্মপন্থা বিভিন্ন বলিয়াই নানা দলের উদ্ভব হয়।

রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে

দলের সহিত উপদলের পার্থক্য

তবে দেশের মঙ্গল ভুলিয়া, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি লোকেরা সম্মিলিত হয়, তবে তাহাকে দল না বলিয়া উপদল (Faction) বলা উচিত। উপদল জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়া সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করে। রাজনৈতিক দলের প্রধান

বল একতা। দলের সভ্যের মধ্যে এই একতার অভাব হইলে, দলটি বিশৃঙ্খল জনতায় পরিণত হয়। যে-দল বলপ্রয়োগ করিয়া বা অসৎ উপায়ে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে, তাহাকে রাজনৈতিক দল বলা চলে না। জাতীয় স্বার্থের উন্নতি সাধনই রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য। অধ্যাপক বার্কারের ভাষায় "A Party is a *particular* body of opinion, which is nonetheless concerned with the *general national* interest, and which forms, and presents to the choice of the electorate a programme of general national scope and width."

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হইয়াছে। কাহারা সরকার চালাইবে এবং কি নীতি অনুযায়ী চালাইবে তাহা স্থির হয় ভোটের অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকদের দ্বারা। গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকই সার্বভৌম ক্ষমতার অতি ক্ষুদ্র খণ্ডের অধিকারী। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এই ছোট ছোট সার্বভৌমত্বের অংশগুলিকে একত্র করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করিতে হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ ভোটাররা যাহাদের সমর্থন করে তাহাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা আসিয়া পড়ে। দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া আনার মত ক্ষমতার এই প্রশস্ত আধার হইতে কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলিয়া আনা দরকার। এই উদ্দেশ্যে যে মন্থন যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাই রাজনৈতিক দল। সমগ্র সমাজের মধ্যে বিস্তৃত এই ক্ষমতারাশি একেবারে স্থির ও অচঞ্চল নয়. বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থে পরস্পর বিরোধ থাকায় এই ক্ষমতাপুঞ্জে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এই সকল সংঘাতের (tensions) মধ্য হইতেই রাজনৈতিক সমস্যাগুলির উদ্ভব ঘটে। এই সকল সমস্যাই রাজনৈতিক [illegible] উপজীব্য। ইহাদের কেন্দ্র ক[illegible] করা, ইহাদে[illegible] উপযোগী কর্মসূচী জনসমক্ষে প্রচার করা, নি[illegible] এবং [illegible] ক্ষমতা দখল করা ইহাদের লক্ষ্য। সংক্ষেপে বলি[illegible] সংখ্যক ও বিক্ষিপ্ত নাগরিকদের হাতে ভোটাধিকার আসিয়া পড়ায় রা[illegible] তার জন্য সংগ্রাম আজকাল প্রতিষ্ঠানগত রূপ লইয়াছে, আর প্রাচীনকা[illegible] তে লড়াই-এ আবদ্ধ নাই। সংগ্রামী এই প্রতিষ্ঠানগুলির নামই [illegible] সর্বজনীন ভোটাধিকারের যুগে ইহাদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, "they are [illegible]itable, like the tides of the ocean."

রাজনৈতিক দলের কার্য (Functions of Political Parties): ব্রাইস বলিতেছেন যে গণতন্ত্রে "রাজনৈতিক দলগুলির দুইটি প্রধান কাজ, বিতর্কের মাধ্যমে তাহাদের নীতিসমূহ প্রচার করা এবং নির্বাচন করা।" কোন মহৎ সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের প্রেরণায় তাহারা এই কাজ করে না। তাহাদের সকল কার্যের উদ্দেশ্য জয়লাভ, ফাইনারের ভাষা উহাই "the first commandment of a political

party.” রাজনৈতিক দলের ভূমিকা হইল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার যন্ত্র হিসাবে কাজ করা। এই জয়লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও কয়েকজন উপনেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। রাজনৈতিক দলের প্রথম কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাহাদের দলীয় নীতি স্থির করা। জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারণ করিয়া সেই সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কার্যতালিকা স্থির করিতে হয়। দলের কর্মসূচী রচনার সময়ে দেখিতে হয় যেন পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর স্বার্থে অনেকটা মিল থাকে। বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধিতা যেন কর্মসূচীর মাধ্যমে অন্তত সাময়িকভাবে সমান হয় (a temporary consensus)। দ্বিতীয়ত, কর্মতালিকা ঠিক করিয়া দলের কার্য হইল তাহাদের নীতি ও কর্মপন্থা নানা উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনমতকে দলের অনুকূল করিয়া গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে নানা কৌশলে প্রচারকার্য চালাইতে হয়। দেশের জনসাধারণ নিজেরা কোন আন্দোলন বা জনমত গঠন সুরু করিতে পারে না সেইরূপ ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাহারা অনুসরণ করিতে পারে। জনসাধারণ বলিলে বহু বিচিত্র শ্রেণী, গোষ্ঠী ও মতামতের স্তূপ বোঝা যায়। তাহাদের সম্মুখে কর্মপন্থা প্রচার করিয়া তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিতে হয়। সাধারণ মানুষের উপযোগী শ্লোগান রচনা করিতে হয়, যে-শ্লোগানে বেশির ভাগ লোক সাড়া দিতে পারে সেইরূপ শ্লোগান প্রচার করিতে হয়। জনসাধারণ যেন এই সকল শ্লোগানে নিজেদের অস্পষ্ট [illegible] আবেগের সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায়। নেতৃহীন জনতা দুর্বোধ্য অর্থহীন চীৎকার বা শব্দসমষ্টি সৃষ্টি [illegible] মাত্র, নেতৃত্ব [illegible] ই জনসমষ্টি সুস্পষ্ট ও অর্থবহ কোন ঐক্যবদ্ধ ব[illegible] নেতৃত্ব দানই দলের কাজ।

কর্মতালিকা গঠন করা

যত অধিকসংখ্যক [illegible] প্রচারকার্যের ফলে দলের নীতিতে আস্থাবান হয়, তত [illegible] র্থক বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, আইনসভার নির্ব[illegible] টি রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় দাঁড়া[illegible] কটি দল তাহাদের প্রার্থী মনোনয়ন করে। উহার পরে তাহারা নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। জনমত প্রভাবকারী সকল প্রকার পথ ইহারা গ্রহণ করে। চমকদার প্রার্থী, বইপত্র, পুস্তিকা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, সভাসমিতি, ব্যয়বহুল ভোজ, উগ্র বক্তৃতা সকল কিছু প্রয়োগ করে। অস্বাভাবিক ও অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দেয়, বহু অসত্য ভাষণ করে, যুক্তি বিচার ও বিবেচনা ভাডিয়া গুঁড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে, “no doubt they are convinced that the end justifies the means.”

দেশে কর্মতালিকা প্রচার করা

ভোটসংগ্রহ

চতুর্থত, নির্বাচনের পরে যদি আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে তবেই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল। দলের নেতাগণ মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যখন শাসন-ক্ষমতা অধিকার করে, তখন তাহারা তাহাদের নীতি ও কার্যতালিকা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে। তাহারা সেই সকল নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া দেশের সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করে। নির্বাচনের সময়ে দলের নেতারা নির্বাচকদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহা তখন রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। অধ্যাপক ফাইনারের ভাষায় "They make policies, create platforms, obtain seats in the Legislative Assemblies, and, if they attain a majority, their platform tend to become laws,"

সরকার গঠন

কিন্তু নির্বাচনের ফলে যদি দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা আইনসভায় সংখ্যালঘু হয় অর্থাৎ অল্প আসন দখল করিতে পারে, তবে তাহারা বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত হয়। তাহারা আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও তীব্র সমালোচনা করিয়া মন্ত্রীদিগকে কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ রাখে। সুযোগ পাইলেই অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন ঘটাইবার চেষ্টা করে। বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনার ফলে মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিশেষ সাবধানে চলিতে হয়। ইহাতে তাহারা স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী হইতে পারে না।

বা
বিরোধী দল গঠন

রাজনৈতিক দলীয় শাসনের দোষ-গুণ (Merits and Demerits of Party System): গণতন্ত্র সফল করিতে হইলে রাজনৈতিক দলের ... অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক ব্যাপ... ...ণ লোকের ... ...তামত থাকে না। আর ম... ...ধারণ। জ... ...ইহা সঠিকভাবে প্রকাশ করিতে ...রে ... ...বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট জনমতকে সুগঠিত ও সুস্পষ্ট করিয়া ... ...য রাজনৈতিক দলের আবশ্যক "out of a chaos of multitude of ... ...ings order and system." সমাজের মধ্য হইতে যে সকল ... , রাজনৈতিক দলগুলি সেই সকল চিন্তাকে পালিশ করিয়া সরকারী যন্ত্রের ...ধ্যমে আইনে পরিণত করে।

গণতন্ত্রের দলীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

কেবল প্রকাশ করিলেই চলে না। কার্যকরী করিবার জন্য উহাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিয়া, পরিস্রুত আকারে আইনের রূপ দিতে হয়। সভাসমিতির প্রস্তাব মূলত আবেগ-প্রধান, তাৎক্ষণিক আবেগে আচ্ছন্ন। অনেক ক্ষেত্রেই উহারা পরস্পর বিরোধী। আইনে পরিণত হইতে হইলে যে পরিশোধন যন্ত্র প্রয়োজন, রাজনৈতিক দল বহুলাংশে সেই প্রয়োজন মেটায়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দল দেশের বিভিন্ন সমস্যার গুণাগুণ আলোচনা করিয়া দৃঢ় জনমত সংগঠন করে। এই দলগুলি জন-সাধারণের সম্মুখে বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা ও তাহার সমাধানের পথ উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে সচেতন করিবার চেষ্টা করে। ইহাতে জনসাধারণের মনে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং দেশবাসীর প্রতি তাহাদের কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার একটি প্রধান মাধ্যম।

তৃতীয়ত, দলপ্রথা না থাকিলে মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যে শাসনের ব্যবস্থা কখনই সফল হইতে পারে না। এই দলপ্রথা না থাকিলে আইনসভার কার্য কখনও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না; দলপ্রথা না থাকিলে শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। সরকারের পশ্চাতে যদি সুগঠিত দলের সমর্থন না থাকে তবে শাসনকার্য পরিচালনা করা যায় না। কারণ, আইনসভায় অধিকাংশ সভ্যের ভোট না পাইলে কোন নীতিই সরকার দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতে পারে না। দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছে বলিয়া আইনসভার সদস্যেরা দলের চাবুকে একযোগে ভোট দেয়। আইন পরিষদের সদস্যগণ তাহাদের দলীয় আদেশমত না চলিয়া যদি খুশিমত ভোট দেয় তবে দায়িত্বশীল সরকারের মন্ত্রিরা মন্ত্রিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। ব্রাইস্ বলিয়াছেন, "If there is no party voting, and everybody gave his vote in accordance with his own perhaps crude and illinformed opinions, parliamentary government of the English type could not go on."

[illegible]র্থত, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা রক্ষা ও পরিচালনা করিতে হইলে দলীয় শাসন-ব্যবস্থার দরক[illegible] না হইলে, যে[illegible] শাসন-ক্ষমতা থাকে, সেই দল নিজ ইচ্ছা অনু[illegible]র [illegible]সনকা[illegible] [illegible]ইত। একমাত্র বলপ্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল[illegible]চ্যু[illegible] করা সম্ভব হইত না। রাজনৈতিক দল থাকায় শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে দেশে[illegible] সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভবপর হয়।

পঞ্চমত, দলীয় ব্যবস্থার ফলে স্বৈ[illegible]ইতে পারে না। বর্তমান যুগে দলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবার সুযোগ পায়। কারণ, এক সময়ে নির্বাচনে তাহাদের দলের মনোমত প্রতিনিধি আইনসভার অধিকাংশ আসন দখল করিতে পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা শাসনক্ষমতার অধিকারী হইবে। এইরূপ পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া শাসনকার্য ভালভাবে চলিতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করে কিন্তু সর্বদাই সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সমালোচনার ভয়ে তাহারা জনস্বার্থ-

বিরোধী কাজ করিতে সাহসী হয় না। এইভাবে দলীয় শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কখনও স্বেচ্ছাচারী হইতে সাহস পায় না।

ষষ্ঠত, গণতন্ত্রের মূল তত্ত্ব হইল জাতীয় ঐক্য এবং সাধারণের কল্যাণ। গণতন্ত্রে প্রত্যেক ক্ষুদ্র স্বার্থই জাতীয় স্বার্থের নিকট নিজের জন্য আবেদন করে। অনেক বিরোধ থাকে ঠিকই, কিন্তু গণতন্ত্রের লক্ষ্য সেই সকল বিষয়ের ঊর্ধ্বে সাধারণ স্বার্থের একটি মহৎ যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করা। রাজনৈতিক দলগুলি সরকার চালাইবার সময় ভৌগোলিক ও অর্থনীতিক সংকীর্ণ স্বার্থ দূরে সরাইয়া দিয়া বৃহত্তর এক জাতীয় স্বার্থ সম্মুখে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করে। বিচ্ছিন্ন নাগরিকের মনে বা নাগরিকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চক্ষে তাহারা সমগ্র জাতির মূর্তি আঁকিয়া দেয়।

পৃথিবীর সকল দেশেই আজকাল দলীয় প্রথাকে বিপুল সমালোচনা করা হইতেছে। এই কঠোর সমালোচনার মূল কারণ হইল ক্ষুদ্র কোন গোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়া জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া। এই কথা স্মরণ করিয়াই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পথিকগণ রাজনৈতিক দলগুলিকে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক মনে করিয়াছিলেন। বিদায় অভিভাষণে রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটনও বলিয়াছিলেন যে দলীয় মনোবৃত্তি গণতান্ত্রিক সরকারের সবচেয়ে বড় শত্রু। বহুপূর্বে রুশোও বলিয়া গিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী থাকিলে সেই দেশের গণইচ্ছা বা প্রকৃত জনমত নিজেকে যথাযথ প্রকাশ করিতে পারে না। অনেক সময়েই রাজনৈতিক দল আদর্শচ্যুত হইয়া পড়ে। তখন এই দলের সূত্রেই মানুষের কৃত্রিম বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং দলাদলির উদ্ভব হয়। দলের প্রাধান্য বজায় [illegible] জন্য অনেক সময় মানুষের ব্যক্তিত্ব [illegible] রা হয়। দ[illegible] রক্ষা করিবার

দলীয় ব্যবস্থার দোষ

• জন্য সভ্যদের [illegible] তে দেওয়া [illegible] না। দলের নীতি প্রত্যেক [illegible] য়া চলিতে হয়। ফলে সভ্যেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে না [illegible] মত প্রকাশ করিতে পারে না। দলীয় স্বার্থের বেদীমূলে ব্যক্তির [illegible] পারে না। [illegible] বলি দিতে হয়। বিবেকের বিরুদ্ধেও তাঁহাদের দলের আদেশ [illegible] ও সুনির্দিষ্ট [illegible] ভাটচুরি, মিথ্যাচরণ, জনসাধারণকে ঠকানো, সকল কিছুই দলের স্বার্থে করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে সংব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিনাশ হয়।

দ্বিতীয়ত, এইভাবে দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ফলে দলের সভ্যগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ভুলিয়া সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখে। দলকে জাতির ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। সরকারী চাকরির লোভে অথবা সরকারের সহায়তায় ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লোভে, নিজেদের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করে। এই

লোভের বশবর্তী হইয়া তাহারা জাতির স্বার্থের কথা বিস্মৃত হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করাটাই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। তাহাতে দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

তৃতীয়ত, যোগ্য ব্যক্তিরা দলের সকল বক্তব্য অনেক সময় মানিতে পারেন না, অথবা অন্ধ আনুগত্য প্রকাশ করিতে পারেন না। তাঁহারা দলে প্রবেশ করিতে দ্বিধা করেন। ফলে অনেক যোগ্য ব্যক্তি শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন, দেশও তাহাদের সুচিন্তিত ও যোগ্য সেবা লাভ করার সুযোগ পায় না, উপরন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের ক্ষমতা স্থায়ী করিবার জন্য সম্মান ও যোগ্যতা বিচার না করিয়া সরকারী চাকরি, সরকারী সাহায্য প্রভৃতি দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকে। ফলে যোগ্য ব্যক্তি অপর দলভুক্ত বলিয়া সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে দেশের শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হইয়া সর্বদাই সরকারী কার্যের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের দোষ অন্বেষণ করে ও সর্বপ্রকার সরকারী কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে আত্মকলহের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে জাতীয় কল্যাণমূলক কাজকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়।

চতুর্থত, কেবল আইনসভা নয়, এই দলগুলি সমগ্র জাতিকে কয়েকটি বিরোধী শিবিরে পরিণত করে। অর্থনৈতিক সংকট বা বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখেও দল- তাহাদের ছোটোখাটো বিবাদ ভুলিয়া একত্র হইতে পারে না। ভারত, ব্রহ্মদেশ প্র[illegible] [illegible]নত দেশ[illegible]লিতে রাজনৈতিক [illegible]বা ছোটোখাটো বিষয়ে অবিরাম ও অহেতুক বিরো[illegible] অর্থনৈতিক [illegible] কাজে মিলিত হওয়ার প্রেরণা তাহাদের আ[illegible]না। অবাস্তব [illegible]-না-কোন বিষয় লইয়া চীৎকার করিয়া তাহারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে[illegible]

পঞ্চমত, দল চালাইবার জন্য [illegible] নি[illegible] হইতে বিপুল চাঁদা লওয়া হয়, তাহারাই ক্রমে দলকে করায়ত্ত ক[illegible] করিয়া দেয়। বাঁশীওয়ালাকে যে টাকা দেয়, সে-ই সুর নির্ধারি[illegible] [illegible]জনৈতিক দলকে টাকা দেওয়া একপ্রকার ব্যবসায়িক বিনিয়োগ বলিয়া গণ্য হয়। দলগুলিও সাময়িক লাভের লোভে নীতি বা সম্মানবোধ বিসর্জন দেয়।

সর্বোপরি, এই দলগুলি যদিও নামে গণতান্ত্রিক, তবুও, আসলে ইহারা সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত। বৃহৎ যে-কোন সংগঠনেই প্রকৃত শক্তি মাত্র কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। নেতারা সাধারণ দলীয় সভ্যদের মূর্খতার সুযোগ লয়, জনসাধারণকে ভয় দেখাইয়া বা চমক লাগাইয়া স্তম্ভিত রাখে।

দলপ্রথা সাফল্যের শর্ত (Conditions for the success of Party System): দলপ্রথার উল্লিখিত ত্রুটিগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দলপ্রথার বিলোপ সাধন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ দলপ্রথা বিলোপের সহিত পরোক্ষ গণতন্ত্র বিলুপ্ত হইবার বাস্তব সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেজন্য দলপ্রথার সাফল্যের জন্যই আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। দলপ্রথার সাফল্য কি কি শর্তের উপর নির্ভর করে তাহা আমাদের বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে গঠিত দুইটি মাত্র শক্তিশালী দলের অস্তিত্ব দলপ্রথার সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত। দুইটি সুগঠিত শক্তিশালী দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করিবে। সংখ্যালঘু শক্তিশালী দলের অস্তিত্বই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় বাধ্য করিবে। তাহা ছাড়া দুইটি দল থাকিলে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনমত গঠন সহজ হইবে। বেশি রাজনৈতিক দলের নানা ধরনের পরস্পরবিরোধী প্রচারে জনমত বিভ্রান্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নীতির ভিত্তিতেই দল গঠন করা প্রয়োজন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতির ভিত্তিতে দল গঠন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বাধীন কোন প্রকারের সেনাবাহিনী গঠন দলপ্রথার সাফল্যের পরিপন্থী। সামরিক শক্তির সাহায্যে ক্ষমতা দখলের সুযোগ সৃষ্টি গণতন্ত্রের পরিপন্থী। রাজনৈতিক দলকে সকল সময় যুক্তিপূর্ণ [illegible] আলোচনার মাধ্যমে জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে সচেষ্ট হইতে হইবে [illegible] সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।

চতুর্থত, শাসনযন্ত্রের দৈন[illegible] রাজনৈতিক [illegible]গুলির হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। সরকারী কর্মচারীদের [illegible], পদোন্নয়ন, শাস্তি প্রভৃতি একটি নিরপেক্ষ বোর্ডের মাধ্যমে হ[illegible] উ[illegible] কারণ রাজনৈতিক দলের প্রভাবে এবং হস্তক্ষেপে শাসনযন্ত্রে [illegible] না [illegible]রতে পারে। ইহাতে শাসনযন্ত্র দুর্বল হয়। [illegible] ও সুনির্দিষ্ট [illegible]

পঞ্চমত, শক্তিশালী জনমতের অস্তিত্ব দলীয় শাসনব্যবস্থায় সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সচেতন এবং সক্রিয় জনমত রাজনৈতিক দলগুলিকে যথাযথ কর্তব্য পালনে বাধ্য করিতে পারে ও দলীয় রাজনীতির পক্ষে জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিবার কোন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিতে পারে।

দল-ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উপায় (The means of removing the defects of Party System): উপরে উল্লিখিত দলপ্রথার কুফল দূর করিতে

কয়েক প্রকার ব্যবস্থা করা যায়। (i) শাসনব্যাপারে একটি দল যেন প্রভুত্ব লাভ করিতে না পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। জনসাধারণের মত অনুযায়ী যদি শাসনকার্য পরিচালিত হয় তবে এই কর্তৃত্ব থাকিবে না। তাহা করিতে হইলে আইন রচনায় গণভোট গ্রহণের প্রথা (Referendum) প্রবর্তন করিতে হয়। গণপ্রস্তাব অনুযায়ী আইন সৃষ্টি (initiative) হইলেও জনসাধারণের আধিপত্য বজায় থাকে।

গণভোট গণপ্রস্তাব ও প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা

যে-দলের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছিল সেই দল পরিত্যাগ করিয়া অন্য দলে যোগ দিতে চায় (defection), অর্থাৎ যদি কোন প্রতিনিধি নির্বাচকদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করে তবে তাহাকে প্রত্যাবর্তনের (recall) নির্দেশ দেওয়ার অধিকার জনসাধারণের থাকিবে। এই সকল ব্যবস্থা থাকিলে জনসাধারণ ক্রমশ আরও অধিকতর সক্রিয়ভাবে শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং দলীয় সর্বকর্তৃত্বের দোষ দূর হইবে। (ii) সরকারী চাকরি ও সম্মান বিতরণের দুর্নীতি দূর করিবার জন্য এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যে একমাত্র যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। সুতরাং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ-পরিষদের হাতে সরকারী চাকরির ব্যবস্থা থাকা উচিত। (iii) দেশের শাসনতন্ত্র যথাসম্ভব অনমনীয় হইলে শাসকবর্গ নিজেদের খুশিমত ও স্বার্থমত তাহা পরিবর্তন করিতে পারিবে না। (iv) জনসাধারণের মৌলিক অধিকারও শাসনতন্ত্রের সাহায্যে সুরক্ষিত রাখা আবশ্যক। (v) একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ [illegible]বালয় থাকিলে শাসনভারপ্রাপ্ত দলও

উপায়সমূহ

স্বেচ্ছাচারিতা ক[illegible] পাইবে না। [illegible]তগণ যদি নিরপেক্ষ হন ও ন্যায়পরায়ণ হন, ত[illegible] সুবিচার হই[illegible] স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা পাইবে। (vi) সরকারী কর্মচারিগণ যাহাতে নিরপে[illegible]ভাবে ও কর্তব্যপরায়ণতার সহিত কাজ করিতে পারে, সেইজন্য তাহাদের [illegible] পদচ্যুতিগুলি শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। (vii) [illegible]ধিকার ও স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্যও শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা থাকা [illegible] শিক্ষাবিস্তারের সাহায্যে ও উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শের সাহায্যে যদি নাগরিকদের রাজনীতিতে সচেতন করিয়া তোলা যায়, তবে তাহারা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়।

বহুদল প্রথা (Multiple Party System): দেশের আইনসভায় যদি নানা দলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং সভ্যগণ নানা দলে বিভক্ত হয়, তখন তাহাকে বহুদল প্রথা বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আজকাল প্রায় সকল রাষ্ট্রেই অনেক রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে ফরাসী

দেশেই প্রায় 15টি রাজনৈতিক দল আছে। ভারতেও 3টি স্বীকৃত জাতীয় রাজনৈতিক দল আছে। আধুনিক সমাজে নানাবিধ শ্রেণীর স্বার্থের মিশ্রণ। একটি বা দুইটি দলের মধ্য দিয়া উহাদের সবগুলিকে প্রকাশ করা যায় না। বহু দল থাকিলে, বিভিন্ন দলের মাধ্যমে জনমতের বিভিন্ন ধারা ও উপধারা প্রকাশিত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় "Groups can be freely organised, can unite and separate with every change of the situation. Opinion-groups, being liberated from a common organisation, are able to formulate their doctrines with compromise." আইনসভাও জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব-মূলক হয়। বহু দল ভোটদাতার সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার কর্মধারা ও আদর্শ উপস্থিত করে। দ্বিতীয়ত, বহু দলের ব্যবস্থা থাকিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আধিপত্য খর্ব হয় এবং সংখ্যালঘু শ্রেণী শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে সুযোগ পায়। একদল দ্বারা গঠিত মন্ত্রিপরিষদ অপেক্ষা বহু-দল-সমর্থিত মন্ত্রিপরিষদ দেশের জনমতকে ভালভাবে অনুসরণ করিতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করিতে পারে।

বহুদল প্রথার প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বের দিক হইতে বিশুদ্ধ হইলেও বহুদল প্রথায় বাস্তবে সরকার পরিচালনার কাজ দুরূহ হইয়া উঠে। লাস্কি বলিয়াছেন, "it is fatal to government as a practical art." এই ব্যবস্থায় সাধারণত কোন একটি দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না। ফলে কোন শক্তিশালী ও স্থায়ী মন্ত্রিসংসদ গঠন করা [illegible] হয় না। কয়েকটি দলের একতায় [illegible] মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়. সামান্য মতে[illegible] হইলে এবং একটি কি দুইটি দল [illegible]লেই তাহা ভা[illegible]ম্ভব। সম্মিলিত সমর্থনের উপর সর্বদা নির্ভর করি[illegible]কমিয়া যায় এবং যে কোন মুহূর্তে মন্ত্রিপরিষদ ভাঙ্গিয়া যায়। এইজন্যই [illegible]মন্ত্রিপরিষদ সর্বদা অস্থায়ী থাকে। সর্বদাই মন্ত্রীদের অন্য দলের সদস্যদের সম[illegible]র উপ[illegible] নির্ভর করিয়া কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে [illegible] পারে না। নীতি অনুসরণ করিতে গেলে আলাপ-আ[illegible] সুনির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়। কোন বিষয়েই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। ঘন ঘন মন্ত্রিপরিষদ গঠন ও পতন হয় বলিয়া শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। ফরাসী দেশে মাসের মধ্যে গড়ে প্রায় একবার মন্ত্রিসভা বদল হইত। কারণ, সেই দেশে ছিল অসংখ্য দল এবং দলের সমর্থন হারাইলেই তাসের ঘরের ন্যায় মন্ত্রিসভার পতন হইত। এইজন্য আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শাসন ব্যাপারে কোন স্থায়ী নীতি সেই দেশে চলিতে পারিত না। ভোটদাতারাও বহু দলের মধ্যে কোন্ দলকে সমর্থন করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। বহু দলের প্রথায়

অসুবিধা ও উপকারিতা

দুর্নীতিও বহু থাকে। এই জন্যই দুইদল প্রথায় নানা গলদ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই বহু-দল প্রথা অপেক্ষা দুইদল প্রথাই শাসনকার্যে বেশি উপযোগী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

একদলীয় শাসন (One Party Government): দেশে বিধিবদ্ধভাবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে তাহাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে একদলীয় শাসন আরম্ভ হয়। সর্বপ্রথমে রুশদেশে সমাজতন্ত্রী দল (বলশেভিক দল) একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করে; অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করিয়া দেয়। বর্তমান সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে একটি সাম্যবাদী দলই শাসনকার্য চালাইতেছে। জার্মানীতে হিট্‌লারের নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নাৎসী দল অন্যান্য দলকে ধ্বংস করিয়া শাসনতন্ত্রে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। ইটালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী দলের উত্থান হয়। সেখানেও বলপ্রয়োগে অন্যান্য দলের বিলোপ করিয়া একদলীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে একদলীয় শাসন রহিয়াছে।

একদলীয় শাসনের উৎপত্তি

যাঁহারা একদলীয় শাসনের সমর্থক তাঁহারা বলেন যে, জাতির সকল নাগ[illegible] যদি একটি আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধ হয়, তবে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাহাদের দেশে দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। আজ সোভিয়েট দেশে একটি দলের শাসন-প্রথা আছে বলিয়াই সেই দেশ সকল বিষয়ে এত দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হই[illegible]ছে। নাৎসী দলের নেতৃত্বে জার্মানীর জাতীয় শক্তি অ[illegible] [illegible]তগতিতে প্রা[illegible] করিয়াছিল। একটি রাজনৈতিক দল যদি জনস্বা[illegible] জন্য গঠনমূলক [illegible]গ করে, তবে রাষ্ট্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারে, জাতীয় এক[illegible] [illegible]প্রায় ও আভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক নীতিতে কোন দুর্বলতা থাকে না। কিন্তু বহু-দ[illegible] প্রথায় ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন হওয়ায় নীতির পরিবর্তন হয়। [illegible] শা[illegible]নের স্থিরতা না থাকায় রাষ্ট্রে নানাপ্রকার দুর্নীতি সৃষ্টি হয়।

[illegible] যুক্তি

যাঁহারা একদলীয় সরকার সমর্থন করেন না, তাঁহারা বলেন যে, জাতিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ভাগ করিলেই জাতীয় একতা নষ্ট হইয়া যায় না। জনসাধারণের মধ্যে নানাপ্রকার মিথ্যা প্রচার-কার্যের সাহায্যেই মাত্র একটা দলের সমর্থন লাভ করা হয় এবং একনায়কত্ব গঠিত হয়। তাহাতে জাতীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয়। রাজনৈতিক অধিকার খর্ব হয় ও বলপ্রয়োগের সাহায্যে

বিপক্ষে যুক্তি

একনায়কের প্রতি আনুগত্য রক্ষার ব্যবস্থা হয়। ইহা গণতান্ত্রিক প্রথার বিরোধী। এইজন্য এই প্রকার ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না।

উপসংহার

কিন্তু সকল দিক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বলা চলে যে, একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা দ্বিদল বা বহু-দল প্রথায় ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেক বেশি নিরাপদ থাকে এবং গণতান্ত্রিক আদর্শও বেশি পরিমাণে রক্ষিত হয়। একদলীয় শাসনব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (Two Party System): যে-রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মূলত দুইটি রাজনৈতিক দল অবস্থান করে তাহাকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বলে। এই সমস্ত রাষ্ট্রে আরও দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কোনরূপ বাস্তব গুরুত্ব বা ভূমিকা না-থাকার জন্য কার্যত দুইটি দলই প্রাধান্য লাভ করায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে প্রধানত দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত। লাস্কি বলিয়াছেন যে, কোন দেশের রাজনৈতিক সংগঠন "is more satisfactory the more it is able to express itself through the antithesis of two great parties." অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থায় দুইটি বৃহৎ দলের পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার যত বেশি প্রকাশ ঘটিবে, সেই শাসনব্যবস্থাই তত বেশি সন্তোষজনক।

দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থার স্বপক্ষে বলা হইয়া থাকে, (i) দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে সক্ষম হয় বলিয়া এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয়। (ii) দ্বিদলীয় নির্বাচকমণ্ডলী সহজে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। কিন্তু বহুদলীয় প্রথায় বিভিন্ন দল [illegible] এবং বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্মপ[illegible] র সম্মুখে উপ[illegible] র ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয় এবং তাহাদের পক্ষে প্রতি[illegible] কঠিন হয়। ([illegible]) বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোন এক দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারার সম্ভাবনা থাকে, এইরূপ অবস্থায় বহুদলের স[illegible]নে যে সরকার গঠিত হয় তাহার কোন সুনির্দিষ্ট নীতি, একতা ও কর্মদক্ষত[illegible]কতে পারে না। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় ইহা ঘটিবার আশঙ্কা না থাকায় কর্মদক্ষ, একতাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণকারী সরকার গঠিত হয়।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বলা হইয়া থাকে যে, এই ব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় জনগণের বিভিন্ন মত ও বক্তব্য প্রতিফলিত হইতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডের রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের মৌলিক নীতির ভিতর খুব বেশি গুণগত এবং মূলগত প্রভেদ নাই। সুতরাং সেখানে যাহারা উক্ত দল দুইটির কোনটির নীতিকে সমর্থন করে না, তাহাদের পক্ষে কার্যত বিকল্প কোন নীতির সমর্থক সরকার প্রতিষ্ঠা করা

সম্ভব নয়। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন মতকে প্রতিফলিত করিবার এই সীমাবদ্ধতাই ইহার প্রধান ত্রুটি।

Questions to be discussed

1. Define Public Opinion.

জনমত-এর সংজ্ঞা দাও।

2. Define Public Opinion and discuss its importance in a democracy.

জনমত কাহাকে বলে? গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব কি?

3. Discuss why and how the success of Democracy depends on organised public opinion.

সুসংগঠিত জনমত-এর উপর গণতন্ত্রের সাফল্য কিভাবে এবং কেন নির্ভর করে দেখাও।

4. What are the various agencies for the formation and expression of public opinion in a democracy?

গণতন্ত্রে জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিন্ন উপাদানগুলি কি?

5. What is Political Party? Discuss the functions of Political Parties.

রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? রাজনৈতিক দলের কার্য আলোচনা কর।

6. Examine the merits and demerits of Party System. How the defects may be remedied?

দল প্রথার দোষগুণসমূহ আলোচনা কর। এই ত্রুটিগুলিকে দূর করার উপায় কি?

7. Argue for and against Multiple Party System.

বহুদল প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ দেখাও।

8. Why One Party rule is against Democracy? Explain with arguments.

গণতন্ত্রে একদলীয় শা... [illegible] ...হে কেন যুক্তি দ্বারা [illegible]।

১০

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক

Relation between States

জাতি কাহাকে বলে (What is a Nation) ঃ কোন সমাজে বহুবৎসর ধরিয়া একদল লোক পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া পরস্পর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে বসবাস করে। ফলে তাহাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের একতাবোধ দেখা যায়। পুরুষ পরম্পরায় তাহারা মোটামুটি একই রকম চিন্তা করিয়াছে, একইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছে, একই প্রকার ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া পার হইয়া আসিয়াছে। পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে গল্প শুনিয়াছে, অতীত কালে তাহারা সমবেত চেষ্টায় কিরূপ সুখ পাইয়াছে, কিরূপ দুঃখ পাইয়াছে। অতীত কালের ঘটনাবলী তাহাদের বুঝাইয়াছে, তাহাদের সকলের ইতিহাস একই, তাহারা একই অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী। এইরূপ অবস্থায় সেই সকল লোকের মনে একই বিশেষ ধরনের অনুভূতির ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, আমরা সকলে এক, আমরা বিদেশীদের হইতে পৃথক্‌। আমাদের নিজস্ব এক বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রার প্রণালী আছে, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থারও একটি বিশেষ রূপ আছে। কোন গণসমষ্টির (people) মনে এইরূপ ঐক্যবোধ বা জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হইলে তাহাকে জনসমষ্টি (Nationality) বলে। কোন জনসমষ্টি যখন নিজেদের খুশিমত চিন্তা ও ধারণা অনুযায়ী নিজেদের শাসন করিবার উপযোগী রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পায়, তখন তাহাকে জাতি (Nation) বলা হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পাইলে কোন জনসমষ্টি নিজের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে, জাতিগত প্রতিভা স্ফুরণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে। তখন সেই জনসমষ্টি জাতিতে পরিণত হয়।

গণসমষ্টি, জনসমষ্টি ও জাতি

সুতরাং জাতীয়তাবোধ হইল এক ধরনের আত্মিক ঐক্যবোধ। কিছু লোক যখন চিন্তা করে যে, আমাদের ঐতিহ্য সমান, আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই রকমের, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা একরূপ সমান, আমাদের নৈরাশ্য, বেদনা ও দুঃখের মধ্যে সাধারণ একটি যোগসূত্র বর্তমান, একই সভ্যতা ও কৃষ্টির আমরা ধারক ও বাহক তখন তাহাদের মনে এইরূপ একতাবোধের সৃষ্টি হয়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কিভাবে সকলে মিলিয়া কোন্‌ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছিলেন, কি ভাবে সকলে মিলিয়া কোন্‌ ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করিয়াছিলেন —সকল কিছুই মনে আবেগ ও অনুভূতির তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া গর্ব, বেদনা ও আনন্দ-মিশ্রিত এক ঐকতানের সৃষ্টি করে। ইহাই জাতীয়তার অনুভূতি—এইরূপ সহানুভূতি যাঁহাদের থাকে তাঁহারা নিজেদের এক

জাতীয়তাবোধ কাহাকে বলে

জাতির লোক বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা নিজেদের জাতির লোকদের পছন্দ করিতে থাকেন ও আপন বলিয়া মনে করেন; অপর জাতির লোকদের ক্রমে অপছন্দ করিতে থাকেন ও পর বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহারা ভাবেন আমরা সকলে এক, আমরা অন্য জাতি হইতে পৃথক্। একত্ববোধ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি জাতীয়তাবোধের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে।

নিজেদের ভৌগোলিক সীমা ও পরিবেশ; অতীত ঐতিহ্য ও সভ্যতার উত্তরাধিকার; আচার, ব্যবহার, প্রথা ও রীতিনীতি—তাহাদের সমষ্টিগত প্রকৃতিকে বিশেষ রূপ দান করে, তাহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে। সাহিত্য, শিল্পকলা ও ভাস্কর্য; সঙ্গীত, ললিত-কলা ও স্থাপত্য—সকল কিছুতেই এই জাতিগত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য যেমন প্রকাশ পায়, মিল্টনের মধ্যেও আমরা সেইরূপ ইংরাজ জাতির বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই; রুশো ও ভলটেয়ারকে আমরা ফরাসী ছাড়া অপর কোন জাতির লেখক বলিয়া ভাবিতে পারি না।

জাতি গঠিত হইলে উহার স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইতে থাকে

জাতি গঠনের উপাদান (Nation-building factors): নানা উপাদা[illegible] জাতি গঠিত হয়। উহার মধ্যে কয়েকটি উপাদান যদিও জাতিগঠনে সহায়তা করে, কিন্তু ইহাদের কোনটিই একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নহে। এই উপাদানগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা দরকার।

[illegible]) **বংশগত ঐক্য** (Racial unity)—সংস্কৃতে জাতি শব্দের অর্থ হইল এক বংশ হইতে উদ্ভূ[illegible] [illegible] রক্ত হইতে যাহ[illegible] [illegible]ত্তি হইয়াছে। এক বংশ হইতে যদি কোন লোক[illegible] [illegible] সৃষ্টি হ[illegible] [illegible]ধ্যে একটা একতার ভাব জাগে। বংশগত ঐক্য গভীর একতাবোধ [illegible] [illegible]রিতে সহায়তা করে। কিন্তু একই পূর্বপুরুষের বংশধর হইলেই যে এক জাতি গঠিত হইবে, তাহা সঠিক বলা যায় না: "Nationality actually cuts through and a[illegible]ss race." জার্মান ও ইংরাজ একই টিউটন বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু আ[illegible] তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বহু ভিন্ন বংশের লোকেরা মিলিয়া একজাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষকে কবি বলিয়াছেন 'মহামানবের সাগর তীর'। মানুষের কত ভিন্ন ভিন্ন বংশ ও কুল হইতে শাখা-প্রশাখা আসিয়া ভারতবর্ষে একটি জাতির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার হিসাব করা কঠিন। আর্য, অনার্য, শক, হূন, দ্রাবিড়, মঙ্গোলিয়ান, তিব্বতীয় প্রভৃতি বংশের ধারা আসিয়া এই মহাজাতির সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং, বংশগত বা কুলগত ঐক্য জাতিগঠনের একমাত্র উপাদান নহে।

(খ) **ভৌগোলিক ঐক্য** (Geographical unity)—অনেক লোক একটি অবিভক্ত অঞ্চলে বসবাস করিলে ক্রমে এক জাতিতে পরিণত হয়। এক স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মবোধ সহজেই জাগিয়া ওঠে। কিন্তু ইহাও অত্যাবশ্যক নহে। সমগ্র ইউরোপ ভৌগোলিক দিক হইতে একটি দেশ, কিন্তু উহার মধ্যে বহু জাতির বসবাস। ইহুদিগণ বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বাস করিয়াও এক জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। পাহাড়-পর্বতের প্রাকৃতিক ব্যবধান জাতিকে বিভক্ত করিতে পারে না ; জাতীয় জনসমষ্টির মানসিক একতাবোধ ভৌগোলিক বাধা ও ব্যবধান অতিক্রম করিতে পারে।

(গ) **ভাষা ও সাহিত্যের একত্ব** (Oneness of language)—সমাজের অধিবাসীরা যদি একই ভাষাভাষী হয় তবে তাহাদের নিজেদের মধ্যে সহজেই ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয় এবং একাত্মবোধ জাগিয়া ওঠে। কিন্তু এই ভাষার ঐক্য জাতিগঠনের অপরিহার্য উপাদান নহে। ভারতবর্ষে কত বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত, যেমন —বাংলা, অসমিয়া, হিন্দী, তামিল, তেলুগু ইত্যাদি। কিন্তু ভাষার এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতবাসীদের একজাতি বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়াছেন। আবার, একই ইংরাজী ভাষা চলিতে থাকা সত্ত্বেও ইংরাজরা ও আমেরিকানরা পৃথক্ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং, কেবলমাত্র ভাষাই জাতিগঠনে সাহায্য করিতে পারে না। দেশের সাহিত্যও জাতীয়তার সাংস্কৃতিক বন্ধন।

(ঘ) **এক ধর্ম** (One Religion)—জাতির একটি প্রধান বন্ধন হইল ধর্ম। সকল অধিবাসী এক ধর্মাবলম্বী হইলে জাতীয়তাবোধ সহজেই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু [illegible] বর্তমান অধিকাংশ রাষ্ট্রই আজকাল ধর্ম [illegible] নিরপেক্ষ থাকে। [illegible] পার্থক্যের জন্যই হিন্দু ও মুসলমান ভারত ও পাকিস্তা[illegible] সৃষ্টি করিয়াছে এবং দুই জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম লইয়া একজাতি গঠনের অনেক উদাহরণ আছে। ভারতে নানা ধর্ম আছে। হিন্দু ধর্ম, মুসলিম ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম প্রভৃতি ধর্মের লোক লইয়া ভারতবর্ষ [illegible] গঠিত। আবার একই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ইউরোপে বহু জাতি দেখা দিয়াছে। বর্তমান জগতে জাতিগঠনে ধর্মের প্রভাব কমিয়া গিয়াছে।

(ঙ) **এক ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও আচার-ব্যবহার** (One Heritage, Culture and Custom)—আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের একতা জাতি সংগঠনে আবশ্যক বলিয়া মনে করা হয়। অতীতের ইতিহাস, জাতির উত্থান-পতন, গৌরব-গ্লানি, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ও সংস্কার এক হইলে লোকের মধ্যে একতার আকর্ষণ জন্মে। কিন্তু ইহারাও অপরিহার্য নহে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও আচার-ব্যবহার বিভিন্ন হইলেও সোভিয়েট ইউনিয়নে বিরাট সোভিয়েট দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে।

(চ) **সমান রাজনৈতিক প্রেরণা** (Common Political Aspiration)—বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবির (Toynbee) ভাষায় বলা চলে যে, জাতি-গঠনের অদম্য আকাঙ্ক্ষাই ("The will to be a nation") হইল জাতীয় জনসমষ্টি গঠনের প্রধান উপাদান। জনসমষ্টিতে জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি হইলে এবং তাহারা পৃথক্ রাষ্ট্র চালাইতে সক্ষম এইরূপ আত্মবিশ্বাস জাগরিত হইলে তাহারা পৃথক্ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিতে থাকে। এই স্বপ্ন তাহাদের সকলের মন একসূত্রে গাঁথিতে থাকে। জাতি গঠিত হইলে একই আইনকানুন ও রীতিনীতির প্রভাবে ঐ দেশের জনসমষ্টির অন্তর্গত অনেক ধরনের গোষ্ঠী ও উপদল নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া জাতির মধ্যে যুক্ত হইতে থাকে।

সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে জাতিগঠন নির্ভর করে একটি বিশেষ মনোভাবের উপরে। এক-জাতিত্বের মনোভাব যখন জাগিয়া উঠে, তখনই জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয় : "A people is a nation when it feels that it is a nation"। একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যখন জনসমাজ দলবদ্ধ হয়, তখনই জাতীয়তাবোধ আসিয়া পড়ে। অতীতের সব সুখদুঃখ-ভোগের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা লোকের মধ্যে একাত্মবোধ জাগাইয়া তোলে। তখন অন্য জনসমাজ হইতে পৃথক্ হইবার ভাব দেখা দেয়। সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নে জনসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাগরণ আসে এবং আত্মবিস্মৃতির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। মুক্তির সংগ্রামে জাতি সচেতন হয়।

একজাতি একরাষ্ট্র (One Nation, one State) : একটি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র [illegible]ঠিত হওয়া উচিত, এই মতবাদটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ইংরাজ মনীষী জন স্টুয়ার্ট মিল সমর্থন ক[illegible] তাঁহার লেখনীর সাহায্যে জনপ্রিয় করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভার্সাই সন্ধিতে আ[illegible]রকার [illegible] ইল্‌সন্ এই মতবাদটির উপর বিশেষ জোর দেন। তাঁহার মতে প্র[illegible] রাষ্ট্র য[illegible] মাত্র একটি জাতি লইয়া গঠিত হয় তবে যুদ্ধবিগ্রহ কমিয়া যাইবে ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটি রাষ্ট্র যদি তিনটি জাতি লইয়া গঠিত থাকে তবে সেই রাষ্ট্রটিকে ভাঙ্গিয়া [illegible]টি পৃথক্ রাষ্ট্র গড়িতে হইবে।

এইরূপ দাবির তাৎপর্য কি

প্রত্যেক আত্মসচেতন জাতি তাহার নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করিয়া নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাঁচাইতে চায়। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কয়েকটি জাতি থাকে, আর তাহাদের স্বার্থ যদি বিভিন্ন হয় তবে আত্মকলহের সৃষ্টি হইবে। সুতরাং যাহাতে প্রত্যেক জাতি একে অন্যের সহিত শান্তিতে ও সদ্ভাবে বাস করিয়া নিজেদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে এবং এইরূপে সকলের কৃষ্টি উন্নত করিয়া মানবসভ্যতার উন্নতি করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই ভিত্তির উপর প্রত্যেকটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত

হওয়া উচিত। তবে যদি কোন জাতি অন্য জাতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া একই রাষ্ট্রের অধীনে থাকিতে চায়, তবে আপত্তির কিছু নাই। বড় জাতি ছোট জাতিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিবে, উন্নত জাতি অনুন্নত জাতির উপরে আধিপত্য করিবে এবং সমান উন্নত জাতিগুলির মধ্যে হিংসা দ্বেষ আসিবে, ইহাই স্বাভাবিক। এই জন্যই যদি কোন জাতি দাবি করে যে তাহার ভিন্ন রাষ্ট্র চাই, তবে সেই দাবি সকলের মানিয়া লওয়া উচিত। প্রত্যেক জাতিরই রাষ্ট্র গঠন করিয়া নিজেদের পরিচালনা করার ও উন্নত হইবার অধিকার আছে। প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক্ থাকে। সেইজন্য প্রতিটি জাতির শাসনতন্ত্র, গঠন ও পরিচালনা সেই জাতি নিজেই করিবে। তাহাতে অন্য জাতির হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাকেই বলে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি বা অধিকার (right of self-determination)। এই অধিকার থাকিলে স্বভাবতই এক-একটি রাষ্ট্র এক-একটি জাতি লইয়া গঠিত হইতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা জন স্টুয়ার্ট মিলের নাম স্মরণ করিতে পারি। তিনি তিনটি কারণে এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করিয়াছেন। প্রথমত, জনসাধারণের নিজেদের উপর শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দরকার। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের সাফল্যলাভের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বহু জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্রে বিষম অনৈক্য দেখা দেয়। মিলের ভাষায় বলিতে গেলে "Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities." ইহাতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। আজ পাকিস্তানের দিকে তাকাইলে আমরা এই [illegible] দেখিতে পাই। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী জাতির আত্ম[illegible] অধিকার দাবাইয়া রাখার জন্যই গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামো বিসর্জন দি[illegible]। ফলে জন্ম নিয়াছে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ।

কিন্তু এই মতবাদের বিরোধীরা বলেন যে ইহা কার্যকালে প্রয়োগ করা কঠিন এবং প্রয়োগের ফলাফলও ভাল নয়।* অনেক রাষ্ট্রে দেখা যায়, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বহুদিন ধরিয়া এক নির্দিষ্ট [illegible]লে মিলিয়া মিশিয়া বাস করার ফলে সুখ-দুঃখের সমান-ভাগী হইয়া একই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যদি কোন কারণে এই ক্ষুদ্র জাতিগুলি আত্মপরিচালনের নীতিতে পৃথক্ রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তবে তাহাদের দুর্বলতা ব্যক্তির ও অন্যান্য স্বার্থের প্রতিকূলে যাইবে। লোক-বিনিময়ের দ্বারা একটি জাতির ভিত্তিতে এক

*অধ্যাপক হল তাঁহার 'ট্রিটিজ অন্ ইণ্টারন্যাশনাল ল' গ্রন্থে বলিতেছেন, "The phrase (self-determination) is one of dangerous vagueness as encouraging inordinate nationalist claims, and its application, in ignoring economic conditions, has led to some disastrous results."

এইরূপ অধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে। যে-অঞ্চলে একটি জাতির অধিবাসী বেশি, সেই অঞ্চল হইতে অন্য জাতির সংখ্যালঘিষ্ঠ দল অপর অংশে চলিয়া যাইয়া নিজেদের জাতির সহিত মিলিত হইবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে এইভাবে লোক বিনিময় হয়। তুরস্কের গ্রীক্ অধিবাসীরা গ্রীসে ফিরিয়া আসে, আর গ্রীসের তুর্কী অধিবাসীরা তুরস্কে ফিরিয়া যায়। 1947 সালে আগস্ট মাসে যখন ভারতবর্ষ দুই খণ্ডে ভাগ হইয়া দুইটি রাষ্ট্রে পরিণত হইল, তখন আমাদের দেশে এই সমস্যা গুরুতর আকারে দেখা দিল। পাকিস্তানে প্রায় দুই কোটি হিন্দু ছিল আর ভারতেও প্রায় চার কোটি মুসলমান ছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মগত নানা কারণে পাকিস্তানের হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া স্বজাতীয় রাষ্ট্রে আসিতে চাহিল। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র। এই জন্যই ভারত হইতে খুব বেশি মুসলমান পাকিস্তানে যায় নাই। কিন্তু পাকিস্তান হইতে বাস্তুহারারূপে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতে আসিয়াছে ও এখনও আসিতেছে। এত বিরাট লোক বিনিময় পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় নাই। যদিও লোক বিনিময় নীতি সরকারী ভাবে গৃহীত হয় নাই, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই বিনিময় ব্যক্তিগত ভাবে চলিতেছে। ইহাতে যে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধান যে কবে পর্যন্ত আমাদের দেশে হইবে, তাহা বলা কঠিন।

যাঁহারা এই নীতির সমর্থন করেন না তাহারা বলেন, এই নীতি অনুসরণ করিলে বর্তমান ইউরোপে 28টি রাষ্ট্রের পরিবর্তে প্রায় 64টি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি রাষ্ট্র হইবে। কিন্তু ইহারা কেহই স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইবে না। ইহাতে তাহাদের প্র[illegible] অবনতি হইবে। বিশেষত, বেশিদিন এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। [illegible]তিবেশী বড় বড় রাষ্ট্রের করতলগত হইবে। ইহাতে কলহ-বিবাদ বাড়িবে ও বিশ্বশান্তি নষ্ট হইবে।

যাঁহারা এই নীতির সমর্থক তাঁহারা বিপরীত যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, বিভিন্ন জাতি এক রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিলেই আত্মকল[illegible] বাড়িবে ও তাহা ক্রমে বিশ্বকলহে পরিণত হইবে। কিন্তু এক জাতির ভিত্তিতে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিলে এই সব বিঘ্ন দূর হইবে। কিন্তু জাতি নিজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে সহায়তা করিবে। কিন্তু বর্তমান জগতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এক হইয়া যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার ঝোঁকই বেশি দেখা যাইতেছে। বিশ্বমানবের একতার জন্য এক রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন জাতির মিলন হওয়াই কাম্য।

আন্তর্জাতিকতা (Internationalism): পৃথিবীতে আজকাল প্রধানত এক একটি জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল রাষ্ট্রের

অধিবাসিগণ নিজেদের এক জাতির লোক বলিয়া মনে করেন এবং অন্য রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বিজাতীয় লোক বলিয়া গণ্য করেন। বর্তমান শতাব্দীতে এইরূপ জাতীয়তাবাদ উগ্রতর হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ ছাড়াও দুইটি বৃহৎ মহাসমর মানবসভ্যতার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। জাতিকে রক্ষা করার নামে পৈশাচিক নরহত্যা, নির্বিচারে অপর জাতির স্ত্রীলোক ও শিশুহত্যা ঘটিয়াছে। বিষবাষ্প ও জীবাণু বোমা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা পরমাণু বোমার প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তি আস্বাদন করিয়াছি। বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুলে পরিণত হইয়াছেন। "ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার" (thirty pieces of silver) বিনিময়ে তাঁহারা বিবেক ও শিক্ষা বিক্রয় করিয়াছেন, কতিপয় বিবেকহীন ক্ষমতালোভীর হাতে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ তুলিয়া দিয়াছেন। জাতীয়তার দোহাই দিয়া এক রাষ্ট্রের সাহিত্যিকেরা অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিবাসীদের ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। সাধারণ মানুষও জাতীয়তার নামে রাষ্ট্রের অনেক অন্যায় কাজ সমর্থন করিয়াছে। বিভিন্ন জাতির ভিত্তিতে পৃথক্ পৃথক্ রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় পৃথিবীতে এইরূপ মানবতাবিরোধী কাজকর্ম সম্ভব হইয়াছে। প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রই নিজেদের দেশের অধিবাসীদের উপর এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা হাতে রাখিয়াছে। জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাই (sovereignty of nation states) বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা বাড়াইয়া দিয়াছে।

জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাই বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ

আজ সকল মানুষের মনেই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার শোনা যাইতেছে। বিভিন্ন জাতির পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব আজ সারা মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আজ আমরা সকলেই উপলব্ধি করিতেছি পৃথিবীর সম্মুখে আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানুষ জাতি ; একই পৃথিবীর অন্নে পালিত, একই রবিশশী মোদের সাথী।" অধ্যাপক লাস্কি তাই বলিতেছেন, "অবিলম্বে জাতীয় রাষ্ট্রগুলির হাত হইতে সার্বভৌম ক্ষমতা সরাইয়া লওয়া দরকার। কারণ, এই সার্বভৌমত্বের একমাত্র প্রকাশ হয় যুদ্ধের মধ্য দিয়া।" রবীন্দ্রনাথও এই উগ্র জাতীয়তাবাদকে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই উগ্র জাতীয়তাবাদই 'সভ্যতার সংকট'।

কেবল বর্তমান নয়, বহুকাল পূর্ব হইতেই পৃথিবীতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিতেছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করিলেও সর্বত্রই মানুষ এক, সমগ্র মানবজাতির অংশ। সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহ দূর করিয়া অবিলম্বে পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতির ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রে পৃথিবীকে আর ভাগ করিয়া রাখা উচিত নয়, এক মহা

কবির কল্পনা—মানুষের আইনসভা আর পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র

মানবজাতির ভিত্তিতে পৃথিবীময় একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ইংলণ্ডের কবি টেনিসনের ভাষায় বলা চলে—এমন দিন কবে আসিবে, যেদিন 'মানুষের আইনসভা ও পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র' (Parliament of Man and Federation of the World) স্থাপিত হইবে ?

এইরূপ মহান্ আন্তর্জাতিকতার আদর্শ এখন আর কবির কল্পনাতে সীমাবদ্ধ নাই, অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে ইহা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করিবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। মানবসমাজ ক্রমশ অগ্রসর হইয়াছে, পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে সম্প্রদায়, সম্প্রদায় হইতে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বিবর্তনের ধারা কখনও এই স্তরেই শেষ হইতে পারে না। জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র কখনই বিবর্তনের শেষ ধাপ নহে। বৃহত্তর মানবসমাজ নিশ্চয় এক আন্তর্জাতিক মহারাষ্ট্রের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে।

জাতীয় রাষ্ট্র হইল বিবর্তনের একটি ধাপ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র গঠনের পথে

ভৌগোলিক ভাবে সমগ্র পৃথিবীর আয়তন এখন ছোট হইয়া আসিয়াছে। পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র ডিঙাইয়া এক দেশের মানুষ অপর দেশের মানুষের সহিত মেলামেশা করিতেছে। এক জাতির সাহিত্য অপর দেশের ভাষায় অনূদিত হইতেছে ; সমগ্র মানবজাতির মনে ভাবজগতে ঐক্য স্থাপিত হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দ্রব্যের জন্ত এক একটি আন্তর্জাতিক বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এমন প্রসার হইয়াছে যে, সকল দেশই পরনির্ভরশীল হইয়া অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কাহারও সহযোগিতা ভিন্ন বাঁচিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর কোন অঞ্চলের কোন ঘটনা অপর কোন অঞ্চলকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করিতেছে। আজকাল নিউইয়র্কের কোন ব্যাঙ্কে গোলমাল বাধিলে শ্যাম দেশে বিপ্লব বাধিতে পারে, আমেরিকায় বেশি গম উৎপন্ন হইলে ভারতের গমচাষীর আর্থিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত।

কোন্ কোন্ শক্তি আন্তর্জাতিকতার স্বপক্ষে

শুধু তাহাই নহে। জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সভায় ও সমিতিতে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিগণ একত্রে মিলিয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, পরস্পর সমস্যা বুঝিবার ও উহা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বোঝাবুঝির মনোভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। মানবীয় অধিকারসমূহের প্রচার, আন্তর্জাতিক শ্রম দফ্তর, বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা প্রভৃতির কাজকর্মে মানুষের মনে সকল দেশেই আন্তর্জাতিকতার মূল সুরটি বাজিয়া উঠিতেছে।

এই আন্তর্জাতিকতা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী মতবাদ

প্রসারের ফলে। "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও", "সর্বহারার কোন পিতৃভূমি নাই" —মার্কসের এই সকল উদাত্ত আহ্বান সংকীর্ণ জাতীয়তার ঊর্ধ্বে উঠিয়া কতকগুলি উচ্চতর মানবীয় আদর্শে বহুদেশের মানুষকে পরস্পরের নিকটতর করিয়া তুলিয়াছে।

আন্তর্জাতিক আইনসমূহ রক্ষা সম্পর্কে আজকাল পৃথিবীর জনমত বিশেষ সচেতন। পৃথিবীর জনমতের বিরুদ্ধে যে কোন জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষেই বিষবাষ্পের ব্যবহার, আণবিক বোমার ব্যবহার বা পরীক্ষা প্রভৃতি কাজ ক্রমশ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষেরা আজ আর বিনা দ্বিধায় জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দাবি মানিয়া লইতে চাহে না।

কোন্ কোন্ শক্তি আন্তর্জাতিকতার বিপক্ষে

তবুও অনেকে, এখনও উটপাখির ন্যায় বালুকার মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখিয়াছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণতা পুরাতন ব্যাধির মত বহু মানুষের মন জরাজীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। অর্থনৈতিক স্বার্থ, ধর্মান্ধতা, সামরিক শক্তির উগ্রতা, অপর জাতির প্রতি অবিশ্বাস, ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি প্রভৃতি আন্তর্জাতিকতার ঘোর বিরোধী শক্তি। জাতীয় রাষ্ট্রকে সর্বাপেক্ষা উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করা, উহাকে নির্বিচারে পূজা করাই ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য, তাহাতেই ব্যক্তির মোক্ষ—এইরূপ মত প্রচার করা আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী।

ইতিহাসের গতি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে

এই সকল বিরোধী মত থাকা সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করি, নদীর গতিধারার ন্যায় পৃথিবীর সকল দেশের বিভিন্ন প্রকার সমাজের বিবর্তন এক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের মহামোহনায় নিশ্চয় পৌঁছিবে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষ আজ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনায়কদের আণবিক আস্ফালনের সম্মুখে কম্পমান: বিজ্ঞানের দম্ভে উন্মত্ত মানুষ নিজের অস্তিত্ব লোপে উদ্যত। আমরা আশা করিতে পারি যে, মানুষের অন্তরের শুভবোধ ও মানবতাবোধের উদয় নিশ্চয়ই হইবে। জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব খর্ব হইবে, মানুষের আইনসভা ও পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nation): প্রত্যেক শিক্ষিত লোকই আজ উপলব্ধি করেন যে, বিশ্বশান্তির জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আবশ্যক। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তির জন্য বিশ্ব জাতিসংঘ (League of Nations) স্থাপন করা হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের নানাপ্রকার ত্রুটি থাকায় ইহা তেমন কার্যকরী হইল না। পৃথিবীর ক্ষুদ্র জাতিগুলির স্বার্থ ইহা রক্ষা করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই বিশ্ব জাতিসংঘের সমাধি ঘটিল। দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ বিরাট ধ্বংসের ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করিল। বহুলোকের প্রাণনাশ হইল, বহু সম্পদ্ ধ্বংস হইল, বহু জাতির নানা প্রকার দুর্গতি হইল। এই বিশ্বযুদ্ধ স্থায়িভাবে নিবারণ করিবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হইল। মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল।

দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় গঠিত

এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানটি একটি মহান্ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া জগতের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধনই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বর্তমানে শতাধিক রাষ্ট্র এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য। এই জাতিপুঞ্জের সনদে নিম্নলিখিত পাঁচটি উদ্দেশ্য লিখিত আছে :

(ক) আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা।

(খ) আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা।

(গ) বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিত্রতার বন্ধন স্থাপন করা।

(ঘ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য সমস্যার জন্য বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতা করা।

(ঙ) এই সকল উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করা।

কয়েকটি পরিষদ ও সমিতি লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। ইহাদের মধ্যে দুইটি পরিষদই উল্লেখযোগ্য : একটি সাধারণ পরিষদ, অপরটি নিরাপত্তা পরিষদ। জাতিপুঞ্জের সকল রাষ্ট্রই সাধারণ পরিষদের সভ্য। বৎসরে একবার করিয়া এই সাধারণ পরিষদের অধিবেশন হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটিমাত্র ভোট দিতে পারে। এই পরিষদে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সমস্যাবলী আলোচনা করা হয় ও বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পাশ করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদ 25 জন সভ্য লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে চীন সাধারণতন্ত্র,* ফরাসী দেশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি 15 জন স্থায়ী সভ্য এবং বাকী 10টি অস্থায়ী সভ্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়। অস্থায়ী সভ্যের কার্যকাল 2 বৎসর। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। 15টি স্থায়ী সভ্য একমত না হইলে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। ইহা ছাড়া সম্মিলিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও বিরাট দফ্তরখানা আছে। এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে নানাপ্রকার সমিতি আছে। এই সকল পরিষদের ও সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য—বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ।

সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ

* চীন সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করায় ফরমোসাস্থিত চীনা সরকারের স্থায়ী সভ্যপদ বাতিল হইয়া যায়।

যদিও মাত্র বিশ বছর ধরিয়া এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি অনেক বিষয়ে ইহা সফলতা লাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে সম্পূর্ণ শান্তিরক্ষা করিতে না পারিলেও এই সংস্থা এখন পর্যন্ত বিরাট কোন বিশ্বযুদ্ধ ঘটিতে দেয় নাই। ইহাই বিশ্বসংঘের একটি বড় কৃতিত্ব। যখনই কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ দেখা দিয়াছে তখনই এই সংস্থা শান্তি স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। আন্তর্জাতিক কলহ মিটাইবার জন্য এই সংস্থার চারি প্রকারের ব্যবস্থা আছে। দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যদি কলহের সৃষ্টি হয় তবে সর্বপ্রথম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শান্তিপূর্ণভাবে এই কলহের মীমাংসার জন্য দুই রাষ্ট্রকেই আহ্বান করিবে। যদি এই শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা মীমাংসা না হয়, তবে মিটমাটের জন্য সংস্থা নিজেরাই একটি সমিতি বা লোককে নিযুক্ত করিবে। তাহাতে যদি কেহ রাজী না হয়, তবে নিরাপত্তা পরিষদ বিবদমান জাতির মধ্যে যেটি মীমাংসায় অনিচ্ছুক তাহার উপর অর্থ নৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারী করিবে অর্থাৎ অন্যান্য রাষ্ট্রকে এই রাষ্ট্রের সহিত কোনরূপ আমদানি-রপ্তানি করিতে নিষেধ করিবে। ইহাতেও যদি সেই রাষ্ট্র ভ্রূক্ষেপ না করে, তবে নিরাপত্তা পরিষদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। এই শেষ উপায় হইল, সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অন্যান্য সভ্যরাষ্ট্রের সৈন্য প্রেরণ করিয়া নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য করানো।

ইহার কার্যপদ্ধতি

এই সংস্থার শান্তিরক্ষার কয়েকটি প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আরব ও ইহুদীদের মধ্যে চিরন্তন বিবাদ এবং প্যালেস্তাইনের এই অশান্তি জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায় এখনও আয়ত্তে রহিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ সরকার ও ঐ দেশের স্বাধীনতাকামী অধিবাসীদের মধ্যে যখন বিরাট যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, তখন এই বিশ্বসংস্থার মধ্যস্থতায় সেই গোলমাল মিটিয়া যায় ও ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যখন জার্মানী দখল লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন ও সোভিয়েটের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়, তখন বিশ্বসংস্থার মধ্যস্থতায় এই গোলযোগ কিছুটা প্রশমিত হয়। পাকিস্তান যখন সহসা কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া বসে ও ভারত সরকার তাহাতে বাধা দিতে যাইয়া এই দুই রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধে, তখন জাতিপুঞ্জের চেষ্টাতেই যুদ্ধ থামে। এই ব্যাপারে এখনও এই সংস্থা মীমাংসার চেষ্টা করিতেছে। যখন উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমান্ত বিরোধ দেখা দিল তখন জাতিপুঞ্জের এই পরিষদ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শান্তি স্থাপন করিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার যে অন্যায় অবিচার করিতেছে তাহা নিবারণ করিতে এই সম্মিলিত

ইহার সাফল্য

জাতিপুঞ্জ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। ব্রিটেন ও ফরাসীদেশ যখন সুয়েজ খাল দখলের উদ্দেশ্যে সহসা মিশর দেশকে আক্রমণ করিয়া বসিল তখন বিশ্বসংস্থার আদেশে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যুদ্ধ থামাইতে বাধ্য হইল ও এই খালের উপরে মিশরের মালিকানা স্বীকার করিয়া লইল। ইহা বিশ্বসংস্থার একটি বিরাট কৃতিত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই। বেলজিয়াম সাম্রাজ্যবাদ যখন কঙ্গোর নবলব্ধ স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টা করিয়াছে তখন এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সেখানকার গৃহবিবাদ মিটাইয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বিবাদ মিটাইতে এই সংঘ যথেষ্ট সচেতন ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে।

এইভাবে যখন বিশ্বশান্তির বিঘ্ন ঘটিয়াছে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায় তাহার কিছুটা মিটমাট হইয়াছে। যদিও তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা এখনও সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই, তথাপি এই বিশ্বসংস্থাই বিশ্বশান্তি রক্ষার একমাত্র ভরসা।

Questions to be discussed

1. What is a Nation ?
   জাতি কাহাকে বলে ?
2. Define Nationalism and discuss the factors which promote national feeling.
   জাতীয়তাবাদ কাহাকে বলে ? জাতীয় মনোভাব গঠনের অনুকূল উপাদানগুলি কি ?
3. Explain the concept 'one nation, one state'.
   "এক জাতি এক রাষ্ট্র"—এই তত্ত্বটি আলোচনা কর।
4. Critically examine the 'principle of self-determination.'
   "জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" তত্ত্বটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখাও।
5. What is Internationalism ? Is it contradictory to Nationalism ?
   আন্তর্জাতিকতাবাদ কাহাকে বলে ? ইহা কি জাতীয়তাবাদ-বিরোধী ?
6. What are the forces for and against Internationalism ?
   আন্তর্জাতিকতাবাদ গড়িয়া ওঠার অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তিসমূহ কি কি ?
7. What is United Nations ? Discuss its composition and functions.
   জাতিসংঘ কাহাকে বলে ? ইহার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

১১

ভারতশাসন পদ্ধতি

Indian Administration

দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসর পরাধীনতার পর ভারতবর্ষ 1947 সালের 15ই আগস্ট ইংরাজদের অধীনতা হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইহার পূর্বে ভারতে সরকার ছিল বটে, কিন্তু কোন বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল ইংলণ্ডের। পরাধীনতার যুগে বৃটিশ পার্লামেণ্ট আমাদের দেশ শাসন করিত; স্বাধীনতা পাইবার পরে নবগঠিত ভারত-রাষ্ট্রের হাতেই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত আছে।

স্বাধীনতা লাভ

1947 সালের জুলাই মাসে বৃটেনের পার্লামেণ্টে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' নামে একটি আইন পাশ হয় এবং সেই আইন অনুযায়ী দুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনের দ্বারা শাসন-ক্ষমতা ও সার্বভৌম ক্ষমতা দুইটি ডোমিনিয়নের নিকট হস্তান্তরিত হইল। দুই দেশের গণপরিষদ স্বাধীন ভাবে তাহাদের শাসনতন্ত্র গঠন করিবার ক্ষমতা ও অধিকার হাতে পাইলেন। এই অধিকারের বলে ভারতের গণপরিষদ ভারতের জন্য নূতন সংবিধান রচনা করেন এবং 1950 সালের 26শে জানুয়ারী হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে নূতন শাসনতন্ত্র ভারতে প্রবর্তিত হয়। আড়াই বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া আমাদের সংবিধান রচিত হইয়াছে।

নূতন সংবিধান রচনা

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Indian Constitution):

স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে মাত্র 7টি ধারা (articles), 27টি উপধারা এবং সাত হাজার শব্দ আছে। আমাদের সংবিধানে ছিল 395টি ধারা ও 8টি তপশীল (schedule)। এখন পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৯৭১) মোট 27 দফা সংশোধনের পর ভারতীয় সংবিধানের কলেবর আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণত সংবিধানে শাসনব্যবস্থার মূলনীতি-গুলির উল্লেখ থাকে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে প্রশাসনের বিশদ খুঁটিনাটি লইয়াও অনেক নির্দেশ ও বিধান দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সংবিধান হইতে ভালো অংশ-গুলি গ্রহণ করিয়া সংবিধান রচয়িতারা এক আদর্শ সংবিধান রচনার চেষ্টা করিয়াছেন।

একটু লক্ষ্য করিলে আমরা ভারতের শাসনতন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। মূলত বৃটিশ শাসনের প্রভাবে আমাদের দেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা (Parlimentnry Government) প্রবর্তিত হইয়াছে। আমাদের মন্ত্রি-পরিষদ মিলিতভাবে সংসদের নিকট দায়ী। সংসদ সকল প্রকার আইন প্রণয়ন করে,

সরকারকে টাকাপয়সা মঞ্জুর করে, কর আদায়ের প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং শাসন সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে। যদিও শাসনব্যবস্থার শীর্ষে একজন রাষ্ট্রপতি এবং ইহার আকৃতি রাষ্ট্রপতিশাসিত (Presidential) কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে আমাদের সংবিধানের প্রকৃতি সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদীয় (Parliamentary or Cabinet system)।

দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিতে (federal structure) গঠিত হইয়াছে। কতকগুলি বিষয়ের শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে, এবং অপর কতকগুলি বিষয়ের শাসনভার রাজ্য সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যে-সকল বিষয়ের কথা সংবিধানে উল্লিখিত হয় নাই, সেই সকল অনুল্লিখিত বিষয়সমূহের শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে এমনভাবে গঠন করা হইয়াছে, যাহাতে জরুরী অবস্থায় ইহাকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা চলে।

তৃতীয়ত, আমাদের সংবিধানের প্রথম দিকে কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতির (directive principles) কথা বলা হইয়াছে। এই নীতিগুলির সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়াই শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন, সংবিধানে এই কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য শাসন কর্তৃপক্ষ এই নীতিগুলি ভঙ্গ করিলে কোন নাগরিক আইনের সাহায্যে আদালতের মাধ্যমে এই নীতির প্রয়োগ দাবি করিতে পারিবেন না।

চতুর্থত, আমাদের সংবিধানের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার (fundamental rights) ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতের যে-কোন নাগরিকের কাছেই এই সকল অধিকার খুবই মূল্যবান; ইহারাই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার ভিত্তি। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কোন আইন মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না।

পঞ্চমত, ভারতীয় সংবিধানে এক-নাগরিকত্ব (uni-citizenship) স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার অর্থ হইল যে ভারতীয় নাগরিকত্ব বলিলে সর্বভারতীয় নাগরিকত্ব বুঝায়, পৃথক্ কোন প্রদেশের বা রাজ্যের নাগরিকত্ব ভারতে নাই।

ষষ্ঠত, আমাদের সংবিধান আংশিক নমনীয় ও আংশিক অনমনীয় (partly rigid and partly flexible)। সংবিধানের কোন কোন অংশ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতেই সহজভাবে পরিবর্তিত করা চলে। আবার কোন কোন অংশের পরিবর্তন করিতে হইলে বিশেষ ধরনের পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।

সপ্তমত, আমাদের সংবিধানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহাতে রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হইয়াছে (secular state)। ইংলণ্ডের সরকার খ্রীষ্টীয় প্রোটেস্টান্ট ধর্মকে এবং পাকিস্তানের সরকার ইস্‌লাম ধর্মকে সরকারী ধর্ম বলিয়া মানিয়া

লইয়াছেন। এইজন্য তাহারা সরকারী অর্থও খরচ করেন। কিন্তু ভারতের সরকার কোন ধর্মের পোষণ ও প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করেন না। সরকারী উৎসাহে কোন ধর্মমত প্রচারিতও হয় না।

অষ্টমত, ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য প্রকার, যেমন বর্ণগত, উপজাতি এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রভৃতির জন্য আমাদের সংবিধানে নানা ব্যবস্থা আছে। সংখ্যালঘুদের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা অপর কোন সংবিধানে নাই।

সর্বশেষে, আমাদের সংবিধানে বিভিন্ন প্রকার প্রথা বা অলিখিত ব্যবহারিক রীতিনীতি (conventions) এখন পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই। দেশের সংবিধান লিখিত থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কালক্রমে উহাতে প্রচুর অলিখিত নিয়মকানুন গডিয়া উঠিয়াছে। সেই সকল প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতি শাসনতন্ত্রের লিখিত ধারাগুলির ন্যায় সমান মর্যাদা লাভ করে। আমাদের নিজস্ব প্রথা ও রীতিনীতি এখনও গড়িয়া উঠে নাই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তাই বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথাকে মানিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করি।

প্রস্তাবনা (Preamble): নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণের জন্যই সংবিধান প্রয়োজন। সংবিধানের মধ্য দিয়া জাতির জীবনদর্শন রূপায়িত হয়। লিখিত সংবিধানের প্রস্তাবনায় ইহার লক্ষ্য ও আদর্শের কথা ঘোষণা করা থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স ও আমেরিকার সংবিধান রচনার সময়ে এইরূপ আদর্শের কথা ঘোষিত হইয়াছিল। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রথমেও একটি প্রস্তাবনা সংযোজিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবনাতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। কতকগুলি আদর্শ ও অভীষ্টকে সম্মুখে রাখিয়া ভারতের জনগণ চলিবে, প্রস্তাবনায় এইরূপ বলা হইয়াছে। প্রস্তাবনাটি এইরূপ: "আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিবার পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিতেছি যে,—

ভারতের প্রত্যেক নাগরিক—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার লাভ করিবে;

চিন্তা, বাচন, প্রত্যয়, ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর আরাধনায় তাহাদের স্বাধীনতা থাকিবে;

তাহারা সমান মর্যাদা ও সুযোগ লাভ করিবে; এবং

ব্যক্তিগত মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগরিত করা হইবে।

আমাদের এই গণপরিষদে, আজ 1949 সালের 26শে নভেম্বর আমরা এই সংবিধান বিধিবদ্ধ করিতেছি, গ্রহণ করিতেছি ও আপনাদিগকে উহার অধীন করিতেছি।"

এই প্রস্তাবনা হইতে দেখা যায়, ভারত একটি **সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।** ইহাকে সার্বভৌম বলিয়া আখ্যা দেওয়ার কারণ হইল সে, ভারতরাষ্ট্র এখন নিজের দেশের মধ্যে স্বাধীন এবং কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অধীন নহে, অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায় সমান ক্ষমতা ও মর্যাদা তাহার আছে। যদিও ভারত স্বাধীন সার্বভৌম কিন্তু তাহা হইলেও স্থির করিয়াছে, সে কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য থাকিবে। ইংলণ্ডের নেতৃত্বে কয়েকটি জাতি ও রাষ্ট্র মিলিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমন্‌ওয়েল্‌থ নামে একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ভারত নিজ স্বার্থে তাহার সদস্য রহিয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয় নাই, কারণ তাহার রাষ্ট্রের উপর আইনগত কোন চরম ক্ষমতা ইংলণ্ডের রাজা বা রানীর হাতে আর নাই, যদিও কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছাসম্মেলনের প্রতীক (symbol) হিসাবে ভারত ইংলণ্ডের রাজা বা রানীকে স্বীকার করে।

ভারতকে **গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র** বলার তাৎপর্য হইল, ভারতের জনসাধারণ ভোট দিয়া নিজ দেশ শাসন করিবে; জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত আইনসভা দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। কেবল আইনগত সাম্য নহে। এই সাবিধানে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় এবং চিন্তা, মতপ্রকাশ, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে—গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রয়াস হইয়াছে।

ইহাকে **প্রজাতন্ত্র** বলার অর্থ হইল ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কোন রাজা বা একনায়ক থাকিবে না। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রের প্রধান হইল রাজা বা রানী কিন্তু ভারতে কোন রাজা বা রানী রাষ্ট্রের শীর্ষে অবস্থিত নাই, তাই ইহা রাজতন্ত্র নহে, প্রজাতন্ত্র। অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে।

সংবিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করিতে গিয়া এই প্রস্তাবনায় ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য (Justice, Liberty, Equality এবং Fraternity) এই চারিটি মহান্ আদর্শকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে।

মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights): মৌলিক অধিকার বলিলে সাধারণভাবে এমন অধিকার বুঝায় যাহারা প্রতিটি ব্যক্তির সকল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাইবার উপযোগী পরিবেশ গড়িয়া তোলে। ব্যক্তিস্বাধীনতার অঙ্গ হিসাবে মানবীয় অধিকারের নিশ্চয়তা দানকে একটি অত্যাবশ্যক শর্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার ঘোষণার প্রথা প্রচলিত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার পর তাহাতে দশটি ধারা সংযোজন করিয়া মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে যে-সকল সংবিধান লিখিত হইয়াছে তাহাতে নাগরিকের

মৌলিক অধিকার বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে মানুষের অধিকার এত বিস্তৃত ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, যাহা অপর কোন রাষ্ট্র এ-পর্যন্ত করে নাই। আমাদের সংবিধানে এই বিষয়ে 26টি ধারা সংযোজিত আছে। ভারতীয় সংবিধান-রচয়িতাগণ রাষ্ট্রকে মৌলিক অধিকারের সীমা নির্ধারণের অধিকার দিয়াছে। কোন বিষয়ে নাগরিকদের চরম অধিকার দেওয়া হয় নাই।

সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে: (1) সাম্যের অধিকার; (2) স্বাধীনতার অধিকার; (3) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার; (4) স্বকীয় ধর্মাচরণের অধিকার; (5) সংস্কৃতি ও শিক্ষাসংক্রান্ত অধিকার; (6) সম্পত্তির অধিকার, ও (7) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার।

(1) **সাম্যের অধিকার**—কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্যসরকারের কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, জন্মস্থান বা উহার কোনটির জন্য বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বা নর ও নারীর মধ্যে বৈষম্য করিতে পারিবে না এবং এই সকল কারণে কোনরূপ অযোগ্যতা বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতে পারিবে না। সাধারণের আমোদ-প্রমোদ স্থান, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কূপ, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট বা রাস্তা ব্যবহারে কোন নাগরিককে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। রাষ্ট্রের ধীনে কোন চাকুরিতে কোন পদে নিয়োগের সমান সুযোগ সমস্ত নাগরিকই পাইবে অস্পৃশ্যতাজাত কোনপ্রকার অযোগ্যতা কাহারও উপর আরোপ করিলে উহাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে। সামরিক উৎকর্ষ, বিদ্যাবত্তা বা ঐরূপ অপর কোন কারণ ছাড়া রাষ্ট্র কোন উপাধি দান করিবে না এবং কোন নাগরিক বৈদেশিক রাষ্ট্র-প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবে না। সাম্য বলিতে পৌর সাম্য, সামাজিক সাম্য, রাজনৈতিক সাম্য, আইনগত সাম্য ও অর্থনৈতিক সাম্য বুঝায়। প্রথম চারিটি সাম্যের অধিকার ভারতীয় নাগরিকদের দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই।

(2) **স্বাধীনতার অধিকার**—নাগরিকগণ নিম্নলিখিত অধিকার ভোগ করিবেন: (1) বক্তৃতা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা; (2) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র অবস্থায় জনসমাবেশ; (3) সমিতি ও সংঘ গঠন; (4) ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা; (5) ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে-কোন স্থানে অবস্থান বা বসবাস; (6) সম্পত্তি অর্জন, রক্ষা ও বিক্রয়; (7) যে-কোন পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা।

মনে রাখা দরকার, এই সকল কোন অধিকারই নাগরিকগণ অবাধে ভোগ করিতে পারেন না। যদি কোন অধিকার প্রচলিত নীতিজ্ঞানবিরোধী হয় অথব

রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও জনস্বার্থ ব্যাহত করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি সম্পর্কে নাগরিকগণকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বঞ্চিত করিতে পারে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকল্পে আটক আইন (Preventive Detention Act) বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে সংবিধান এই কারণে সংশোধিত করিতে হইয়াছে। এইরূপ নিরাপত্তা আইনের ফলে নাগরিকের এই অধিকার বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

(3) **শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার**—এই অধিকারের ফলে নরনারী লইয়া ব্যবসায়, বেগার ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। উহা লঙ্ঘন করা বিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয়। 14 বৎসরের কমবয়স্ক কিশোর-কিশোরীদের কারখানা প্রভৃতিতে নিয়োগ করিতে পারিবে না। অবশ্য জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে রাষ্ট্র সকলকেই কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে।

(4) **ধর্মাচরণের স্বাধীনতা**—সকল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা থাকিবে এবং ধর্মবিশ্বাস, উহার আচরণ ও প্রচারের অধিকার থাকিবে। সমাজকল্যাণ ও সংস্কারমূলক সংস্থাগুলি অথবা সাধারণের ব্যবহার্য হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুদের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার স্বাধীনতা থাকিবে। কোন বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কাহাকেও কর দিতে বাধ্য করা যাইবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় উপদেশ ও পূজার্চনার কালে উপস্থিতি সম্পর্কে স্বাধীনতা থাকিবে।

মনে রাখা দরকার, নাগরিকের ধর্মাচরণ রাষ্ট্রের শান্তি, শৃংখলা ও সাধারণ নীতি-জ্ঞানের বিরোধী হওয়া চলিবে না।

(5) **সংস্কৃতি ও শিক্ষা-সংক্রান্ত অধিকার**—কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী নাগরিকের সুনির্দিষ্ট কোন ভাষা ও লিপি বা সংস্কৃতি থাকিলে উহা সংরক্ষণের অধিকার তাহাদের থাকিবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

(6) **সম্পত্তিতে অধিকার**—কোন ব্যক্তি বে-আইনীভাবে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে পারিবে না। সরকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিয়া কোন নাগরিককে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কীয় নীতি আইন দ্বারা নির্ধারিত করিতে হইবে।

1951 সালের বিধানে এই অধিকারের কতকগুলি ধারাকে সংশোধিত করা হয়। এই সংশোধনের ফলে জনস্বার্থের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান দখল করিবার ও পরিচালনা করিবার ব্যাপক ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে দেওয়া হইয়াছে।

(7) **সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার**—উপরিউক্ত অধিকারগুলির মধ্যে একটি বা একাধিক অধিকারে বঞ্চিত হইলে এই অধিকারের সাহায্যে অধিধর্মাধি-

করণের (Supreme Court of India) শরণাপন্ন হওয়ার সুনির্দিষ্ট অধিকার সকল নাগরিকের থাকিবে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ঐ সকল সংবিধানগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য অপরাধীকে বিচারকের নিকট হাজির করিবার আদেশ প্রভৃতি পরোয়ানা জারী করিতে পারিবে। ইহাকে বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus) বলে। আবার হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্ট চরম আদেশ বা Mandamus, প্রতিষেধ (prohibition), অধিকার-পৃচ্ছা (quo warranto), উৎপ্রেষণ (certiorari) জারী করিয়া কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অধস্তন আদালত বা সরকারকে নিজের দায়িত্ব পালন করিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

নির্দেশক নীতি (Directive Principles of State Policy) : আমাদের সংবিধানের চতুর্থ অংশে (36-51 নম্বর ধারাতে) রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতির বিধান রাখা হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রের কাজকর্ম অতি ঘনিষ্ঠভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত জড়িত, সেইজন্য সংবিধানে ঐ সকল নীতি স্বীকৃত থাকা প্রয়োজন।* সোভিয়েট ইউনিয়ন, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি সকল আধুনিক সংবিধানেই এই ধরনের নীতি নির্দেশ করা রহিয়াছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলা হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল তান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল করা। যাহাতে দেশের শাসকবর্গ এই কথা মনে রাখেন এবং কিরূপ উপায়ে শাসন করা উচিত তাহা বুঝিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রে এই সকল নির্দেশক নীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যেমন, প্রত্যেক রাজ্যসরকার লোককল্যাণের উদ্দেশ্যে এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা কার্যকরীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবে যাহাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অধিবাসী ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ করিতে পারে, যাহার ফলে জাতীয় জীবনের সকল প্রতিষ্ঠান রূপময় হইয়া উঠে।

নির্দেশক নীতি কাহাকে বলে

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশক নীতিসমূহকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) অর্থনৈতিক আদর্শসমূ[illegible] (গ) আইন ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কার ; (ঘ) বৈদেশিক নীতির আদর্শ।

প্রত্যেকটি রাজ্যসরকার এমন নীতি অবলম্বন করিবে যাহাতে (1) নাগরিকেরা, নর ও নারী, সমানভাবে জীবিকার্জনের পর্যাপ্ত সুযোগ লাভের অধিকারী হইবে ;

* যেমন আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (International Labour Organisation) পঞ্চদশ বুলেটিনে বলা হইয়াছে "প্রত্যেক সংবিধানেই যেমন জনগণের সুপ্রাচীন স্বাধীনতাগুলি মৌলিক অধিকাররূপে চিহ্নিত থাকিবে, তেমনই আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কর্মবিধিও তাহাতে লিপিবদ্ধ থাকা দরকার' ("A constitution should embody both a reaffirmation of classical individual liberties and a declaration of the objectives and methods of modern welfare state.')

(2) জাতীয় সম্পদের মালিকানা এমনভাবে বণ্টিত হইবে যাহাতে উহা এক স্থানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সর্বাধিক পরিমাণে সর্বজনীন কল্যাণে আসিতে পারে; (3) নর ও নারী উভয়েই সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাইবে; (4) কৈশোর ও যৌবনকে শোষণ ও নৈতিক আত্মবিসর্জন হইতে রক্ষা করিতে হইবে, (5) নর ও নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তি যেন অপচিত না হয়; (6) প্রত্যেক রাজ্যসরকার পল্লী-পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যবস্থা করিবে; (7) প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ সামর্থ্যমত প্রত্যেক অধিবাসীকে কাজ ও শিক্ষালাভের সমান অধিকার দিবে এবং বেকারী, বার্ধক্য, পীড়া, অসামর্থ্য এবং অহেতুক দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য সুনিশ্চিত করিবার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে; (8) মজুরগণ যাহাতে মনিব শ্রেণীর নিকট সহৃদয় ব্যবহার পায় এবং নারী শ্রমিকগণ যাহাতে প্রসূতি-সাহায্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে; (9) কৃষি, শিল্প অথবা অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিক যাহাতে পরিপূর্ণ কাজ, জীবনধারণের উপযোগী মজুরি, জীবন যাপনের ভদ্রোচিত মান ও বিশ্রাম লাভের প্রকৃষ্ট সুযোগ পায়; ব্যক্তিগত বা সমবায়ের ভিত্তিতে কুটির-শিল্পের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করিবে; (10) সর্বত্র একপ্রকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন-বিধি প্রবর্তনের চেষ্টা করিবে; (11) কিশোর-কিশোরীদের চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের ব্য[illegible] করিবে; (12) অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও তপশীলভুক্ত শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে এবং সামাজিক অত্যাচার ও সর্বপ্রকার শোষণ হইতে রক্ষা করিবে; (13) জনগণের পুষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, লোক-স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন প্রত্যেক রাজ্য-সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য হইবে এবং চিকিৎসা ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে মাদকজাতীয় পানীয় ও ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবে; (14) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুপালন ও পশুপ্রজননের ব্যবস্থা করিবে ও অন্যান্য দুগ্ধবতী ও শকটবাহী পশু হনন নিষিদ্ধ করিবে; (15) উচ্চাঙ্গ শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ বস্তু ও আবাসস্থল, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ, স্থান ও বস্তুকে প্রত্যেক রাজ্য সরকার ক্ষতি, ধ্বংস, অপসারণ, বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি হইতে রক্ষা করিবে; (16) শাসন (Executive) বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক্ রাখিতে হইবে; (17) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধি-বিষয়ক শর্তগুলি প্রতিপালন ও সালিশীর সাহায্যে আন্তর্জাতিক কলহ মীমাংসা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

এই নীতিসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা

এই আদর্শগুলির সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি আমাদের সমাজবিবর্তনের কোন চিত্র আমরা চক্ষের সম্মুখে রাখিব। রাষ্ট্র পরিচালনার এই নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ অনেকাংশে সমাজতান্ত্রিক। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, বেকার ভাতা প্রদান, শিশু ও

যুবক-যুবতীদের শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির লক্ষণ। সম্প্রতি আমাদের দেশের শাসকদল সুস্পষ্টভাবে সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু কথা হইল, আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই। নির্দেশাত্মক নীতিতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। সংবিধানে অর্থনৈতিক সাম্যের মৌলিক অধিকার (Fundamental right to economic equality) থাকিলে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে দেশ হইতে আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করিতে হইত। অর্থাৎ বর্তমানে ভারতে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাষ্ট্রের চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু ইহা করিতে রাষ্ট্র সংবিধানগতভাবে বা আইনগতভাবে বাধ্য নহে। ভারতে কঠিন বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে, কিন্তু এই পর্যন্ত ভারত সরকার কাহাকেও বেকারভাতা প্রদান করে নাই। এই নির্দেশক নীতিগুলি তাই রাষ্ট্র সর্বদা পালন করে না; পালন করিতে আইনত বাধ্যও নহে। এই নীতিগুলিকে যদি নাগরিকদের মৌলিক অধিকাররূপে গণ্য করা হইত তবে দেশে পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী সংবিধান রচিত থাকিত। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকগণকে কাজের অধিকার, অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার এবং শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাই সমাজতান্ত্রিক সংবিধান রচনার নীতি।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য আছে (Differences between the Directive Principles of State Policy and the Fundamental Rights)। প্রথমত, মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর সীমা আরোপ করে, রাষ্ট্রের কাজের পরিধি সংকুচিত করে। অপরপক্ষে, নির্দেশক নীতিসমূহ কতকগুলি লক্ষ্য বা আদর্শে পৌঁছিবার উপযোগী নির্দেশনামা। প্রথমটি নেতিবাচক বা নিষেধমূলক, দ্বিতীয়টি কতকগুলি করণীয় নির্দেশের সমষ্টি। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির দিক হইতে বিচার করিলে মৌলিক অধিকারগুলি বিচারযোগ্য, কিন্তু নির্দেশক নীতিগুলি বিচারযোগ্য নয়। ইহার দুইটি তাৎপর্য আছে: (১) মৌলিক কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে আদালতের আশ্রয় লওয়া যায়, নির্দেশক কোন নীতি প্রতিপালিত না হইলে আদালতে যাওয়া যায় না। অর্থাৎ এই নীতিগুলি কার্যে পরিণত করিতে হইলে সেই মর্মে আইন প্রণয়ন করিতে হয়। কিন্তু নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য পৃথক্ আইন করিবার প্রয়োজন হয় না। (২) সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন আইন নির্দেশক নীতির বিরোধী হইলে সেই আইনকে আদালত বাতিল করিতে পারে না। কিন্তু মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে আদালত সেই আইন সংবিধান-বিরোধী বলিয়া বাতিল করিতে পারে। চতুর্থত, নির্দেশক নীতি

এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে যদি কোন বিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে মৌলিক অধিকার বহাল থাকিবে, নির্দেশক নীতি অগ্রাহ্য হইবে। পঞ্চমত, উদ্দেশ্যের দিক্ হইতে নির্দেশক নীতিগুলি সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক। সমাজতন্ত্র আমাদের লক্ষ্য বা আদর্শ, গণতন্ত্র আমাদের সংবিধানগত বাস্তব (constitutional reality)। সংবিধানের দিক হইতে বিচার করিলে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়ের সংমিশ্রণ আছে বটে, তবে প্রথমটির উপর গুরুত্বই বেশি।

এই নীতিগুলির সমালোচনা এবং উপযোগিতা ও গুরুত্ব

অনেকে মনে করেন যে, নীতিগুলি আদালতগ্রাহ্য নয় তাই ইহাদের কোন সার্থকতা নাই। তাঁহাদের মতে এইগুলি সংবিধানে অপ্রয়োজনীয় সংযোজন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। সংবিধানের 37নং ধারা অনুযায়ী এইগুলি দেশের শাসন পরিচালনার মৌলিক অঙ্গ (fundamental in the governance of the country)। আইনের বাধ্যবাধকতাই কোন নীতির কার্যকারিতার একমাত্র গ্যারান্টি নয়। সচেতন জনমতের দ্বারাই এইগুলি সাফল্যের সহিত রূপায়িত হইতে পারে। এই নির্দেশক নীতিগুলির গুরুত্ব রাজনৈতিক। সরকার যদি এই নীতিগুলি অনুযায়ী পরিচালিত না হয় তবে সচেতন জনমত বা নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট নিশ্চয় তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। ইহাদের অবহেলা জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে। আদালত বিচার করিবে না ঠিকই, কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী এইগুলি কার্যকরী হইতেছে কি না সেই মানদণ্ডেই সরকারকে বিচার করিবে। দ্বিতীয়ত, সরকারের প্রতিটি আইন, শাসকদের প্রতিটি কাজ, বিচারকদের প্রতিটি বিচার—এই সকলের পথপ্রদর্শক হিসাবে ইহারা কাজ করে। তাই ইহাদের শিক্ষণ মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতিগুলির সহিত সঙ্গতি রাখার জন্য মৌলিক অধিকারের সংশোধন করা হইয়াছে। সর্বোপরি, এইগুলি উল্লেখের ফলে আমাদের সংবিধানের আদর্শগত মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে Justice, Liberty, Equality ও Fraternity-র কথা বলা হইয়াছে তাহা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ ও আহ্বান এই নীতিগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের সংবিধানের প্রগতিশীল চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অধিকার সৃষ্টি হইয়াছে। গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ করার জন্য সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে অপরিহার্য, ইহাই এই নীতিগুলিতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

(Indian Union)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন ও কাঠামো (Formation and Structure of Indian Union): প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে অবিভক্ত ভারতে ইংরাজশাসিত অঞ্চল ছাড়াও প্রায় ছয়শত দেশীয় রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজারা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করিতেন এবং ইংরাজ সরকারকে নিয়মিত কর দিতেন। স্বাধীনতালাভের পর দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত বা পাকিস্তান কোন-না-কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ রাজ্যই ভারতে যোগদান করিয়াছে। যোগদানের চুক্তিনামা (Instrument of Accession) নামক দলিল সম্পাদন করায় এবং ভারত সরকার তাহা অনুমোদন করায় সেই সকল রাজ্য ভারতের সহিত একীভূত হইয়াছে। কিছুসংখ্যক দেশীয় রাজ্যকে একত্রে মিলাইয়া স্বতন্ত্রভাবে অঙ্গরাজ্যের (member states) মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে ; বাকি দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে ; অথবা ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে।

সংবিধান অনুসারে ভারত একটি রাজ্যসংঘ (union), কতকগুলি রাজ্য লইয়া গঠিত একটি রাষ্ট্র। সংবিধানের সুরুতে রাজ্যসংঘের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল: 'ক,' 'খ' ও 'গ'। 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে ছিল (1) আসাম, (2) বিহার, (3) বোম্বাই, (4) মধ্যপ্রদেশ, (5) মাদ্রাজ, (6) উড়িষ্যা, (7) পূর্ব-পাঞ্জাব, (8) উত্তরপ্রদেশ, (9) পশ্চিমবঙ্গ। 1953 সালে মাদ্রাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্ধ্রকে 'ক' শ্রেণীর রাজ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। 'খ' শ্রেণীর রাজ্য ছিল—(1) হায়দরাবাদ, (2) জম্মু ও কাশ্মীর, (3) মধ্যভারত, (4) মহীশূর, (5) পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য-সমবায়, (6) রাজস্থান, (7) সৌরাষ্ট্র ও (8) ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন। 'গ' শ্রেণীর রাজ্য ছিল—(1) আজমীঢ়, (2) ভূপাল, (3) বিলাসপুর, (4) কুর্গ, (5) দিল্লী, (6) হিমাচল প্রদেশ, (7) কচ্ছ, (8) মণিপুর, (9) ত্রিপুরা ও (10) বিন্ধ্যপ্রদেশ। বিন্ধ্যপ্রদেশকে পূর্বে 'খ' এবং পরে 'ক' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। এই তিন শ্রেণীর রাজ্যের সহিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে লইয়া ভারতের রাজ্যক্ষেত্র (territory) গঠিত হইয়াছিল। কোন নূতন অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহাও ভারতের রাজ্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইবে ইহা স্থির হইল। যেমন, চন্দননগর ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল ছিল, এখন ভারতের অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। কিছুকাল পরে বিলাসপুরকে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছিল।

সংবিধানে নিয়ম আছে যে, ভারতীয় সংসদ (Indian Parliament) আইন করিয়া বিভিন্ন রাজ্যগুলির গঠন, সীমানার হ্রাস-বৃদ্ধি, নাম পরিবর্তন বা একাধিক অঞ্চলের একত্রীকরণ প্রভৃতি করিতে পারেন। তবে উক্ত রাজ্যগুলির মতামত জানিয়া লইতে হইবে, কিন্তু রাজ্যগুলির মতামত গ্রহণ করা বা মানিয়া লওয়া সম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা ভারত সরকারের নাই। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া এই ধরনের কোন বিল বা আইনের খসড়া সংসদের কোন পরিষদে উপস্থিত করা চলিবে না।

মনে রাখিতে হইবে 1956 সালে 1লা নভেম্বর হইতে ভারতের রাজ্যক্ষেত্র স্থির থাকিলেও বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা নূতনভাবে স্থির হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে আমাদের সংবিধান সংশোধিত হইয়াছিল এবং 'নবম সংবিধান সংশোধন বিধি' দ্বারা নূতনভাবে রাজ্যসমূহ গঠিত হইয়াছিল, পুরাতন শ্রেণীবিভাগ বিলুপ্ত হইয়াছিল। 1956 সালের 1লা নভেম্বর হইতে ভারতে সমমর্যাদাসম্পন্ন 14টি রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। উহাদের নাম হইল : জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, বোম্বাই, অন্ধ্র, মহীশূর, মাদ্রাজ ও কেরল। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত 6টি এলাকাও গঠন করা হইয়াছিল। ইহারা ছিল প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন : দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ। ইহার পরে 1960 সালের 1লা [illegible] বোম্বাই রাজ্যকে ভাঙিয়া গুজরাট ও মহারাষ্ট্র নামে দুইটি পৃথক্ রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। 1961 সালের ফেব্রুয়ারীতে নাগা পাহাড়-তুয়েনসাং অঞ্চলকে পৃথক্ করিয়া নাগাভূমি (Nagaland) নাম দেওয়া হয়। 1962 সালের সেপ্টেম্বর হইতে উহা একটি স্বতন্ত্র অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয় এবং 1967 সালে পাঞ্জাব রাজ্য ভাঙিয়া পাঞ্জাব ও হরিয়ানা নামে দুইটি পৃথক্ রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। 1971 সালের জানুয়ারী মাসে হিমাচল প্রদেশকে অংগরাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে ও মেঘালয় রাজ্যেরও সৃষ্টি হয়। 1972 সালের জানুয়ারী মাসে ত্রিপুরা ও মণিপুর অংগ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং বর্তমানে ভারত শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে [illegible]টি অংগ রাজ্য ও 9টি কেন্দ্রশাসিত ইউনিয়ন অঞ্চলে বিভক্ত আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে মাদ্রাজ রাজ্যের নাম পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহাকে এখন বলা হয় তামিলনাড়ু।

ভারতীয় রাজ্যসংঘের বর্তমান গঠন*

ক। অংগরাজ্যসমূহ

1. অন্ধ্রপ্রদেশ
2. আসাম
3. উড়িষ্যা
4. উত্তরপ্রদেশ
5. কেরল
6. গুজরাট
7. জম্মু ও কাশ্মীর
8. তামিলনাড়ু**
9. ত্রিপুরা
10. নাগাভূমি
11. পশ্চিমবঙ্গ
12. পাঞ্জাব
13. বিহার
14. মণিপুর
15. মধ্যপ্রদেশ
16. মহারাষ্ট্র
17. মহীশূর
18. মেঘালয়
19. রাজস্থান
20. হরিয়ানা
21. হিমাচলপ্রদেশ

খ। কেন্দ্র-শাসিত বা ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহ

1. অরুণাচল প্রদেশ (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা [নেফা])
2. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
3. গোয়া, দমন ও দীউ
4. চণ্ডীগড়†
5. দ[illegible] ও নগর হাভেলি
6. দিল্লী
7. পণ্ডিচোর
8. মিজোরাম
9. লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনাদিভি দ্বীপপুঞ্জ।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলের (দিল্লী, গোয়া, দমন ও দিউ, পণ্ডিচেরি প্রভৃতি) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভার উপরে ন্যস্ত থাকিবে ; এই সকল রাজ্যের আইন, বাজেট ও নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সাহায্যের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ অথবা স্ট্যাণ্ডিং কমিটি থাকিবে। উপদেষ্টা পরিষদে বা স্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে থাকিবেন এই

---

* 1972 সালে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে (North-Eastern Areas) 5টি রাজ্যে (States) ও 2টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে (Union Territories) ভাগ করা হইয়াছে। 5টি রাজ্য— আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং নাগাভূমি আর 2টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল—মিজোরাম (মিজো পাহাড় অঞ্চল লইয়া গঠিত) এবং অরুণাচল প্রদেশ (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা [NEFA])। পুনর্গঠন আইনানুসারে ইহা স্থির হইয়াছে যে একজন রাজ্যপাল উপরিউক্ত 5টি রাজ্য শাসন করিবেন এবং সকলের জন্য একটি মাত্র হাইকোর্ট থাকিবে। ইহা ছাড়া এই সমগ্র অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের জন্য উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টা পরিষদও থাকিবে। এই পরিষদের নাম হইবে উত্তর-পূর্ব পরিষদ (North-Eastern Council)। উত্তর-পূর্ব অঞ্চল পুনর্গঠনের পর বর্তমান রাজ্যসংখ্যা দাঁড়াইল 21-এ।

** তামিলনাড়ুর পূর্ব নাম ছিল মাদ্রাজ রাজ্য।

† আরও জানা গিয়াছে আগামী 1975 সালে চণ্ডীগড় পাঞ্জাব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে—পৃথক্ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে থাকিবে না।

সকল অঞ্চল হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ। দিল্লীতে একটি করপোরেশন গঠিত হইবে, এবং অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, পণ্ডিচেরিতে, কেন্দ্রীয় শাসনাধীন আঞ্চলিক পরিষদ থাকিবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন (Distribution of Powers between the Central and State Governments) : যদি দেশের মধ্যে একটিমাত্র সরকার সমস্ত অঞ্চলকে শাসন করেন, সমস্ত অঞ্চলের জন্য এবং সকল বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে সেইরূপ সরকারকে বলা হয় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary State), যেমন, ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি। কিন্তু যদি দেশে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক দুই ধরনের সরকার থাকে এবং ইহারা কে কি বিষয় শাসন করিবে তাহা বিভক্ত থাকে, অর্থাৎ যদি উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ থাকে, তাহা হইলে সেইরূপ রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র (Federal State) বলে ; যেমন, ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি।

আমাদের ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহাকে বলা হয় ভারতীয় রাজ্যসংঘ। এই দেশে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারসমূহ উভয়ে বিভিন্ন বিষয় শাসন করেন এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। কোন্ সরকারের কি কি, বিষয়ের উপর ক্ষমতা এবং কি কি ধরনের কার্যাবলী তাহা সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে। 1935 খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শাসনবিধিকে অনুসরণ করিয়া এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিধিতে বলা হইয়াছিল যে, যে-সকল বিষয় কাহার হাতে দেওয়া হইল এইরূপ কোন উল্লেখ নাই উহারা গর্ভনর জেনারেলের হাতে থাকিবে। এই নিয়মের পরিবর্তে ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে এই অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (বা Residual powers) থাকিবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। ভারতীয় সংবিধানের এইরূপ ক্ষমতা বণ্টন রীতিতে নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকার অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে। ঐরূপ না করিলে দেশের ঐক্য ও সংহতি বিশেষ ব্যাহত হইত। বর্তমানে আরও বেশি কেন্দ্রিকতার ঝোঁক দেখা যাইতেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি সম্পর্কে সর্বভারতীয় নীতি গ্রহণ করা দরকার। তাই সকলেই আজকাল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অধিকতর ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী।

আইন প্রণয়ন ও শাসনের সমগ্র ক্ষমতাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে : (1) সংঘ তালিকা (Union List), (2) রাজ্য তালিকা (State List) এবং (3) যুগ্ম-তালিকা (Concurrent List)।

(1) **সংঘ তালিকা**—সংঘ তালিকায় 97টি বিষয় আছে এবং ইহাদের সম্পর্কে কেবল ভারতীয় সংসদই আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, কোন রাজ্যসরকারের এই

বিষয়সমূহের উপর কোন এক্তিয়ার নাই। দেশরক্ষা ; যুদ্ধ ও শান্তি ; স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী ; অস্ত্রোৎপাদন ; বৈদেশিক বা পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় বিষয় ; রেলপথ ; জাহাজ ; নাগরিকত্ব ; ডাক, তার ও বেতার ব্যবস্থা ; মুদ্রা-ব্যবস্থা ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ; বীমা ; আদমসুমারী ; প্রধান প্রধান বন্দর ; শেয়ার বাজার ; লবণ ; খনি ; আফিম ; কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি ; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ; বৈদেশিক ঋণ ও জাতীয় ঋণ প্রভৃতি এবং আরও অনেক বিষয় এই তালিকাতে রহিয়াছে।

(2) **রাজ্য তালিকা**—রাজ্য তালিকায় 65টি বিষয় আছে এবং ইহাদের সম্পর্কে সাধারণ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন এক্তিয়ার নাই। কেবল বিভিন্ন রাজ্য-সরকারই ইহাদের সম্পর্কে নিজ নিজ অঞ্চলে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা, পুলিস, জেল ও বিচার ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পথঘাট, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, কৃষি-শিক্ষা ও গবেষণা, পরিবহন, জল সরবরাহ, সেচব্যবস্থা, ভূমি-ব্যবস্থা, বনসম্পদ, সমবায় আন্দোলন, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি আরও অনেক বিষয় এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

যদিও এই সকল বিষয় রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত তাহা হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন এবং শাসন করিতে পারেন। যেমন, (1) রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে, (2) একের বেশি রাজ্য সরকার অনুরোধ জানাইলে, (3) রাজ্য পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ জাতীয় স্বার্থে ইহা প্রয়োজন মনে করিলে, এবং (4) পররাষ্ট্রের সহিত সন্ধি বা চুক্তি পালনের জন্য প্রয়োজন মনে করিলে পার্লামেণ্ট এই সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইতে পারেন।

(3) **যুগ্ম-তালিকা**—যুগ্ম-তালিকাতে 47টি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েই এই সকল বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। তবে উভয়ের আইনে বিরোধ ঘটিলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বলবৎ থাকে এবং রাজ্য সরকারের আইন বাতিল হইয়া যায়। ফৌজদারী আইন ও কার্যবিধি, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেওয়ানী বিচার ও কার্যবিধি, শ্রমিক সংঘ ও শ্রমিক সংঘাত ; সামাজিক বীমা, পুনর্বাসন, জন্মমৃত্যুর খতিয়ান, কারখানা, বিদ্যুৎ, সংবাদপত্র, পুস্তক, ছাপাখানা ; ছোট ছোট বন্দর ; মূল্য নিয়ন্ত্রণ ; দেউলিয়া প্রভৃতি বিষয় যুগ্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। যে-সকল বিষয় উপরোক্ত তিনটি তালিকার কোথাও উল্লিখিত নাই সেই সকল অনুল্লিখিত বা অবশিষ্ট বিষয়সমূহ (Residuary Powers) কেন্দ্রের অধীন।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ কি কি বিষয় হইতে আয় করিতে পারিবে তাহাও সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে ; এইরূপ উভয়ের মধ্যে আয়ের উৎসসমূহও বিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন, আয়কর, সম্পত্তি কর, বাণিজ্য শুল্ক, আভ্যন্তরীণ দ্রব্যাদির উপর

শুল্ক, রেলপথ, ডাক ও বেতার, মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি হইল কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উৎস। আয়করের কিছু অংশ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং পাট রপ্তানি শুল্কের কিছু অংশ পাট-উৎপাদনকারী রাজ্যসমূহকে (যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি) দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকারগুলির আয়ের উৎস হইল ভূমি-রাজস্ব, কৃষি-আয়কর, বিক্রয় কর, রেজিস্ট্রেশন, বিদ্যুৎ কর, আবগারী শুল্ক, প্রমোদ কর, কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত আয়করের অংশ বা অর্থ-সাহায্য।

ভারতীয় রাজ্যসংঘের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে গঠিত হইলেও আমাদের দেশে অধিক কেন্দ্রীয় ভাব পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে বা নিজ নিজ ক্ষেত্রে আইনত প্রধান কর্তৃপক্ষ হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে শাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, রাজ্য সরকারগুলির আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের দ্বারা প্রণীত আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে এবং রাজ্য সরকারগুলির শাসন-ক্ষমতা যেন কখনই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-ক্ষমতার পরিপন্থী না হয় বা উহাকে ব্যাহত না করে। এরূপ লেখা আছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং সেই নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারের শাসন চালাইতে হইবে। পূর্বে দেখিয়াছি, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন বোধ করিলে রাজ্য তালিকার বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এবং সর্বশেষে, রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া রাজ্যের শাসনভার কেন্দ্রের হাতে তুলিয়া লইতে পারেন।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ইহার বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Indian Federation) : আমাদের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদান কতটা আছে তাহা আলোচনার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখা দরকার। এই ধরনের রাষ্ট্রে জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং অঙ্গরাজ্যের সার্বভৌমত্ব—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করা হয়। বলা হয় যে "A federal constitution attempts to reconcile the apparently irreconciliable claims of national sovereignty and state sovereignty." এইরূপ সংবিধানে কয়েকটি মূল রাজ্য নিজেদের সার্বভৌমত্বের কিছু অংশ একটি কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে অর্পণ করে। ফলে একই সংবিধানের মধ্যে দুই ধরনের সরকার সহাবস্থান করে। উভয় প্রকার সরকারই ক্ষমতা পায় শাসনতন্ত্র বা সংবিধান হইতে। শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকের এক্তিয়ার সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কি কি

বৈশিষ্ট্য হইল শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য, ক্ষমতার বণ্টন, এবং বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা। প্রতি নাগরিক উভয় সরকারেরই অধীন, অর্থাৎ তাহাদের দ্বিনাগরিকত্ব (double citizenship) দেখা যায়। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত নাই এমন বিষয়সমূহ অর্থাৎ অনুল্লিখিত বিষয়গুলি (residual powers) সাধারণত অঙ্গরাজ্যের সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।

আমাদের সংবিধানে কোথাও যুক্তরাষ্ট্র বা Federation শব্দটি ব্যবহার করা হয় নাই। সকল সময়েই কেন্দ্রের সহিত অঙ্গরাজ্যের সম্বন্ধকে ইউনিয়ন (Union) বা সংযুক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তথাপি এই ইউনিয়নের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতি-নীতির কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মোট 21টি রাজ্য (মেঘালয় সমেত) এবং 9টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল লইয়া এই যুক্তবাষ্ট্র গঠিত। প্রত্যেকটি রাজ্যেরই আলাদা সরকার আছে এবং উহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে। সমগ্র দেশের স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে আইন করার এক্তিয়ার অঙ্গরাজ্যসমূহের হাতে। আবার কোন কোন বিষয়ে আইন রচনার ভার উভয় সরকারের হাতে। কেন্দ্র যাহাতে অঙ্গরাজ্যের অধিকারে বা অঙ্গরাজ্যগুলি যাহাতে কেন্দ্রের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে, তাহা দেখিবার ভার সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া আছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংসদকে এবং রাষ্ট্রপতিকে অঙ্গরাজ্যের অধিকার লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রের তুলনায় অঙ্গরাজ্যকে নিতান্ত হীনপ্রভ মনে হয়। এই কারণে অনেকে বলেন যে ভারতে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রবর্তিত হয় নাই।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য কিছুটা বর্তমান

যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির যে মর্যাদা, ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য সেই মর্যাদা পায় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে "অঙ্গরাষ্ট্রের অধিকার" (State-rights) নামে যে বিধান আছে, আমাদের সংবিধানে তাহা নাই। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ছিল না, কোন অঙ্গরাষ্ট্রের সম্মতিও লওয়া হয় নাই। আমেরিকার কোন অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে কি না তাহা স্পষ্টভাবে বলা নাই। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই অধিকার আছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে কোন অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না।

ভারতীয় সংবিধানের 248 সংখ্যক ধারা অনুযায়ী অনুল্লিখিত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা মূল রাজ্যগুলির হাতে। আমেরিকার সংবিধান কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কিত ; রাজ্যসরকারগুলির সংবিধান পৃথক্।

কি কি কারণে কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক বেশি

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্ট বা সংসদ আইন রচনা, নূতন রাজ্য গঠন, আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি, রাজ্যের সীমানা ও নামের পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যের আইনসভা সম্মতি না দিলে উক্ত ধরনের বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপন করা যায় না। আমাদের নাগরিকদের দ্বিনাগরিকত্বেরও কোন অধিকার নাই, আমরা সকলেই ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক।

ভারতের অঙ্গরাজ্যসমূহের হ্রাসবৃদ্ধি ও নাম পরিবর্তনের অধিকার কেন্দ্রীয় সংসদের, কিন্তু মার্কিণ রাষ্ট্রে ইহা কখনও সম্ভব নয়। উহা হইল "an indestructible union composed of indestructible States." ভারতে অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত। রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে রাজ্য আইনসভায় গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাইতে পারেন। বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিরাও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত। সুইজারল্যাণ্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ দেখা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য হইতে প্রতিনিধির সংখ্যা সমান থাকিবে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চকক্ষ সিনেটে 50টি অঙ্গরাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব; ধনজনশালী বৃহৎ নিউইয়র্ক ও আলাস্কা প্রত্যেকেই দুইজন প্রতিনিধি পাঠান। কিন্তু ভারতের রাজ্যসভায় প্রতিটি রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা সমান নয়, যেমন উত্তর প্রদেশ 34 জন এবং আসাম 7 জন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত 12 জন সদস্যও সেখানে আছেন।

যদি দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা এমন প্রস্তাব পাশ করে যে অঙ্গরাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন করিলে ভাল হয় তাহা হইলে (252 ধারা অনুযায়ী) ওই বিষয়ে সংসদ আইন করিতে পারিবেন। আরও একটি বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংসদ রাজ্যের অধিকারভুক্ত বিষয়ের উপর আইন করিতে পারেন। উহা হইল ভারত সরকার বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি বা চুক্তি করিলে সেই শর্ত পালনের জন্য যে কোন বিষয় (253 ধারা)।

সাধারণ অবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলি যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করেন জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির হাতে এত বেশি ক্ষমতা আসে যে তখন অঙ্গরাজ্যগুলির ততটুকু স্বাধীনতাও থাকে না এই অবস্থায় আমাদের সংবিধান প্রায় সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক হইয়া পড়ে। অর্থসংক্রান্ত বিষয়, জাতীয় ভাষা প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়েও কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক প্রবল। বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দরুন রাজ্য সরকারসমূহ অর্থের জন্য কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী বলিয়া তাহাদের স্বাধীনতা একান্ত সঙ্কুচিত। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একদলীয় শাসন দীর্ঘকাল চলিতেছে বলিয়া এইরূপ এককেন্দ্রিকতার ঝোঁক ক্রমশ আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

এই সকল নানা কারণে অধ্যাপক জেনিংস্ (Jennings) বলেন যে ভারত হইল "a federation with a strong centralising tendency." অধ্যাপক হুইয়ার (Wheare) লিখিয়াছেন যে ভারতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া উহার সহিত কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংযোজিত হইয়াছে মাত্র; "a system of government which is quasi-federal...a unitary state with subsidiary federal features, rather than a federal state with subsidiary unitary features." ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্যতম বিশেষজ্ঞ শ্রীদুর্গাদাস বসুও এইরূপ ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে, "The Constitution of India is neither federal nor purely unitary, but is a combination of both. It is a Union or a composite state of novel type. It enshrines the principle that in spite of federation the national interest ought to be paramount."*

উপসংহার: আধাযুক্তরাষ্ট্রীয়

ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন ব্যবস্থা (Amendment of the Indian Constitution): যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শাসনতন্ত্র সর্বদাই লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া দরকার। লিখিত না হইলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা লইয়া না। বিবাদ-বিসংবাদ চলিতে থাকিবে। ইহাদের মধ্যে কেহ যাহাতে অন্যের অধিকার সংকুচিত করিতে না পারে এইজন্য ইহা দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়াও প্রয়োজন।

ভারতের শাসনতন্ত্র আংশিকভাবে পরিবর্তনীয় এবং আংশিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়। ইহার কোন কোন অংশ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতেই পরিবর্তন করা যায়, আবার কিছু অংশ পরিবর্তন করিতে হইলে বিশেষ পদ্ধতি বা পৃথক্ ব্যবস্থার মাধ্যমে করিতে হয়। তবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সুপরিবর্তনীয় ধারাগুলি সংখ্যায় অল্প ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। তাই ইহাকে প্রধানত দুষ্পরিবর্তনীয় বলা চলে।

আমাদের সংবিধানের সংশোধনবিধিকে চারিভাগে ভাগ করা চলে। (1) কতকগুলি বিষয় আছে যাহাদের সংশোধন করা অতি সহজ, ব্রিটেনের সংবিধান সংশোধনের মত। কোন সাধারণ বিল পার্লামেন্টের উভয় সদনে সাধারণভাবে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিলে ও পরে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাইলে আইনে পরিণত হইতে পারে। সংবিধানের কতকগুলি ধারা এই সাধারণ বিলের মতন সহজ পদ্ধতিতেই সংশোধিত হইতে পারে। যেমন, নির্বাচনের আইন, কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের সংবিধান, নির্বাচন-ক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণ, অনুন্নত অঞ্চল ও তপশীলভুক্ত জনসমষ্টির প্রশাসন সম্পর্কে সংবিধানের ধারাগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত।

কতকগুলি ধারা সাধারণ বিলের মতই

* D. Basu—*Commentary on the Constitution of India*, Vol. I. P. 13.

(2) আবার কয়েকটি ধারা আছে যাহাদের উপরে-উল্লিখিত একান্ত সাধারণ পথে সংশোধন করা যায় বটে, তবে পূর্বে সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনসভার অনুরোধ, সম্মতি ও পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। মনে রাখা দরকার আমাদের সংবিধান অনুসারে অঙ্গ রাজ্যগুলির নিজ নিজ সংবিধান প্রণয়ন বা সংশোধন করিবার কোন অধিকার নাই। কিন্তু কোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে হইলে একটি রাজ্যের অংশ লইয়া অন্য রাজ্যের সহিত জুড়িয়া দিতে হইলে সেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের পরামর্শ লইতে হইবে। 'পরামর্শ' বলিলেই 'সম্মতি' বুঝায় না। রাজ্য সরকার 'সম্মতি' না দিলেও সংসদ রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারেন। কেবল জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সংসদের সেরূপ ক্ষমতা নাই। রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে হইলে ঐ রাজ্যের সম্মতি লইতে হইবে।

কতকগুলির ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভাকে জানান দরকার

তবে দুই একটি ক্ষেত্রে রাজ্যের আইনসভা নিজের সংবিধান সংশোধন করিতে নিজেই উদ্যোগী হইতে পারেন। যদি কোন রাজ্যের বিধানসভা (নিম্ন সদন) দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব পাশ করে যে সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ (উচ্চ সদন) স্থাপন করা হউক বা উহার বিলোপ কর[illegible] তাহা হইলে ভারতীয় সংসদ ঐ বিষয়ে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা[illegible] মাধ্যমে আইন পাশ করিয়া ওই রাজ্যে দ্বিতীয় সদন প্রতিষ্ঠা বা বিলোপ করিতে পারে। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ পরিবর্তনকে সংবিধানের সংশোধন বলা হইবে না।* যেমন পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা 1969 সালে প্রস্তাব লইয়াছিল যে বিধান পরিষদ বিলোপ করা হউক। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের বিলোপ ঘটিয়াছে।

রাজ্যের উদ্যোগ-ক্ষমতা কতটুকু

সংবিধানের 368 ধা[illegible] উপরে বর্ণিত দুইটি সংশোধন পদ্ধতি বলা হয় নাই। ঐ ধারা অনুযায়ী ভারতের সংবিধান দুইটি পদ্ধতিতে সংশোধিত হইতে পারে।

(3) সংবিধানসম্মত দুইটি পদ্ধতির প্রথমটিতে রাজ্য আইনসভাগুলি নির্লিপ্ত, ইহাদের কোন ভূমিকা নাই। সংসদের যে-কোন সদনে একই মর্মে সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করিয়া উভয় সদনেই উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে ইহা পাশ করাইতে হইবে। প্রত্যেকটি সদনে সমর্থনসূচক ভোটের

* অবশ্য কোন রাজ্যের বিধানসভা অনুরোধ করিলেই সংসদ তাহা মানিতে বাধ্য এমন নহে। 1954 সালে বোম্বাই-এর বিধানসভা দ্বিতীয় সদন লোপ করার প্রস্তাব পাশ করে, কিন্তু 1959 সাল পর্যন্ত সংসদ ওই বিষয়ে কোন আইন তৈয়ারি করে নাই। বোম্বাই প্রদেশ 1960 সালে দ্বিধা বিভক্ত হইলে মহারাষ্ট্রে দুইটি সদন, কিন্তু গুজরাটে একটি সদন রহিয়াছে। আবার 1957 সালে নবগঠিত মধ্য প্রদেশের জন্য সংসদ উভয় সদনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু ঐ রাজ্য তাহা মানিয়া লয় নাই।

সংখ্যা যেন ঐ সদনের সমগ্র সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি হয়।† উভয় সদনে এইরূপ বিলটি পাশ হইলে উহাকে রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হইবে। এই ধরনের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারিবেন না, এবং প্রথা অনুসারে অসম্মতিও দিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ইহা গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষিত হইবে।

বিশেষ পদ্ধতি—রাজ্যসরকারের বিনা সম্মতিতে

(4) আবার কতকগুলি বিষয় বা ধারা সংশোধন সম্পর্কে এই পদ্ধতির সহিত রাজ্য আইনসভাগুলির সম্মতি প্রয়োজন। দেশের অন্তত অর্ধেক আইনসভা উহা সমর্থন (ratified) করিলে তবে সেই সংশোধনী বিল পাশ হইল বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনবিষয়ক ও আইন প্রণয়নবিষয়ক ক্ষমতার বণ্টন, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট, সংসদে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব এবং সংবিধান সংশোধননীতি—প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারাসমূহ উপরের পদ্ধতিতে সংশোধিত হইবে। এই সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যসমূহের স্বার্থ জড়িত আছে বলিয়া তাহাদের মত লওয়া দরকার।

বিশেষ পদ্ধতি—রাজ্যগুলির সম্মতি সহ

এই কয় বৎসরে আমাদের সংবিধান সাতাশ বার সংশোধিত হইয়াছে। অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের সহিত সংবিধানকে খাপ খাওয়াইতে গেলে সংশোধন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সংবিধানের উদ্দেশ্যই হইল সমাজ-বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ যাহাতে সহজে আসে তাহাতে সাহায্য করা। সুতরাং সংশোধন কোন অন্যায় বিষয় নয়। সংশোধনগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উহারা প্রগতিমূলক। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একটি দলের বিপুল রাজনৈতিক সংখ্যাধিক্য থাকায় এত বেশিসংখ্যক সংশোধন সম্ভব হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government)

রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিসভা লইয়া ভারতীয় রাজ্যসংঘের শাসন বিভাগ বা কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত। সংবিধানের 52 নম্বর ধারায় রাষ্ট্রপতিপদ এবং 74-1 নম্বর ধারায় মন্ত্রিসভার সৃষ্টি করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি (The President)ঃ সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং রাজ্যসমূহের নিম্ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তর-যোগ্য গোপন ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সাধারণত তিনি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং পুনর্নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

নির্বাচন

† একটি উদাহরণ দিলে বুঝা হইবে। যেমন, লোকসভার সদস্যসংখ্যা 524, সংশোধনী প্রস্তাবের দিন উপস্থিত 374, সকলেই ভোট দিলেন। সংশোধনের পক্ষে ভোটের সংখ্যা হইল 250। এই প্রস্তাব পাশ হইল না। কারণ, 250 ভোট 374-এর 2/3 অংশ হইলেও সমগ্র সদস্যসংখ্যার, অর্থাৎ 524-এর অর্ধেকের কম। ঐ সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করাইবার জন্য অন্তত 262টি ভোট দরকার।

তাঁহাকে (1) ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে, (2) তাঁহার 35 বৎসরের অধিক বয়স হইতে হইবে, (3) তাঁহার সংসদের নিম্ন পরিষদ অর্থাৎ লোকসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা থাকিবে, (4) তিনি কোন লাভজনক কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না, (5) তিনি কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য আইনসভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না।

যোগ্যতা

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন ও বিনা ভাড়ায় বাড়ি ও সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত রাহাখরচ প্রভৃতি পাইবেন।

সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংসদের যে কোন পরিষদ অভিযোগ আনিতে পারে। যদি সেই অভিযোগ সেই কক্ষের $\frac{2}{3}$ সংখ্যক সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হয় এবং অন্য পরিষদ কর্তৃক অনুসন্ধানের পর সেখানেও $\frac{2}{3}$ সংখ্যক সদস্যের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা চলিবে। উপরাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন-পত্র দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিতে পারেন। দেশের সাধারণ বিচারালয় তাঁহার বিচার করিতে পারে না।

অপসারণ

ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি (Mode of election of Indian President) : বিশেষ এক নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা (electoral college) ভা... রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টও এইরূপ পরোক্ষভা... নির্বাচিত হন। কিন্তু কার্যত সেখানে নির্বাচন প্রত্যক্ষ রূপ লইয়াছে। ফলে তাঁহা... ক্ষমতা সেখানকার আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেসের তুলনায় কম নহে ফ্রান্সের পঞ্চম রিপাব্লিকে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু 1962 সালের শেষে গণভোট লইয়া স্থির করা হইয়াছে যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচি... হইবেন। ইহার ফলে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে। আমাদে... সংবিধান-রচয়িতারা রাষ্ট্রপতিকে সংসদের অথবা মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁ... করাইতে চাহেন নাই বলিয়া পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কেন পরোক্ষ নির্বাচন

এই নির্বাচকমণ্ডলী সংসদের উভয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য এবং রাজ্যবিধা... সভাগুলির নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া গঠিত। মনোনীত সদস্যেরা ভোট দিতে পারে... না। রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হইলে তাহা... গুরুত্ব হ্রাস পাইত। কেননা সংসদে যে দল সংখ্যাধিক সেই দ... রাজ্যগুলিতেও সংখ্যাধিক না হইতে পারেন। সেইজন্য সমগ্র ভারতের মধ্যে যে দ... প্রবল তাহাদের দ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভোটের ব্যাপারে দুইটি নীতি অনুসৃত হয়। প্রথমত, পার্লামেণ্টের সদস্যগণের যতগুলি ভোট থাকে রাজ্যে...

দুইটি মূলনীতি

বিধানসভার সদস্যগণের ততগুলি ভোট থাকে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভোটের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা হয়।*

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতিটি অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি। সংবিধানে ইহাকে একক হস্তান্তর-যোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (proportional representation by means of single transferable vote)। পদ্ধতিটি এইরূপ: প্রথম রাজ্যের জনসংখ্যাকে ঐ রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা দিয়া ভাগ করা হয়। ভাগফলকে আবার 1000 দিয়া ভাগ দেওয়া হয়। এইভাবে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে, তাহাই দাঁড়াইবে ঐ রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যের ভোটদানের সংখ্যা। এই সংখ্যা ঐ রাজ্যের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা গুণ করিলে ঐ রাজ্যের মোট ভোটসংখ্যা পাওয়া যাইবে।† সকল রাজ্যের মোট ভোটসংখ্যা যোগ করিলে যে-সংখ্যা দাঁড়াইবে, তাহাই হইবে পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের মোট ভোটসংখ্যা। পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যদের প্রাপ্ত মোট ভোটসংখ্যাকে নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে-ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের প্রত্যেকের ভোটদানের সংখ্যা। এইভাবে দেখা যাইবে যে, পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যা সকল রাজ্যের নির্বাচিত সভ্যদের মোট ভোটসংখ্যার সমান।

রাজ্যের ও পার্লামেণ্টের সদস্যদের ভোটসংখ্যা নিরূপণ

ভোটাধিকারী সদস্য ব্যালট কাগজে নিজের পছন্দমত প্রার্থীদের নামের পাশে তাঁহার পছন্দ (preference) অনুযায়ী 1, 2, 3, 5 প্রভৃতি সংখ্যা বসাইবেন। তিনি 2য়, 3য় বা পরবর্তী পছন্দের ভোট না-ও দিতে পারেন, কিন্তু প্রথম পছন্দের ভোট না দিলে তাঁহার ভোট বাতিল হইয়া যাইবে।

ভোটদানের পদ্ধতি

নির্বাচন শেষ হইলে বৈধ ভোটপত্রগুলিকে 100+1 দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত আরও 1 যোগ করা হয়। ইহাতে যে-সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে কোটা (Quota) বা ন্যূনতম প্রাপ্তব্য ভোটসংখ্যা বলে। প্রথমে প্রথম পছন্দের ভোটগুলি গণনা করিয়া দেখা হয় যে, কেহ কোটামত ভোট পাইয়াছে কিনা। 'কোটা' পাইলেই তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কেহ কোটা না পাইলে সর্বনিম্ন ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দিয়া তাঁহার

ভোট গণনার পদ্ধতি

* "Uniformity among the states *inter se* as well as parity between the states as a whole and the Union." —*Constitution of India. Art 55 (2).*

† যেমন কোন রাজ্যের জনসংখ্যা তিন কোটি, এবং রাজ্যবিধানসভার প্রতিনিধির সংখ্যা 250 জন। সেই রাজ্যের প্রত্যেক প্রতিনিধিদের ভোটসংখ্যা $= \frac{30,000,000}{250 \times 1000} = 120.$

প্রাপ্ত ভোটগুলিকে দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীদের নামে হস্তান্তরিত করা হয় এইভাবে যে পর্যন্ত না একজন প্রার্থী 'কোটা' মত ভোট পান সেই পর্যন্ত প্রার্থীপদ ও ভোট হস্তান্তরের কার্য চলিতে থাকে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে এইরূপ জটিল পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বনের তিনটি কারণ আছে বলা হয়। (1) কোটি কোটি ভোটদাতার পক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ বিশেষ অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। (2) ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত করিলে তিনি প্রকৃত শাসনক্ষমতা দাবি করিতে পারেন। তাঁহাকে প্রকৃত শাসনক্ষমতা দিলে মন্ত্রিপরিষদের হস্তে প্রকৃত শাসনক্ষমতা থাকে না। ইহাতে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ রক্ষা করা যায় না। (3) রাষ্ট্রপতির মত গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচনের জন্য সরাসরি জনগণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। নির্বাচকমণ্ডলীই যখন জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত তখন এইভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক বলিয়া মনে করা চলে। দলীয় মনোনয়ন পরিহার করার জন্য কেন্দ্রীয় সংসদ এবং রাজ্যগুলির প্রতিনিধি উভয়কেই নির্বাচকমণ্ডলীতে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ফলে যথার্থই জাতীয় সমর্থনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্ভব হইয়াছে। (4) না করিয়া যদি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি অনুসরণ করা হইত তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-প্রার্থীর সংখ্যা বেশি থাকিলে রাষ্ট্রপতি সংখালঘুর ভোটেও নির্বাচিত হইতে পারিতেন। এইরূপ ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর, তাই সমর্থনযোগ্য নয়। এই কারণে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি ও পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে।

এই জটিল পদ্ধতি গ্রহণের কারণ কি

নির্বাচিত হইবার পর রাষ্ট্রপতি যেদিন পদ গ্রহণ করেন সেদিন সংসদগৃহের মধ্যবর্তী হলঘরে একটি অনুষ্ঠানে বড় বড় সামরিক, বেসামরিক ও বিচার বিভাগের পদস্থ ব্যক্তিদের সমক্ষে ভারতের প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করান: "আমি···অমুক·· ভগবানের নাম লইয়া শপথ করিতেছি যে-আমি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদের কার্য বিশ্বস্তভাবে সম্পাদন করিব···এবং আমি ভারতের জনগণের কার্যে ও কল্যাণের জন্য নিজেকে নিযুক্ত রাখিব।"* তিনি শপথ লইতে অনিচ্ছুক হইলে আনুষ্ঠানিকরূপে স্বীকার করিতে পারেন। শপথ গ্রহণের পর তাঁহাকে 31

* I...do swear in the name of God solemnly affirm that I will faithfully execute the office of the President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India." (Art 60.)

বার কামান দাগিয়া অভিবাদন জানানো হয়। উহার পর তিনি একটি ঘোষণা করেন যে তিনি নির্বাচিত হইয়া পদগ্রহণ করিলেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পাঁচ বছরের জন্য। তবে তিনি যতবার ইচ্ছা পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হইতে পারেন। কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে পারেন অথবা সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে তাঁহাকে অপসারণ করাও সম্ভব। রাষ্ট্রপতির নামে অভিযোগ আনিতে হইলে ঐ অভিযোগ সংসদের যে কোনও কক্ষে, অন্তত এক-চতুর্থাংশ সভ্যের স্বাক্ষরসহ 14 দিনের একটি বিজ্ঞপ্তি জারীর পর, একটি প্রস্তাবাকারে, উত্থাপন করিতে হইবে। ঐ প্রস্তাব ঐ কক্ষের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থনে পাশ হইলে অন্য কক্ষ প্রস্তাবে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবে। তদন্তকালে রাষ্ট্রপতি আত্মপক্ষ সমর্থন ও নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযাগ পাইবেন। এই তদন্তের পর যদি তদন্তকারীর পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্রপতির নামে আনীত অভিযোগ সপ্রমাণ এইরূপ প্রস্তাব পাশ হয়, তবে রাষ্ট্রপতিকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিতে হইবে (31 নম্বর দ্বারা)।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ পদ্ধতি

স্বাভাবিকভাবে কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই রাষ্ট্রপতিপদে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হয়। পদত্যাগ, মৃত্যু বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে ...মাস মধ্যে নূতন রাষ্ট্রপতি নিয়োগের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্য (Powers and Functions of the President): আমেরিকার মত ভারতে রাষ্ট্রপতি থাকিলেও ইহা মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার। ব্রিটেনের রাজার মতন ভারতেও রাষ্ট্রপতির নামে দেশ শাসন হয়, আনুষ্ঠানিক ভাবে সকল ক্ষমতা তাঁহারই হাতে। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের মতই আমাদের দেশে প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলিলে আমরা তাই মন্ত্রিসভার ক্ষমতাই বুঝি। তবু রাষ্ট্রপতির নামে এই সকল ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় বলিয়া আমরা ইহাদের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার নামে আলোচনা করিতে পারি। রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাসমূহ সাধারণত ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(1) **শাসন পরিচালনার ক্ষমতা বা শাসনমূলক কার্য** (Executive Functions)—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃপক্ষের শীর্ষে রাষ্ট্রপতি অবস্থিত এবং তাঁহার নামেই দেশের সকল শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। তিনি বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল নিয়োগ করেন, সুপ্রিম কোর্ট, উচ্চ বিচারালয়ের সকল বিচারক, ভারতের অডিটর-জেনারেল (উচ্চতম সরকারী হিসাব-পরীক্ষক) ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়া থাকেন। তিনি সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর অধিকর্তা; যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করিতে পারেন।

কার্যত যিনি সরকার পরিচালনা করেন সেই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি, এবং সেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতি নিজস্ব বিবেচনা প্রয়োগ করিবার বিশেষ কোন সুযোগ পান না। যদি লোকসভায় কোন রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তবে স্বভাবতই সেই দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা ছাড়া রাষ্ট্রপতির কোন উপায় থাকে না। তবে যদি রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হইয়া দাঁড়ায়, কোনো দলেরই নির্ভরযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে এবং একাধিক রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে মন্ত্রিসভা গঠন করা ছাড়া অন্য সমাধান চোখে না পড়ে, তখন রাষ্ট্রপতিকে নিরপেক্ষভাবে নিজস্ব বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করিতেই হয়। সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী কর্তৃত্বে বহাল থাকিবেন। যতদিন না এই বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতির উদ্ভব হইতেছে ততদিন রাষ্ট্রপতিকে দেখিতে হইবে যে কোনো মন্ত্রিসভা সত্যসত্যই জনগণের আস্থাভাজন আছে কি না। জনসাধারণের সমর্থন হারাইয়াছে মনে করিলে তিনি মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন (75 নম্বর ধারা)।

মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

(2) **আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্য** (Legislative Powers Functions)—রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার উভয় পরিষদ লইয়া ভারতীয় সংসদ। সুতরাং তিনি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ-বিশেষ। তিনি উভয় পরিষদ অথবা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন (86-1 নম্বর ধারা), স্থগিত পারেন এবং নিম্ন পরিষদ বা লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বানের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করিতে পারিবেন। কোনো ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে তিনি উভয় পরিষদের নিকট বাণী পাঠাইতে পারিবেন (86-2 নম্বর ধারা)। এইরূপ বাণী সম্বন্ধে পরিষদে দ্রুত আলোচনা হইবে। তবে সাধারণত রাষ্ট্রপতি বাণী প্রেরণ করেন না। মন্ত্রিসভার সহিত মতৈক্য না হইলে তবেই এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে।

আইনসভা সংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধানে 331 নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই কতিপয় সভ্যকে মনোনয়ন করিতে পারেন। এই কতিপয় সভ্য মনোনয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা। নির্বাচন পদ্ধতিতে এই স্বার্থরক্ষা সম্ভব না-ও হইতে পারে। ইহা বিবেচনা করিয়াই রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

উভয় পরিষদের দ্বারা কোন বিল পাশ হইলে উহার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি অবশ্য প্রয়োজন, একমাত্র তাহার পরেই সেই বিল আইন হিসাবে গণ্য হইবে। বিলটিতে

তিনি সম্মতি প্রদান করিতে পারেন অথবা সম্মতি প্রদানে বিরত থাকিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন না করিলে তাহা সংশোধিত আকারে অথবা বিনা সংশোধনে যদি উভয় পরিষদ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয় তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে সংবিধানের 111 নম্বর ধারা অনুযায়ী তাঁহাকে সম্মতি প্রদান করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি-প্রবর্তিত জরুরী আইনগুলি আইনসভার পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং সংসদের অনুমোদন না পাইলে উহা ছয় সপ্তাহ পরে বাতিল হইয়া যাইবে। কতকগুলি বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্বসম্মতি প্রয়োজন হয়। কোনো নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা, পুরাতন কোনো রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন—প্রভৃতি প্রস্তাবের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব-অনুমোদন দরকার (3 নম্বর ধারা)। অর্থদাবী-সংক্রান্ত কোন বিল বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষিত ভাণ্ডার (Consolidated Fund) হইতে খরচ সম্বন্ধীয় কোন বিলও পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয় না (117-1 এবং 117-3 নম্বর ধারা)। তাহা ছাড়া আয়কর হইতে সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে বণ্টিত হয়। দেশে প্রচ. . ী ভাষা পরিবর্তনের বিলেও রাষ্ট্রপতির পূর্ণসম্মতি প্রয়োজন। সকল অর্থ গন্ত বিল (money bills) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয় বলিয়া হা পুনর্বিবেচনার জন্য তিনি ফেরত পাঠাইতে পারেন না।

আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা

কতকগুলি আইনে রাষ্ট্রপতির পূর্বসম্মতি প্রয়োজন

রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্গত হইল তাঁহার জরুরী আইন জারী করার ক্ষমতা (ordinance-making power)। পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ থাকা অবস্থায় (সংবিধানের 113 নম্বর ধারা অনুযায়ী) রাষ্ট্রপতি অর্ডিনান্স বা জরুরী . ন প্রণয়ন করিতে পারেন। পার্লামেণ্টের অধিবেশন সুরু হইলে এই অর্ডিনান্স লইয়া আলোচনা, অনুমোদন, বা বাতিল করার অধিকার পার্লামেণ্টের থাকে। পার্লামেণ্টের অধিবেশন সুরু হওয়ার পর ছয় সপ্তাহকাল পর্যন্ত এই সকল অর্ডিনান্স কার্যকরী থাকে।

জরুরী আইন বা অর্ডিনান্স জারীর ক্ষমতা

রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন যদি রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেন (যেমন, কেরালা ভূমিসংস্কার আইন) এবং যদি রাষ্ট্রপতি তাহাতে সম্মতি প্রদান না করেন তবে তাহা আইনে পরিণত হইবে না। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ ক্ষমতা নয়, রাজ্যপাল তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলে তবেই তিনি অনুমোদন বা নাকচ করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে ঐ বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্য

রাজ্য বিধান সভায় প্রণীত আইন বাতিল করার ক্ষমতা

বিধানমণ্ডলীতে প্রেরণ করিতে পারিবেন। রাজ্যের আইনসভা পুনরায় বিলটি পাশ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইলে তিনি যদি অনুমোদন না করেন, তবে বিলটি নাকচ হইয়া যাইবে।

(3) **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্য** (Financial Powers & Functions)—উপরে উল্লিখিত অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীত, সংসদের উভয় পরিষদের নিকট আগামী বৎসরের কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাষ্ট্রপতি উত্থাপন করাইবেন।

(4) **জরুরীবিষয়ক ক্ষমতা** (Emergency Powers)—সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে কতকগুলি জরুরী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। জরুরী ক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) **জরুরী অবস্থার ঘোষণা ঃ** (সংবিধানের 352 নম্বর ধারা অনুযায়ী) রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উক্ত গোলযোগ ঘটিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি এইরূপ জরুরী অবস্থার ঘোষণা জারী করিতে পারেন। প্রত্যেকটি জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নিকট উপস্থাপিত করিতে হয়। সংসদের উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে দুই মাস কাল এই ঘোষণা বলবৎ থাকিবে। উভয় পরিষদ অনুমোদন করিলে ... সের অধিককাল বলবৎ থাকিতে পারে।

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে এবং র... সমূহের উপর কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। নাগরিকগণ মৌলিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে রাষ্ট্রপতি একটি আদেশ দ্বারা আদালত মারফত বলবৎ করার অধিকার বাতিল করিতে পারেন। সংবিধানের 250-1 ধারা অনু...ী রাজ্যতালিকার যে-কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদ আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন-সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম রাষ্ট্রপতি পরিবর্তিত করিতে পারেন।

(খ) **রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণা ঃ** রাষ্ট্রপতি যদি বুঝিতে পারেন যে, কোন রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থায় অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা হইলে তিনি সংবিধানের 356 নম্বর ধারা অনুযায়ী ঘোষণা করিয়া সেই রাজ্যের শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। এই ঘোষণার বলে রাষ্ট্রপতি এইরূপ আদেশ দিতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যবিধানমণ্ডলের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইবে। পার্লামেণ্ট তখন 351 নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যবিধানমণ্ডলের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর অর্পণ করিতে পারে, ঐ ক্ষমতা অপর কাহাকেও

প্রত্যর্পণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থব্যয়ের অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণাও দুই মাসের অধিককাল স্থায়ী নহে। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ প্রস্তাব পাশ করিয়া এই ঘোষণা অনুমোদন করিলে উহা আরও 6 মাস বলবৎ থাকে। বারবার 6 মাস করিয়া প্রস্তাব লইয়া উহাকে 3 বৎসর পর্যন্ত বলবৎ রাখা চলে।

(গ) **অর্থসংক্রান্ত জরুরী ঘোষণা:** (সংবিধানের 360-1 নম্বর ধারা অনুসারে) যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, ভারতের বা কোন অংশের আর্থিক দায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী ঘোষণা করিতে পারিবেন। এই অবস্থায় রাজ্যসরকারের আয় ও ব্যয়-সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের মাহিনা কমাইয়া দিতে পারিবেন। সাধারণভাবে এইরূপ ঘোষণার মেয়াদ দুই মাস কাল বলবৎ থাকিবে। তবে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দ্বারা পূর্বেই গৃহীত হইলে ইহার মেয়াদ বাড়ান যাইবে।*

(5) **বিচারবিষয়ক ক্ষমতা**—সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নি[illegible]গ কর[illegible]ও রাষ্ট্রপতির অন্যান্য বিচারবিষয়ক ক্ষমতা আছে। (সংবিধানে 72 ন[illegible]া অনুযায়ী) দণ্ডিত ব্যক্তিকে তিনি মার্জনা করিতে পারেন, সাময়িকভাবে মুক্তিদ[illegible] করিতে পারেন; শাস্তির পরিমাণ কমাইয়া দিতেও পারেন।

(6) **রাজ্যবিষয়ক ক্ষমতা**—রাজ্যসমূহের শাসনতান্ত্রিক প্রধান বা রাজ্যপালদের রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করি[illegible] থাকেন। কতকগুলি বিল সম্বন্ধে রাজ্যের আইনসভায় আলোচনার পূর্বে তাঁহার অনুমতি লইতে হয়। যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে

* অনেকে মনে করেন রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরী অবস্থায় এত বেশি ক্ষমতা দেওয়া ঠিক্ই হইয়াছে। এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি রাষ্ট্রপতি প্রয়োগ করিবেন মন্ত্রিসভার পরামর্শে। মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট দায়ী। সুতরাং এই ক্ষমতাগুলির অপপ্রয়োগের আশঙ্কা বেশি নাই।

তবে বাস্তবক্ষেত্রে এই অপপ্রয়োগের আশঙ্কা এত প্রবল যে অনেকেই রাষ্ট্রপতির হাতে এত বেশি ক্ষমতাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। জরুরী অবস্থায় আদালত রাষ্ট্রপতির কাজ বৈধ কি না তাহা বিচার করিতে পারে না—ইহা ন্যায় ও গণতান্ত্রিক নীতির তীব্র বিরোধী। জনসাধারণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করার অধিকার পার্লামেন্টের আছে কিন্তু জরুরী অবস্থা কতদিন থাকিবে, কি অবস্থায় ইহা রাখা উচিত, সংবিধানে সেইরূপ কোন নির্দেশ নাই। শান্তির সময়েও জরুরী অবস্থা চলা উচিত নয়—এইরূপ মতই সকল রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ প্রকাশ করিয়াছেন। রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় অচল অবস্থা আসিল কি না তাহা যদি পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কর্তারা বিচার করেন তবে কোনো রাজ্যে কখনই ভিন্ন দল শাসন চালাইতে পারিবেন না। কেরলের ক্ষেত্রে যে অবস্থায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল, অনেকে মনে করেন উহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর অবস্থাতেও আসাম রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল করা হয় নাই। ইহাকে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ বলা চলে।

রাজ্যের আইনসভা প্রস্তাব গ্রহণ করিলে একমাত্র রাষ্ট্রপতির সম্মতির পরেই সেই প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতি ব্যবহার করিবেন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পরামর্শে; সুতরাং এত ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহাকে একনায়ক বলা চলে না। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ হইতে মন্ত্রিসভা গঠিত এবং সেই মন্ত্রিসভার সম্মতি ও পরামর্শে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসমূহ প্রযুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতির এইরূপ ক্ষমতা থাকার দরুন ভারতীয় সরকারকে মন্ত্রিসংসদ-চালিত (Cabinet form of Government) বলা হয়।

নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা, প্রকৃত নহেন

রাষ্ট্রপতির স্থান: রাষ্ট্রপতি কি একনায়কে পরিণত হইতে পারেন (Constitutional status of the President: Can he become a Dictator ?)—সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে অসংখ্য ক্ষমতা দেওয়া হইলেও কোনটিই তিনি নিজের ইচ্ছামত প্রয়োগ করিতে পারেন না। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির প্রকৃত শাসক হওয়ার কোন সুযোগ নাই। ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মত তাঁহার সম্পর্কেও বলা চলে যে তিনি রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না (He reigns but does not govern)। সংবিধা[illegible] ধারার 1 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "There shall be a Council of Ministers [illegible] the Prime Minister at the head to aid and advise the Preside[illegible] in the exercise of his functions". শাসনতন্ত্রের রচয়িতাদের মতে ভার[illegible] রাষ্ট্রপতি সকল সময়ে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানিয়া চলিবেন এবং একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কাজ করিবেন। আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতে [illegible]Ve have not given our President any real powers, but we have made his position one of great authority and dignity."

তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান

সম্প্রতি এই বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে বহু আলোচনা চলিতেছে। 1960 সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে রাষ্ট্রপতির প্রকৃত বা আসল ক্ষমতা আছে। এই মতবিরোধের উৎস সংবিধানের মধ্যেই নিহিত। 53 নম্বর ধারায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অসীম; আবার 74/1 ধারায় তাহাকে "সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য" একটি মন্ত্রিসভাও সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই যে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানিয়া লওয়া রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক কি না। আয়ার্ল্যাণ্ডের সংবিধানে এই কথা স্পষ্টই বলা আছে যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানিয়া লইতে বাধ্য। কিন্তু ভারতের সংবিধানে এইরূপ সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ নাই।

ইহার বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

দ্বিতীয়ত, শুধু লিখিত নাই তাহাই নহে। আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের যে সকল মৌলিক অধিকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিগুলি নির্দেশিত হইয়াছে, উহাদের রক্ষা করাই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব। মন্ত্রিসভা এইগুলি সংকুচিত বা খর্ব করিলে এবং ইহাদের বিরোধী কাজ করিলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সেই নির্দেশ মানিয়া সংবিধান ভঙ্গ করিতে পারেন না। সংবিধানের রক্ষক হিসাবে প্রয়োজন মনে করিলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার কোন কোন পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারেন। তৃতীয়ত, কতকগুলি ক্ষমতা হইতে বোঝা যায় তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক নন, প্রকৃত শাসক। যেমন (111 নম্বর ধারা অনুযায়ী) তিনি সংসদে প্রথমবার গৃহীত বিলের উপর ভেটো দিতে পারেন, অর্থাৎ ইহাকে ফেরত দিতে পারেন। সুতরাং এক্ষেত্রে, পরিষ্কার দেখা যায় তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়াই কাজ করিতেছেন। চতুর্থত, জরুরী অবস্থায় শান্তি ও শৃংখলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতিকে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা গণতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের অবসান ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট।

নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের পক্ষে যুক্তি

উপরের যুক্তিগুলি খুবই বই-ঘেঁষা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কেবলমাত্র শব্দের অর্থ দিয়াই সংবিধান ব্যাখ্যা করা যায় না। সংবিধানের পিছনে রাজনৈতিক কতকগুলি মূলনীতি কার্যকরী হইতে থাকে। এই নীতিগুলিই সংবিধানকে কাজ করায়। সংবিধান-রচয়িতাদের সুস্পষ্ট ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত করা।*

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের অনেক ধারা উল্লেখ করা চলে যেখানে রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক বলা সম্ভব নয়। পরোক্ষ নির্বাচনের তাৎপর্যই হইল রাষ্ট্রপতির কোন প্রকৃত দায়িত্ব না-থাকা। (সংবিধানে 78 নম্বর ধারায়) আছে মন্ত্রিসভার 'সিদ্ধান্ত' 'জানিবার' অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে। প্রকৃত শাসক হইলে এই অধিকার ঘোষণার দরকার হইত না; আর শুধু 'জানিবার' নয়, ঐ সিদ্ধান্ত 'গ্রহণের' অধিকারও তাঁহার স্বভাবতই থাকিত।

তৃতীয়ত, ভারতে দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংসদের নিকট সকল শাসন কার্যের দায়িত্ব মন্ত্রিসভার, রাষ্ট্রপতির নয়। ফলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবে। রাষ্ট্রপতি যদি বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠন করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে লোকসভা

* "The President occupies the same position as the King under the English constitution. He is the head of the state but not of the executive. He represents the nation, but does not rule the nation...The President of the Indian Union will be generally bound by the advice of his ministers. He can do nothing contrary to their advice, nor can he do anything without their advice." B. R. Ambedkar's *Speech in the Constituent Assembly, Nov. 4 1948.*

ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। পরবর্তী নির্বাচনে পুরানো প্রধানমন্ত্রীর দল নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিকেই পদত্যাগ করিতে হইবে।

চতুর্থত, আমাদের দেশে এখনও সংবিধান ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে, সকল প্রকার রীতিনীতি ও প্রথার পূর্ণ উদ্ভব এখনও হয় নাই। এই সকল প্রথাই সংবিধানের কঙ্কাল বা কাঠামোকে জীবন্ত রূপ দেয় ও চলমান রাখে। ভারতে বিগত 22 বৎসর যাবৎ এইরূপ প্রথাই রচিত হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রধান মাত্র।

সর্বোপরি, গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপতি কখনই সংবিধান বিসর্জন দিয়া একনায়কে পরিণত হইতে পারেন না। দেশের জনমত নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন থাকিবে, আর রাষ্ট্রপতি সংবিধান লঙ্ঘন করিয়া একনায়ক হইবেন, ইহা কখনই স্বাভাবিক নয়। এইরূপ ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে বটে, কিন্তু ইহাতে রাষ্ট্রপতির কার্যকে সংবিধান-বিরোধী বলা হইবে, সংবিধানসম্মত নয়।

উপ-রাষ্ট্রপতি (Vice-President): সংবিধান অনুযায়ী (63 নম্বর ধারা) ভারতরাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। উপ-রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোটপদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবেন। তাঁহা পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইবে। সংসদের উচ্চ পরিষদে ভোটাধিক্যে তাঁহাকে করা চলিবে। রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীর অনুরূপ যোগ্যতা থাকিতে হইবে, উচ্চ সদস্য হইবার যোগ্যতা তাঁহার থাকা চাই। উপ-রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপ নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়া কার্যভার ত্যাগ করিতে পারেন। পদাধিকারবলে তিনি উচ্চ-পরিষদের সভাপতি। মৃত্যু, অপসারণ বা পদত্যাগ দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে উপরাষ্ট্রপ রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্য করেন (shall act as the President); তবে অনুপস্থিতি, সাময়িক অসুস্থতা, বা অনুরূপ কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি অল্প কিছু কালের জন্য কাজ না করিলে উপ-রাষ্ট্রপতি এই কাজগুলি সম্পন্ন করিবেন (shall discharge the functions of the President)। রাষ্ট্রপতির কাজকর্ম করার সময়ে তিনি আর রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না। এই সময়ে তিনি রাষ্ট্রপতির বেতন ও মর্যাদা লাভ করেন।

মন্ত্রিপরিষদ ও কেবিনেটের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ (Composition & Function of Council of Ministers & Cabinet): ভারতের সংবিধানের 73নং ধারার 1নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ বিষয়ে সাহায্য করিবার ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ অবশ্যই রাখিতে হইবে: "There shall be a Council of Ministers with the Prime

Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions." রাষ্ট্রপতি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তাহাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করেন। (সংবিধানের 75-1 ধারা অনুযায়ী) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারেন। তাঁহাদের যে কোন কক্ষের বিতর্কে অংশ গ্রহণের অধিকার আছে, কিন্তু কোন মন্ত্রী যে কক্ষের সদস্য শুধু মাত্র সেই কক্ষেই ভোট প্রদান করিবার অধিকারী। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হয়। যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সময় কোন মন্ত্রী পার্লামেন্টের সদস্য না থাকেন তবে মন্ত্রী হইবার 6 মাসের মধ্যে যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে হইবে। ভারতে আমরা তিন প্রকারের মন্ত্রী দেখিতে পাই, কেবিনেট সদস্য (Members of the Cabinet), রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State), এবং উপমন্ত্রী (Deputy Ministers)। যাঁহারা খুব প্রভাবশালী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে কেবিনেটে স্থান দেওয়া হয়। তাঁহারা এক একটি বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করেন, আবার সরকারের সকল বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য কেবিনেটে বসি[illegible]রণও করেন। কেবিনেট-ভুক্ত মন্ত্রীর সংখ্যা 13/14 হইতে 18/19 পর্য[illegible]য়। সাধারণত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মন্ত্রীকে কেবিনেটে লওয়া হয়। তবে কোন্ বিভাগের মন্ত্রীকে লওয়া হইবে বা হইবে না [illegible] নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর উপর। রাষ্ট্রমন্ত্রীরা (Ministers of State) [illegible]বিনেটের সদস্য নহেন কিন্তু মন্ত্রিত্বের অন্যান্য সম্মান ও মর্যাদা ইঁহারা পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের পরে আছেন সহকারী মন্ত্রীরা। তাঁহারা মন্ত্রীদের অধীনে থাকিয়া এক একটি দপ্তর পরিচালনায় সাহায্য করেন। আমাদের [illegible]বিধানে সহকারী মন্ত্রীর পদের উল্লেখ নাই। মন্ত্রিপরিষদের কোন স্বতন্ত্র অফিস নাই বা কর্মচারী নাই, কেবিনেটের অফিস আছে এবং উহার সেক্রেটারী আছেন। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সপ্তাহে একদিন করিয়া কেবিনেটের অধিবেশন হয়। সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদের (Council of Ministers) কথা আছে, কেবিনেটের কথা নাই। কিন্তু বাস্তবে প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে নাই, উহা কেবিনেটের হাতে।

মন্ত্রিপরিষদ গঠন

মন্ত্রিপরি[illegible] কেবিনেট

আমাদের দেশের মন্ত্রিসভার কাজ ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার কার্যের অনুরূপ, কারণ, ব্রিটেনের সংবিধানের অনুকরণেই ভারতের মন্ত্রিসভা গঠিত। সংক্ষেপে মন্ত্রিসভার কার্যক্রমকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, দেশের শাসন-সংক্রান্ত সাধারণ নীতি স্থির করা। শাসন-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি কাজ করেন বিভাগীয় স্থায়ী কর্মচারীরা। মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সাধারণ নীতিসমূহ স্থির

হয়। এই সব নীতি অনুযায়ী আইন-কানুনের খসড়া রচনা করা হয়, বিভিন্ন বিভাগীয় নির্দেশাদি প্রচার করা হয় এবং আইনসভায় বিরোধী পক্ষের সমালোচনার জবাব দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, শাসন পরিচালনা। প্রত্যেক মন্ত্রীই এক বা একাধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন। নিজ নিজ দপ্তরের পরিচালনা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বা বিশেষ কোন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রত্যেক মন্ত্রীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রীরা অবশ্য সাধারণ নির্দেশ দিয়াই ক্ষান্ত। সেই সব নির্দেশের রূপায়ণ, অর্থাৎ উহাদের কার্যকরী করার দায়িত্ব বিভিন্ন দপ্তরের অধীন প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপর। অবশ্য প্রশাসন বিভাগের এইসকল কর্মচারীদের কাজকর্মের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেই বিভাগীয় মন্ত্রীর। তৃতীয়ত, শাসনব্যবস্থার সংহতি-সাধন। আধুনিক যুগে সরকারের সমস্যা ও কর্তব্যের সীমা নাই। অসংখ্য বিষয়ে সরকারকে সকল সময়ে জড়িত থাকিতে হয়। সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থার জন্য এই সমস্ত বিভাগীয় কার্যকলাপের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকা দরকার। মন্ত্রিসভার যৌথ অস্তিত্ব সেই ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। নিজ নিজ দপ্তরে প্রত্যেক মন্ত্রীই সর্বেসর্বা, তবুও শাসন-সংক্রান্ত সাধারণ নীতিগুলি মন্ত্রিসভার অধিবেশনে গৃহীত হয় বলিয়া সমস্ত বিভাগগুলি একটি সুসংহত [illegible] ভাবে সুন্দররূপে কাজ করিয়া চলে।

মন্ত্রিপরিষদের কার্যকলাপ: তিন জাতীয়

মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থার মূলনীতি (Basic Principles of the Cabinet System): মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থার কতকগুলি অন্তর্নিহিত মূল নীতি আছে (Basic principles of the cabinet system)। প্রথমত, মন্ত্রিপরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে সংসদের সভ্য হইতে হইবে। সংবিধানে (75/5 ধারায়) বলা হইয়াছে যে কোন মন্ত্রী একটানা ছয় মাস সংসদের কোন কক্ষের সভ্য না হইলে তাহার মন্ত্রীপদ বাতিল হইয়া যাইবে। সাধারণত অধিকাংশ মন্ত্রীই লোকসভার সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত হন। এই নীতির গুরুত্ব হইল মন্ত্রীদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে নিজ কার্য করা। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিসভার কতকগুলি দায়িত্ব আছে। মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ, নিজ দলের সংসদীয় সংস্থা (Parliamentary Party), এবং সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতি কোন বিশেষ মন্ত্রীর কোন সিদ্ধান্ত অবৈধ মনে করিলে প্রধানমন্ত্রীকে এই বিষয়ে জানাইতে পারেন এবং ঐ বিষয়টির পুনর্বিবেচনার জন্য সমগ্র মন্ত্রিপরিষদকে অনুরোধ করিতে পারেন। কোন মন্ত্রীর অবসর গ্রহণ বা অপসারণ যুক্তিযুক্ত মনে হইলে প্রধানমন্ত্রী প্রথমে অনুরোধের দ্বারা এবং সেই অনুরোধ ব্যর্থ হইলে রাষ্ট্রপতির নির্দেশবলে সেই মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

১। সংসদের সদস্য হওয়া

২। বিভিন্ন দিকে দায়িত্ব

মন্ত্রীদের নিজ দলের প্রতি দায়িত্ব সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৩। যৌথ দায়িত্ব

তৃতীয়ত, মন্ত্রিপরিষদ সাধারণভাবে আইনসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। যৌথ দায়িত্বের নীতির অর্থ হইল মন্ত্রিগণ সব সময় একটি সমমতাবলম্বী গোষ্ঠী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করিবেন। সংবিধানে (75/3নং ধারায়) বলা হইয়াছে, "The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People." মতের পার্থক্য প্রকাশ করায় বা তাহার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনে বাধা নাই। কিন্তু যখনই সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিপরিষদ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তৎক্ষণাৎ প্রতিটি মন্ত্রী সেই নীতি বা সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতে বাধ্য। অন্যথা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে হইবে। এই যৌথ দায়িত্বের নীতি না থাকিলে সংসদে বিরোধী দলের সম্মুখে মন্ত্রিপরিষদের সংহতি বজায় রাখা সম্ভব নয়। মন্ত্রিসভা সংসদের নিকট যৌথভাবে দায়ী। বিশেষ কোন একজন মন্ত্রী পৃথক্‌ভাবে যদি সংসদের আস্থা হারান বা মন্ত্রিসভার কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সংসদে বাতিল হইয়া যায় তাহা হইলে সমগ্র মন্ত্রিসভাই পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকে।

কেবিনেট স্বৈরাচারের দিকে প্রবণতা

নে করেন আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সংসদের কর্তৃত্ব ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে মন্ত্রিসভা [illegible]শ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিতেছে (decline of Parlia-m [illegible] and rise of Cabinet dictatorship)। ভারতেও ইহার লক্ষণ আমরা দে [illegible] পাইতেছি। আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবই মন্ত্রিসভার তরফ হ [illegible] উত্থাপন করা হয়, সাধারণ সভ্যদের 'বিল' ততটা গুরুত্ব পায় না, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুগামীদের সমর্থনের জোরে প্রায় সব প্রস্তাবই বিনা বাধায় পাশ হইয়া যায়। সংসদ কেবলমাত্র [illegible]মতিসূচক শীলমোহর দেওয়ার যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আধুনিক আইন-কানুন ও বাজেট রচনা এত জটিল এবং এত খুঁটিনাটি তথ্যে ভারাক্রান্ত থাকে যে সংসদে সাধারণ সভ্যদের পক্ষে উহার সমালোচনা করা সম্ভব হয় না। সংসদে এত খুঁটিনাটি আলোচনার সময়ও খুব কম। আবার সরকারী কার্যকলাপ সম্বন্ধে সমালোচনা করার সুযোগ একমাত্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সর্বোপরি, সরকারের বিরোধিতা করিলে কোন সাধারণ সভ্যের পক্ষে পুনরায় দলীয় মনোনয়ন পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এই সকল কারণে সংসদ এখন অনেকাংশে পঙ্গু। মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থা ক্রমেই কেবিনেটের স্বৈরাচারে পরিণত হইতেছে।

সর্বশেষে, দেশের শাসনব্যবস্থায় যে নেতৃত্ব, উদ্যোগ, বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রয়োজন পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে উহাদের ধারক হইলেন মন্ত্রিপরিষদ। যে কোন গোষ্ঠীরই যেমন

একজন পথনির্দেশক নেতা থাকা প্রয়োজন, মন্ত্রিসভার পক্ষেও তেমনি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব অপরিহার্য। মন্ত্রিসভার মধ্যমণি প্রধানমন্ত্রী, তিনিই ইহার ভিত্তিস্থানীয়। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। মন্ত্রীদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করেন, বিবাদ মিটান। কেবিনেট সদস্যদের সকলেরই মর্যাদা সমান। তবুও দলের নেতা এবং রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা হিসাবে তিনিই প্রথম এবং প্রধান। মন্ত্রিসভায় তিনিই সভাপতি এবং রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার মধ্যে সংযোগসেতু।

প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister) **:** মন্ত্রিসভার মধ্যমণি হইলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁহার বুদ্ধি, বিবেচনা ও কর্মদক্ষতার উপরে সমগ্র মন্ত্রিসভার ঐক্য, সংহতি, দায়িত্বশীলতা ও শাসন-দক্ষতা সকল কিছু নির্ভর করে। শুধু মন্ত্রিসভার নহে, সামগ্রিকভাবে সরকারী কাঠামোর সাফল্য ও বিফলতার জন্য প্রকৃত পক্ষে তিনিই দায়ী। ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীও "Keystone of the Cabinet arch."

স্থান

তিনি দেশের মধ্যে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত থাকেন, এবং সেই দলের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি দেশের লোকের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। জনসাধারণকে সেই দল সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করেন, দেশে দলের সম[illegible] চেষ্টা করেন। দলের ঐক্য, সংহতি ও সং[illegible] সুদৃঢ় রাখি[illegible] ব্যবস্থা করেন, বিরোধী দলগুলিকে সমালোচনা করিয়া দেশে উহাদের সমর্থন কম[illegible] চেষ্টা করেন। সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখে বিভিন্ন অঞ্চলে দলীয় [illegible] করেন। নির্বাচনী যুদ্ধে দলের জয়-পরাজয় অনেকখানি নির্ভর করে ব্য[illegible]তভাবে তাঁহার যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও জনচিত্তে তাঁহার কিরূপ স্থান, এই সকল বিষয়ের উপর।

দলের সহিত সম্পর্ক

[illegible]শের জনসাধারণ, বিশেষত, ভারতের ন্যায় অশিক্ষিত ও বীরপূজার মনোবৃত্তিসম্পন্ন জনসাধারণ অনেক ক্ষেত্রেই দলীয় নীতিপদ্ধতি বিচারের পরিবর্তে দলের নেতা অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। সুতরাং তাঁহাকে শুধু মাত্র দলীয় নেতা হইলেই চলে না, প্রকৃত পক্ষে জাতীয় নেতা বা জননেতা হইতে হয়।

জনসাধারণের সহিত সম্পর্ক

যদি তাঁহার দলের প্রতিনিধিগণ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন, তখন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকেই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করিবেন; কারণ, তিনি দলের অধিকাংশ সদস্যদের অর্থাৎ লোকসভার অধিকাংশের সমর্থন পাইতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আহূত হইয়া তিনি দলের অপরাপর নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন এবং রাষ্ট্রপতি উহা গ্রহণ করিলে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত সম্পর্ক

তিনিই মন্ত্রিসভার কার্যক্রম স্থির করেন ও সভাপতি হিসাবে সভা পরিচালনা করেন, মন্ত্রিদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা তাঁহার কাজ। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, তিনি নিজেই পরিচালিত করেন। ইংলণ্ডের মত আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী "সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম" (First among equals বা *prime inter pares*)।*

আইনসভার সহিত সম্পর্ক

তিনি আইনসভার কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করেন, আইনসভা আহ্বান করা, স্থগিত রাখা ও ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দেন। কোন্ বিষয় কবে, কতক্ষণ, কিভাবে আলোচিত হইবে তাহা স্থির করিতে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। আইনসভায় দলীয় সদস্যদের সমর্থনে দলীয় রাজনৈতিক নীতি অনুযায়ী তিনি আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন এবং বিরোধী দলগুলির সমালোচনায় উত্তর দিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি লোকসভার অধিনায়ক বা লীডার অব্ দি হাউস্ (Leader of the House)। সরকারী নীতির তিনি যে ব্যাখ্যা দেন তাহাই সকলে প্রামাণিক বলিয়া মনে করে। নিজে তিনি লোকসভার সদস্য, কিন্তু রাজ্যসভাতেও তিনি সরকারী নীতি সম্পর্কে

।

রাষ্ট্রপতি সম্পর্ক

সংবিধানে[illegible] নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হইল ইউনিয়নের শাসন-[illegible] বিষয়ে ম[illegible]পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত ও আইনের খসড়া প্রভৃতি রাষ্ট্রপতিকে জানানো। ঐ সকল বিষয় রাষ্ট্রপতি কিছু জানিতে চাহিলে প্রধানমন্ত্রী তাহা জানাইবেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিলে কোন বিষয় মন্ত্রিসভার পুনর্বিবেচনার জন্য রাখিবেন। প্রধানমন্ত্রী একদিকে যেমন সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে, অন্যদিকে তেমন [illegible]পরিষদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সেতুরূপে কাজ করেন।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর তুলনামূলক স্থান

রাষ্ট্রপতির তুলনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সম্মান ও ক্ষমতা অধিক, কারণ প্রধানমন্ত্রীই জননির্বাচিত নেতা, অপর পক্ষে রাষ্ট্রপতি সেই দলীয় নেতার প্রতিনিধি মাত্র। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কে রাজা হইবে তাহা স্থির করিতে পারেন না, কিন্তু এখানে রাষ্ট্রপতি বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে পদলাভ করেন না, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধান স্থির করিতে পারেন। জরুরী

* "Although in Cabinet, all its members stand on the equal footing, speak with equal voice and on the rare occasions when a division is taken are counted on the fraternal principle of one man one vote, yet head of the Cabinet is Prime Minister who occupies position which so long as it lasts is one of exceptional and peculiar authority."

অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী খুবই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠেন। এখনও ভারতের পার্লামেণ্টারী রীতি-নীতি ও প্রথা ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর স্থান ও ক্ষমতা বর্তমানে গঠনোন্মুখ অবস্থায় আছে বলিতে পারা যায়। রাষ্ট্রপতির তুলনায় দেশে কত বেশি মর্যাদা ও ক্ষমতা তিনি পাইবেন, ইহা অনেকাংশে নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, দলের মধ্যে ও জনচিত্তে তাঁহার স্থান প্রভৃতির উপর। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে অ্যাসকুইথ (Asquith) যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধেও বলিতে পারি; "প্রধানমন্ত্রী নিজে যেরূপ গড়িয়া লইতে সক্ষম (বা ইচ্ছুক) তাঁহার পদটিও সেইরূপই হইয়া উঠে।"*

ভারতীয় রাজ্যসংঘের আইনসভা বা সংসদ (Union Legislature or Parliament): ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট যেমন রানী, কমন্সসভা ও লর্ডসভা লইয়া গঠিত, তেমনি রাষ্ট্রপতি এবং দুইটি আইনসভা লইয়া ভারতের সংসদ (Parliament) গঠিত। আমাদের নতুন সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম পার্লামেণ্টই রাখা হইয়াছে। ইহার উচ্চকক্ষের নাম রাজ্যসভা (Council of States) এবং নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা (House of the People)। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট যে কোন বিষয় লইয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারে, উহা তাই সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা (sove making body)। কিন্তু ভারতের এই সংসদ সংবিধানে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে অ প্রণয়ন করিতে পারে। কোন আইন সংবিধানের বিরোধী ... তীয় ... ম কোর্ট উহাকে সংবিধান-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। আম ... ই সার্বভৌমত্বহীন আইনপ্রণয়নকারী সংস্থা (non-sovereign law-makin dy)।

রাজ্যসভা (Council of State): রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা এবং সমাজ ... বিষয়ে অভিজ্ঞ 12 জন মনোনীত সভ্য এবং রাজ্যসরকারগুলি কর্তৃক নির্বাচিত অনধিক 238 জন প্রতিনিধি লইয়া রাজ্যসভা গঠিত হইবে। এখন রাজ্যসভায় 231 জন নির্বাচিত সদস্য আছেন। এই প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত ইন প্রদেশগুলি বা অঙ্গরাজ্যগুলির আইন পরিষদের সভ্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রথা অনুযায়ী একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের সাহায্যে (proportional representation by means of single transferable vote)।

রাজ্যসভার এইরূপ গঠন সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্যতম প্রধান নীতি হইল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সকল অঙ্গরাজ্য কর্তৃক সমান-সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ (যেমন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি)।

* "The office of the Prime Minister in England is what its holder chooses to make it."

প্রথমত, আমাদের দেশে রাজ্যসভায় প্রতিনিধি প্রেরিত হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে। ইহা সকল রাজ্যের সমতার নীতিকে ক্ষুণ্ণ করে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 12 জন সদস্যের মনোনয়ন বিশেষভাবে গণতন্ত্র-বিরোধী। এই উপায়ের মাধ্যমেই জনসাধারণের প্রতিনিধি ছাড়া অপর কেহ মন্ত্রিসভায় প্রবেশের সুযোগ পাইতে পারে।

রাজ্যসভায় আসন বণ্টন *

ক।	রাজ্য (States)	আসন সংখ্যা
1.	অন্ধ্র প্রদেশ	18
2.	আসাম	7
3.	বিহার	22
4.	মহারাষ্ট্র	19
5.	গুজরাট	11
6.	হরিয়ানা	5
7.	হিমাচল প্রদেশ	3
8.	কেরল	9
[illegible]	[illegible]দেশ	16
[illegible]	তামিলনাড (মাদ্রাজ)	18
[illegible]	মহী[illegible]	12
[illegible]	[illegible]	10
13.	[illegible]	7
14.	[illegible]জস্থান	10
15.	উত্তরপ্রদেশ	34
16.	পশ্চিমবঙ্গ	16
17.	জম্মু ও কাশ্মীর	4
18.	নাগাভূমি	1
19.	মেঘালয়	1
20.	মণিপুর	1
21.	ত্রিপুরা	1

লোকসভায় আসন বণ্টন †

ক।	রাজ্য (States)	আসন সংখ্যা
1.	অন্ধ্রপ্রদেশ	41
2.	আসাম	14
3.	বিহার	53
4.	গুজরাট	24
5.	হরিয়ানা	9
6.	হিমাচল প্রদেশ	4
7.	জম্মু ও কাশ্মীর	6
8.	কেরল	19
9.	মধ্যপ্রদেশ	37
10.	তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ)	39
11.	মহারাষ্ট্র	45
12.	মহীশূর	27
13.	নাগাভূমি	1
14.	উড়িষ্যা	20
15.	পাঞ্জাব	13
16.	রাজস্থান	23
17.	উত্তরপ্রদেশ	85
18.	পশ্চিমবঙ্গ	40
19.	মেঘালয়	2
20.	মণিপুর	2
21.	ত্রিপুরা	2

* 1972 সালের জানুয়ারী মাসে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের [নেফা] পুনর্গঠন ও মেঘালয় ও মিজোরাম এলাকার উৎপত্তির জন্য রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা 228 হইতে বাড়িয়া 231 হইয়াছে।

† উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের (নেফার) পুনর্গঠনের ফলে লোকসভায় আসাম 14, ত্রিপুরা 2, মেঘালয় 2, মণিপুর 2, মিজোরাম 1 এবং অরুণাচলপ্রদেশ 1টি আসন পাইয়াছে।

খ। ইউনিয়ন অঞ্চল (Union Territories)			**খ। ইউনিয়ন অঞ্চল** (Union Territories)	
1.	দিল্লী	3	1. আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	1
2.	মিজোরাম	1	2. চণ্ডীগড়	
3.	পণ্ডিচেরি	1	3. দাদরা ও নগরহাবেলি	
4.	অরুণাচল প্রদেশ (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা [নেফা])	1	4. দিল্লী	
	মোট 231 *		5. গোয়া, দমন ও দিউ	2
			6. লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমীনদিভি দ্বীপপুঞ্জ	1
			7. পণ্ডিচেরি	1
			8. মিজোরাম	1
			9. অরুণাচল প্রদেশ (উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকা [[illegible]	
			মোট [illegible]	

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার স[illegible] অ[illegible]র করিবেন। রাজ্যসভা যথাসম্ভব শীঘ্র উহার কোন সদস্যকে উপ-স[illegible]ত করিবে। রাজ্যসভার উপ-সভাপতি তাঁহার উক্ত পরিষদে[illegible]য়ুকাল অতিক্রান্ত হইলে এই পদ ত্যাগ করিবেন। তিনি যে কোন সময়ে [illegible]্যসভার সভাপতির নিকট স্বহস্তে লিখিত পত্র মারফত পদত্যাগ করিতে পারিবেন। রাজ্যসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উপ-সভাপতির পদ হইতে তিনি অপসারিত হইতে পারিবেন।

কোন ভারতীয় নাগরিককে রাজ্যসভার সদস্য হইতে হইলে অন্তত 30 বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। উন্মাদ, দেউলিয়া, গুরুতর অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক দণ্ডিত কোন ব্যক্তি বা সরকারী কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত কোন নাগরিক ইহার সভ্য হইতে পারিবেন না। ইহা স্থায়ী পরিষদ, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ইহাকে ভাঙিয়া দিতে পারেন না এবং প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই সভার ⅓ অংশ সদস্য পদত্যাগ করেন।

* ইহা ছাড়াও রাষ্ট্রপতি 12 জন সদস্য মনোনীত করেন।

† ইহা ব্যতীত অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের 2 জন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পুনর্গঠনের ফলে লোকসভায় বর্তমান সদস্যের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে (522+2)=524

লোকসভা (House of the People): অনধিক 525 জন সদস্য লইয়া লোকসভা গঠিত হইবে। রাজ্যসরকারগুলির ভোটদাতাগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন অনধিক 500 জন সদস্য; এবং অনধিক 25 জন ইউনিয়ন অঞ্চলের প্রতিনিধি। লোকসভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা 524. প্রতিবার এই নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনী এলাকাগুলিকে সমষ্টিবদ্ধ করা অথবা নূতনভাবে গঠন করা যাইবে। প্রত্যেকটি নির্বাচন কেন্দ্রের পরিধি এমনভাবে বিন্যস্ত করিতে হইবে যাহাতে প্রতি $7\frac{1}{2}$ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু অন্যূন একজন সদস্য নির্বাচিত হন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন 1952 সালে এই সীমা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল অঞ্চল কোন রাজ্য সরকারের অন্তর্ভুক্ত নহে, কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত তাহাদের প্রথম প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা সংসদ আইন দ্বারা নির্ধারিত করিবে। প্রত্যেক লোকগণনার (census) পর লোকসভার নির্বাচনকেন্দ্রগুলির পরিধির সীমানা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

গঠন

লোকসভার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল উহার জীবনের মেয়াদ বলিয়া গণ্য হইবে। এই মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেও উহার সমাপ্তি হইতে পারিবে। কিন্তু পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে উহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া [illegible] আপৎকালীন জরুরী ঘোষণা বর্তমান থাকা কালে লোকসভার স্থিতিকাল এককালে এক বৎসর করিয়া বর্ধিত হইতে [illegible]ব। কিন্তু আপৎকালীন ঘোষণার অবসান হইলে কোন-[illegible] মাসের অধিক উহার স্থিতিকাল বর্ধিত হইতে পারিবে না।

ক্র[illegible]

লো[illegible]র সদস্য হইতে হইলে (ক) তাঁহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে, (খ) রা[illegible]সভার সভ্য হইতে হইলে তাঁহাকে অন্যূন 30 বৎসর, এবং লোকসভার সভ্য হইতে হইলেও তাঁহাকে অন্যূন 3[illegible] বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে, এবং (গ) সংসদ কর্তৃক অপরাপর যে সকল গুণ বা যোগ্যতা নির্ধারিত হইবে, তাঁহাকে সেই সকল যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য কোন সরকারের অধীনে লাভজনক কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। কোন ব্যক্তি যুগপৎ সংসদের উভয় কক্ষ বা সংসদের কোন একটি কক্ষ এবং কোন রাজ্যবিধানমণ্ডলীর কোন কক্ষের সভ্য থাকিতে পারিবেন না। একাধিক আসনে নির্বাচিত হইলে একটি পদ ব্যতীত আর সব আসন হইতে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

যোগ্যতা

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার (The Speaker and Deputy Speaker): ইংলণ্ডের কমন্সসভার স্পীকার পদের অনুকরণে ভারতেও লোকসভার সভাপতিত্বের

ভার লোকসভার দ্বারা নির্বাচিত এক স্পীকারের উপর অর্পিত হইয়াছে। তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে বা কোন কারণে তাঁহার পদ শূন্য হইলে স্পীকারের দায়িত্ব সাময়িকভাবে গ্রহণের জন্য একজন ডেপুটি স্পীকারও নির্বাচিত হন। সাধারণত লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হইলে, বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে (স্পীকার ডেপুটি-স্পীকারের কাছে এবং ডেপুটি স্পীকার স্পীকারের কাছে), বা অভিযোগমূলক প্রস্তাবের দ্বারা লোকসভা কর্তৃক অপসারিত হইলে এই দুই পদ শূন্য হইতে পারে। শূন্য হওয়া মাত্রই নূতন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করিয়া লইতে হয় (93—95 নম্বর ধারা)।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

সংবিধানে স্পীকারকে লোকসভার একজন দলমত নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সভাপতিরূপে পরিগণিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার বেতন ও ভাতা সংরক্ষিত তহবিল হইতে দেওয়া হয়। সংসদে ভোটাভুটির সময়েও তিনি সাধারণত ভোট দানে বিরত থাকেন, তবে যদি কোন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট প্রদত্ত হয়, তখন তিনি নিজস্ব একটি ভোট (casting vote) দিয়া বিষয়টি মীমাংসা করিয়া দেন। একমাত্র লোকসভায় অধিকাংশ সভ্যের অভিযোগক্রমেই স্পীকা... পদচ্যু... করা যায়। গ্রেট ব্রিটেনে স্পীকারের নিরপেক্ষতা এমন সন্দেহাতীতভা... কোন ব্যক্তি একবার স্পীকার পদে নির্বাচিত হইলে আ... তিনি স... থাকেন; সরকারী ও বিরোধী সকল দলই তাঁহাকে সম্মান ... দের দেশে সম্প্রতি স্পীকারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নানারূপ বাগ্‌বিত... ।

স্পীকারের মর্যাদা ও দায়িত্ব অসামান্য। তাঁহার প্রধান কাজ হই... কসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা এবং সংসদের বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ করা। ...তর্ককালে ...ত্যেক সভ্যের বক্তব্যের অধিকার, মতপ্রকাশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ ইত্যা... রক্ষা করা তাঁহার দায়িত্ব। এই বিষয়ে তাঁহাকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কোন্ বিষয়ে কাহাকে কতটা সময় বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে, কোন্ কোন্ প্রস্তাবের উপর বিতর্ক চালানো হইবে, সভা মুলতুবি রাখা হইবে কি না, কোন সভ্যের আচরণ সংসদীয় রীতিবিরোধী হইলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ, এমন কি শাস্তিবিধান করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্পীকারকে দেওয়া হইয়াছে। সংসদীয় বিভিন্ন কমিটির সভ্য ও সভাপতি তিনিই মনোনীত করেন এবং স্বয়ং সংসদীয় কার্যবিধি সংক্রান্ত কমিটির সভাপতিত্ব করেন। দেখা যাইতেছে, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে স্পীকারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অসামান্য।

স্পীকারের সাংবিধানিক মর্যাদা

সংসদের কার্যপদ্ধতি ও কার্যাবলী (Procedure and Functions of Parliament) : সংসদের দুইটি সভার অধিবেশনই বৎসরে অন্ততপক্ষে দুইবার আহ্বান করিতে হইবে। কোন অধিবেশনের শেষ সভা ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম সভার মধ্যে ছয় মাসকাল ব্যবধান থাকিতে পারিবে না। রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে উভয় সভার বা কোন একটি সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন, স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রপতি সংসদের কোন সভায় অথবা উভয় সভার সম্মিলিত অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতি সংসদের কোন সভার বিবেচনাধীন কোন বিল বা অন্য কিছু সম্পর্কে বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং যে সভায় কোনরূপ বাণী প্রেরিত হইবে সেই সভা যথাসম্ভব শীঘ্র সেই বাণীর বিষয়ীভূত বস্তু সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে। প্রত্যেকটি অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করিবেন এবং সংসদের অধিবেশন আহ্বানের কারণ উহাতে বিবৃত করিবেন।

[illegible] অন্যান্য মন্ত্রিগণ, এবং ভারতের মহাব্যবহারিক (Attorney-General) [illegible] বা উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে বা সংসদের যে সমিতির (C[illegible]mit[illegible] [illegible] সভ্য সেই সমিতিতে যোগদান ও বক্তৃতা করিতে পারিবেন, কিন্তু [illegible] রের বলে ভোট দিবার অধিকারী হইবেন না। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ যে [illegible] সদস্য কেবল সেই কক্ষেই ভোট দিতে পারিবেন।

উভয় সভার প্রত্যেক সভ্য আসন গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতি অথবা তাঁহার দ্বারা নিয়োজিত ব্যক্তির সমক্ষে শপথ গ্রহণ করিবেন। প্রত্যেক কক্ষের অধিবেশনে অথবা উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাব উপস্থিত সভ্যগণের সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হইবে। সভাপতি ও পরিষদপাল কেবল তখনই তাঁহাদের নির্ণায়ক ভোট (casting vote) দিতে পারিবেন যখন সদস্যদের মধ্যে উভয় পক্ষের ভোটের সমতা (equal number of votes) ঘটিবে। সংসদের কোন সভার অধিবেশনে উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-দশমাংশ উপস্থিত থাকিলে গণপূর্তি (Quorum) হইবে, অর্থাৎ সভা অধিবেশনযোগ্য হইবে। উপস্থিত সভ্যসংখ্যা দশমাংশের অনধিক হইলে পরিষদের অধিবেশন স্থগিত থাকিবে।

সংসদের প্রধান ও মৌলিক কাজ আইন প্রণয়ন করা। ভারতীয় সংসদ রাজ্য-সংঘের তালিকা এবং যুগ্ম-তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন করিতে পারে। কোন

প্রস্তাব আইনে পরিণত হইলে উভয় সভার সম্মতি প্রয়োজন হয়। কোন পরিষদ সম্মতি জ্ঞাপন না করিলে বা ছয় মাসের মধ্যে সেই প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত না জানাইলে রাষ্ট্রপতি উভয় সভার যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং তাহাতে ভোটাধিক্যে বিলটি গৃহীত হইলে উহা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হইবে।

১। আইন প্রণয়ন

অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব রাজ্যসভায় উত্থাপিত হইতে পারে না লোকসভা ঐ সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া রাজ্যসভায় প্রেরণ করে এবং 14 দিনের মধ্যে মতামত জ্ঞাপন না করিলে উচ্চ পরিষদের সম্মতি ব্যতীত উহা আইনে পরিণত হইতে পারে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার কালে রাজ্যসভা অথবা এক বা একাধিক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কেও সংসদ আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সরকারের আয়-ব্যয় মঞ্জুর করা, কোন্ বিষয়ে কত অর্থ ব্যয় হইবে তাহা স্থির করা, কর ধার্য করা ইত্যাদি বিষয় স্থির করা সংসদের কার্য। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভার সভাপতি ও সহসভাপতি, লোকসভার পরিষদপাল (Speaker), অধিধর্মাধিকরণের (Supreme Court) বিচারপতিগণ প্রভৃতি ব্যক্তিদের বেতন ও ভাত [illegible] ঋণ ইত্যাদি সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষ নহে। ইহারা "কেন্দ্রীয় ত[illegible] হইতে ধার্য [illegible]"। ইহা ব্যতীত অপর সকল বিভাগীয় ব্যয়-বরাদ্দ লোকস[illegible] এবং লোকসভা মঞ্জুর করিলে তাহার পর ব্যয় করা চলে।

২। অর্থের বিলিব্যবস্থা করা

তৃতীয়ত, সংসদ মন্ত্রিসভার কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন যাহাতে [illegible]নিক্ষমতার অপব্যবহার না হয়, জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে তাহা লক্ষ্য র[illegible] সংসদের [illegible]দায়িত্ব। সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হন এবং মন্ত্রিগণ যৌথভাবে বা এককভাবে তাঁহাদের কার্যের জন্য সংসদের নিকট দায়ী। লোকসভা নিম্নলিখিত উপায়ে মন্ত্রিসভার উপরে অনাস্থা প্রকাশ করিতে পারে: (১) সরাসরি অনাস্থা প্রস্তাব পাশ, (২) মুলতুবী প্রস্তাব পাশ, (৩) কোন ব্যয়-বরাদ্দের দাবি না-মঞ্জুর করা বা কমানো, (৪) গুরুত্বপূর্ণ কোন সরকারী বিল বা প্রস্তাব অগ্রাহ্য। শাসন বিভাগের পরিচালকগণ আইনসভার নিকট দায়ী বলিয়া ভারতীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) বলা হয়।

৩। মন্ত্রিসভাকে শাসন করা

উভয় সদনের ক্ষমতা, মর্যাদা ও পারস্পরিক সম্পর্ক (Powers & Prestige of two Houses and relations between them): ভারতে

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রবর্তন করা হইয়াছে। শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা তাহা নয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই উচ্চতর কক্ষের প্রবর্তন। পুনর্নিরীক্ষা, বাধাদান, কালক্ষেপ ও সংশোধনী প্রস্তাবের দ্বারা সুবিবেচিত ও জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়নই ইহার লক্ষ্য। এইরূপ উদ্দেশ্যগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ভারতে দুইটি কক্ষের মধ্যে নানা পার্থক্য দেখা যায়। পৃথিবীর কোন দেশেই আইনসভার দুই কক্ষের সমান মর্যাদা ও ক্ষমতা দেখা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চকক্ষ সেনেটের ক্ষমতা নিম্নকক্ষ কংগ্রেসের তুলনায় অনেক বেশি; ইংলণ্ডে কমন্সসভার তুলনায় লর্ড সভাকে একেবারে নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। ভারতেও, বৃটিশ প্রথায় অনুকরণে, নিম্নতর কক্ষ লোকসভাকেই উচ্চতর কক্ষ রাজ্যসভার তুলনায় অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

দুইটি কক্ষের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

অর্থবিলের ক্ষেত্রে সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে যে এই সকল বিল একমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপন করা যাইবে। লোকসভায় কোন অর্থবিল পাশ হইয়া যাইবার পর রাজ্যসভার অনুমোদনের জন্য উহা প্রেরিত হয়; প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ অন্তত 14 দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে ঐ বিল পুনরায় লোকসভায় ফেরত পাঠাইতে হই[illegible] ঐ সক[illegible]িশ গ্রাহ্য করা বা না-করা লোকসভার ইচ্ছাধীন। সুপারিশ গৃহী[illegible] অথবা যদি অর্থবিল প্রেরণের 14 দিনের মধ্যে রাজ্যসভা এ বি[illegible]জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলেও যে-ভাবে লোকসভায় বিলটি প[illegible] হইয়াছে সেইভাবেই উহা বিধিবদ্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে [illegible] বিলটি সম্পর্কে বড় জোর পক্ষকালব্যাপী কালক্ষেপ করা ছাড়া অর্থবিলের উত্থাপন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধনে রাজ্যসভার কোন ক্ষমতাই নাই।

অর্থবিলের ক্ষেত্রে [illegible]কসভা[illegible]

অর্থবিল ব্যতীত অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষকে সমান ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিল যে-কোন কক্ষে উত্থাপিত হইতে পারে এবং উভয় কক্ষের সম্মতি পাইয়া বিধিবদ্ধ হয়। রাজ্যসভা কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিলে সরাসরি উহা উপেক্ষা করার ক্ষমতা লোকসভার নাই।

অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতা

যদি এক কক্ষ কোন বিষয়ে আইন করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং অন্য কক্ষও উহা প্রত্যাখ্যান করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, এক প্রকার অচল অবস্থার (dead-lock) সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্কে 158 নম্বর ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, (ক) সংসদের কোন এক কক্ষে পাশ

হইবার পর যদি অপর কক্ষে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়, বা (খ) বিলটির উপর প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পর্কে অপর কক্ষ আপত্তি জানায়, বা (গ) অপর কক্ষে বিলটি আসার পর ছয় মাস অতিবাহিত হইলেও কোন সিদ্ধান্ত লওয়া না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিবেন। এই যুক্ত অধিবেশনে বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে পাশ হইলে স্বাভাবিকভাবেই উহা আইনে পরিণত হইবে। অবশ্য এক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে সংখ্যাধিক্যের বলে যুক্ত অধিবেশনে লোকসভার মতামতই প্রতিষ্ঠিত হয়।

উভয় কক্ষের বিরোধ অচলাবস্থা সমাধানের উপায়

সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণেও লোকসভার কর্তৃত্ব অনেক বেশি। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ. যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী, রাজ্যসভার নিকট নহে। একমাত্র লোকসভায় অনাস্থাসূচক প্রস্তাব বা কোন সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতার দ্বারাই সরকারের পতন ঘটিতে পারে। রাজ্যসভাকে এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। তবে দেখা যায় যে রাজ্যসভার সদস্যগণ সরকারী নীতির সমালোচনা, প্রশ্ন উত্থাপন বা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষমতাই প্রয়োগ করিতে পারেন। এই সকল ক্ষমতা তাঁহাদের আছে।

সাধারণত দেশের অধিকাংশ রাজ্যগুলিতে যে দল ক্ষমতা [illegible] ন্দ্রের উভয় কক্ষেই সেই দলের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। উভয় ক[illegible] বিধিও [illegible]টা এক রকম। তবে সদস্য সংখ্যা কম বলিয়া এবং সভা[illegible] ই[illegible] প্রস্তাব কম থাকায় লোকসভার তুলনায় রা[illegible] না ও বিচারবিবেচনার সুযোগ অনেক বেশি। প্রতি [illegible] $2\frac{1}{2}$ ঘণ্টা ছাড়াও প্রতি শুক্রবার সাধারণ সদস্যদের আলোচনা ও বক্তৃতার জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে।

রাজ্যসভায় অধিক আলোচনার সুবিধা

মোটের উপর ইহা বলা চলে যে, ভারতের সংবিধান স্পষ্টতই লোকসভাকে অধিকতর ক্ষমতা ও মর্যাদা দিয়াছে। যদিও ঐ পর্যন্ত উভয় কক্ষের মধ্যে গুরুতর বিবাদ দেখা দেয় নাই, তবুও সেইরূপ ঘটিলে লোকসভাই প্রাধান্য লাভ করিবে।

সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি (Process of ordinary Lawmaking): সংসদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি জটিল ও সময়সাপেক্ষ। এই সম্পর্কে সংবিধানের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। (1) অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য সকল বিল সংসদের যে কোন কক্ষে প্রস্তাবিত হইতে পারে; অর্থসংক্রান্ত বিল কেবলমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপন করা চলে। (2) উভয় কক্ষের সম্মতি ছাড়া কোন বিলই সংসদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে না। (3) উভয় কক্ষের মধ্যে

মতবিরোধ ঘটিলে উহাদের যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে উহার মীমাংসা হইবে। (4) অর্থবিলের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, প্রথমেই তাহা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই এবং লোকসভাতেই তাহার প্রথম উত্থাপন হইবে। লোকসভায় পাশ হইলে বিলটি রাজ্যসভায় পাঠানো হইবে। সম্মতি, অসম্মতি বা সংশোধনের সুপারিশসহ 14 দিনের মধ্যে বিলটি পুনরায় লোকসভায় ফেরত পাঠাইতে হয়; নতুবা 14 দিন পরে বিলটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। অর্থ বিলে রাজ্যসভার সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করা লোকসভার ইচ্ছাধীন। (5) সর্বশেষে প্রত্যেকটি গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতি নিকট পাঠানো হয় তাঁহার সম্মতি লাভের জন্য। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে ঐ বিলে সম্মতি দিতে পারেন, না-ও দিতে পারেন, কিংবা নিজস্ব সুপারিশসহ বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। তাঁহার সুপারিশ মানিয়া লইয়া বা একেবারে পূর্বের আকারেই বিলটি যদি উভয় কক্ষে পাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে তাহাতে সম্মতি দিতেই হইবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া মাত্র বিলগুলি আইনে পরিণত হয়।

...ধারণ নিয়ম ছাড়া, প্রত্যেক বিলকে কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়া য... হয়। ...:, বিল উত্থাপনের পূর্বে সভাকে পূর্বে অবহিত করিয়া সভার অব... প্রা... য়।

বিলের উত্থা...ন ও প্রথম আলো...না

...অনুমতি লইয়া আইনসভায় বিলটি উত্থাপন করিতে হয় এবং সেই সময় বি... ...তে হয় যে (1) তখনই বিলটি বিবেচনা করা হউক, বা (2) বিচার-বিবেচনার জন্য নির্দিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হউক, অথবা (3) বিলটি সম্পর্কে জনমত জানিবার ... উহাকে গেজেটে প্রচার করা হউক। কোন মন্ত্রীকে বিল উত্থাপনের জন্য কোন অনুমতি ল...ত হয় না। এই অবস্থাকে ও এই পদ্ধতিকে বিলের উত্থাপন এবং প্রথম আলোচনা (Introdu...tion and First Reading) বলে। এই স্তরে বিলটি সম্পর্কে বিশদ বিবেচনা সম্ভব হয় না, কেবল নীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

কমিটি-স্তর ও দ্বিতীয় আলোচনা

বিলটিকে যদি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় তাহা হইলে সেই কমিটি বিলটি বিবেচনা করিয়া সুপারিশ সহ লোকসভায় প্রেরণ করে। এই স্তরকে কমিটি-স্তর (Committee Stage) বলা হয়। এই স্তরের পর বিলটির উত্থাপক ঐ বিলটির দ্বিতীয় আলোচনার (Second Reading) প্রস্তাব করেন। এই স্তরে উহার সম্পর্কে আলোচনা হয় ও ভোট গ্রহণ করা হয়।

তৃতীয় আলোচনা

সংখ্যাধিক্যের ভোট পাইলে বিলের উত্থাপক তৃতীয় আলোচনার (Third Reading) প্রস্তাব করেন এবং এই স্তরে মৌখিক সংশোধন ব্যতীত অন্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না।

আইন প্রণয়ন সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নীতি জানিয়া রাখা দরকার। প্রথমত, সাধারণ বিল সংসদের উভয় পরিষদের বিনা সংশোধন অথবা উভয় পরিষদ কর্তৃক সংশোধন সহ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

দ্বিতীয়ত, উভয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হইয়াছে (Prorogued) এইরূপ ঘোষণার দরুন সংসদে প্রস্তাবিত কোন বিল বাতিল হইয়া যাইবে না। লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই এইরূপ কোন বিল রাজ্যসভার বিবেচনাধীন থাকিলে লোকসভা ভাঙিয়া দিবার দরুন সেই বিল বাতিল হইয়া যাইবে না।

তৃতীয়ত, যে বিল লোকসভার বিবেচনাধীন আছে অথবা লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর যাহা রাজ্যসভার বিবেচনাধীনে আছে, তাহা লোকসভা ভাঙিয়া দিলে বাতিল হইয়া যাইবে।

অর্থবিষয়ক আইন প্রণয়ন (Enactment of a Mone[illegible]) ঃ সং[illegible] অর্থবিল প্রণয়ন সম্পর্কে সাধারণ আইন প্রণয়ন ছাড়া [illegible] অ[illegible]ক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 110 নং ধারায় অর্থবিলের একটি ব্যা[illegible]য়া হইয়াছে। (1) কোন করের প্রবর্তন, রহিতকরণ, হ্রা[illegible] [illegible] নিয়ন্ত্রণ; (2) সরকারী ঋণ-সংক্রান্ত নিয়মকানুন, ভারতের [illegible]রক্ষিত [illegible] আপৎকালীন তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা ঐ তহবিলে অর্থসঞ্চয় ও প্রত্যাহার এবং তৎসম্পর্কিত আইনকানুন প্রভৃতি—ইহারা [illegible]র্থ-সংক্রান্ত বিলের আওতায় পড়ে। অর্থ-সংক্রান্ত বিলের মধ্যে প্রধান হইল বা[illegible]। কোন বিল অর্থ-সংক্রান্ত বিল কি-না সেই বিষয়ে স্পীকার মহো[illegible]য়ের সিদ্ধান্ত চরম বলিয়া মানিতে হইবে।

অর্থ বিল কাহাকে বলে

অর্থ-সংক্রান্ত বিল পাশ করাইবার পদ্ধতিতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই ধরনের বিল কেবলমাত্র মন্ত্রীরাই উপস্থিত করিতে পারেন, বে-সরকারী সদস্যেরা পারেন না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া অর্থসংক্রান্ত বিল পেশ করা যায় না। বে-সরকারী সদস্যরা কোন কর ধার্য করার প্রস্তাব তুলিতে পারেন না। তাহারা ব্যয় কমাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন, কিন্তু ব্যয় বাড়াইবার প্রস্তাব করিতে বা ঐ উদ্দেশ্যে সংশোধনী প্রস্তাব আনিতে পারেন না।

অর্থ বিলের বৈশিষ্ট্য

অর্থসংক্রান্ত বিল প্রথমে লোকসভায় আনিতে হয়, রাজ্যসভায় ইহাকে প্রথমে উত্থাপন করা যায় না। লোকসভায় সাধারণ বিলের পদ্ধতিতে ইহা পেশ হয়। পেশ হইবার পরেই ইহার আলোচনার ব্যবস্থা করা যায়, দুইদিন অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন হয় না। বেসরকারী সদস্যরা একদিনের নোটিশ দিয়া সরকারী প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব আনিতে পারেন। এইরূপ সংশোধনী প্রস্তাব তিন ধরনের হইতে পারে। প্রথমত, যদি কোন সদস্য সরকারী কোন বিভাগের বিলম্বিত নীতির বিরোধিতা করিতে চান তবে তিনি ঐ বিভাগের ব্যয় মঞ্জুরীর সময়ে প্রস্তাব করিতে পারেন যে, এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ঐ বিভাগের জন্য মাত্র এক টাকা মঞ্জুর করা হউক। দ্বিতীয়ত, মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে বিভাগের ব্যয় এতটা কমান হউক বা বিশেষ কোন কোন দিকে ব্যয় বাদ দেওয়া হউক। তৃতীয়ত, কোন বিভাগের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য প্রস্তাব করা যায় যে, ঐ বিভাগের মোট ব্যয় হইতে 100 টাকা হ্রাস করা হউক।

লোকসভায় কোন অর্থ বিষয়ক বিল গৃহীত হওয়ার পর উহা অনুমোদনের জন্য রাজ্যসভায় প্রেরিত হয় এবং রাজ্যসভা বিলপ্রাপ্তির তারিখ হইতে 14 দিনের মধ্যে অ[illegible] [illegible]পারিশসহ উহা লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে বাধ্য। লোকসভা র[illegible] [illegible]ার কোন [illegible] বা সমগ্র সুপারিশ গ্রহণ অথবা বর্জন করিতে পারিবে। যদি [illegible]কস[illegible] [illegible]কান সুপারিশ গ্রহণ করে তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া হই[illegible] [illegible]সম্পর্কীয় বিল লোকসভায় যেরূপ আকারে গৃহীত হইয়াছে সেইরূপ আকারেই [illegible] অনুমোদিত হইয়াছে।

লোক[illegible]ায় গৃহীত কোন অর্থ বিষয়ক বিল অনুমোদনের জন্য রাজ্যসভায় প্রেরিত হওয়ার প[illegible] যদি 14 দিনের মধ্যে লোকসভায় ফেরত না আসে ত[illegible] হইলে অনুমিত হইবে যে লোকসভায় উহা যে আকারে গৃহীত হইয়াছে, উভয় পরিষদ কর্তৃক তাহা অনুমোদিত [illegible]ইয়াছে। উহার পর সেই বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়। সংবিধানে আছে যে রাষ্ট্রপতি উহা অনুমোদন করিতেও পারেন, না-ও করিতে পারেন। তবে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে চালিত হন বলিয়া তিনি স্বভাবতই অনুমোদন দিয়া দেন।

অর্থসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভারই প্রাধান্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোকসভার প্রাধান্য নামে মাত্র, কেবিনেটই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতির অর্থবিলও আসলে কেবিনেটের প্রস্তাব। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস যেমন আর্থিক ব্যাপারে আগাইয়া আসিয়া নানাবিধ ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে পারে, ব্রিটেনের বা ভারতের পার্লামেণ্ট সেরূপ করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে।

সংসদের পক্ষে প্রতিটি বিভাগের খুঁটিনাটি বিচার করা অসম্ভব। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিবার শক্তি, সময় ও সদিচ্ছা কোন বেসরকারী সদস্যেরই নাই। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মতন ভারতের সংসদও আর্থিক ব্যাপারে কেবিনেটের নেতৃত্ব মানিয়া চলে।

রাজ্য সরকার (State Government)

1956 সালের 31শে অক্টোবর পর্যন্ত ভারতে তিন শ্রেণীর রাজ্য গঠিত ছিল এবং ইহাদের শাসনতান্ত্রিক কার্য পরিচালনার জন্য সংবিধানে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সকল রাজ্যই সমমর্যাদাসম্পন্ন। আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিতে রচিত। কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যের শাসনব্যবস্থার পৃথক্ দায়দায়িত্বের বিভাগ আমাদের সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপ। তবে আমাদের অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুরূপ। আমাদের রাজ্যগুলিতেও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা ও পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত। রাজ্যের শাসন-বিভাগের প্রধান একজন রাজ্যপাল। রাষ্ট্রপতির মত তিনিও রাজ্যসরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিপরি[illegible] বং নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে তাঁহাকে মন্ত্রিসভা, বিশেষত মুখ্যম[illegible] পরামর্শ [illegible] কার্য পরিচালনা করিতে হয়। মন্ত্রিপরিষদ তাঁহার কার্যের [illegible] ভার নিম্ন পরিষদের নিকট দায়ী।

অঙ্গরাজ্যের শাসন

রাজ্যপাল (Governor): প্রত্যেক রাজ্য [illegible] একজন রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত আছে। অবশ্যই দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য [illegible]জন মাত্র রাজ্যপালও নিযুক্ত [illegible]ইতে পারেন (153 নম্বর ধারা)। 1972 সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পুনর্গঠনের ফলে 5টি অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই 5টি রাজ্য—আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও নাগাভূমি। এই 5টি র[illegible]্যের একজন রাজ্যপাল ও একটি হাইকোর্ট থাকিবে। রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে নিযুক্ত করেন এবং রাষ্ট্রপতির আস্থা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত (during his pleasure) রাজ্যপাল নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। তাঁহার কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বৎসর। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নূতন রাজ্যপাল কার্যে যোগদান না করা পর্যন্ত তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। অবশ্য তাহার পূর্বেই তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিত আবেদনক্রমে পদত্যাগ করিতে পারেন। পদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে প্রধান বিচারালয়ের (High Court) প্রধান বিচারপতির নিকট রাজ্যপাল শপথ গ্রহণ করিবেন।

নিয়োগ

যোগ্যতা

রাজ্যপাল হইতে হইলে তাঁহাকে 35 বৎসর বয়স্ক এবং ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের অথবা কোন রাজ্যসরকারের আইন পরিষদের সদস্য থাকিতে পারিবেন না। রাজ্যপাল রাজ্যের অন্য কোন লাভজনক বা বেতনভুক্ কর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তাঁহার মাসিক বেতন হইবে 5500 টাকা। ইহা ব্যতীত তিনি নানাবিধ ভাতা পান। রাজ্যপালের বেতনাদি একত্রীকৃতকোষ হইতে দেয় (charged on the consolidated fund) এবং উহা লইয়া বিধানসভায় ভোটাভুটি হয় না।

রাজ্যপালের ক্ষমতা (Powers of the Governor): রাজ্যপালের ক্ষমতাগুলিকে শাসন বিষয়ক, আইন বিষয়ক, অর্থ বিষয়ক এবং বিচার বিষয়ক—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সংবিধানের 154 নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যের শাসন বিভাগীয় সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যপালের উপর অর্পিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং বা নিম্নতম কর্মচারীদের মাধ্যমে এই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতির নামে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কাজ করা হয়, তেমনি অঙ্গরাজ্যের সকল কাজ রাজ্যপালের ন[illegible]রা হয়। রাষ্ট্রপতির মত রাজ্যপালও সাংবিধানিক শাসক (constitu-[illegible] ruler [illegible] সাধারণত তিনি মন্ত্রিদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে সরকারী কা[illegible]রি[illegible] [illegible]বশ্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রিদের পরামর্শ না-ও লই[illegible] [illegible]কন্তু এরূপ ব্যবস্থা স্বাভাবিক নয়। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার এই মৌলিক [illegible]ন রা[illegible]খয়া আমরা রাজ্যপালের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা (formal powers) আলোচনা করিতে পারি।*

সাংবিধানিক শাসক বা আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা

(ক) **[illegible]াসন বিষয়ক ক্ষমতা**—যে সকল বিষয়ে রাজ্যের আ[illegible]ন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, সেই সকল বিষয় লইয়াই রাজ্যের শাসন-ক্ষমতার বিস্তৃতি। রাজ্যের শাসন বিষয়ে সমুদ[illegible] ক্ষমতার অধিকারী হইলেন রাজ্যপাল। 163 নম্বর ধারা অনুযায়ী তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে এবং তাঁহার পরামর্শ মত অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রিগণ রাজ্যপালের মর্জি অনুযায়ী স্বপদে বহাল থাকেন, যদিও কার্যত আইনসভার আস্থাই এ বিষয়ের প্রধান নিয়ামক। 167 নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ও সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জানাইবার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর। এ ছাড়া কোন মন্ত্রির ব্যক্তিগত ভাবে আনীত কোন প্রস্তাব মন্ত্রিসভায়

* 1950 খ্রীষ্টাব্দে সুনীল কুমার বসু ও অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সেক্রেটারীর মামলায় কলিকাতা হাইকোর্ট এইরূপ রায় দেন যে, রাজ্যপাল মন্ত্রিদের উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য। 1955 খ্রীষ্টাব্দে আর. জে. কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ঐ মত সমর্থন করিয়া বলেন যে, রাজ্যপাল শাসনবিভাগের প্রধান কিন্তু নামেমাত্র; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অবস্থা ইংলণ্ডের রাজার মত।

আলোচনার জন্য রাজ্যপাল নির্দেশ দিতে পারেন। তিনি উচ্চ বিচারালয়ের বিচারকের যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে অ্যাডভোকেট-জেনারেল নিযুক্ত করেন। রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করিবার অধিকার না থাকিলেও এই নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের পরামর্শ গ্রহণ করেন। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণও রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন, অবশ্য এই সদস্যদের তিনি পদচ্যুত করিতে পারেন না।

বিভিন্ন রাজ্যের উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি-সংক্রান্ত ব্যবস্থার ক্ষমতা রাজ্যপালের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অন্তর্গত। এই সম্পর্কে রাজ্যপালকে ভারত সরকারের নিকট প্রতি বৎসর একটি বিবৃতি পেশ করিতে হয়।

(খ) **আইন-বিষয়ক ক্ষমতা**—রাষ্ট্রপতি যেমন সংসদের অঙ্গীভূত, রাজ্যপালও সেইরূপ আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি রাজ্যের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, স্থগিত রাখিতে পারেন এবং নিম্ন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি আইন পরিষদের যে কোন কক্ষে বাণী প্রেরণ করিতে পারেন বা বক্তৃতা দিতে পারেন। কোন বিল আইনে পরিণত হইলে তাঁহার সম্মতি প্রয়োজন। তিনি সম্মতি দান করিতে পারেন, প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন বা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অ... তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন। ...সভা সে... পুনরায় গ্রহণ করিলে রাজ্যপাল সম্মতি দিতে অস্বীকার করি...

আইনসভার অধিবেশন স্থগিত অবস্থায় রাজ্যপাল জরুরী আই... ...) জারী করিতে পারেন। এই জরুরী আইন আইনসভায় পেশ করিতে ...ব এবং অধিবেশন শুরু হওয়ার পর ছয় সপ্তাহকাল বলবৎ থাকিবে।

(গ) **অর্থ-বি...ক ক্ষমতা**—সংবিধানের 202 নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক আর্থিক বৎসর আরম্ভের পূর্বে রাজ্যের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব রাজ্যপালের নির্দেশে অর্থমন্ত্রী আইনসভার নিকট দাখিল করেন। রাজ্যপালের অনুমোদন ব...ীত রাজস্ব-সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব আইনসভায় আনা যায় না।

(ঘ) **বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা**—রাজ্যপাল জেলার প্রধান বিচারক বা অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ করেন। দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস বা ক্ষমা করিতে পারেন, এক জাতীয় দণ্ডকে অন্য জাতীয় দণ্ডে পরিণত করিতেও পারেন।

যদি তিনি মনে করেন যে, রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে জানাইবেন এবং রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে ঘোষণার দ্বারা রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে লইবেন। জরুরী অবস্থায় রাজ্যপাল যাহাতে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনা অনুযায়ী সেরূপ ব্যবস্থা করিবেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ লইয়াই তাঁহাকে সকল কার্য পরিচালনা করিতে হয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে নির্দেশ ও আদেশ দেন।

কিন্তু যে সকল বিষয়ে শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাজ্যপাল নিজ 'বিবেচনানুযায়ী' (discretion) কার্য করিতে নির্দিষ্ট হইয়াছেন সেই সমুদয় বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ লইতে বাধ্য হইবেন না। কোন বিষয়ে রাজ্যপালের 'বিচারবুদ্ধি' প্রয়োগের অধিকার আছে কি-না এরূপ প্রশ্ন উঠিলে, রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। রাজ্যপালের বিচারবুদ্ধি-প্রণোদিত কার্যকলাপের বৈধতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারিবে না।

সর্বশেষে একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে রাজ্যপালের ক্ষমতা ও স্থান রাজ্যের ক্ষেত্রে অনেকাংশে রাষ্ট্রপতির মতনই। এই ধারণা মূলত সঠিক, কিন্তু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সহিত রাজ্যপালের ক্ষমতার কয়েকটি পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রপতি বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের দর্শন দেন ও বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু রাজ্যপালের সেইরূপ কোন কূটনৈতিক অধিকার নাই। জনচিত্তে মর্যাদার দিক হইতে রাষ্ট্রপতি অনেক উচ্চে। উভয়ের নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতিতেও বহু পার্থক্য আছে। রাষ্ট্র[illegible] স্থলবাহি[illegible] [illegible]িমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, কিন্তু রাজ্যপালের এইরূপ ক্ষমতা নাই। [illegible] ষ্ট্রপ[illegible] [illegible]স্থা ঘোষণা করিতে পারেন, রাজ্যপাল তাহা পারেন না।

রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের ম[illegible] ক্ষমতা[illegible]

র[illegible] [illegible]ংবিধানিক স্থান বা মর্যাদা (Constitutional Position of Gove[illegible]): রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় রাজ্যপালের ভূমিকা দুই দিক হইতে বিচার্য। এ[illegible]দিকে তিনি আঞ্চলিক শাসনের নিয়মতান্ত্রিক শীর্ষাধিনায়ক; অন্যদিকে তিনি বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে কেন্দ্রের প্রতিনিধি।*

আঞ্চলিক শাসনের দিকটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে অন্যান্য অনেক ক্ষমতার মধ্যে রাজ্যপাল[illegible] রাজ্যের মন্ত্রিসভা গঠন, আইনসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিতকরণ ও অবসান, রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের জন্য সংরক্ষিত বিল ছাড়া অন্যান্য আইনের প্রস্তাব অনুমোদন বা বর্জন প্রভৃতি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে মন্ত্রিসভার উপদেশক্রমে তিনি এই সকল কাজ করিবেন। আবার ইহারই পাশাপাশি 1935 সালের ভারত শাসন আইনের অনুকরণে রাজ্যপালকে কিছু কিছু স্বেচ্ছাধীন কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে (to act in his discretion)।

* "On the one hand, the Governor is the constitutional head of the local state, on the other hand he is the agency of the centre called upon to implement its policy from a wider federal point of view."—Alexandrowicz—*Constitutional Developments in India.*

সংবিধানের 163 নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলির নির্বাচনে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চরম ও চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। উহার বৈধতা লইয়া কোন প্রশ্ন তোলা চলিবে না। এই সকল কারণে সংবিধানে রাজ্যপালের সঠিক ভূমিকা ও স্থান কি তাহা লইয়া নানারূপ বিতর্ক দেখা দিতেছে।

অনেক বিষয় আলোচনা করিলেই মনে হইবে রাজ্যপাল কেবল আনুষ্ঠানিক শোভাবর্ধনকারী পদাধিপতি নন, মন্ত্রিমণ্ডলীর কথায় উঠা বসা ছাড়াও তাঁহার নিজ ক্ষমতা কিছু আছে। (ক) উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর সম্পর্ক রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহাকে প্রতি বৎসর সরাসরি রিপোর্ট পাঠাইতে হয়। (খ) যদি রাষ্ট্রপতির আদেশে পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্য বা অঞ্চলের শাসন-ক্ষমতা রাজ্যপালের উপর অর্পিত হয়, তবে সেই ক্ষমতা তিনি রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়াই ব্যবহার করেন। (গ) সংবিধানের 356 নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিকট রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ঠিকমত সংবিধান অনুযায়ী চলিতেছে বলিয়া রিপোর্ট পেশ করিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ রিপোর্ট রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও যাইতে পারে। উহা নিশ্চয় মন্ত্রিসভার পরামর্শে করা যাইতে পারে না। (ঘ) একটি মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়েও রাজ্য [illegible] তা কিছুটা প্রয়োগ করিতে পারেন। রাজ্যের আইনসভায় কোন দলের নিরঙ্কু[illegible]ক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে তখন রাজ্যপাল অবস্থা বু[illegible] বেচনা [illegible] য়োগ করেন। (ঙ) কোন বিলে সম্মতি প্রদান না করিয়া রাজ্যপা[illegible]তির নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। রাজ্য ও কেন্দ্রের [illegible] দল দ্বারা পরিচালিত না হইলে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিধি বাড়িয়া যা[illegible] রাজ্যপাল তখন ভুলিতে [illegible]রেন না যে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত, রাষ্ট্রপতির [illegible]ন্তুষ্টির উপর তাঁহার স্থিতিকাল নির্ভরশীল। ফলে তিনি সর্বদাই মনে করেন যে [illegible]াহার প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির নিকট, রাজ্যের মন্ত্রিসভার নিকট নয়। (চ) সর্বোপরি [illegible]রুরী অবস্থায় যখন রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির 'এজেণ্ট' বা 'প্রতিনিধি' রূ[illegible] কাজ করেন, তখনও তাঁহার পক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। এই সকল কারণে অনেকেই তাঁহাকে কেন্দ্রের সতর্ক প্রহরী (watchdog of the centre) বলিয়া অভিহিত করেন।

অনেকে অবশ্য মনে করেন যে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইবেন তাহাই সংবিধান রচয়িতাদের উদ্দেশ্য। রাজ্যপালের নিয়োগ-প্রথাতেই ইহা সুপরিস্ফুট। খসড়া সংবিধানে ছিল যে রাজ্যপাল নির্বাচিত রাজনায়ক হইবেন। কিন্তু সংবিধান রচনা-পরিষদে এই সম্পর্কে সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে রাজ্যপাল ও মন্ত্রিসভা উভয়ই গণনির্বাচিত হইলে উভয়ের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিবে। উভয়ই নির্বাচিত

জন-প্রতিনিধি হইলে কাহারও পক্ষে অপরের মত লওয়া বাধ্যতামূলক হইবে না। তাই নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল তৈয়ারীর উদ্দেশ্য লইয়াই রাজ্যপালের নির্বাচন-প্রথা রাখা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, সংবিধানের সামগ্রিক তাৎপর্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইহা দায়িত্বশীল সরকার। মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার নিকট দায়ী। মন্ত্রিমণ্ডলীকে উপেক্ষা করিয়া কোন কাজ করিলে রাজ্যপালের সেই কাজের জন্য আইনসভায় মন্ত্রিমণ্ডলী কিরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন? যদি রাজ্যপাল পরামর্শ উপেক্ষা করেন তবে রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করিয়া রাজ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি করিতে পারেন।

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংহতি ও স্বার্থ সংরক্ষণ, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন, এবং কেন্দ্রীয় নীতির যথাযথ রূপায়ণ—এই তিনটি উদ্দেশ্য লইয়াই রাজ্যপালের পদ সৃষ্টি এবং উহার নিয়োগ ব্যবস্থা রচিত হইয়াছে। সংবিধানকে রক্ষা করা তাঁহার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব। এই প্রসঙ্গে এক লেখক বলিতেছেন, "The old notions about the role of a Governor should be buried deep. A Governor now no longer governs but he is the watchdog of the constitution. His function is to listen to everything, watch and tender advice not only to the ruling party but to all."

…ম **মন্ত্রিপরিষদ** (State Cabinet): মন্ত্রিপরিষদ্ রাজ্যের শাসনে কর্তা … রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তারূপে বিরাজ করিবেন, ইহা …তন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও …প্রত্যেক দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় ঐ রীতি অবলম্বিত হয় বলিয়া রাজ্যসরকারের শাসনেও সেই রীতি অবলম্বিত হইবে ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। রাজ্যপালের নামে মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন।

গঠন

রাজ্য আইনসভার নিম্ন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করিয়া এবং তাঁহার পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া দেন। মন্ত্রিদের সাহায্য করিবার জন্য উপ-মন্ত্রী নিযুক্ত হইতে পারে। সংবিধানে মন্ত্রীদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ নাই। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিবেচনাই চরম। মন্ত্রিপরিষদ রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনা করে এবং আইন-সংক্রান্ত বা শাসন-বিষয়ক নীতি স্থির করিয়া আইন প্রণয়ন এবং উহা কার্যকরী করার ব্যবস্থা করে।

মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে (collectively) রাজ্যসরকারের বিধানসভার (Legislative Assembly) নিকট দায়ী থাকিবেন, কিন্তু বিধানপরিষদের নিকট তাহাদের কোন দায়িত্ব নাই। কোন মন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে উক্ত রাজ্যসরকারের

আইনসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইতে না পারিলে মন্ত্রিসভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। মন্ত্রিগণের বেতন ও ভাতা রাজ্যের আইনসভা স্থির করিয়া দিবেন।

মন্ত্রিগণ আইনসভার উভয় পরিষদেই বক্তৃতা দিতে পারেন। কিন্তু যে-মন্ত্রি যে-কক্ষের সদস্য কেবল সেই কক্ষেই তাঁহার ভোট দেওয়ার অধিকার। বিধানসভা নানাভাবে মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে পারে, যেমন সমগ্র মন্ত্রিসভা বা কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ, গুরুতর আইনের প্রস্তাব পরিবর্জন, বাজেট অনুমোদনে অস্বীকৃতি, মুলতুবী প্রস্তাব পাশ প্রভৃতি। মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্যগণের প্রশ্ন ও উপপ্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে বাধ্য।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর যে স্থান রাজ্যেব মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রীরও সেই স্থান।

মুখ্যমন্ত্রীব স্থান

তিনিই রাজ্য আইনসভার নেতা এবং সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ নিয়ন্ত্রণকারী। তাঁহার পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হয়, দপ্তরসমূহ বণ্টিত হয়, মন্ত্রীদের পদচ্যুতি ঘটে। তাঁহার পদত্যাগে সমগ্র মন্ত্রীপরিষদের পতন হয়। মুখ্যমন্ত্রীই রাজ্য আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সুতরাং রাজ্যের অধিবাসীদের অধিকাংশের জননেতা হিসাবে তিনিই শাসন-ক্ষমতা পরিচালনা করেন। রাজ্যপাল ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীই সংযোগসেতু।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যসরকারের শাসন সম্বন্ধে ও কোন আইনের প্রস্তাব

সকল সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জানাইবেন। রাজ্যপাল যে-সংবাদ জা

তাহা তাঁহাকে জানাইতে হইবে। যদি

মন্ত্রিপবিষদ ও রাজ্যপাল

যৌথভাবে গৃহীত না হইয়া একজন মন্ত্রী

তাহা হইলে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার সকলের নিকট সেই সিদ্ধান্ত

মন্ত্রীকে আদেশ দিতে পারিবেন।

রাজ্য সরকারের আইন প্রণয়ন বিভাগ (The State L gi ature)

প্রত্যেক রাজ্যে এক ন-রাজ্যপাল এবং একটি বা দুইটি পরিষদ লইয়া রাজ আইনসভা গঠিত: সংবিধানের 168 নম্বর ধারা অনুযায়ী আইনসভার একটি বা ইটি পরিষদ থাকিতে পারে। বর্তমানে তেরটি রাজ্যের (আসাম, উড়িষ্যা, গুজ ট, রাজস্থান, নাগাভূমি, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও কেরল) একটি করিয়া পরিষদ, অন্যান্য রাজ্যে দুইটি করিয়া পরিষদ আছে। যেখানে দুইটি করিয়া পরিষদ থাকিবে সেখানে উচ্চ পরিষদ 'বিধান পরিষদ' (Legislative Council) এবং নিম্ন পরিষদ 'বিধান সভা' (Legislative Assembly) নামে অভিহিত। যেখানে আইসভার দুইটি পরিষদ নাই সেখানেও আইনসভাকে 'বিধান সভা' নাম দেওয়া হইয়াছে। সংসদ আইন প্রণয়ন করিয়া কোন রাজ্যে উচ্চ পরিষদের প্রবর্তন করিতে পারিবে। কিন্তু সংসদ কর্তৃক ঐ প্রকার আইন প্রণীত হইতে পারিবে

যদি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের বিধান সভার (Legislative Assembly) মোট সদস্য-সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যা এবং সভায় উপস্থিত ও ভোটে যোগদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা উক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে।

বিভিন্ন রাজ্যের বিধান পরিষদ ও বিধান সভার সদস্য সংখ্যা

রাজ্য*	বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা	বিধান সভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা
১। অন্ধ্রপ্রদেশ	৯০	২৮৭
২। উত্তরপ্রদেশ	১০৮	৪২৫
৩। জম্মু ও কাশ্মীর	৩৬	৭৫
৪। বিহার	৯৬	৩১৮
৫। মধ্যপ্রদেশ	৯০**	২৯৬
৬। মহারাষ্ট্র	৭৮	২৭০
৭। মহীশূর	৬৩	২১৬
[illegible]মিলনাড়ু (মাদ্রাজ)	৬৩	২৩৪
[illegible] আসাম	—	১২৬
[illegible] উ[illegible]	—	১৪০
[illegible]	—	১৩৩
১২ [illegible]	—	১৬৮
১৩। [illegible]গাভূমি	—	৫২
১৪। পশ্চিমবঙ্গ	—	২৮০
১৫। পাঞ্জাব	—	১০৪
১৬। [illegible]জস্থান	—	১৮৪
১৭। হরিয়ানা	—	৮১
১৮। হিমাচলপ্রদেশ	—	৬০
১৯। মেঘালয়	—	৬০
২০। মণিপুর	—	৬০
২১। ত্রিপুরা	—	৬০

* সম্প্রতি ভারতের রাজ্যপুনর্গঠন আইনানুযায়ী উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের (North-Eastern Areas) ৫টি রাজ্যে ও ২টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে)। বর্তমানে রাজ্যের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ২১টি। [illegible]

** মধ্যপ্রদেশে এখনও বিধান পরিষদ গঠিত হয় নাই।

(ক) বিধান পরিষদের গঠন ও ইহার যৌক্তিকতা (Legislative Council and its Organisation)—বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা রাজ্য সরকারের বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক হইতে পারিবে না। কোন মতেই বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা 40-এর কম হইতে পারিবে না। সংসদ যতদিন অন্য আইন প্রণয়ন না করিতেছে, ততদিন বিধান পরিষদ নিম্নপ্রকারে গঠিত হইবে, যথা—1$\frac{1}{3}$ অংশের কাছাকাছি সভ্য নির্বাচিত হইবেন মিউনিসিপালিটি, জিলা পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান হইতে, (2) এই রাজ্যে বসবাসকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের পুরাতন স্নাতক (graduate) অথবা সমযোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিরা $\frac{1}{12}$ অংশের কাছাকাছি সদস্য নির্বাচিত করিবেন, (3) যাহারা মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে (secondary schools) অন্তত পক্ষে তিন বৎসরকাল শিক্ষকতা করিয়াছেন তাঁহারা $\frac{1}{12}$ অংশের কাছাকাছি সভ্য নির্বাচিত করিবেন, (4) রাজ্য সরকারের বিধানসভার সভ্যগণ $\frac{1}{3}$ অংশের কাছাকাছি সভ্য নির্বাচিত করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ নির্বাচিত হইতে পারিবেন না, (5) বাকী সভ্যগণ মনোনীত হইবেন রাজ্যপাল দ্বারা। রাজ্যপাল মনোনয়ন করিবেন এমন সদস্যগণকে যাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমবায়, আন্দোলন, সমাজসেবা প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ ব্যুৎপন্ন। প্রথম তিন শ্রে[illegible]ন হইবে সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা নির্দিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন[illegible] (terr[illegible]al constituency) দ্বারা।

বিধান পরিষদের আয়ুষ্কাল চিরস্থায়ী, উহা ভাঙিয়া দিবার [illegible] প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় বা অবসর গ্রহ[illegible]। ইহা লটারী দ্বারা স্থির হয়।

বিধান পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (Chairman) এবং একজন সহসভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচিত করেন। সভাপতি অথবা তাঁহার অবর্তমানে সহ-সভাপতি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব ক[illegible] এবং সভার কার্য পরিচালনা করেন।

বিধান পরিষদের সদস্য হইতে হইলে প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক এবং কম পক্ষে 30 বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই।

রাজ্য বিধান মণ্ডলীতে বিধান পরিষদ বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত কি-না (justification for Legislative Councils in State Legislature) সেই বিষয়ে বর্তমানে দেশে প্রচুর বিতর্ক চলিতেছে। বিধান পরিষদ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত নয়। ইহাতে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যরা থাকেন। এই কারণে এই কক্ষের

হাতে অতি অল্প ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। যাঁহারা বিধান পরিষদ তুলিয়া দিতে চান তাঁহারা বলেন যে, যে-সংস্থা মাত্র চারি মাস কালের বেশি বিল পাশ ঠেকাইতে পারেন না, অর্থ বিল-সংক্রান্ত ক্ষমতাই যাহার কম, উহাকে বজায় রাখিয়া লাভ কি? আমাদের মত দরিদ্র দেশে ইহার জন্য অর্থব্যয় একেবারেই অপব্যয়। বিধানসভা কোন ক্ষতিকারক বিল পাশ করিলে, জনমত উহার বিরুদ্ধে গেলে, অবিবেচনাপ্রসূত বা দ্রুত কোন আইন পাশ হইলে রাজ্যপাল ঐ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য বিধান সভার নিকট পাঠাইতে পারেন। রাজ্যের বিধানসভা ভুল করিলে রাষ্ট্রপতি আছেন, হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টও আছে। এই অবস্থায় আবার বিধান পরিষদের প্রয়োজন আছে কি-না, সেই বিষয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিয়াছে।

কেন বিধান পরিষদ অপ্রয়োজনীয়

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে অনেক শান্ত, বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের হাঙ্গামায় নিজেদের জড়াইতে চাহেন না, অথচ তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি দেশের আইনপ্রণয়ন ও শাসনকার্যে নিয়োগ করিতে চান। এইরূপ ব্যক্তিরা বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতে পারেন বা রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইতে [illegible]রেন। এইরূপভাবে গৃহীত হইয়া তাঁহারা মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যও হইতে পারেন। এমন [illegible] মুখ্যম[illegible] [illegible]ছেন। আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে দেশের [illegible] [illegible] স্বার্থের কথা আইনসভায় সমভাবে প্রকাশ না-ও হইতে পারে। [illegible] [illegible]কাগোষ্ঠী ও শ্রেণী হইতে মনোনীত হইয়া সদস্যেরা দেশের শাসন-কাঠা[illegible]তে বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের (Functional Representation) সুবিধা আ[illegible]তে পারে। সর্বোপরি, দ্বিতীয় কক্ষ বজায় রাখা[illegible] কারণ প্রধানত রাজনৈতিক। নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলি বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট হইতে [illegible]নাবিধ উপায়ে সাহায্য পায়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে লোকেরা সেই সাহায্যে[illegible] প্রতিদান দা[illegible] করে। তাহাদের তুষ্ট না করিলে দলের চলে না। প্রভাব প্রতিপত্তির ভাগাভাগির প্রয়োজনে দ্বিতীয় পরিষদের সদস্যগিরি অনেকের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ রাজনৈতিক প্রয়োজনেও ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ইহাকে টিঁকাইয়া রাখা হইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

তবুও ইহাদের কেন জিয়াইয়া রাখা হইতেছে

(খ) **বিধানসভা** (Legislative Assembly)—প্রত্যেক রাজ্য সরকারের বিধানসভা সর্বজনীন ভোটাধিকারে ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। কিন্তু কোন রাজ্যের রাজ্যপাল যদি দেখিতে পান যে, তথাকার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সংখ্যা যথোপযুক্ত

হয় নাই, তাহা হইলে তিনি কয়েকজনকে মনোনীত করিতে পারিবেন। কোন বিধান সভার সদস্য সংখ্যা 500-এর অধিক বা 60-এর কম হইবে না। পূর্ববর্তী আদমসুমারীর গণনা মতে বিধান সভায় ভোটার সংখ্যার প্রতি 75000 জনে একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে। প্রত্যেক নির্বাচকমণ্ডলীর জনসংখ্যা ও উহা হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধির অনুপাত যতদূর সম্ভব সর্বত্র সমান হইবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় বর্তমানে মোট সদস্যসংখ্যা 284 জন, ইহার মধ্যে 280 জন নির্বাচিত ও 4 জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্য মনোনীত।

প্রত্যেক বিধানসভার আয়ুষ্কাল 5 বৎসর। আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে রাজ্যপাল বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তবে রাষ্ট্রের জরুরী অবস্থাকালে ভারতীয় সংসদ আইন করিয়া ইহার আয়ুষ্কাল এক বৎসর করিয়া বাড়াইয়া দিতে পারে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার তারিখ শেষ হইবার পর আর ছয় মাসের বেশি বিধানসভার স্থিতিকাল বৃদ্ধি করা যাইবে না।

আয়ু

রাজ্যসরকারের আইনসভার সদস্যগণকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। সদস্যের বয়স অন্ততপক্ষে 25 বৎসর হইতে হইবে। তিনি যে রাজ্যের বিধান সভার জন্য দাঁড়াইবেন সেখানকার ভোটার হওয়া দরকার। সরকারের অধীনে কোন লাভ[illegible]ক কাজে তাঁহারা যুক্ত থাকিবেন না, অবশ্য মন্ত্রীদের এই পর্যায়ে ফেলা যায় না। দে[illegible]লিয়া, বিকৃতমস্তিষ্ক বা সংসদের কোন আইন কর্তৃক অযোগ্য বিবেচি[illegible] কেহ [illegible]র্বাচন-প্রার্থী হইতে পারিবেন না। কোন ব্যক্তি একই সময়ে [illegible]ার বা ঐ রাজ্যের বিধানসভা ও বিধান [illegible] একাধিক রাজ্যের বিধানসভার সদস্য থাকিতে পারিবেন[illegible]। কোন নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে যদি তিনি একটি পদ [illegible]্যাগ না করেন তবে তিনি সমস্ত পদই হারাইবেন। কেহ সদস্য নির্বাচিত হইবার প[illegible] একাদিক্রমে বিধানসভার বিনা অনুমতিতে ষাটদিনের বেশি অনুপস্থিত থাকিলেও [illegible]িনি সদস্য পদ হইতে চ্যুত হইবেন।

সদস্য পদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

বৎসরে অন্তত দুইবার আইনসভার অধিবেশন হইতে হইবে, প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন ছয় মাসের মধ্যে হওয়া চাই। মোট সদস্যসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকিলে তবে কোন পরিষদে গণপূর্তি (Quoram) হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে এবং উক্ত পরিষদের অধিবেশন হইতে পারিবে। দশজনের কম সদস্য উপস্থিত থাকিলে অধিবেশন স্থগিত থাকিবে। প্রত্যেক পরিষদের প্রত্যেক সদস্য আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে বিধিমত শপথ গ্রহণ করিবেন। আইনসভার নিকট উপস্থাপিত সকল প্রস্তাব সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত

কার্যপদ্ধতি

হইবে। বিধানসভার সদস্যদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার (Speaker) ও একজন ডেপুটি স্পীকার (Deputy Speaker) নির্বাচিত করিতে হইবে। সভার পরিচালনা ও শৃংখলা রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব স্পীকারের এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকারের। সকল রাজ্যের বিধান সভার ক্ষেত্রেই লোকসভার স্পাকারের ও ডেপুটি স্পীকারের সম্মান ও মর্যাদার অনুরূপ মর্যাদা স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে দেওয়া হয়। স্পীকার সাধারণত ভোট দেন না, তবে ভোটসংখ্যা সমবিভক্ত (tie) হইলে তিনি ভোট দিতে পারেন।

সভা পরিচালনা, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীপ্রার

রাজ্যপাল প্রত্যেক পরিষদের অধিবেশনের (session) স্থান ও সময় নির্দেশ করিবেন। রাজ্যপাল সভা আহ্বান করিতে, স্থাপিত রাখিতে বা ভাঙিয়া দিয়া সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারিবেন। রাজ্যপাল কোন একটি বা উভয় পরিষদের সভ্যগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অভিভাষণ (address) দিতে পারিবেন। প্রত্যেক অধিবেশনের পূর্বে তিনি কেন আইনসভা আমন্ত্রণ করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে অভিভাষণ দিবেন। তিনি আইনসভার কোন একটিতে বা উভয় পরিষদে কোন বিল বা অন্য কোন বিষয়ে বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। ঐ বাণী যে পরিষদে প্রেরিত হইবে তাহাতে ঐ বাণী [illegible]ত্বর তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। রাজ্যের যে-কোন [illegible]ব্যবহারিক দুইটি পরিষদেই বক্তৃতা দিতে পারিবেন, কিন্তু যে-পরিষদের [illegible] পরিষদেই ভোট দিতে পারিবেন।

[illegible]পাল ও অ[illegible] সভা সম্পর্কে ব্যবস্[illegible]

আইন[illegible]ার ক্ষমতা ও উহার সীমাবদ্ধতা (Powers of State Legislatures and its Limitations): রাজ্যতালিকাভুক্ত ও যুগ্মতালিকা[illegible]ক্ত বিষয় সম্পর্কে রাজ্য আইন[illegible]ভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে রাজ্য আইন[illegible]ার দ্বারা প্রণীত আইন যদি সংসদ-প্রণীত আইনের বিরোধী হয়, তাহা হইলে রাজ্য আইনসভার আই[illegible] বাতিল হইয়া যায়। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে বিল বা আইনের খসড়া পেশ করার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইতে হয়। যেমন রাজ্যের মধ্যে বা আন্তঃরাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণকারী কোন প্রস্তাব, হাইকোর্টের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ কোন প্রস্তাব। রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে যদি স্থির হয় যে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয় সাময়িকভাবে সংসদের এক্তিয়ারে রাখা হউক, তাহা হইলে ঐ সময়ের মধ্যে রাজ্যের বিধানমণ্ডলী উহার উপর কোন আইন করিতে পারিবেন না।

রাজ্য আইনসভার ক্ষমতার সীমা

যখন রাষ্ট্রপতি কোন অঙ্গরাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসন চালানো অসম্ভব বলিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তখন সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর সমস্ত ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত হইতে পারে। যখন রাষ্ট্রপতি দেশের অবস্থা বিপন্ন বলিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন তখন সংসদ রাজ্যতালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে আইন করিতে পারে। কোন বৈদেশিক চুক্তি বা আন্তর্জাতিক কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যও কেন্দ্রীয় সংসদ রাজ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সেই সময়ে রাজ্যবিধানমণ্ডলীর আর আইন করার অধিকার থাকে না, যদিও বিধানমণ্ডলী কিন্তু ভাঙিয়া যায় না।

এই সকল বাধানিষেধ ব্যতীত রাজ্য বিধানমণ্ডলী তাহার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন। কিন্তু রাজ্যের হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট কোন মামলা-মোকদ্দমা বিচার করিবার সময়ে ঐ বিধানমণ্ডলীর দ্বারা তৈয়ারী আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে। সংবিধানের সহিত (লেখায় ও ভাবে) অসামঞ্জস্য দেখা দিলে ঐ বিচারালয় সেই আইনকে অবৈধ বা অসাংবিধানিক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

উভয় পক্ষের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কে

কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদের অনুমোদন দরকার, তবে উচ্চ পরিষদের ক্ষমতা নিম্ন পরিষদের তুলনায় অনেক কম। বিধান পরিষদ তিনমাস পর্যন্ত বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলে স[illegible]তি জ্ঞাপন না করিতেও পারে। ঐ বিলটি যদি বিধ[illegible]সভা দ্বিতীয়বার গ্রহণ করে, তাহা হইলে বিধান পরিষদ একমাস প[illegible] সম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া রাখিয়া দিতে পারে। একমাস সময়ের পর সেই বিল আ[illegible] হইবে। অর্থ-সংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্রে নিম্নপরিষদের প্রাধান্য দেখা [illegible]য়, কারণ[illegible] বিলে বিধান পরিষদের মতামত দিবারই মাত্র ক্ষমতা আছে, বিধানসভা [illegible] মতামত গ্রহণ না করিতেও [illegible]রে। 14 দিনের মধ্যে বিধান পরিষদ সম্মতি না [illegible]দলে উহা আইনে পরিণত হয়। অর্থসংক্রান্ত বিল কেবলমাত্র বিধানসভাতে[illegible] উত্থাপিত হইতে পারে।

রাজ্যের আয় ও ব্যায়ের ব্যবস্থা করা আইনসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ [illegible]জ। সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব বা ব্যয়-বরাদ্দের দাবি মঞ্জুর করাও বিধানসভার কাজ। বিধানসভা অনুমোদন না করিলে রাজস্ব ব্যয় করা চলে না। রাজ্যপালের সুপারিশ [illegible]তীত বিধানসভার নিকট ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উপস্থাপিত করা যায় না। মন্ত্রিগণই কর-ধার্য বা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব আনিতে পারেন, অপর কোন সদস্য পারেন না।

মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা আইনসভার প্রধান দায়িত্ব। মন্ত্রিগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য এবং আইনসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। আইনসভার সদস্যগণ প্রশ্ন করিলে মন্ত্রিগণ উত্তর দেন, অর্থাৎ আইনসভাই মন্ত্রিগণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বিধানসভা নিম্নলিখিত উপায়ে মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা প্রকাশ করিতে পারে: (1) অনাস্থা প্রস্তাব পাশ; (2) মুলতুবী প্রস্তাব পাশ; (3) কোন ব্যয়-বরাদ্দের দাবি হ্রাস বা না-মঞ্জুর করা; (4) কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বিল বা প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা।

রাজ্যসরকারের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি (The Process of Law-making in the State Legislature): আইনসভায় পাশ করিবার জন্য উপস্থাপিত বিলগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: 'সাধারণ বিল' ও 'অর্থসম্বন্ধীয় বিল'।

সাধারণ বিল

সাধারণ বিল উভয় পরিষদের যে-কোন একটিতে উত্থাপিত হইতে পারিবে। সেখানে বিধান পরিষদ (Legislative Council) আছে, সেখানে উভয় পরিষদ কর্তৃক বিলটি পাশ করিতে হইবে। তাহার পর রাজ্যপালের সম্মতি লাভ করিলে উহা আইনে পরিণত হইবে। আইন পরিষদের অধিবেশন স্থগিত থাকিলে বিবেচনাধীন কোন বিল বাতিল হইয়া যাইবে না। বিধান পরিষদে প্রস্তাবিত কোন বিল, যাহা বিধানসভায় কখনও পাশ হয় নাই, তাহা বিধানসভা ভঙ্গ হইবার ফলে বাতিল হইয়া যাইবে না। কিন্তু যে-বিল বিধানসভায় উত্থাপিত ইয়াছে অথবা পাশ হইবার পর বিধান পরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হইয়াছে ত, বিধানসভা ভঙ্গ হইলে বাতিল হইয়া যাইবে।

য-রাজ্যে িধান পরিষদ আছে সেখানে যদি কোন বিল বিধানসভা কর্তৃক পাশ হইয়া ধো প্ররিত হইবার পর উহা বিধান পরিষদ কর্তৃক গৃহীত না হয় অথবা মাস যাবৎ উপস্থাপিত থাকিলেও বিধান পরিষদে উহা পাশ না হয়, অথ ধান-পরিষদ কর্তৃক বিধানসভার বিনা অনুমোদনে সংশোধিত আকারে পাশ হয়, তাহা হইলে বিধানসভা সেই অধিবেশনে বা পরবর্তী অধিবেশনে বিধান পরিষদের প্রস্তাবিত সংশোধন গ্রহণ করিয়া বা বিনা সংশোধনে বিলটি পাশ করিয়া বিধান পরি দে প্রেরণ করিতে পারে।

এইরূপে দ্বিতীয়বার বিধানসভা কর্তৃক বিলটি পাশ হইয়া বিধান পরিষদে প্রেরিত হইলে উহা যদি বিধান পরিষদ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, অথবা বিলটি বিধান পরিষদে উপস্থাপিত হইবার পর একমাস কাটিয়া যায়, অথবা বিধানসভার বিনা অনুমোদনে বিধান পরিষদ কর্তৃক পাশ হয় তাহা হইলে উক্ত বিল বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অর্থসম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব বিধান পরিষদে উত্থাপিত হইবে না। উহা আইনসভার নিম্ন পরিষদে অর্থাৎ বিধানসভায় (Legislative Assembly) উত্থাপিত হইবে। বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর উহা বিধান পরিষদে প্রেরিত হইবে।

বিধান পরিষদ ঐ বিল পাইবার চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ বিল সম্বন্ধে উহার সুপারিশ বিধানসভাকে জানাইবে। বিধানসভা ঐ বিল সম্বন্ধে বিধান পরিষদের সুপারিশ গ্রহণ করিলে ঐ সুপারিশসহ অর্থসম্বন্ধীয় বিল আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু যদি বিধানসভা ঐ বিল সম্বন্ধে বিধান পরিষদের সুপারিশ গ্রহণ না করে তাহা হইলে বিল যে-আকারে বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল সেই আকারে উভয় পরিষদ কর্তৃক পাশ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। যদি বিধান পরিষদ অর্থসম্বন্ধীয় বিলের প্রস্তাব পাইয়া 14 দিনের মধ্যে তাহা সুপারিশসহ বিধানসভায় প্রেরণ না করে তাহা হইলে যে-আকারে বিধানসভা কর্তৃক ঐ বিল অনুমোদিত হইয়াছিল সেই আকারে উভয় পরিষদ কর্তৃক উহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অর্থসম্বন্ধীয় বিল

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Central and State Governments) : কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে আইনগত, শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয়, অর্থসম্বন্ধীয়, রাজস্ববিভাগ ও বণ্টনগত নানাপ্রকার সম্বন্ধ আছে। নিম্নে উহারা একে একে আলোচিত হইয়াছে।

(1) **আইনগত সম্পর্ক**—ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের। অ[illegible] ভারতে দুই ধরনের সরকার আছে—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার। উভয় [illegible]ার সরকার কোন্ কোন্ বিষয় সম্পর্কে শাসন ও আইন প্রণয়ন করিতে [illegible]পারিবেন সংবিধানে নির্দিষ্ট আছে।

শাসনতন্ত্রের সপ্তম তপশীলে তিনটি তালিকা আছে : কেন্দ্রী[illegible] [illegible]Jnion List), রাজ্যতালিকা (State List) এবং যুগ্ম-তালিকা (Concurren List)। উক্ত তিনটি তা[illegible]কার বহির্ভূত বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন [illegible]য়ো[illegible]ন হইলে তাহার ক্ষমতা (residuary powers) কেন্দ্রীয় সংসদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তালিকায় উল্লিখিত নাই এইরূপ অবশিষ্ট বিষয়সমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় ভারতে কেন্দ্রীয় সরকা[illegible] রাজ্যসরকা[illegible]র তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে। যুগ্ম-তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে উভয়ের আইনে বিরোধ ঘটিলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বলবৎ থাকে এবং রাজ্যসরকারের আইন বাতিল হইয়া যায়।

আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বিভাগ : কেন্দ্র অধিকতর শক্তিশালী

সাধারণ অবস্থায় রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন করিতে সক্ষম না হইলেও নিম্নলিখিত অবস্থায় উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। প্রথমত, যদি রাজ্যসভায় (Council of States) উপস্থিত সভ্যগণ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এইরূপ

সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন আবশ্যক বা যুক্তিসঙ্গত, তাহা হইলে সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে· এই প্রকার আইনের মেয়াদকাল এক হইতে আড়াই বৎসরের বেশি হইবে না।

আম্বায়োেকন্ ক ব্যতিক্রম

দ্বিতীয়ত, সমগ্র ভারত কিংবা তদন্তর্গত কোন অঞ্চলের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার অজুহাতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা (emergency) ঘোষিত হইলে সংসদ ঐ ঘোষণা বলবৎ থাকা-কালে রাজ্যতালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। জরুরী ঘোষণার বলে সংসদ এই প্রকার আইন করিলে এই জরুরী ঘোষণা প্রত্যাহার হওয়ার পর এইরূপ আইনের মেয়াদ ছয়মাস কাল বলবৎ থাকিবে।

তৃতীয়ত, দুই বা ততোধিক রাজ্যসরকার যদি মনে করে যে, রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইন করার ক্ষমতা না থাকিলেও ঐ সকল রাজ্যসরকারের সুবিধার জন্য ঐ বিষয়ে সংসদেরই আইন প্রণয়ন করা কর্তব্য তাহা হইলে উহাদের অ. নসভা এই প্রকার প্রস্তাব করিলে সংসদ ঐ রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি লইয়া আই. প্রস্তুত করিতে পারিবে।

চতুর্থত, কো. বিষয় রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইলেও কোন সন্ধিশর্ত বহাল করিতে [illegible] শের সহিত কোন চুক্তি বা ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে সংসদ আ[illegible] পারিবে।

যদি র[illegible]সরকারের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনের অ[illegible]বা [illegible]র্তমানে প্রচলিত আইনের বিরোধী হয়, তাহা হই[illegible] রাজ্যসরকারের প্রণীত ঐ আইন রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত হইয়া তাঁহার সম্মতি প্রাপ্ত হইলে তবে বলবৎ হ[illegible]বে। শেষোক্ত প্রকার আইন সম্পর্কে সংশোধনমূলক আইন প্রণয়ন করিবার অধি[illegible]র সংসদের আ[illegible]ছ।

(2) **শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত সম্বন্ধ**—কেন্দ্রীয় সংসদ প্রণীত আইন ভারতের সকল রাজ্যের মধ্যে বাধ্যতামূলক হইবে। রাজ্যসরকারসমূহ সংসদ-প্রণীত কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না। সাধারণ অবস্থায় সংসদ কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহই সাসন করিতে পারিবে। কিন্তু জাতীয় অথবা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে রাজ্যসরকারগুলিকে নির্দেশ দিতে পারিবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারসমূহের অন্তর্গত রেলপথ সংরক্ষণ বিষয়ে

শাসন-সংক্রান্ত বিষয়েও কেন্দ্রের ক্ষমতা অধিক

উহাদের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং তজ্জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের টাকা চুক্তিমত দিতে বাধ্য থাকিবে।

কেন্দ্রীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করিয়া রাজ্যতালিকার বহির্ভূত যে-কোন বিষয়ের শাসনভার রাজ্যসরকারগুলিকে অর্পণ করিতে পারিবে। উহার জন্য যে-ব্যয় হইবে কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তিমত তাহা দিতে বাধ্য থাকিবে।

ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে যে-কোন বিচারালয়ের রায়, ডিক্রী অথবা হুকুম যে-কোন স্থানে জারি হইতে পারিবে।

একাধিক রাজ্যসরকারের মধ্যবর্তী কোন নদী কিংবা জল ব্যবহার, বণ্টন, নিয়ন্ত্রণ লইয়া কোন বিরোধ বা অভিযোগ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করিয়া সালিশীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন, তাহা হইলে জনসাধারণের কল্যাণকল্পে রাজ্যসরকার-সমূহের মধ্যে বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য পরামর্শ-পরিষদ (Council) নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(3) **অর্থসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা**—আইনগত উপায় ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন কর ধার্য হইতে পারিবে না। ভারতীয় সরকার কর্তৃক আদায়ী রাজস্ব, ভারতীয় সরকারের ঋণলব্ধ অর্থ এবং ভারতীয় সরকারের ঋণদান খাতে আদায়ী অর্থ ভারতীয় সঞ্চিত ভাণ্ডারে বা রাষ্ট্রীয় তহবিলে (consolidated fund of India) জমা হইবে। রাজ্যসরকারসমূহের রাজস্বখাতে আদায়ী অর্থ ও ঋণলব্ধ [illegible] ভাণ্ডারে (consolidated fund of the state) জমা হই[illegible]

অর্থসম্পর্কিত বিষয়ে কেন্দ্রিকতার ঝোঁক বেশি

যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, ভারতের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন। এই অবস্থায় উক্ত রাজ্যসরকারের আয় ও ব্যয়সম্পর্কিত সকল প্রকার প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের মাহিনা কমাইয়া দিতে পারিবেন।

(4) **রাজস্ববিভাগ ও বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত সম্পর্ক**—(ক) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য কয়েকটি কর রাজ্যসরকার কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রাপ্যরূপে নির্দিষ্ট হইবে; যেমন, দলিলাদির উপর ধার্য কর, ঔষধ ও প্রসাধন দ্রব্যের উপর শুল্ক প্রভৃতি।

(খ) ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত কয়েকটি কর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হইবে; যেমন, কৃষিজাত ভিন্ন অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় কর; সম্পত্তি কর (estate duty); রেলপথে, সমুদ্রপথে বা বিমানপথে পণ্য ও যাত্রীর উপর ধার্য

প্রান্তকর (terminal tax); রেলপথে যাত্রী ভাড়া ও মাশুলের উপর ধার্য কর; শেয়ার ও ফাট্কা বাজারে (stock exchange) লেনদেনের উপরে ধার্য কর; সংবাদপত্র ক্রয় অথবা বিক্রয় এবং উহাতে বিজ্ঞাপনের উপর ধার্য কর।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত কয়েকটি কর যাহা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হইবে, যেমন—আয়কর প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা এই রাজ্য কয়টিকে প্রতি বৎসর পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর ধার্য রপ্তানি শুল্কের আয়লব্ধ অর্থের কিয়দংশ রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট নিয়মে বণ্টন করিবেন। ঐ অর্থসাহায্য ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের উপর দায়যুক্ত থাকিবে।

যে সকল কর বা শুল্কের সহিত রাজ্যসরকারসমূহের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তাহার প্রবর্তন, পরিবর্তন বা সংশোধনমূলক কোন বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ভিন্ন পার্লামেন্টের কোন কক্ষে উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

এই সকল বিষয়েও কন্দ্রের প্রাধান্য [illegible]া যায়

কেন্দ্রীয় সংসদ কোন দুঃস্থ রাজ্যসরকারের সাহায্যকল্পে যে পরিমাণ সাহায্যদান করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিবে, সেই পরিমাণ সাহায্য করিতে পারিবে। ঐ অর্থ রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের উপর দায়মুক্ত হইবে। উপজাতিদের কল্যাণ সাধনের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হইবে ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে ঐ অর্থ দেওয়া হইবে এবং উহা রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের উপর [illegible] থাকিবে।

স[illegible] নতন আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি রাজ্যসরকার-গুলিকে সাহায্যদান মঞ্জুর করিতে পারিবেন। অর্থ কমিশন (finance commission) নিযুক্ত হইবার পর রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশ বিবেচনার [illegible] ঐরূপ সাহায্য মঞ্জুর করিবেন। বর্তমানে দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারগুলির আর্থিক সম্পর্ক স্থির হইতেছে।

[illegible]রতের বিচার বিভাগ (Indian Judiciary)

ভারতের বিচারালয়গুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী আদালত। জমিজমা, বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে বিরোধের বিচার হয় দেওয়ানী আদালতে; আর মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনজখম প্রভৃতি অপরাধের বিচার হয় ফৌজদারী আদালতে।

দেওয়ানী মামলার বিচার (Civil Judiciary): দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য সর্বাপেক্ষা নিম্নে ছিল ইউনিয়ন কোর্ট*। বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে

পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় এই কোর্টের স্থান অধিকার করিয়াছে ন্যায়-পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত আদালত। প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি আদালত থাকে। ইহার উপর ছোট ছোট দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার দেওয়া আছে। পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া এক একটি গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠিত হইয়াছে এবং সেই গ্রাম-পঞ্চায়েতসমূহ অনেক ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করিতেছে। এই সকল ন্যায়-পঞ্চায়েত অনধিক একশত টাকার দাবী-দাওয়া সংবলিত দেওয়ানী মামলা ও ফৌজদারী মামলারও বিচার করিবে। ইহার উপরে মহকুমাতে বা চৌকিতে মুনসেফের আদালত থাকে এবং নির্দিষ্ট অল্পমূল্যের সম্পত্তি-সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা এই মুনসেফের আদালতে বিচার হয়। সম্পত্তির মূল্য ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি হইলে সাব-জজ বা জিলা জজের আদালতে সেই মামলার বিচার হইয়া থাকে। জিলার বিচার বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হইলেন জিলা জজ। মুনসেফের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জিলা জজের নিকট আপীল করা হয়। বড় বড় শহরে ছোটখাটো দেওয়ানী বিচার করিয়া থাকে ছোট দেওয়ানী আদালত (small causes court)।

(1) ইউনিয়ন কোর্ট বা ন্যায়-পঞ্চায়েত
(2) মুনসেফী আদালত
(3) জিলা জজ
(4) হাইকোর্ট
(5) সুপ্রিম কোর্ট

প্রত্যেকটি রাজ্যের রাজধানীতে একটি করিয়া হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ আছে এবং রাজ্যের মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা বড় আদালত। জিলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে এবং বড় বড় শহরের ছোট দেওয়ানী আদালতের (small causes court) রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট বা অধিধর্মাধিকরণে আপীল করা চলে। এই সুপ্রিম কোর্ট হইল সর্বোচ্চ বিচারালয়, ইহার রায়ের বিরুদ্ধে কোথাও আপীল করা চলে না।

ফৌজদারী মামলার বিচার (Criminal Judiciary) : ফৌজদারী মামলার বিচারের সর্বনিম্ন আদালত হইল ইউনিয়ন বেঞ্চ*। কোন কোন ইউনিয়ন বোর্ডের উপর ছোট ছোট ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া যে এক একটি ন্যায়-পঞ্চায়েত গঠিত হইতেছে উহারা ছোটখাটো ফৌজদারী মামলার বিচার করিবে। ইহার উপরে মহকুমা বা জিলা শহরে ম্যাজিস্ট্রেটগণ ফৌজদারী মামলার বিচার করিয়া থাকেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন; ইহা ব্যতীত অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন, ইহারা ম্যাজিস্ট্রেটের সুপারিশে রাজ্যসরকারের বিচারবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন। অভিযুক্ত আসামীকে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট 50 টাকা জরিমানা ও একমাস জেল; দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট 200 টাকা জরিমানা ও 6 মাস জেল, এবং প্রথম

---

* ইউনিয়ন বোর্ডের দেওয়ানী বিচারের শাখাকে বলে ইউনিয়ন কোর্ট এবং ফৌজদারী বিচারের শাখাকে বলা হয় ইউনিয়ন বেঞ্চ।

শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট 1000 টাকা জরিমানা ও 2 বৎসর জেল দিতে পারেন। জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা থাকে এবং তাঁহার নিকট দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে পুলিশ কোর্ট ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ফৌজদারী মামলার বিচার করিয়া থাকে। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হইতে আপীলের শুনানী হয় জিলা ও দায়রা জজের কোর্টে; জিলা দায়রা জজ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারেন। সেই মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(1) ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ন্যায়-পঞ্চায়েত
(2) ম্যাজিস্ট্রেটগণ
(3) জেলা দায়রা জজ
(4) হাইকোর্ট
(5) সুপ্রিম কোর্ট

কোন গুরুতর ফৌজদারী মামলা হইলে, যেমন—খুন বা অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি, ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শুনানীর পর দায়রা জজের নিকট মামলা পাঠাইয়া দিবেন। দায়রা জজ জুরীর সাহায্যে সেই মামলার বিচার করিবেন। বড় বড় শহরে হাইকোর্টে এই মামলার বিচার হইয়া থাকে। ফৌজদারী মামলায় জিলা জজের কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা চলিবে; সুপ্রিম কোর্টের রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া হইবে।

হাইকোর্ট (High Court): সংবিধান অনুসারে (214 নম্বর ধারা) প্রত্যেক রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত সেই রাজ্যের হাইকোর্ট বা মহান্যায়াধিকরণ। তবে (সংবিধানের 231 নম্বর ধারায়) সংসদকে দুই অথবা আরও বেশিসংখ্যক রাজ্যের জন্য এক হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দেওয়া লইয়াছে।*

একজন প্রধান বিচারপতি এবং যে-কয়জন বিচারপতি নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন সেই কয়জন বিচারপতি লইয়া হাইকোর্ট গঠিত। রাষ্ট্রপতি সর্বাধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতিও নিয়োগ করিতে পারেন। সাধারণত বিচারপতিদের কার্যকাল ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করেন। সাধারণ বিচারপতিদের সময়ে রাজ্যপাল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করেন।

হাইকোর্টের গঠন

বাষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত চাকুরির মেয়াদ হইলেও তাহার পূর্বেই রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিয়া যে-কোন বিচারক পদত্যাগ করিতে পারেন। ইহাঁ

* যেমন এই ধারা অনুযায়ী সংসদ স্থির করিয়াছে, 1972 সাল হইতে মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও নাগাল্যাণ্ডের কাজকর্ম আসামের হাইকোর্টই চালাইবে।

ছাড়া অসদাচরণ, দুর্নীতি প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মতই হাইকোর্টের বিচারপতিগণ পদচ্যুত হইতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতির আদেশে অন্য রাজ্যের হাইকোর্ট অথবা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকপদে উন্নীত হইতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারপতিদের ভারতের নাগরিক হইতে হইবে এবং অন্তত দশ বৎসর বিচারকার্যের অথবা এক বা একাধিক হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংবিধানে ইঁহাদের অপসারণের এক বিশেষ পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে। সংসদে আনীত এবং উভয় সদন হইতে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে অপসারণের প্রস্তাবটি পাশ করাইয়া রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাইতে হয় এবং রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। এরূপ করা সহজ নহে। তাই হাইকোর্টের বিচারকদের চাকুরির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের বেতনও আইনসভার ভোটে দেওয়া হয় না। অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অবস্থিত হইলেও তথাকার আইনসভা হাইকোর্টের সংবিধান ও সংগঠনের কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতনও সংবিধানে নির্দিষ্ট। প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক 4000 টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণের বেতন মাসিক 3500 টাকা। সংসদীয় বিধান এবং সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহাদের অন্যান্য ভাতা, ছুটি ও সুখসুবিধাও স্থিরীকৃত। নিয়োগের পর এই সকল সুযোগ-সুবিধাও কোন পরিবর্তন করা চলে না।

বিচারকদের নিয়োগ, বদলী, বেতন ও অপসারণ

প্রত্যেক রাজ্যেই হাইকোর্ট সেই রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী সমস্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ আপীল আদালত। প্রেসিডেন্সী শহরগুলিতে (কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ) অবস্থিত হাইকোর্টের যুগপৎ আপীল ও মৌলিক ক্ষেত্রাধিকার রহিয়াছে। মৌলিক ক্ষেত্রাধিকারের বলে হাইকোর্ট সরাসরি যে কোন মামলার বিচার করিতে পারে। নূতন সংবিধানে রাজস্ব সংক্রান্ত বিরোধও (যাহা পূর্বে এই আদালতের এক্তিয়ারের বাহিরে) মৌলিক ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আপীল আদালত হিসাবে রাজ্যের নিম্নতম আদালত হইতে প্রেরিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী সর্ববিধ মামলার শুনানী গ্রহণ করে হাইকোর্ট। যদি নিম্ন কোন আদালতে চলতি কোন মামলায় হাইকোর্টের বিবেচনায় সংবিধান সংক্রান্ত গুরুপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে হাইকোর্ট সেই মামলা তুলিয়া লইয়া আসিয়া স্বয়ং বিচার করিতে পারে। তাহার পর ঐ মামলা সম্পর্কে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দিতে পারে অথবা শুধুমাত্র সাংবিধানিক আইনের প্রশ্নটির সমাধান করিয়া মামলার অন্যান্য অংশের উপর রায় দিবার ভার সংশ্লিষ্ট নিম্নতন

হাইকোর্টের কার্য ও ক্ষমতা

আদালতে ন্যস্ত করিতে পারে। হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধিকারসমূহের পরিবর্ধন বা সংকোচনের ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সংসদকে দেওয়া হইয়াছে। উপরের ক্ষমতাগুলি ছাড়া (সংবিধানের 227 নম্বর ধারা অনুযায়ী) সামরিক ট্রাইবুনাল ব্যতীত নিম্নতন আদালতগুলির উপর নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃত্ব করার অধিকারও হাইকোর্টকে দেওয়া হইয়াছে। বিশেষত, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রভৃতি রক্ষার জন্য হাইকোর্ট হেবিয়াস্ কর্পাস, ম্যাণ্ডামাস, প্রহিবিশন, ওয়ারাণ্টো, সার্টিওরেরাই প্রভৃতি বিভিন্ন নির্দেশনামা জারী করিতে পারে। ইহা ছাড়া স্বীয় কর্মচারী নিয়োগ ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতাও হাইকোর্টের আছে।

সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় হাইকোর্টও অভিলেখ-আদালত (বা Court of Record)। ইহার অর্থ হইল যে হাইকোর্টের সমস্ত রেকর্ড রক্ষিত হয় এবং পরবর্তীকালে উহা সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। কোন ব্যক্তি যদি আদালতের অবমানকর কোন উক্তি করেন তবে কোর্ট অব রেকর্ড হিসাবে হাইকোর্ট তাঁহাকে দণ্ড দিতে পারে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট (The Supreme Court of India) : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বিভক্ত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রধানত মিশ্র কাঠামো, ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিতে পারে। উভয় প্রকার সরকারই লিখিত সংবিধান হইতে ক্ষমতা পায় বটে কিন্তু ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের গুরুত্ব

সময় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অথবা কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দিতে পারে। এই সময় সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় এবং সেই ব্যাখ্যা সকলে মানিয়া লয় এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান (authority) থাকা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় তাই সংবিধানের রক্ষক। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের নাম সুপ্রিম কোর্ট। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হইলে পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া পড়িবে। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের স্বাধীনতা রক্ষা করা ভারতের সংবিধানের একটি অন্যতম প্রধান দিক।

সংবিধানের 124 নং ধারা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক 7 জন বিচারপতি লইয়া গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় হওয়ার কথা। সংবিধানে লেখা আছে যে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইতে পারেন। 1956 সালে এবং 1960 সালে পার্লামেণ্ট নূতন আইন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা যথাক্রমে 11 জন ও 14 জন নির্দিষ্ট করিয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ করিতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের

প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি এই বিষয়ে অভিজ্ঞ বিচারপতিদের, প্রধান ধর্মাধিকরণ রাজ্যসমূহের হাইকোর্টগুলির প্রধান বিচারপতির এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিতে হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে কতকগুলি যোগ্যতা থাকা দরকার। তাঁহাকে ভারতের নাগরিক হইতে হয়, একজন খ্যাতনামা আইনজ্ঞ হইতে হয় অথবা কোন হাইকোর্টে অন্তত পাঁচ বৎসরের জন্য বিচারপতি হইতে হয় অথবা অন্তত দশ বৎসর কোন হাইকোর্টে বা একাধিক হাইকোর্টে একটানা ওকালতির অভিজ্ঞতা থাকিতে হয়।

সুপ্রিম কোর্টের গঠন

আমাদের দেশে সুপ্রিম কোর্টের স্বাধীনতা কয়েকটি উপায়ে রক্ষা করার চেষ্টা হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানে কোন নিম্নতম বয়সের সীমা উল্লেখ করা হয় নাই, তবে একবার নিয়োগের পরে বিচারপতিগণ 65 বৎসর বয়স পর্যন্ত চাকুরিতে বহাল থাকেন। সংবিধান-নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে কোনক্রমেই তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় না। একমাত্র নিজ হস্তে লিখিত ভাবে প্রদত্ত পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইলে, অথবা সংসদের উভয়পক্ষে কোন বিচারপতির অসদাচরণের জন্য অপসারণের প্রস্তাব গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে বিচারপতিকে পদত্যাগ করিতে হয়। বিচারপতিদের বেতন সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট। প্রধান বিচারপতি প্রতি মাসে 5000 টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ 4000 টাকা বেতন পান। এই সকল বেতন দেওয়া হয় দেশের সংরক্ষিত তহবিল হইতে, সুতরাং বেতনের পরিমাণ ইত্যাদি সংসদের ভোটাভুটির উপর নির্ভর করে না। সংবিধানের 125 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে বিচারকদের চাকুরির শর্ত, সুযোগ-সুবিধা বা অধিকারসমূহ তাঁহার নিযুক্ত হওয়ার পর আর বদল করা যাইবে না। একমাত্র আর্থিক জরুরী অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতির আদেশবলে বিচারকদের মাহিনার পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। এই সকল কারণের ফলে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

সুপ্রিম কোর্টের কাজকর্ম ও ক্ষমতা (Functions and Powers of the Supreme Court) : পৃথিবীর বেশির ভাগ যুক্তরাষ্ট্রেই যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় এবং অঙ্গরাজ্যের আদালতগুলি স্বাধীন। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্য এই দুই কাঠামোতে বিচারব্যবস্থা তৈয়ারী। কিন্তু ভারতের বিচার-সংগঠন এককেন্দ্রিক ধরনের, ইহা পিরামিডের সঙ্গে তুলনীয়। সুপ্রিম কোর্ট এই পিরামিডের চূড়ায় অবস্থিত, সুতরাং ইহার ক্ষমতাও অসামান্য। সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের তিনটি

ক্ষেত্রাধিকারের (jurisdiction) কথা বলা হইয়াছে : (1) মৌলিক (Original), (2) আপীল সংক্রান্ত (Appellate) এবং (3) পরামর্শ সংক্রান্ত (Advisory)।

(1) সংবিধানের 131 নম্বর ধারায় সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকার ক্ষমতাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। কেন্দ্র ও এক বা একাধিক রাজ্যসরকারের মধ্যে, অথবা কোন কোন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার সঙ্কোচন বা সংবিধানের ব্যাখ্যা লইয়া যদি গোলযোগ বাধে, তবে তাহা হয় সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকার বিষয়বস্তু। ভরতে অন্য কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সুপ্রিম কোর্ট ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির সংরক্ষক। এই মৌলিক অধিকারগুলি-সংক্রান্ত বিবাদ মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত, তবে রাজ্যের হাইকোর্টকেও এই বিষয়ে কিছু কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

1. মৌলিক ক্ষেত্রের ক্ষমতাসমূহ

মৌলিক অধিকারগুলির কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন (ক) কোন অঙ্গরাজ্য জড়িত আছে এমন সমস্ত চুক্তি বা সনদের কোন বিধান, অন্তঃরাজ্য জলবিরোধ, অর্থ কমিশনের নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরিত আর্থিক বিষয়সমূহ সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রাধিকারের বাহিরে। (খ) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রেও একমাত্র আইনসঙ্গত অধিকারের রক্ষার জন্যই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা যায়, কোন রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বিরোধের মীমাংসা এখানে করা যায় না।

(2) আপীল-সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকারটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় : (ক) সাংবিধানিক আপীল ; (খ) দেওয়ানী মামলা-সংক্রান্ত আপীল ; এবং (গ) ফৌজদারী মামলা-সংক্রান্ত আপীল। (ক) সাংবিধানিক আপীল—কোন মামলায় হাইকোর্টের রায় বা আদেশের বদলে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যায় যদি হাইকোর্ট এই মর্মে সুপারিশ (certificate) করে যে সংশ্লিষ্ট মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে। হাইকোর্ট এইরূপ কোন সুপারিশ করিতে অস্বীকার করিলে সুপ্রিম কোর্ট এই ধরনের আপীলের বিচারের জন্য বিশেষ অনুমতি (special leave) দিতে পারে।

2. আপীল-সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকা

(খ) দেওয়ানী আপীল—বিশেব বিশেষ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট হইতে দেওয়ানী মামলার আপীল সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা যায় যদি হাইকোর্ট এই মর্মে সুপারিশ দেয় যে এই মামলায় কমপক্ষে 20,000 টাকা জড়িত আছে, অথবা অন্য কোন কারণে আলোচ্য বিরোধটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারের যোগ্য। তবে যদি নিম্নতর আদালতের রায় হাইকোর্টও বহাল রাখে, তাহা হইলে আপীল পাঠাইবার জন্য হাইকোর্টকে

আরও সুপারিশ করিতে হইবে যে সংশ্লিষ্ট মামলায় গুরুতর আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে।

(গ) ফৌজদারী আপীল—ফৌজদারী মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় যদি হাইকোর্ট পুনর্বিচার করিয়া কোনো আসামীর মুক্তির আদেশ রহিত করে অথবা তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, কিংবা নিম্নতর আদালতে চলাকালীন কোন মামলা সরাসরি তুলিয়া আনিয়া আসামীকে অভিযুক্ত এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, কিংবা মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে পুনর্বিবেচনার যোগ্য, এই মর্মে হাইকোর্ট সুপারিশ দেয়।

ইহা ব্যতীত 136 নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের ইচ্ছামত আপীল-সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার পরিবর্ধনের সুযোগ রহিয়াছে। কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা-বাহিনীর জন্য আইনবলে সংগঠিত ট্রাইবুনাল ছাড়া অন্য যে কোন আদালতে চলতি যে-কোন মামলার আপীলের জন্য সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ অনুমতি (Special leave) দিতে পারে। আবার 138 নম্বর ধারা অনুসারে সংসদ সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রাধিকার কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত সমস্ত বিষয়ে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগপৎ সম্মতিক্রমে অন্য যে-কোন বিষয়ে সম্প্রসারিত করিতে পারে।

ক্ষেত্রাধিকার পরিবর্ধনের সুযোগ

(3) সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ দান-সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে 143 নম্বর ধারায় আলোচনা করা হইয়াছে। সাংবিধানিক আইন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইন ও তথ্যের প্রশ্নে (question of law and fact) রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইতে পারেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দিতে বাধ্য নন। আবার এই পরামর্শ গ্রহণ করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক কি-না সেই বিষয়েও সংবিধানে স্পষ্ট কিছু বলা হয় নাই।

3. পরামর্শ দান সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার

সর্বশেষ, সুপ্রিম কোর্টের আরও কয়েকটি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুপ্রিম কোর্টে গৃহীত সিদ্ধান্ত অন্যান্য সমস্ত বিচারালয় মানিয়া লইতে বাধ্য। উহার রায় ভারতের সমস্ত হাইকোর্ট ও অন্যান্য নিম্ন আদালতের নজিররূপে গৃহীত হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকেরা যে সিদ্ধান্ত করেন তাহা আইনরূপে গণ্য হয়। অবশ্য প্রয়োজন বুঝিলে ও ইচ্ছা হইলে সুপ্রিম কোর্ট এই প্রকার মামলায় নিজেদের রায় বদলাইয়া নূতন সিদ্ধান্ত লইতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের যেরূপ ব্যাখ্যা করিবে তাহাই সকলে মানিতে বাধ্য। সংবিধানে ঘোষণা করা হইয়াছে যে প্রত্যেক অসামরিক ও

সুপ্রিম কোর্টের প্রাধান্য

বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের সহায়ক কাজ করিতে বাধ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সুপ্রিম কোর্ট কোন কোন বিষয়ে আইনসভা ও শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী।

সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা ও স্থান (Role and Position of the Supreme Court): ভারতের শাসনব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিচারালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য হইল আইনসমূহ যথাযথ প্রযুক্ত ও প্রতিপালিত হইতেছে কি-না এবং কোন কোন বিচারালয়ে কোন বিচারপ্রার্থীকে ন্যায়বিচার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে কি-না, সেই বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখা। এই উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্টকে একটি এককেন্দ্রিক বিচার সংগঠনের শীর্ষদেশে আসন দেওয়া হইয়াছে. যতদূর সম্ভব ইহার স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহার মূল উদ্দেশ্যগুলিকে কার্যকরী করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। দেশের সমগ্র বিচার-সংগঠনের শীর্ষদেশে থাকায় সুপ্রিম কোর্ট ঐক্যবন্ধনের সহায়ক (unifying force)। সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত আইন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দেশের সমস্ত বিচারালয় মানিয়া লইতে বাধ্য। ফলে সারা দেশে একটি সুসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনের ঐতিহ্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সর্বোপরি, সুপ্রিম কোর্টের উপরই সংবিধান ব্যাখ্যা করা এবং রক্ষা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব। সংবিধান সংরক্ষণের দুইটি তাৎপর্য: (1) যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে সংবিধানে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধের মীমাংসা, এবং (2) দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা, এই দুইটি কাজের জন্য সংবিধানের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের প্রণীত আইনসমূহের বৈধতা পরীক্ষা করিতে হয়। ইহাকে বলে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা (Judicial Review)।

সংবিধানের ব্যাখ্যাকারী ও সংরক্ষক

বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা বা Judicial Review কাহাকে বলে? রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড বা গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি দেশের সংবিধানে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে, বা প্রথা আছে যে, দেশের বিচারবিভাগ সংবিধান ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। এই সকল দেশের আইনসভা যে কোন আইনই পাশ করুক না কেন কোন আদালত বলিতে পারে না যে ঐরূপ আইন করিবার ক্ষমতা আইনসভার আছে কিংবা নাই। কিন্তু আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টকে সংবিধান ব্যাখ্যা করার বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই দেশে, "The Constitution comes to mean what the court say it means." ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ ক্ষমতা সুপ্রিম

বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা বা জুডিশিয়াল রিভিউ

কোর্টের আছে। অর্থাৎ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট যদি দেখিতে পায় যে কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যের কোন আইন এমন হইয়াছে যাহার দ্বারা সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে অথবা সংবিধানে নির্দিষ্ট ক্ষমতাবণ্টন লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহা হইলে মামলা উপস্থিত হইলে রায় দিবার সময়ে সুপ্রিম কোর্ট ঐ আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। সংবিধানের সহিত সঙ্গতি না থাকিলে কোন আইন বৈধ হইতে পারে না এবং ঐরূপ সঙ্গতি আছে কি-না তাহা বিচার করার ভার সুপ্রিম কোর্টের উপর। বিচারবিভাগ কর্তৃক কোন আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতাকে "জুডিশিয়াল রিভিউ" বলে।*

বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা ক্ষমতা একেবারে পূর্ণ নয়

মার্কিন বিচারবিভাগীয় আইন সমীক্ষার ক্ষমতা এত ব্যাপক যে কংগ্রেসের অনেক প্রগতিশীল আইনই মার্কিন ফেডারেল কোর্ট বাতিল করিয়া দিয়াছে। বিচারকদের রক্ষণশীল মতামত বা রাজনৈতিক প্রবণতা নূতন ও প্রগতিশীল আইন প্রণয়নে বাধা দিয়াছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টও জমিদারী উচ্ছেদ আইনগুলিকে সংবিধান বিরোধী বলিয়া রায় দিয়াছিল। বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ফলে আইনসভার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে চায়। এই কারণের ফলে আমাদের দেশের সংবিধানে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি রক্ষামূলক ব্যবস্থাও (safeguards) গৃহীত হইয়াছে।

* 1950 খৃষ্টাব্দে একটি মামলার রায় দান প্রসঙ্গে বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন "A statute law to be valid must in all cases be in conformity with the constitutional requirements and it is for the judiciary to decide whether any enactment is constitutional or not."

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

Higher Secondary Examination

ECONOMICS AND CIVICS

Group A (Answer any *three* questions)

1. Define wealth, What are the characteristics of wealth? Give reasons for your answer.

2. Describe the advantages and disadvantages of large scale production.

3. Explain, with reference to an example, the meaning of barter. Describe the disadvantages of barter.

4. Discuss the reasons for the difference in the rates of ɜrest on different types of loans.

5. What is meant by international trade? What are its advantages and disadvantages?

Group B (Answer any *three* questions)

6. Define citizenship. Distinguish between a citizen and an alien.

7. Explain the meanings of law and right. Indicate their relationship.

8. Define democracy. What are the factors upon which the success of democracy depends?

9. What is meant by adult suffrage? Explain the arguments for and against it.

10. What are the powers given to the President of India under the Indian Constitution?

—

Higher Secondary Examination

ECONOMICS AND CIVICS

ক—বিভাগ (যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

1. চাহিদা কাহাকে বলে? চাহিদার লক্ষণগুলি বুঝাইয়া দাও।

2. উৎপাদনের উপাদানগুলি উল্লেখ কর এবং প্রত্যেকটির অর্থ বুঝাইয়া দাও।

3. শিল্পের স্থানীয়করণ কাহাকে বলে? স্থানীয়করণের কারণগুলি বুঝাইয়া দাও।

4. মুদ্রার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। মুদ্রার পরিমাণের সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

5. ব্যাংকের কার্যাবলী বুঝাইয়া দাও। ভারতীয় ব্যাংকগুলির শ্রেণী নির্ণয় কর এবং সংক্ষেপে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাংকের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা কর।

খ—বিভাগ (যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

6. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য কিভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তাহা ব্যাখ্যা কর।

7. ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

8. জনমত কাহাকে বলে ? জনমত প্রকাশের মাধ্যমগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

9. ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যপালকে কি কি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ?

10. আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

[ENGLISH VERSION]

Group A (Answer any *three* questions)

1. Explain the meaning of demand and point out its ...ics.

2. ...n the factors of production and explain the meaning of each of them.

3. What is meant by localisation of industry ? Explain the causes of localisation.

4. Define money. Explain the relation between the quantity of money and the level of prices.

5. Explain the functions of banks. Classify the Indian banks and briefly explain the peculiarities of different kinds of banks.

Group B (Answer any *three* questions)

6. Explain how the rights and duties of citizenship are mutually related.

7. Explain carefully the principle of Separation of Powers.

8. What ... meant by public opinion ? Describe briefly the media of the ...ression of public opinion.

9. What are the powers of the Governor under the Constitution of India ?

10. Describe briefly the end and functions of modern States.

Higher Secondary Examination, 1969 (Compt.)

ECONOMICS AND CIVICS

Group A (*Answer any* THREE *questions.*)

1. Define Economics and explain the subject matter of Economics.

2. What is market ? What are the factors that determine the size of the market ?

3. Explain the functions of money,

4. How is the rate of interest determined ?

5. What is meant by international trade? Describe its advantages.

Group B (*Answer any* THREE *questions.*)

6. Define State and explain the elements of the State.

7. Define Law and explain clearly the usefulness of Law.

8. What do you understand by Constitution? Distinguish between Written and Unwritten Constitution.

9. Explain the advantages of party system,

10. How is the Prime Minister of India appointed Describe his powers.

Higher Secondary Examination, 1970

ECONOMICS AND CIVICS

Group A (যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

1. কোন দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হইলে ঐ দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক তাহা কি ভাবে বুঝিবে? অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের চাহিদা কি স্থিতিস্থাপক হয়? কারণসহ উত্তর দাও।

2. বৃহদায়তনে উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যেকটির অন্তত একটি করিয়া বাস্তব উদাহরণসহ উত্তর দাও।

3. বাজার দাম ও স্বাভাবিক দামের পার্থক্য দেখাও। কি ভাবে বাজার দাম নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।

4. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাহাকে বলে? উহার প্রধান কার্য কি

5. জাতীয় আয় কাহাকে বলে? ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎসগুলি আলোচনা কর।

Group B (যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

6. আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর।

7. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাহাকে বলে? এইরূপ শাসন ব্যবস্থার গুণাগুণ কি কি?

8. গণতন্ত্রে একাধিক দল থাকা অপরিহার্য কেন? আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির কার্য ব্যাখ্যা কর।

9. ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও কেন্দ্রীয় আইনসভার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

10. জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(ENGLISH VERSION)

Group A (*Answer any* **three** *questions.*)

1. If the price of a commodity changes, how can you find out whether the demand for the commodity is elastic or in-elastic ?

Is the demand for necessaries is elastic ? Give reasons for your answer.

2. What is meant by internal and external economies of large scale prod..ion ? Illustrate your answer by giving at least one concrete example of each.

3. ..tinguish between market price and normal price. Explain ... market price of a commodity is determined.

...t ... a Central Bank ? What are its main functions ?

... National Income ? Discuss the principal sources ... National Income.

Group B (*Answer any* **three** *questions*)

6. Explain the relationship between Law and Liberty.

7. What is a Federal Government ? What are the merits and defects of such a form of government ?

8. Why should there be a number of political parties in a democracy ? Explain the functions of political parties in a modern democracy.

9. Explain the relation between the Union Executive and the Union Legislature in the present Constitution of India.

10. Explain the meaning of nationalism.

Hig.. r Secondary Examination, 1970 (Co..pt.)

ECONOMICS AND CIVICS

Group A (*Answer any* **three** *questions.*)

1. What is meant by Demand ? What are the factors that govern a consumer's demand for a commo..ty ?

2. What is Capital ? Explain the importance of capital formation for economic development.

3. Explain clearly the advantages of division of labour.

4. What is Money ? Discuss the advantages and disadvantages of paper money.

5. What is a Commercial Bank ? What are its main functions ?

Group B (*Answer any* **three** *questions*)

6. In what respects does the State differ from other associations ? Distinguish the State from Government.

7. How is Citizenship acquired and how does it terminate ?

8. Discuss the merits and defects of democratic form of government.

9. Describe the method of election of the President of India. Discuss the relation between the Presic nd his Council of Ministers.

10. What do you mean by Public C ion ? Describe the methods of influencing Public Opinion.

Higher Secondary Examinatio

ECONOMICS AND CIVIC

Group A (যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দ

1. ক্রমহ্রাসমান উপযোগবিধির নিয়মটি ব্যাখ্যা কর। মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক কি ?

2. আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার কাজগুলি আলোচনা কর।

3. কি কি উপাদান বাজারের পরিধি নিয়ন্ত্রিত করে ? স্বল্পকালীন বাজার ও দীর্ঘকালীন বাজারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

স্থদ বলিতে কি বুঝ ? বিভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য স্থদের হারের তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা কর।

5. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা কর। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে ?

Group B (যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

6. রাষ্ট্রের কতিপয় প্রয়োজনীয় এবং কতিপয় বিকল্প ন কর।

7. গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝ ? ইহার গুণ কি কি ? ইহার সাফল্যের শর্ত কি কি ?

8. শাসনতন্ত্র বলিতে কি বুঝ ? নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

9. আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কর।

10. পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি কি কি ? ইহাদের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ENGLISH VERSION)

Group A (*Answer any* **three** *questions*)

1. Explain the Law of Diminishing Utility. What is the relation between total utility and marginal utility ?

2. Discuss the functions of an entrepreneur in a modern industrial organisation.

3. What are the factors governing the size of the market ? Distinguish between short-period market and long-period market.

4. What do you mean by interest ? Account for the variation in the rates of interest on different types of loans.

5. Describe th[illegible] of commercial banks. How does a Central Bank cont[illegible] commercial banks ?

Grou[illegible] (*Answer any* **three** *questions*)

6. Describe s[illegible] of the essential and optional functions of the State.

7. [illegible] mean by democracy ? What are its merits ? What [illegible]ns of its success ?

8. [illegible]ou mean by a Constitution ? Distinguish betwee[illegible] onstitution and a flexible Constitution.

[illegible] the functions of a political party in a modern [illegible]

[illegible] What are the various institutions for Local Self-Government in West Bengal ? Briefly discuss their functions.

Higher Secondary Examination, 1971 (Compt.)

ECONOMICS AND CIVICS

Group A (*Answer any* **three** *questions*)

1. Explain the law of Demand, Has this law any exception ?

2. Define Capital. Distinguish between Fixed and Circulating Capital. Discuss the functions of Capital in production.

3. "Value is determined by the general relations of demand and supply." E[illegible] and illustrate.

4. Wha[illegible] mean by inflation ? Describe the effects of inflation.

5. Define profit and explain the different elements of profit.

Group B (*Answer any* **three** *questions*)

6. Distinguish between a Citizen and an Alien. How is Citizenship acquired ?

7. Discuss the merits and demerits of a Unitary State.

8. Explain the principle of Separation of Powers. Do you think that strict separation of powers is desirable ?

9. Discuss the advantages of the Party System. What are the disadvantages of a Multi-party System ?

10. Discuss the relation between
 (*a*) the President and his Council of Ministers, and
 (*b*) the Council of Ministers and Parliament in India.